স্ফুরিত যৌবন
অপু রোজারিও
একটি রেমোশ নিবেদন
লিমন

রৌদ্র-ছায়ার বাঁক পেরিয়ে সময় সামনে এগোয়। রোদের আঁচ কখনো মায়াবী ছোঁয়ার মতো কোমল, কখনো বা ফসলী মাঠ পুরিয়ে দেয়ার মতো ঝলসানো; ছায়াও কখনো পরম বিশ্বাসী এক অনাবিল আশ্বাসে মোড়ানো সপ্নালোকের মতো নরম, কখনো বা ধূসর গণ্ডি পেরোনো আতঙ্কিত মানের গাঢ়, কৃষ্ণ। এহেন রৌদ্র-ছায়ার অসংখ্য বাঁক পেরিয়ে শিমুল সামনে এগুতে থাকে। তার চলায় সাথী হয় কখনো রিয়া, কখনো অতুল; কখনো রীতা, সবুজ, কখনো বা তিথি। কিন্তু তার এই পথচলার শুরুটাই হয় মূলত ফেলু মেম্বরের ছত্রছায়ায় এবং তাকে ভেঙ্গে ফেলার আকুলতায়। শিমুলের পথ হয়ে ওঠে বন্ধুর! মাটিমাখা মা এবং জোছনার মতো নরম বড়'পাও বিশ্বাসী ছায়া হয়ে শিমুলকে রক্ষা করতে পারে না। শিমুল নিষিদ্ধ হয়ে ওঠে।

প্রগতির বিপরীত স্রোত ভেঙ্গে শিমুল চলতে থাকে। সামনে হাঁ কোরে আছে এক দূরবর্তী অচেনা দ্বীপ। কোনো এক কালবেলায় কালাকানুনের বিষচুম্বনে সে বিবষিত হয়, হয়ে ওঠে নিষিদ্ধ দ্বীপের বিচ্ছিন্ন বাসিন্দা। তখনো কে তার পাশে রবে, সঙ্গ দেবে একাকীত্ব ভাঙ্গার দৃপ্ত প্রত্যয়ে!

এমনই এক ঘুণেধরা দ্বন্দ্বমুখর সমাজতাত্ত্বিক চিত্রকল্পের আদিপর্ব— 'স্ফুরিত যৌবন'

স্ফুরিত যৌবন

অপু রোজারিও

রেসি এন্টারপ্রাইজ

লেখকের প্রকাশিত বই
‘বিপরীত উত্থান’
‘বিন্দুর গভীরে’

‘বইমেলা’য় প্রকাশের অপেক্ষায়
কাব্যগ্রন্থ- বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণা

"রজনীগন্ধা'র বুকে বাসা বাঁধে
কতটুকু ভালোবাসা
তোমাকে হলো না বলা
কী দারুণ অক্ষম আমি!"

রেবু,
আমার 'ঈশ্বরী'কে

ছোট্ট খাল। তাতে কি, বর্ষা মওসুমে জল রীতিমতো থৈ থৈ করে। এঁকে বেঁকে, গাছ-পালা আর ঘর বাড়ির আঙ্গিনা ছুঁয়ে এক ফাঁকে আত্রাই নদীতে গিয়ে মিশেছে। ভরা ভাঁদরে দু'চারটে ব্যবসায়িক নৌকা খাল ধোরে ভেতরে ঢুকে পড়ে। জলে মোটামুটি স্রোত হয়, দুই আড়াই মাস তার মাতামাতি চলে। তারপরই ভাটির টান। ভুল কোরে ঢুকে পড়া জল ভোঁ-দৌড় লাগায়, মুখ রাখে মায়ের বুকে। খালটা ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়ে পড়ে। কৃষিশ্রমিক কলিম বুড়োর মতো অতি দ্রুত নেংটো হয়ে যায়; বুকের রিক্ততা বেরিয়ে পড়ে। তবে কলিম বুড়োর মতোই খালটা ঝিরঝির কোরে বয়ে চলে, একদম শুকিয়ে যায় না; যদিও দু'চার জায়গা দিয়ে কোমর পর্যন্ত ভিজিয়ে তাড়াহুড়ো কোরে লোকজন এপার ওপার করে, মাথা ডুবোতে হয় না।

কয়েকদিন আগে ভারী একটা বৃষ্টি হয়ে গেছে। শুকনো মাঠ ঘাট ভিজিয়ে অবশিষ্ট জল গড়িয়ে গড়িয়ে খালে এসে জমা হয়েছে। ঘোলা জল। এতোদিনে বেশ থিতিয়ে গেছে। কেমন একটা না-হল্‌দে না-সবুজ রং ধরেছে। হয়তো এই জলের রেষ ধোরেই বর্ষ এসে খালে ঢুকবে। এখন চৈত্রের শেষ কাল। খালের পার ঘেঁষা রাস্তাটা এখানে এসে হুট কোরে পশ্চিমমুখি বেঁকে গেছে। বাঁকটা চোখে পড়ে। বাঁকে বেশ কয়েকটা ইয়া বড় আমগাছ। ডালে প্রচুর আম। লতায় পাতায় ঝুলে ঝুলে এই ঝাঁঝালো হল্কা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। না পাকলেও আঁটি বতি হয়ে গেছে, যে কোনো দিন বিনা নোটিশে গায়ে হলুদ রং মাখবে।

শিমুল একটুও না দাঁড়িয়ে, একবার মাত্র পেছন ফিরে হাটমুখি রাস্তা ছেড়ে সোনারংয়ী পাকা গম ক্ষেতের আল ধোরে মাঠে নেমে গেলো। কৌশল। মাঝখানের ব্যবধানটুকু না বাড়ালে যে কোনো সময় রগচটা ঘাড়ের ভূতটা মুখ থুবড়ে বন্দী হয়ে যেতে পারে। দমও যায় যায় অবস্থা। খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছে সে। চোখের দু'কোন বেয়ে গড়িয়ে পড়া লোনা জল শুকিয়ে দাগ কেটে রেখেছে। তাকালেই বোঝা যায়। মাথার চুল এলোমেলো। উড়ছে। কপালে ঘামে জবুথবু হয়ে গোছা খানেক লেপ্টে আছে।

পড়ি পড়ি কোরেও শেষ পর্যন্ত মাটিতে হাত ছুঁই ছুঁই অবস্থা থেকে শিমুল সামলে ওঠে। পা আর উঠতে চায় না। তাল হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রচণ্ড এক জেদ এবং কষ্ট মাখানো অভিমান

ওর চোখে মুখে। ওকে থামতে দিতে চায় না জেদের অজগর। ভেতর থেকে হিসহিস কোরে ধাক্কা দিয়ে গতি দিচ্ছে আর ফুসলিয়ে বলছে– 'তাকাসনে শিমুল, পেছনে বারবার ওভাবে তাকাসনে।খবরদার, ভুল কোরেও থামবিনে। দৌড়ো। জোরে, আরো জোরে, সামনে; যেদিকে খুশি, গেলেই হলো। মোট কথা– দৌড়োতে হবে, দৌড়ো।'

বাঁধা খোপা অনেকক্ষণ আগেই খুলে গেছে। কাকের চোখের রংয়ে রাঙানো এক ঝাড় চুল কখনো হাওয়ায় উড়ছে, কখনো পিঠে হুটোপুটি করছে, কখনো বা ঢেকে দিচ্ছে চোখ মুখ। তাতে কোনো ছন্দ নেই। এলোমেলো। আধমাথা ঢাকা নিত্য সময়ের ঘোমটা টানা আঁচল নেই। খসে গেছে। খরখরে শুকনো মাটিতে ছেঁচড়ে চলছে। চিকন একটা শুকনা ঘাঘরার ডাল তিন চারটে ঘাঘরাসহ ওই আঁচলে দিব্বি ঝুলে পড়েছে। পা খালি। পরনে সায়া নেই। খয়েরী রংয়ের রংচটা ব্লাউজের উপরের প্রথম বোতামটি কখন যেনো গা এলিয়ে ফাঁস ছেড়ে দিয়েছে। বুকের উপরে গতানুগতিক কাপড় নেই। তাতে কোনো খেয়াল বা তোয়াক্কা নেই। চোখ দু'টো চৈত্রের খরখরে মাঠ, কিন্তু তাতেই তীব্র একটা ক্ষরণ যে হচ্ছে, তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ক্ষরণ হচ্ছে হৃদয়ের পরতে পরতে। প্রথম পর্যায়ের হালকা ভয়ের বোধটা এতোক্ষণে লক্ষ কোটি টন ওজন হয়ে ফাঁস এঁটে মননকে জেঁকে ধরেছে। গলায় সার্বক্ষণিক অদ্ভুত একটা গোংড়ানির আর্তি। কান্না। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত হাঁপানোর কারণে খুব অস্পষ্ট। পা দু'টোয় অযূত-নিযূত দানবীয় থাবার সম্মিলিত চাপ খুব দ্রুত কেবল বেড়েই চলেছে। পা দু'টোর বিশ্বাস ঘাতকতায় যে কোনো সময় মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু থামলে তার চলবে না। কিছুতেই না। 'শিমুল, বাবা আমার, যাদু আমার, আর দৌড়াইও না বাবা, খাড়াও; আমি আর পারতাছি না।' গলা চিঁড়ে ফ্যাসফেসে একটা আর্তি বাইরে বেরোয় ঠিকই, কিন্তু কোনো সুস্পষ্ট অর্থ ধারন করতে ব্যর্থ হয় সেই শব্দ।

মাঝখানের ফাঁক কোন ফাঁকে খানিকটা বেড়ে প্রায় দেড় দুইশ' হাত হয়ে গেছে। আগে শিমুল, পিছে লতা। ছেলে ও মা। দুইজনই হাঁপাচ্ছে। দুইজনই খালের পশ্চিম পার ঘেঁষে টেনে টেনে, দম নিয়ে নিয়ে পা ফেলছে, দৌড়োচ্ছে। লতা এক সাগর আশা নিয়ে এদিক ওদিক কয়েক পলক তাকালো। কিন্তু খুব দ্রুত হতাশার নিকষ কালো ঝলকানি তার চেতনার চোখকে ধাঁধিয়ে স্তব্ধ কোরে দিলো। চৈত্রের খাঁ খাঁ দুপুর। বাতাসে আগুনের হল্কা। কোথাও কেউ নেই। বুকের গভীর তলদেশ থেকে হাহাকার মেশানো অদ্ভুত অচেনা একটা বোধের স্রোত বেয়ে বেয়ে তার রক্তের কানায় কানায় মিশে যেতে শুরু করেছে। তাতে শুধু কষ্ট আর কষ্ট, প্রচণ্ড কষ্টের তীব্র একটা স্রোত ঘূর্ণাবর্তে দোলায়িত আশংকার শূণ্যতায়।

হিজলদীঘি হাট থেকে নেমে রাস্তাটি সোজা খালের পাড়ে এসে থমকে গেছে। সামনে খালের উপর দিয়ে এপার ওপার করার সাঁকো। সাঁকোটা তল্লা বাশের চটা দিয়ে বানানো। সেই মান্ধাতার আমল থেকে পারাপারের এই ব্যবস্থাটা চলে আসছে। তবে রাস্তাটির গুরুত্ব এতোদিনে হোলেও সরকার যেনো বুঝতে পেরেছে। অনেক ইঁট আর রড অযত্নে রাস্তার এপাশে ওপাশে পড়ে আছে। সাঁকোটি পাকা করার বন্দোবস্ত।

মাঠের তুলনায় রাস্তাটি অনেক উঁচু। উঠতে গিয়ে শিমুল দ্বিতীয়বারের মতো হোঁচট খেলো। খড়ির জন্যে কেটে নেওয়া ভাট গাছের চোখা গোড়া লেগে ডান ভ্রুর সামান্য উপরে কেটে গেছে। তীব্র একটা ব্যথা হঠাৎ জেগেই সাথে সাথে চাপা পড়ে গেলো। গরম এবং লাল রঙ - এর রক্তে বাম হাতের চেটোয় মেখে চোখের সামনে এনে দেখলো সে। হুট কোরে প্যান্টের পেছনে মুছে নিলো। ঝরুক রক্ত। পরোয়া নেই। আহ্, কি আরাম, কি হাল্কা শরীরটা! কি তৃপ্তি! বৈচিত্র্যিক রঙ মাখা একটা বেলুন উড়ে যেতে দেখলো এক ঝাঁক বুদবুদের মাঝখান দিয়ে এবং সাথে সাথেই সে চমকে উঠলো। অদ্ভুত একটা ভয় এতোক্ষণ পরে ওকে জাপ্টে ধরলো। সাথে সাথে সে পেছন ফিরে তাকালো। মা অনেক কাছে এসে গেছে। শিমুল দ্রুত হাত বাড়ায়। নাগালে আকন্দ গাছের ডাল। ওর উপর ভর কোরে সে উঠে দাঁড়ায়। হেলে পড়া একটা কলাপাতা বাম হাত দিয়ে সরিয়ে রাস্তায় উঠে আসে শিমুল। সামনে সাঁকো। নতুন কোরে কান্না পেলো ওর। চোখের উপরের ব্যথাটাও সুযোগ বুঝে চিনবিনিয়ে উঠলো। কিন্তু এতো কিছুর পরেও শিমুল থামলো না। পেছন ফিরে মাকে আবারো সে দেখলো। তারপর হেঁটে হেঁটে সাঁকোটি পাড় হয়ে গেলো। ওর বুকের মাঝে উথাল পাথাল অভিমানের ঢেউ। সেখানে এখন অচেনা একটা অজগর হিসহিস করছে। গজরাচ্ছে। থামতে দিতে চায় না শিমুলকে।

লতা ছেলের পেছনে আঁঠার মতো লেগে আছে। পা আর চলে না। মুখ থুবড়ে পড়ি পড়ি কোরেও টিকে আছে। মাঝখানের দূরত্বটুকু একটু একটু কোরে বেড়েই যাচ্ছে। গাছ পালা আর ঝাপ ঝোড়ের আড়ালে আবডালে শিমুল মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। মন তখন ছটফটানিতে ব্যাকুল হয়ে উঠছে বেশি কোরে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে দূরত্টুকু কমিয়ে আনার জন্যে। কিন্তু পারছে না। হচ্ছে ঠিক উল্টোটা।

বুড়ো লোকটি গরুর খোটা নাড়ছিলেন। শিমুল ওকে দেড়-দুইশ' হাত দূর থেকে দেখতে পেলো। সতর্কতা হিসেবে সে রাস্তা থেকে আবার মাঠে নেমে এলো। আর তখনই লতা বেশ জোরে শব্দ কোরে কেঁদে ফেলে। বুড়ো লতাকে দেখলেন, দেখলেন শিমুলকেও। যা বোঝার, বুঝে নিলেন। কয়েক মুহূর্ত 'থ' মেরে মা ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই ফাঁকে গরু কিছুটা সরে গিয়ে পাকা গমের শীষে ধারালো জিভ বাড়িয়ে ধরেছে। হাতে টান পড়ায় বুড়ো সামান্য চমকে ওঠলেন। বিরক্তিতে গরুর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় কোরে গালি দিলেন। তার পক্ষে আর কি করা উচিত, ঠিক মতো বুঝতে না পেরে উত্তরমুখি হয়ে খিনাখিনে গলায় কিন্তু তীব্রভাবে ডাক ছাড়লেন- 'ও মতিরে, বক্কার, এদিকে জলদি এটু আয় তো তোরা বাজান।'

ধড়ফড়ানি বুকটা আরো জোরে ধড়াস কোরে লাফিয়ে উঠলো। পেছন ফিরে তাকিয়ে দৌঁড়ের গতি বাড়িয়ে দিলো শিমুল। ওর মা হাউমাউ কোরে কেঁদে উঠলো। পরাজয়ের ঠিক পূর্বেকার শেষ শক্তি জড়ো কোরে দৌড়োতে শুরু করে সে। কিছুক্ষণ পরই তার চোখের সামনে একটা দুটো কোরে অজস্র হল্‌দে বুদবুদ ছোটাছুটি লাফালাফি করতে শুরু করে। একদম শেষ মুহূর্তে কাঁদতে কাঁদতে ফ্যাসফেসে গলায় সে বলে- 'শিমুল, যাদু আমার ' শেষ করা হয় না। কান্না আর যন্ত্রণায় বোধের শাব্দিক প্রকাশ চাপা পড়ে। লতা হোঁচট খেয়ে কিংবা শক্তিতে

নি:শেষিত হয়ে মশুরি ক্ষেতে পড়ে যায়। পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অদ্ভুত এক কান্নার গোংড়ানি তার শুকনো গলা দিয়ে বেরিয়ে এসে চৈত্রের দুপুরকে ভীষণভাবে ঝাঁকিয়ে দেয়। শিমুল থমকে থেমে পড়ে। তাকায় পেছন ফিরে। বুকের ভেতর থেকে কি যেনো একটা দলা পাকিয়ে উঠি উঠি কোরেও উঠে আসতে পারছে না। গলার ঠিক নিচে আটকে আছে। চোখে যদিও জল নেই, ভেতরে ভেতরে ওর তখন কষ্টের উথাল পাথাল ঢেউ। সে পাকা মশুরের উপর এলিয়ে পড়ে থাকা মায়ের দিকে তাকায়। আছড়ে পিছড়ে ওর কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে মাকে জড়িয়ে ধোরে। খুব যন্ত্রণা হয় ওর বুকের ভেতরে। কারণটা যদিও সে ভালো কোরে ধরতে পারছে না। একটু আগে মায়ের মুখ থেকে এই যে বিশেষ ধরণের কান্নার আহাজারি শোনার পর সে থেমে গেলো, ঠিক এমন কোরে মাকে আরো একবার কাঁদতে দেখেছিল শিমুল। সেদিনও সে ঠিক কোরে কারণটা বুঝতে পারেনি। বছর আড়াই আগেকার কথা।

আড়াইটে বছর! মহাকালের আবর্তে সময়টা হিসেবেই পড়ে না। কিন্তু শিমুলের জীবনে সময় সীমাবদ্ধ। সেই সীমাবদ্ধ সময়ের কাছে আড়াইটে বছর অনেক কিছু। চেতনার আলোয় শিমুল এরই মাঝে একটু একটু কোরে আলোকিত হতে শুরু করেছে। নইলে ওই আড়াই বছর আগে যা সে একটুও বুঝতে পারেনি, আজ তা-ই স্মৃতির অস্পষ্ট এ্যালবাম থেকে নড়ে চড়ে কারো কোনো সহযোগিতা ছাড়াই কথা বলতে শুরু করে কি কোরে? কেনো অদ্ভুত একটা অনুভূতির স্পন্দন বুক থেকে বেরোতে পারছে না বোলে শ্বাস নিতে ওর এতো কষ্ট হয়?

সংসারের আরো পাঁচজনের সাথে অবোধ শিমুলের জীবন যাত্রায় ওই দিনটি ছিলো জটিল একটা বাঁক পেরোনোর পরম মুহূর্ত। মাঝে মধ্যেই কেমন যেনো আবছা আবছা, কুয়াশাঘেরা অস্পষ্ট কিছু ছবি শিমুলের বন্ধ থাকা চোখের আকাশে দোল খায়। অনেক লোকজন এসেছিল সেদিন। সবার চোখে মুখেই কিছু একটা কি যেনো ছিলো। কেউ হাসেনি সেদিন। পারত পক্ষে ওর সাথে কথাও বলেনি তেমন কেউ। মুরুব্বি গোছের কেউ কেউ শিমুলকে সামনে পেতেই মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল; গাল টেপেনি, নাক ধোরে টানেনি হাসেমের দাদী। বরং ওকে জড়িয়ে ধোরে 'ভাইরে' বোলে হিসহিস কোরে বুড়িটা সেদিন কেঁদে উঠেছিল। দাদীর মুখ থেকে কি বিশ্রী একটা গন্ধ ভটভট কোরে বেরিয়ে ওর পেটে ঢুকে পড়েছিল। শিমুলের বেশ অস্বস্তি হচ্ছিলো। ওভাবে কাঁদছে কেনো, বুঝতেই পারেনি সে। কিন্তু সংক্রামিত হয়ে শেষ পর্যন্ত শিমুলও এক সময় 'ভ্যা' কোরে কেঁদে ফেলেছিল।

অন্য পাঁচটা সাতটা দিনের মতো সেদিনও শিমুল কাচের গুলি নিয়ে খেলতে বেরিয়েছিল। হাশেম বা জন, কেউই ওর সাতে সেদিন খেলেনি। বয়সে জন বেশ কিছুটা বড়। ও-ই বলেছিল– 'আজকে তুই গুলি খেলবি?'

বেশ ঝাঁঝালো ভাবেই শিমুল তাৎক্ষণিক ভাবে জবাবে বলেছিল– 'খ্যালতাম না ক্যা? কালকে আমি নয়ডা গুলি হারি নাই?'

'তোর বাবা না মইরা গ্যাছে? তুই বাইত্যে যা গা।'

'বাবায় মরছে তো আমার কি? খেলবি তো আয়।'

'বিয়ানে খাইছস কিছু? জন ওকে দরদ দেখাতে চেষ্টা করে।'

'না খেললে আমার গুলি ফেরত দে। কালকে আমি নয়ডা গুলি হারছিনে? আমার আকাইশ্যা রঙয়ের ডাগাডাও।'

'তুই একটা ভোঁদাই।'

জন বেশ রেগে ওঠে। সে একদৌঁড়ে বাড়িতে চলে যায়। শিমুল রাগে ক্ষোভে যখন হতাশ হয়ে হাসেমের দিকে কটমট কোরে তাকালো, তখনই জন ফিরে এলো। ওর হাতে জালট। লাল সাদা রঙয়ের নাইলনের জালটে পনর কুড়িটা কাচের গুলি। সবগুলোই প্রায় নতুন, ঝকঝক করছে। জন জালটটার দিকে একবার তাকায়। ওর ভেতরে সামান্য সময়ের জন্যে কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাজ করে। কিন্তু খুবই সাময়িক সেই প্রলোভন। জন গুলির জালটটা ছুঁড়ে দেয় শিমুলের সামনে। 'খন্ন-ন্'- একটা চাপা শব্দ। কোনো কথা না বোলে জন ভোঁ দৌড়ে নিজেদের বাড়ি চলে গেলো। হাসেম শিমুলের বয়সী। ওর চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া। একটা গুলির জন্যে কান্টেমি কোরে জন কতোদিন খেলাই ভন্ডুল কোরে ছেড়েছে! হাসেম জনের চলে যাওয়া পথের দিকে একবার, একবার শিমুলের মুখের দিকে তাকাতে থাকে। শিমুলও হতভম্ব। তবে তা খুবই সাময়িক। সে গুলির জালটটা হাতে তুলে নেয়। ভেতরে ওর আদরের 'ডাগা'টা দেখা যাচ্ছে। গাঢ় আকাশি রঙয়ের মাঝখানে ধবধবে ভাসমান একটা সাদা বাঁকা চাঁদ। যেনো দাঁত বের কোরে শিমুলকে ডাকছে।

শিমুল তেমন একটা ভাবলো না। জালটটা একটু নাড়া চাড়া কোরে জনদের বাড়ির দিকে তাকালো। মুখ খুলে বেছে বেছে নয়টা গুলি নিয়ে সে নিজের পকেটে রেখে জালটের মুখ আটকে দিলো। এবার কি করবে, বুঝতে না পেরে গুলির জালটটা জনদের বাড়ির দিকে ছুঁড়ে মেরে শিমুল বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

ভিটের দক্ষিণ দিকে পূব-পশ্চিমমুখি বেশ ঘন আর লম্বা একটা জঙ্গল। আট দশটা পেয়ারা আর চারটে আম গাছকে ঘিরে জংলী লেবুর ঝাড়। ফাঁক ফোঁকড়ে মটকিলা আর ভাট গাছের উন্মাতাল আগবাড়ানো মাতামাতি। সময়ের তালে তালে সকালের শীত শীত ভাবটুকু উবে গেছে। আকাশে দশটা এগারোটার সূর্য। রোদের মিঠে আমেজ ফুরিয়ে তেতে উঠেছে। বাতাস নেই। শিমুল বাড়ির পূব পাশের সিঁদূরে আম গাছের তলায় এসে দাঁড়ায়।

খুব ক্ষিধে পেয়েছে ওর। বাড়িতে শুধু মানুষ আর মানুষ। সিঁদূরে আম গাছ তলায় দাঁড়িয়ে শিমুল চুক্কা জাম্বুরা গাছের ফাঁক দিয়ে বাড়ির দিকে তাকায়। মনে মনে মাকে একবার খোঁজে। কেমন একটা উ উ সুর শোনা যাচ্ছে। সুরটা যেনো মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসছে। সুরটা মায়ের গলার মতো। সকাল থেকেই মাকে আজ অন্য রকম দেখেছে শিমুল। অন্য দিনের মতো শিমুল দাঁত মাজেনি বোলে নিজে থেকে আজ ধূয়ে দেয়নি, খেতে ডাকেনি, এমনকি স্কুলেও যেতে বলেনি।

হাতের ঢিলটা উদ্দেশ্যহীন ভাবে শূন্যে ছুঁড়ে শিমুল গা থেকে শার্ট খুলে ফেললো। শার্টটা মাজায় পেঁচিয়ে নিলো সে। একপা দু'পা কোরে জঙ্গলের গা ছুঁয়ে দাঁড়ালো। বাড়ির দিকে আরো একবার তাকালো। রানুটারও কোনো পাত্তা নেই। আশ্চর্য!

শিমুল জঙ্গলে ঢুকে বেছে বেছে ঝোপড়া একটা পেয়ারা গাছে ওঠে। গাছে অনেক ডাঁশা পেয়ারা। সে হাত বাড়িয়ে পেয়ারা পাড়ার জন্যে চিকন একটা ডাল হেলাতে যায়। অমনি তিন চার হাত দূরে আম গাছের ঝোপ থেকে একটা প্যাঁচা ডানা ঝাপ্টে উড়ে গেলো। ভয়ে কেঁপে উঠলো শিমুল। 'ভয় পেলে বুকে থুতু ছিটালে আর কোনো ভয় থাকে না'- সে বিভিন্ন সময়ে বারবার শুনেছে কথাটা। আগেও বিভিন্ন সময়ে ভয়ে অভয়ে শিমুল কত্তো থুতু ছিটিয়েছে বুকে! কাজ হয় কি হয় না, সেই হিসেব কখনো সে নেয়নি, অতোটা বোঝার বোধই ওর নেই। 'থু-থু' শব্দ কোরে শিমুল তাড়াতাড়ি বুকে থুতু ছেটায়। বেশ খোঁজাখুঁজির পর একটা জায়গা ওর পছন্দ হয়। তিন ডালের সংযোগ স্থল। আশেপাশে হাত বাড়ালেই নাগালে রয়েছে ডাশা ডাশা পেয়ারা। শিমুল আরাম কোরে বসে।

কাঠের লম্বা একটা বাক্স কাঁধে নিয়ে সবাই পেছনে পেছনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। সামান্য উত্তরে মিশন পাড়া। গির্জার উঁচু চূড়ায় বিশাল একটা ঘন্টা। ঢং ঢং ঢং- ঘন্টাটা বেজে উঠলো গভীর একটা ঐকতানে। শিমুলের গায়ে কাঁটা ফুটলো যেনো। দুপুর বারোটার ঘন্টা। জন বলেছে– ঠিক দুপুরে, যখন এই ঘন্টা বাজে– গাছে তখন শয়তান এসে বিশ্রাম নেয়। তখন কেউ গাছে থাকলে ওরা নাকি ধাক্কা দিয়ে বা ডাল ভেংগে তাকে নিচে ফেলে দেয়। শিমুল তিন তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে পড়লো। জঙ্গল ফেলে পাত্তালে ক্ষেত ভেঙ্গে বাড়ির সামনে এসে একটু দাঁড়ালো সে। বাড়িতে কারো কোনো সাড়া শব্দ নেই। ওর খুব হিসি পায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসি কোরে, শিমের টালে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওটার নিচ দিয়ে হেঁটে সে বাড়ির উঠানে উঠে আসে।

মাকে দেখে শিমুল থমকে যায়। কেমন তরো এলোমেলো। মায়ের এই ছবি আগে কখনো সে দেখেনি। যেনো স্তব্ধ একটা মূর্তি। পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বারান্দায় বাঁশের খুটিতে হেলান দিয়ে বোসে আছে। চোখের চাহনিতে ঘোলাটে ভাব, আকাশের দিকে তাকানো। মাথার ঘোমটা গলার পাশ দিয়ে খুলে ঝুলে রয়েছে। খোপা খোলা, চুল পিঠে ছড়ানো, এলোমেলো। শিমুলের কেনো যেনো একটু ভয় ভয় লাগলো। ছোট বোন রানুকে খুঁজলো এদিক ওদিক তাকিয়ে। নেই। বাড়িতে যেনো আর কেউ নেই, ছিলোও না কোনোদিন।

লতা হঠাৎ কোরেই শিমুলকে দেখতে পায়। মুহূর্তে তার চোখের ভাষা পাল্টে গেলো। সে উঠে এলো ধীরে ধীরে। শিমুল আরো একটু বেশি ভয় পেলো। সে ফ্যালফেলিয়ে মায়ের দিকে চেয়ে রইলো। লতা কাছে এসে ওর পিঠে মাথায় হাত বুলাতে লাগলো। হাত বুলানোর স্পর্শেও কেমন একটা ক্ষ্যাপাটে ভাব। শিমুল টের পায়। চেয়ে দেখলো, মায়ের দাঁত নিচের ঠোঁটে অনেকটা বোসে গেছে। শরির অদ্ভুতভাবে কাঁপছে। কয়েক মুহূর্ত। হেরে গেলো লতা। বিধ্বস্ত কাল বৈশাখীর প্রচণ্ডতায় শিমুলকে জড়িয়ে ধোরে সে বোসে পড়লো এবং হাউ মাউ কোরে কেঁদে উঠলো। শিমুলও আর পারলো না। মায়ের কোলে মুখ গুঁজে সেও ভ্যা কোরে কেঁদে ফেললো।

আজ এতোদিন পরে, সুদীর্ঘ আড়াইটে বছরের উথাল পাথালের পরে সেই দিনের সেই কান্নার পুন:রণন মায়ের মুখে শিমুল আবার শুনলো। ওর বুকের ভেতর অদ্ভুত ধরণের কিছু একটা খামচা-খামচি শুরু করেছে। সে ধীরে ধীরে মায়ের কাছে এগিয়ে গেলো। 'মা'! কিন্তু গলাটা ভীষণ শুকিয়ে আছে। কোনো শব্দই বেরোলো না সেই শুকিয়ে থাকা গলার ফাঁস গলিয়ে। সে মায়ের মাথার পাশে বসতে গিয়ে অবশেষে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললো। শব্দটা লতার কানে গেলো। লতা তার ক্লান্ত হাত ধীরে ধীরে শিমুলের কোলে এনে রাখে। আরো কিছুক্ষণ সে নিথর হয়ে পড়ে থাকে। তৎক্ষণিক ভাবে উঠে বসার শক্তি পায় না। বেশ কিছুটা সময় নেয় সে। তার বুকের বাঁ দিকে যেনো ধারালো একটা প্যাঁচানো কাঁটাতার আটকে আছে, শ্বাস নিতেই নিষ্ঠুর ভাবে নরম বুকে গেঁথে যাচ্ছে শ্বাস নেয়ার তালে তালে।

শ্বাস বন্ধ রেখে, খুব ধীরে ধীরে শ্বাস টেনে একটু একটু কোরে ব্যথাটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে শেষে উঠে বসে লতা। ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করে। শিমুলকে কোলে টেনে আরো কিছুটা সময় সে চুপচাপ বোসেই থাকে। আকাশে গনগনে সূর্য, কোথাও একফোটা মেঘ নেই। হালকা বাতাস বইছে। তাতেও উত্তাপের চাবুক আর সুক্ষ্ম বালুর কণা। মা ছেলে ঘেমে নেয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। গায়ে মায়ের গা লাগতেই ছ্যাৎ কোরে একটা উত্তাপের ঢেউ শিমুলের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে ওর একটুও খারাপ লাগলো না। ভ্যাপসা গরমের মাঝেও মায়ের শরীর থেকে আতা ফুলের গন্ধ পায় শিমুল। মন জুড়ানো গন্ধ। এই গন্ধ নেবার লোভে প্রায় প্রতিরাতেই রানুর সাথে শোওয়ার সময় ওর ঝগড়া হয়। শিমুল ধীরে ধীরে মায়ের বুকে মাথা এলিয়ে দেয়। কান্না ততোক্ষণে থেমে গেছে। লতা ছড়িয়ে পড়া আঁচল টেনে যত্ন কোরে শিমুলের চোখ মুখ মুছিয়ে দিলো। গা থেকে ভিজে যাওয়া যবু থবু শার্টটা খুলে, শাড়ির আঁচল ছায়া বানিয়ে ওর মাথায় বিছিয়ে ধীরে ধীরে পিঠে ছড়িয়ে পড়া চুল হাতের মুঠোয় নিয়ে সে খোঁপা করে।

শিমুল কখনো একা, কখনো বা জন বা হাশেমের সাথে সময়ে অসময়ে এদিক ওদিক যখন তখন ঘোরাফেরা করে। কখনো মাছ ধরতে ছিপ হাতে, কখনো বা বক মারার ফাঁদ হাতে। কোনো কোনো দিন দুই চার মাইল দূরেও চলে যায়। কিন্তু এই তল্লাটে এর আগে সে আর আসেনি। তেনাছেঁড়া বট গাছটা না দেখা পর্যন্ত ওর পক্ষে বোঝার উপায় নেই সে এখন ঠিক কোন জায়গায়। সে মনে মনে বট গাছটা খুঁজতে থাকে। মায়ের বাঁ হাতের মুঠোয় ওর ডান হাত। চৈতালী ফসলে ভরা মাঠ ভেঙ্গে ওরা হাঁটতে শুরু করে।

বড় রাস্তা আর বট গাছের চূড়োটা শিমুল প্রায় একই সময়ে দেখতে পেলো। বড় রাস্তা এড়িয়ে মাঠের আল ধোরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা মাঝারি সাইজের একটা আম বাগানের ভেতরে এসে দাঁড়ালো। অনেকক্ষণ পরে ছায়া পাওয়ার মজাই আলাদা। আলসেমিতে পেয়ে বসে। বাতাসটাও এখানে এসে যেনো একটু ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে। লতা আধপোড়া দুর্বা ঘাসের উপর বসে পড়ে। গাছের ডালে ডালে হরেক কিসিমের আম ঝুলছে। দুই তিনটে রীতিমতো পেকে লালচে হলুদ হয়ে আছে। অন্য সময় হোলে শিমুল নির্ঘাত ঢিল ছুঁড়তো। আজ কিন্তু ওর তেমন ইচ্ছেই হলো না। সুবোধ বালকের মতো মায়ের গা ঘেঁষে সে বোসে রইলো।

শিমুলের মাথায় হাত ঢুকিয়ে লতা চোখ বোঁজে। আঙ্গুল চুলের গোড়ায় গোড়ায় বিলি কাটে।

'খুব ক্ষিধে লাগছে, না?' লতা চোখ না খুলেই জিজ্ঞেস করে।

'হ। বইনে আমার রুডি খাইয়া ফেলাইছে দেইখাইতো আমি হেরে মারছি। একটা কিল দিছিলাম খালি।' শিমুলের গলার স্বর কিছুটা আর্দ্র হয়ে ওঠে।

'বইনে ছোডো না? হ্যায় তোমার মতোন বুঝলে রুডি খাইতো না।'

'বাবায় থাকতে আমাগো কোনো কষ্ট আছিল না। অহনে আমাগো এতো কষ্ট ক্যারে, মা?'

লতার হাত থেমে যায়। কিন্তু তাড়াতাড়িই সে নিজেকে সামলে নেয়। তার মানসচোখে একটা মুখ জ্বলজ্বল কোরে ভেসে ওঠে। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে লতা পরম মমতায় শিমুলকে বলে– 'তুমি তাড়াতাড়ি বড় হও। দেইখো, তখন আর কোনো কষ্ট থাকবো না। তুমি আজকে আমারে ফালাইয়া কই যাইবার লাগছিলা বাবা?' লতার কণ্ঠ আবারো কিছুটা কেঁপে ওঠে।

'আমারে মারছো ক্যা তুমি? আমার বুঝি বিষ করে না?'

'আর মারতাম না।' লতার গলায় সোহাগের ঝড়। গভীর মমতায় ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঠোঁট কাঁমড়ে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।

'তুমি এমন কইরা পলাইয়া যাওনের কথা আর ভাইব্বো না। তুমি না থাকলে আমি কারে লইয়া বাঁচুম, বাবা?'

'আমি আর পলাইতাম না। জানো মা, বিকু না বিড়ি খায়! টিপু স্যারের কাছে আমি কইয়া দিমু। আর জানো মা, কথায় কথায় খালি মিছে কথা কয়।'

'থাক্‌গা বাবা, তোমার কিছু কওন লাগতো না। বিকু বিড়ি খাইলে, খারাপ কাম করলে, মিছে কথা কইলে তারই পাপ হইবো, পরীক্ষায় ভালা করবার পারবো না।'

'বিকুইতো হের লগে আমারে পলাইয়া টাউনে যাইবার কথা কয়।'

'তুমি শোনো দেইখাইতো এইসব কথা তোমারে হ্যায় কইবার পারে।'

'ওরে আমি টিপু স্যারের গরম চা খাওয়াইয়া ছাড়ুম।'

'হেইডা আবার কি?' লতা আলতো কোরে হাসে।

শিমুল মায়ের বোকামিতে মজা পেয়ে হাসে। চোখ বড় বড় কোরে বলে– 'গরম চা চিনো না? টিপু স্যারের জোড়া বেতের বাড়ি।'

লতা শিমুলের হাত ধোরে উঠে দাঁড়ায়। বাগানের শেষ প্রান্তে বেশ বড় একটা লিচু গাছ। প্রচুর লিচু ধরেছে। হালকা পাকা রং লেগেছে লিচুর গায়ে। শিমুলের জিভে এতোক্ষণে সত্যি সত্যি জল এলো। গাছটার দিকে তাকিয়ে মাকে সে জিজ্ঞেস করে– 'কাগো বাগান, মা?'

লতা দীর্ঘশ্বাসটা আটকে ফেলার কোনো চেষ্টা করলো না। বললো– 'দিপুগো আছিলো। হেরা ইন্ডিয়া গ্যাছে গা। অহনে ফেলু মেম্বরের।'

'ফেলু মেম্বরের? ফুপাগো?'

'হ। মাইনসে কয়, তিন চাইর শ' ট্যাহা দিয়া জোর কইরা নাকি টিপ সই করাইয়া রাইত্যের আন্ধারে ফেলু মেম্বর তাগো ইন্ডিয়ায় খেদাইয়া দিছে। তুমি কিন্তু হেগো আবার কিছু কইবার যাইও না।'

'কইতাম না ক্যা?'

লতা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে– 'হোন নাই, চোররে চোর কইতে নাই? অহনে মেম্বর না?'

'হুনলে আমাগো রেশন দিবো না?'

'দিবার না-ও পারে।'

শিমুল একটুখানি থেমে যায়। কি যেনো ভাবে। হঠাৎ কোরে সে মায়ের হাত কিছুটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে– 'আইচ্ছা মা, ফেলু ফুপাগো বাড়িতে এতো চাইল, এতো দুধ, কাপড়, আমাগো দিবার পারে না?'

'পারবো না ক্যা? পারে। তয়, তারা তোমারে দিলেই তুমি নিবা ক্যারে?'

'দিলেও নিতাম না?'

'যার তার ডা নেওন যায় না।'

'জানো মা, কালকে আমি কাচামিষ্টি আম গাছ থাইকা একটা আম পাড়ছিলাম। ফুপু হের লাইগা কি জোরে আমার কান টাইন্যা দিছে। আমডাও নিছিলো গা।'

'নেকগা।'

'নিবো ক্যা? গাছটা তো আমাগো।'

লতা ছেলের মুখের দিকে তাকায়। অবচেতন মনে হাঁটতে শুরু করেছিল, তা-ও ক্ষণিকের জন্যে থেমে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে জ্বলতে থাকা শূন্যতার দিকে তাকায়। গহীন নীলাকাশ জ্বলছে মধ্যাহ্নের খরতাপে।

'আগে তোমাগো আছিল। অহনে হ্যাগো।'

প্রতিবাদে ঘাড় তেড়া করে শিমুল– 'ক্যা?'

দাঁড়িয়ে পড়া ছেলের হাতে মৃদু টান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লতা বলে– ' তুমি তাড়াতাড়ি বড় হও, লেখাপড়া শিখো। তখন সব বুঝবার পারবা।'

'বড় হইয়া আমি ডাক্তার হমু মা, টিপু স্যারের চাইতে বড় ডাক্তার।'

'হইও বাবা। তার লাইগা ঠিকমতন লেখাপড়া করণ লাগবো।'

শিমুল অবাক চোখে বোকা মায়ের দিকে চোখ বড় কোরে তাকায়- 'ওম্মা, আমি না প্রত্যেক বার ক্লাশে ফার্স্ট হই?'

'তা তো হওই। কিন্তুক তুমি পলাইয়া গ্যালে, লেখা পড়া ঠিকমত না করলে আর কেউ ফাস্ট হইয়া যাইবো না? তাইলে তুমি ডাক্তার হইবা কেমনে?'

শিমুল মায়ের কোমড় জড়িয়ে ধরে, খুব মিঠে গলায় কিছুটা লাজ মিশিয়ে বলে– 'আমি আর পলাইতাম না।'

বটগাছের কাছাকাছি হয়ে ওরা বড় রাস্তায় উঠে আসে। বছর সাড়ে তিন চারেক আগে রাস্তাটি পাকা করা হয়েছে। আগে ভীষণ অ্যাবড়ো থেবড়ো ইঁট বিছানো রাস্তা দিয়ে শুধুমাত্র ঘোড়ার গাড়ি চলতো। কিন্তু পাকা হতে না হতেই খুব দ্রুত ঘোড়ার গাড়ির সংখ্যা অনেক কমে গেছে, যায়গাটা রিক্সা এসে দখল কোরে নিয়েছে। ওইসব ঝকঝকে রিক্সার পেছনে কি অদ্ভুত অদ্ভুত সব জন্তু জানোয়ারের ছবি। সময়ে অসময়ে এইসব ছবি দেখার জন্যেও শিমুল পাকা রাস্তার আশেপাশে কতো ঘুরঘুর করেছে! ভাগ্যচক্রে মাঝে মধ্যে দুই একদিন দৈত্যের মতো ইঞ্জিন গাড়িও আসে। বেশির ভাগই কারিতাসের। খাবার দাবার, কাপড় চোপড় আর কম্বল বোঝাই কোরে কোত্থেকে যে গাড়িগুলো আসে! আবার হঠাৎ কোরেই উধাও!

বট গাছের নিচে এসেই মায়ের হাত গলিয়ে শিমুল গাছটার গোড়ায় দৌঁড়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে হতাশ হয়। কিচ্ছু নেই। আগে থাকতো। খোঁজটা বিকুই প্রথমে দিয়েছিল। তা-ও দুই তিন বছর আগেকার কথা। সেই দূর দূরান্ত থেকে লোকজন এসে বট গাছের তলায় মানত করতো। হিন্দু মুসলমান– সবাই। কেউ মুরগীর বাচ্চা দিতো, গোড়ায় দুধ ঢেলে দিতো কেউ কেউ, সাথে দশ পয়সা পাঁচ পয়সার অনেক মুদ্রা। যাবার আগে খুব যত্ন কোরে, চোখ বুঁজে, এক নি:শ্বাসে বটগাছের ডালে 'তেনা' বেঁধে দিতো। তেনাছেড়া বটগাছ বলতেই দশ বিশ মাইল দূরের লোকজন এক ডাকেই চেনে। অবশ্য আগের মতো জাঁকালো ধাঁচের মানত ইদানিং হয় না বললেই চলে। তবে মানত হয়, তেনাও বাঁধে।

গাছের দক্ষিণ পশ্চিম কোনাটা এখনো বিদ্‌ঘুটে ধরণের ঘন জঙ্গলে ঢাকা। গা ছমছম করা একটা থমথমে ভাব। শিমুল দেখেনি, তবে শুনেছে, একাত্তর সনে যুদ্ধের সময় সেলিম-এর নানাকে নাকি হাতে পায়ে বেঁধে এই গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সতেরো দিন। পচে পচে খাবলা খাবলা মাংশ খসে খসে পড়লো, তবুও কেউ লাশ নামায়নি। সাহস পায়নি। লোকটা যে রাজাকার ছিলো! লোকটা নাকি এখন ভূত হয়ে এই গাছেই থাকে। অমাবশ্যা পূর্ণিমা রাতে অনেকেই দেখেছে। গফুর চাচাও। গফুর চাচাতো আর মিছে কথা বলবেন না! মসজিদের ঈমাম, দুই দুইবার হজ্ব পালন করেছেন। কি মধুর হাসি তার দাড়ি ভরা মুখে সব সময় ঝুলে থাকে!

ভূতের কথাটা প্রথম দিকে প্রবল উত্তেজনার কারণে শিমুলের মনে ছিলো না। কিন্তু মানত করা কোনো কিছু না পাওয়ার সাথে সাথে মনটা যেই না হতাশ হলো, অমনি ভূতের কথাটাও ওর মনে পড়ে গেলো। সে একদৌড়ে, চোখ প্রায় বন্ধ কোরে মায়ের কাছে ছুটে এসে কোমর জড়িয়ে ধরে। লতা কপাল কুঁচকে ছেলের দিকে তাকায়।

'কি হইছে?'

চোখ না খুলেই শিমুল বলে– 'ভূত।'

'ভূত! কই ভূত?'
'আস্তে কও, এই গাছে থাহে।'

ছেলের পিঠ চাপড়ে অভয় দেয় মা।
'তোমারে কেডা কইছে?'
'কত্তো মানুষ দেখছে! সেলিমগো নানা ভূত!'
'ডরাও ক্যা, আমি আছি না? ভূত দেখতে ক্যামন, বাবা?'
'তুমি যে কি না মা! সব্‌তে জানে আর তুমি খালি জানো না।'

লতা হাসে। শিমুল তাকে ঠেলছে। কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে লতা। যতোটা পারা যায় ছেলের মন থেকে মিথ্যে ভয়টা ভেঙ্গে দিতে চায়। সে হেসেই বলে– 'আমি তো আর বেশি লেখাপড়া শিখি নাই।'

শিমুর অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকায়। মা কি চমৎকার কোরে তাকে সব পড়া শিখিয়ে দেয়! দুই তিনবার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যায়, আর ভুল হয় না। কি মনে কোরে শিমুল ফিক কোরে হেসে মায়ের বুকে মুখ ঘষে।

লতা আবার জিজ্ঞেস করে– 'কইলানা ভূত ক্যামন?'

'আমি তো দেহি নাই। অমাবশ্যা আর পূর্ণিমার রাইত্যে নাকি সেলিমগো নানা ভূতটা এক পাও বটগাছে দিয়া আর এক পাও ডাল্লা বাড়ির তালগাছে দিয়া খাড়াইয়া থাহে। এ্যাত্তো বড় বড় চোখ।' হাত ছড়িয়ে শিমুল নিজের চোখে অদ্ভূত একটা আতংক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। 'হাত দিয়া রাস্তায় যারে পায়, তারেই নাকি ধইরা গাছের আগায় উডাইয়া গপ কইরা গিল্যা ফ্যালায়।'
'কই, এই পর্যন্ত আমাগো পাড়ার কারে খাইছে?'

শিমুল ভেবেও কারো নাম বলতে না পেরে শেষে মাকেই আবার বোকা বানায়।
'তুমি কিচ্ছু বুঝো না।'
'ভূত প্রেত বইল্যা কিছু নাই বাবা। মানুষই আসল ভূত। তুমি ভয় পাইলে একটা কলা গাছের পাতারেই তোমার মনে হইবো ভূত নাচতাছে, তোমারে ডাকতাছে।'

শিমুল এবার সত্যিই দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে। সে মায়ের দিকে তাকায়। মা তো কোনো সময় মিছে কথা কয় না। মা-ই কয়, 'মিছে কথা কইলে পাপ হয়।' তবে? গফুর চাচাও সব সময় সত্য কথা কয়। উনিতো সবাইরে বইলা বেড়ান–'মিছে কথা কইলে গোনাহ্ হয়, আল্লাহ্ লানত পাঠান।' ধন্ধে পড়ে শিমুল। শেষে আবারো মাকেঁই ওর বোকা মনে হয়। মাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলে–' তুমি কিচ্ছু জানো না। আমি কিন্তুক অহনে আর ভূতরে ডরাই না।' গর্বের হাসি ওর মুখে। 'বিকু ছলিম নানার কাছ থাইকা ভূত খেদাইবার মন্ত্র শিখছে। আমি ছয়ডা

গুলি দিয়া ওর কাছ থাইকা শিখছি। বেশ গর্বিত ঢংয়ে শিমুল আবৃত্তি করে–

"ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি,
মাথার উপর খোদা আছেন, করবে আমার কি?"

বটগাছ পেছনে রেখে হাত পঁচিশ ত্রিশ উত্তরে এগিয়ে গিয়ে ছেলের হাত ধোরে লতা চৌরাস্তার পশ্চিমমুখি রাস্তায় ছোট্ট জাম গাছের ছায়ার তলে গিয়ে দাঁড়ায়। ওখান থেকে হাত দশেক সামনে একটা দোকান। সকাল সন্ধ্যা খোলা থাকে।

একটা রিক্সা বেল বাজিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। রিক্সায় দুইজন যাত্রী। শিমুল ওদের কাউকেও চিনতে পারে না। লতা কাছে এসে কোমরে গাঁট দেয়া আঁচল খুলে শিমুলের হাতে একটা সিকি দেয়। শিমুলের হাতের তালুতে চকচকে একটা সিকি। খুশিতে ওর চোখ নেচে ওঠে। আশ্চর্যও হয় কিছুটা। সে মায়ের দিকে তাকায়। লতা হেসে বলে–'মুড়কি কিন্যা আনো গা।'

শিমুল এক দৌঁড়ে দোকানের সামনে চলে যায়। লোকটার বেশ বয়স হয়েছে, তাকালে তাই মনে হয়। বাঁশের চটা দিয়ে বানানো বেঞ্চিতে বোসে লোকটা এই খাঁ খাঁ দুপুরে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছে। চোখ মেলে শিমুলকে এক নজর দেখেই আবার বন্ধ করলো বুড়ো লোকটা। দোকনদারের হাতে একটা বিড়ি। জ্বালানো। ঝিম হয়ে বোসে থাকা দোকানদারের খেয়ালীর সুযোগে বিড়ির মাথায় বেশ খানিকটা ছাই জমে উঠেছে। শিমুলকে দেখে সে সোজা হয়ে বসলো। বিড়িতে জোরে টান দিয়ে একটা টিনের কৌটায় চেপে বিড়ির আগুন নিভিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো– 'আর কতো বাকি দিমুরে? আমারও যে এই দিকে আর চলে না বাপ! তর মায়রে ইট্টু কইস। তো, কি নিবি?'

শিমুলের মন দমে যায়। সে মাথা কিছুটা নিচু কোরে হাত বাড়িয়ে তালুবন্দী সিকিটা লজেন্স -এর বৈয়ামের উপর রেখে বলে–'বিশ পাইয়ের মুড়কি দেন। পাঁচ পাইয়ের কাঠি লজেন্স।'

দোকানদার কাকুর কথায় শিমুলের আনন্দের বিশাল বেলুনটা ফুটো হয়ে হুট কোরে চুপসে গেছে। কাটি লজেন্স দুইটি প্যান্টের পকেটে রেখে মুড়কির ঠোঙ্গা হাতে শিমুল মায়ের পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। চুপচাপ। হঠাৎ কোরে, বেশ রাগত স্বরে লতাকে কিছুটা চমকে দিয়ে শিমুল বললো–'দোকানদার কাকা টেহা চাইছে।'

দীর্ঘশ্বাস চেপে বাবলা গাছ থেকে উড়ে যাওয়া বকটার দিকে চোখ রেখে লতা শুধু বলে–'হু।'

পাকা রাস্তা থেকেই বাড়ি দেখা যায়। তবুও ঘুর পথে এখনো বেশ কিছুটা পথ ভাঙ্গতে হবে। তারপর পুল। পুল পেরোলে গজ পঁচিশ পশ্চিমেই বাড়ি।

পাকা রাস্তা থেকে ছোট পায়ে হাঁটা রাস্তা খাল পাড়ে চলে গেছে। ওই রাস্তায় নামতে নামতে ছেলের দিকে তাকিয়ে লতা বললো–'খাওনা ক্যারে? খাও। পয়সা পাইলে মাইনসে তো চাইবোই, মন খারাপ কইরা কি হইবো? মুড়কি খাও।'

শিমুল মুড়কির ঠোঙ্গা খোলে। অনেক মুড়কি। দোকানদার কাকা মেপে দেয়নি। সে প্রায়ই এমন করে। বাবার খুব বন্ধু মানুষ ছিলো। শিমুল এখনো স্মৃতি ঘেঁটে ভাসা ভাসা ওইসব দিন দেখতে পায়। তখন তো অবস্থা এমন গরীব ছিলো না। এইতো সেদিনের কথা। কিন্তু বাবা মরে যেতেই হু হু কোরে কেনো যে সব ওলোট পালোট হয়ে গেলো! খুব তাড়াতাড়ি। মাত্র দুই তিন বছরে কি কোরে যে গরীব হয়ে গেলো, শিমুল তা' একটুও বুঝতে পারে না। ওর শুধু ভেতরে ভেতরে কেমন যেনো একটা রাগ হয় আর তখন ফেলু ফুপা আর মার্গেটা ফুপুর মুখদুটো ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ঠোঙ্গা থেকে মুড়কি বের কোরে মুখে দিতে গিয়েও শিমুল থেমে যায়। মায়ের আমসি শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বলে–'তুমিও ন্যাও।'

'তুমি একলা খাও।'

'অনেকগুলান দিছে।'

'তুমি খাইয়া বইনের লাইগ্যা কয়ডা রাহো।'

'রাহুমনে, তুমি ন্যাও।'

'না বাবা। মিষ্টি খাইলে আমার দাঁত বিষ করে।'

শিমুল আবার হোঁচট খায়। মিষ্টি খেলে দাঁত ব্যথা হয়, এ আবার কেমন কথা! সত্যিই ব্যথা করে? মাতো মিছে কথা কয় না! করে নিশ্চয়! কিন্তু কই, তার তো করে না? বিকুর? বিকু নিশ্চয় কথাটা জানেই না।

খালের পাড়ে এসে ওরা দাঁড়ালো। ওইতো বাড়ি। মাঝখানে এই খালটা আর খালের ওইপাড়ে বিঘে দুই জমি। শিমুল মুড়কি চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করে–'ভিজ্যে পার হইবা?'

'হ। লও একবারে গা ধুইয়া যাই।'

শিমুল তাড়াতাড়ি মুড়কির ঠোঙ্গা দুমড়িয়ে আটকিয়ে পকেটে চালান কোরে দেয়। একটানে রাবারে আটকানো হাফ প্যান্ট খুলে ফেলে সে। মায়ের হাতে প্যান্ট দিয়ে দুই হাত দিয়ে লাফিয়ে পানি ছিটায়। লতা ধীরে ধীরে নেমে ওকে কোলে তুলে নেয়। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে শিমুল। আতা ফুলের সেই গন্ধ! ফিক কোরে হেসে শিমুল ওই গন্ধের বাগানে ঢুকে পড়ে। কতোদিন পরে মায়ের কোল!

'মাজ্জ '

কেঁপে কেঁপে ডাকটা শিমুলের কানেও আসে। সে শিলু আপাকে দেখতে পায়। শিলু দৌড়ে আসছে। পেছনে রানু, একটু একটু কোরে বেশি পেছনে পড়ে যাচ্ছে। শিমুলের ছোট বোন। ওকে মারার কারণেই আজ এতো কিছু হলো। শিমুল মায়ের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসে। তারপরই সে খলবলিয়ে দৌড়ে পাড়ে উঠে আসে। আর তক্ষুণি, বেশ পেছনে পড়ার কারণে রানু মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। হাত পা ছুঁড়ে চেঁচাতে শুরু করে গলায় যতোটা জোর জড়ো করা যায়– সবটুকু দিয়ে। শিলু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মায়ের ভিজে ওঠা কাপড়ে হাত রাখে। শিমুল ততোক্ষণে পকেট থেকে মুড়কির ঠোঙ্গা বের কোরে ফেলেছে। শিলুর চোখ ঠোঙ্গায়।

লতা শিলুর মাথায় হাত বোলায়। সোহাগ মেখে বলে– 'বইনে কানতাছে না? যাও মা, বইনেরে ইট্টু ধরো গা।'

শিলুর তেমন ইচ্ছে নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে পা বাড়ায় রানুর দিকে। কিন্তু শিমুল ওকে পেছনে ফেলে এক দৌড়ে রানুর কাছে চলে যায়। রানুকে ধরতে গেলো সে। তাতে ফল হলো উল্টো। রানু আরো জোরে তেতিয়ে উঠলো। ভ্যাবাচেকা হয়ে শিমুল মায়ের দিকে তাকায়। হঠাৎ ওর মাথায় বুদ্ধি আসে। সে মুড়কির ঠোঙ্গা থেকে মুড়কি বের কোরে রানুর সামনে ধোরে বলে–'কান্দে না বইনে, এই দ্যাখ, তর লাইগ্যা মুড়কি আনছি। কান্দলে কিন্তু সব মুড়কি আমি মঙ্গলারে দিয়া দিমু!'

তৎক্ষণাৎ রানুর কান্না শেষ। সে চোখ পিটপিট কোরে মুড়কি ধরা শিমুলের হাতের দিকে তাকায়। মাথা উঁচিয়ে মাকেও দেখে একবার। হাত বাড়িয়ে মুড়কি ধরতে যায়। কিন্তু শিমুলের অন্য হাতে ঠোংগা দেখা মাত্রই সে দ্রুত তার মত পাল্টে ফেলে। আবার সে গড়িয়ে পড়ে ধূলায়, সাথে চিৎকার আর হাত পা ছোঁড়া।

শিমুল সাথে সাথেই রানুর কৌশলটা বুঝতে পারে। পুঁচকে হোলে হবে কি, ঘটে শয়তানি বুদ্ধির ডিপো। একার সব চাই। শিমুল নিজের বাম হাতে ধরা ঠোঙ্গার দিকে একবার তাকায়। সবগুলো মুড়কি হাতছাড়া করতে ওর মন সহজে সায় দেয় না। তবুও সে রানুকে শান্ত করার জন্যে সে জোরে জোরে বলে–'নে, সবগুলানই নে। রাক্ষস! নে, কান্দিসনে আর, এইবার ওঠ।'

শিমুল রানুকে ধূলো থেকে হাত ধোরে টেনে তোলে। ওর সারা গায়ে ধূলো। ধূলো মাখা বাড়ানো হাত নিজের শার্ট দিয়ে ঝেড়ে মুড়কির ঠোঙ্গা রানুকে দিয়ে দেয়। ইতোমধ্যে রানু একদম লক্ষি মেয়ে হয়ে ওঠে। একটা মুড়কি মুখে পুড়ে দিব্বি দুই হাত বাড়িয়ে দেয় কোলে ওঠার জন্যে। শিমুল দ্বিধা না কোরে ওকে কোলে তুলে নেয়।

লতা ততোক্ষণে পাশে এসে গেছে। সাথে শিলু। লতা তাড়াতাড়ি বলে–'ওরে অহনে কোলে নিছো ক্যা? সারা শইলে যে আবার ধূলা লাগতাছে!'

শিমুল মায়ের দিকে না তাকিয়ে হাসে।

'ইস, কি ভারীরে! মুটকি!' টুক কোরে বোনকে চুমো খায় শিমুল। তারপর ওকে জাপ্টে ধোরে বাড়ির দিকে দৌড় দেয়।

স্কুল সীমানার দক্ষিণমুখি শেষ প্রান্তে আসতেই বাবার মুখটা শিমুলের মনে পড়ে যায়। বাবা যখন মারা যায়, ও তখন কত্তো ছোট। তবুও বাবার মুখ, হাসি, মেহেদি মাখা হল্‌দে লালে সংমিশ্রিত এক মাথা পরিপাটি চুল, গোলগাল চশমার ফাঁদে ডুবে থাকা দু'টি চোখ– সব, সব ওর মনে পড়ে। মাঝে মাঝেই মনে হয়। নতুন নতুন অদ্ভুত সব অনুভূতি আর এলোমেলো প্রশ্নের বোঝা মাথায় নিয়ে সেই অতীত ফিরে ফিরে আসা যাওয়া করে। জ্বলে জোনাকি পোকার মতো। হঠাৎ হঠাৎ ধাক্কাও লাগে। ভালো বোঝে না শিমূল, তবে বোঝে। বোঝাটা ধোঁয়াশার ধূসর পর্দা দিয়ে মোড়ানো, যা ইদানিং প্রতিটি দিন একটু একটু কোরে সেই অস্পষ্টতা কেটে টগবগে লাল সূর্যের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে অন্ধকারকে ঝেঁটিয়ে দূর কোরে দিচ্ছে। শিমুল নিজের ভেতরে সেই টগবগে লাল বলটা ধরিধরি কোরেও ধরতে পারে না। শেষে কোনো কোনোদিন সবার অগোচরে বাবার বাঁধানো ছবির সামনে গিয়ে সে চুপচাপ ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে। অস্পষ্ট শব্দে ঠোঁট নাড়ে। তখন তীব্র এক কষ্টে ওর বুক ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়। কেনো যে এমন হয়!

বিভিন্ন স্মৃতি হামাগুড়ি দেয় শিমুলের চোখে, বোধে। অভাব বলতে কিছু ছিলোই না। অর্ধেকটা এঁটো না করলে ওর ভাত খাওয়া শেষই হতো না। তিন বেলা যতো পারো, খাও। শিমুলের চোখ ঝাপ্সা হয়ে ওঠে। সেই ফাঁকে পেটে ঘাপটি মারা ক্ষুধার অজগর জিভ বের কোরে দেয়। ফুঁসতে থাকে অজগরটা। সাথে শিমুলও ফুঁসতে থাকে। রাস্তার পাশে একটা পাথর পড়ে আছে। শিমুল পাথরটা তুলে নেয়। গেটের দুই পাশে সিমেন্টের দুইটি ঢালাই কলস। কলস লক্ষ্য কোরে শিমুল পাথরটা ছুঁড়ে মারে। লক্ষ্যচ্যুত ঢিল। তাতে শিমুলের ভেতরটা আরো বহুগুণে তেতে ওঠে। আশেপাশে পাথর খোঁজে এবং পাথর খুঁজতে গিয়ে সে রাস্তা ছেড়ে বেশ কিছুটা পশ্চিমে সরে যায়। ওর নাকের খুব কাছে ফজলি আমের গাছ এবং ফজলি আম গাছটা দেখা মাত্রই ওর মাথায় প্রলোভনের গাঁদি পোকা গন্ধ ছড়াতে শুরু করে। পিটপিট কোরে দ্রুত এবং সন্তর্পণে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে শিমুল। না, কেউ নেই।

শিমুল গাছে ঢিল মারে। ঢিলের চেয়েও বেশি গতিতে ধকধকিয়ে ওঠে ওর বুক। ধকধকানির শব্দটা যেনো দূরে থেকেও শোনা যাচ্ছে। সে আকন্দ গাছের আড়াল নিয়ে ঝিম মেরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে বেশ কিছুটা সময়। ক্ষুধার অজগর ইতোমধ্যেই লেজ গুটিয়ে নিয়েছে। শিমুলের চোখে মুখে আতংক আর খুব ক্ষীণ একফালি লোভের লতা জড়িয়ে আছে।

সাত ভায়রা পাখির দল অবলীলায় চ্যাক চ্যাক কোরে আম গাছটায় উড়ে এসে বসলো। শিমুল এবার ক্ষিপ্র বেগে তলা থেকে ইয়া বড় তিন আম কুড়িয়ে দ্রুত বইয়ের ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলে। এদিক ওদিক তাকায়। আরো সতর্ক হয়ে সে বাতাবি লেবু গাছে ঝুলে থাকা ডালের নিচ দিয়ে মাথা নুইয়ে হেঁটে প্রাচীরের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। প্রাচীরের উচ্চতাটুকু এই প্রথমবারের মতো সে পরখ করলো। অনেক বেশি উঁচু, ওর ধরা ছোঁয়ার বাইরে, এটা ডিঙ্গিয়ে ওর পক্ষে পার হওয়ার উপায় নেই। প্রাচীর ঘেঁষে পাতা মেলে দিব্বি দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকৃতির মান কচু আর দুধ কচু। তার আড়াল নিয়ে শিমুল অতি সন্তর্পণে গেটের পাশে চলে আসে। স্কুলের দিকে আরো একবার তাকায়। ধকধক করছে বুক। স্যার টিউব ওয়েলের পাশ দিয়ে স্কুলের পেছন দিকে গেলেন। আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সাঁই কোরে শিমুল গেট পেরিয়ে বাইরে চলে আসে। অনেকক্ষণ পরে স্বস্তির শ্বাস টানে সে। কিন্তু আম? বাড়ি গেলে নির্ঘাৎ মায়ের নজরে পড়বে। প্রায়-ঝিমিয়ে পড়া বুকের ধকধকানিটা মায়ের মুখ মনে পড়ার সাথে সাথেই আবার লাফিয়ে ওঠে। সে বাড়ির সোজা পথ ছেঁড়ে প্রাচীর ঘেঁসা প্রায়-পরিত্যাক্ত পশ্চিমমুখি রাস্তা দিয়ে দ্রুত পা বাড়ায়।

ধরা পড়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও আর নেই ভেবে শিমুল যেই মাত্র নিশ্চিন্তে শ্বাস নিতে যাবে, মেয়েটাকে তখনই সে দেখতে পায়। ইব্রাহিম স্যারেরমেয়ে। কড়ইগাছে হেলান দিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে আছে। বারবার গলা বাড়িয়ে কি যেনো খুঁজছে। গায়ে সবুজ আর হালকা খয়েরী রঙের সালোয়ার কামিজ দিব্যি বনলতার রংয়ের সাথে মিতালি পাতিয়ে নিয়েছে, হুট কোরে আলাদা করা যাচ্ছে না। মেয়েটাকে হঠাৎ দেখে শিমুল থমকে গেছে। ভয় পেয়েছে। বুকে থুতু ছিটানোর কথাও সে ভুলে গেছে। ধরা পড়ার হাত থেকে রেহাই পেতে সে তিন তাড়াতাড়ি জংলীলেবুর গাছের ফাঁক ফোকড় গলিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো এবং হাত ও ঘাড়ে কয়েক মুহুর্তে বেশ কয়েকটা ডাঙ্গী পিঁপড়ের কামড় খেলো।

নি:শব্দে জঙ্গল ভেঙ্গে পাট ক্ষেতের আল্-এ এসে শিমুল কড়ই গাছের দিকে তাকায়। ওর চোখ দু'টো বিস্ময়ে হতবাক, ছানাবড়া! অতুলদা যে! শিমুলের শরীর কেনো যেনো একটু কেঁপে উঠলো। সে চুপিচুপি পাট ক্ষেতের মাঝখানে ঢুকে পড়ে। কিছুটা ভাবে। শেষে স্কেল দিয়ে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে স্কেল ভেংগে ফেলে। আমগুলো গর্তে ঢুকিয়ে ভালো কোরে মাটিচাপা দিলো সে। এতোক্ষণে ওর ভয় সত্যি সত্যি অনেক কমে যায়। আবার সে আলের পাশে ফিরে আসে। ইব্রাহিম স্যারের মেয়ে অতুলদার বুকে মুখ ঘঁষছে। অতুলদার হাত মেয়েটির কাঁধে। অতুলদা মেয়েটির মুখে চুমো খেলো! শিমুল কিছুটা সরে দাঁড়ায়। মেয়েটি অতুলদাকে জোরে জড়িয়ে ধরেছে যেনো। অতুলদার মুখ মেয়েটির মুখ ছেড়ে গলায়, গলা ছেড়ে বুকের দিকে

নেমে আসতে থাকে। খারাপ কিছু হচ্ছে. শিমুলের তাই মনে হলো অস্পষ্টভাবে। খারাপটা কি আর কেনো. তার কোনো ব্যাখ্যা ওর জানা নেই। ও মাজা বেঁকিয়ে এক মুঠো মাটি তুলে নেয়। মুঠি চেপে একটা দলা পাকালো সে। ঢিল। আরো কিছুটা সরে গেলো। আড়ালে। পাট গাছের উপর দিয়ে উঁচিয়ে সে ঢিলটা ছুড়ে দিলো। ঢেলা কোথায় গিয়ে পড়লো না পড়লো, ওদিকে কি হলো এতোসব দেখার সাহস ওর থাকে না। সে পাট ক্ষেত ভেঙ্গে দৌড়ে বাড়ির পেছনের ন্যাড়া বেল গাছের নিচে গিয়ে থামে এবং পেছনে ফেলে আসা রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে থাকে।

মাচার একপাশে রাখা বিশালাকারের আর্মীবাক্স আর বেড়ার মাঝখানের জায়গাটায় বইয়ের ব্যাগ ছুঁড়ে ফেলে শিমুল। দরোজার চৌকাঠে বোসে শিলু আপা দিব্বি রুটি খাচ্ছে! শিমুলের গা জ্বলে ওঠে হিংসায়। সেই সাথে ক্ষুধার ডালকুত্তাটা খ্যা খ্যা কোরে তেড়ে আসে। শিকেয় রুটির থালা আরেকটা থালা দিয়ে ঢাকা। শিমুল দ্রুত গিয়ে ঢাকনি থালাটা সরিয়ে নেয়। এবং হাত দিয়ে রুটি ধরতেই ভীষণ কান্না আসে ওর। সাথে আকাশ উঁচু রাগ। সেই কবে থেকেই দুপুরে ভাতের মুখ দেখা নেই। সকালের রুটি থাকে দুই একটা। স্কুল থেকে ফিরে তাই ভাগ কোরে খায় শিলু আর শিমুল। কোনো কোনো দিন থালা যে একদম শূন্যও থাকে না, তা-ও না। আজ, এখন, শিমুলের ভাগে আধখান রুটি পড়ে আছে। তাও আবার কম অর্ধেক। ওর তাই মনে হলো। স্কুলে না গিয়েও শিলু আপা দিব্বি রুটি খাচ্ছে, আর ওর জন্যে–, রাগটা ছিটকে গিয়ে মায়ের উপর পড়ে। শিমুল স্কুলে না গেলেই হলো, অমনি মায়ের চোখ লাল হয়ে যাবে, এমনকি শিমুলের পিঠে পাছায়ও মাঝেমধ্যে বেশ উত্তম মধ্যম পড়ে। মাঝেমধ্যে ভীষণ হতাশ হয় লতা। তখন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, হাতের লাঠি বা চড় থাপ্পড় থামিয়ে খুব ঠান্ডা গলায় ছন্দ তুলে বলে–'পোলার পো– আজ বুঝলি না, বুঝবি কাইল,
গোয়া থাবড়াইয়া পাড়বি গাইল!'

আর তখনই, অন্য সময়ে মারধোর খেয়েও শিমুলে যা হয় না, তা-ই হয়। কষ্টে আর লজ্জায় শিমুলের মন কেমন কেমন করে, কষ্ট হয় মায়ের জন্যে। তখন সে মনে মনে কোনো না কোনো ভালো একটা প্রতিজ্ঞা কোরে ফেলে।

থালার রুটি থালায়ই আছড়ে ফেলে শিমুল। শিলুর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে– 'ছোঁচা।'

রাগে শিলুর চোখ দু'টো ধক কোরে জ্বলে ওঠে। সেই সাতসকাল থেকে একটার পর একটা কাজ লেগেই আছে। তার উপর রানুর জ্বালাতন। আর নবাব পুত্তুর স্কুল থেকে ফিরেই রায় বাহাদুর সেজেছেন।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নেয় শিলু। মুখের শুকনো রুটিটা জিভ দিয়ে ঠেলে গিলে ফেলে সে পানি আনার জন্যে রান্না ঘরে যায়। পানি নিয়ে ফিরে এসে দেখে শিমুল নেই। আধখানা রুটি থালায় দুমড়িয়ে পড়ে আছে। শিলুর রাগ এতোক্ষণে বুকের ভেতরে দুমড়ে মুচড়ে ঝুরঝুর হয়ে চোখ বেয়ে কষ্টের আকারে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। সে অসুস্থ্য ঘুমন্ত

রানুর পাশে দাঁড়িয়ে, বাবার সবচে ন্যাওটা এই মেয়েটা সত্যি সত্যি ফুঁপিয়ে ওঠে। 'আধখানা রুটি নিজে না খেলে কি হতো!' নিজেকেই ওর অপরাধী মনে হয়।

হুড়মুড় কোরে উঠানে দৌড়ে এলো বিকু। হাঁপাচ্ছে। সাথে কালু। কালুও জিভ বের কোরে দুষ্টোমি ভরা চোখে চেয়ে আছে বিকুর দিকে। বারান্দায় না উঠে, উঠান থেকেই সে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাক ছাড়ে–'কইরে শিমুল, তাড়াতাড়ি বাইর হ।'

শিমুলের চাচাতো ভাই বিকু। বয়সে বিকু শিমুলের বছর দেড়েকের মতো বড় হোলেও দুইজন একই ক্লাশে পড়ে। চতুর্থ শ্রেণী। দুইজনের মাঝে গলায় গলায় মিল। কিন্তু শিমুল যতোই বড় হচ্ছে, ততোই কেমন যেনো একটু একটু বদলে যাওয়া চোখে বিকুর দিকে তাকাতে শুরু করে। কিছু একটা খোঁজে বিকুর চোখে মুখে। পায় না। অথচ জিনিসটা যে আছে, তা-ও সত্যি। সব কিছুতেই কেমন তরো একটা ধন্ধ জাগে ওর। বিদ্বেষের ছোঁয়া লাগে চেতনায়।

বিকুর মা মরে গেছে সেই কবে! শিমুল আগে এমনটাই জানতো। কিন্তু সেদিন শিলুর সাথে বিকুর ঝগড়া বাঁধাতে চমকে গিয়েছিল শিমুল। শিলু বিকুর সাথে কোনো কিছুতেই পারে না। অগত্যা সে ঠোঁট খুলে দিয়েছিল নিষ্ঠুরভাবে। তখনই শিমুল প্রথম শোনে– বাবার সাথে কি নিয়ে যেনো ঝগড়া বেঁধেছিলো বিকুর মায়ের। তারই জের হিসেবে বিকুর মা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আর ফিরে আসেনি। বিষ খেয়ে মরে গিয়েছিল। শিলু তাই বলেছে। শিলুর অভিশাপ– বিকুও মায়ের মতো বিষ খেয়ে মরবে। কথাটা শুনে শিমুলের খুব খারাপ লেগেছিল। সেদিন সেও শিলু আপার সাথে কোনো কথা বলেনি। সান্ত্বনা কিভাবে দিতে হয় তা-ও ওর জানা নেই। সে খুব আস্তে কোরে কিন্তু বেশ দৃঢ়তার সাথে বিকুকে সেদিন বলেছিল– 'শিলু আপাটা আচ্ছা একটা হারামি,খচ্চর। মন খারাপ করছ ক্যা? অরেট্টু বড় হইয়া আমি আর তুই তর মায়রে খুইজ্যা বাইর করুমনে। আমার মনে হয়, তর মায় মরে নাই। শিলু মিছে কথা কইছে। ল, ওঠ অহন। মাছ ধরবার যাইতিনে?' কথাটা শিমুল একদিনের জন্যেও ভোলেনি।

বিকুর বাবা চাঁপাই নবাবগঞ্জে কি যেনো একটা চাকরি করে। বছরে সর্ব সাকুল্যে একমাসও বাবাকে কাছে পায় না বিকু। দাদীই ওর বাবা মা। বুড়ি বিকুটাকে সত্যিই খুব ভালোবাসে। বিকুও তা জানে এবং জানে বোলেই মাঝে মধ্যে দাদীকে ভয় ধরিয়ে পিলে চম্‌কে দেয়, আদায় কোরে নেয় নিত্য নতুন জামা কাপড়, টাকা পয়সা, কত্তো কি!

শিলুর সেই কথা শোনার পর থেকে মাঝেমধ্যে বিকুটা লা পাত্তা হয়ে যায়। দুই তিন দিন কোনো খোঁজ খবর থাকে না। খেয়াল খুশি মতো বিকু বুড়িকে না বোলেই কোথাও চলে যায়। তখন বুড়ির সে কি করুণ অবস্থা! অন্য সময়ের ডাইনী ডাইনী মুখটা তখন কি মায়াবী আর সুন্দর হয়ে ওঠে,ঠিক মায়ের মতো। শিমুল তখন আশেপাশে একটু আধটু ঘুরঘুর করে। বুড়িটা অন্য সময়ের মতো তখন খেঁকিয়ে ওঠে না। খড়খড়ে শুকনো গলায় একদলা নরম মোম ঢেলে বলে– 'আয় ভাই, ব। বিকুডারে দেখছস? আমার হাড় গোড় জ্বালাইয়া খাইয়া দুবলা ঘাস না বানাইলে নবাব পুত্তুরের খায়েশ মিটবো না। বুঝবি লো, বুঝবি; তয়, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুঝলি না। আমার কি? আমি আর কয়দিন? আইজ মরলে কাইল দুইদিন,

তখন তোরে কেডা পুছবো?' দাদীর একটানা বকে চলায় শিমুল তখন আর বিরক্ত হয় না, কেনো যেনো তখন লক্ষী ছেলে হয়ে ওঠে শিমুল এবং মনে মনে সে বিকুকে গাল দেয় আর ক্ষেপে ওঠে।

আজও বিকু আর শিমুল একই সাথে স্কুল থেকে ফিরেছে। বিকুর হাতে কাচের গুলি। সে দ্বিতীয়বার শিমুলকে ডাক দিতে যায়। কিন্তু শিলুকে কাঁদতে দেখে সে থমকে যায়। ওর ডান পা বারান্দায় ওঠার জন্যে মাটির তৈরি সিঁড়ির এক থাক উপরে।

'ধূস, সব জায়গায় খালি প্যানর প্যানর কান্দন, ফিল্‌মী ঢং।'

শিলু দুই একটা ফিল্‌ম্-এর গল্প অতুলদার মুখে শুনেছে, কিন্তু নিজের চোখ দিয়ে এখনো দেখা হয়নি। ওর চেয়ে বেশ ছোট বিকুর মুখে ফিল্‌মী ঢং কথাটা শুনে সে বেশ রেগে গেলো। রাগের ফলে তৎক্ষণাৎ কান্নাটাও ওর থেমে যায়।

বিকু হি হি কোরে হাসে। শিলু কিছুই বোঝে না। ফলে শেষ পর্যন্ত রেগে মেগে সে বিকুকে তেড়ে আসে। বিকু দৌড়ে সরে দাঁড়ায়। হাসে। খুব মজা পায় বিকু। খুঁটিতে পিঠ ঘষে আরাম করছিল শিলুর আদরের খাসি মঙ্গলা। শিলুকে আরো বেশি রাগিয়ে দেয়ার জন্যে বিকু মঙ্গলার কান মলে দেয়। তারপরই পেছন ফিরে একবার তাকিয়ে পড়িমরি কোরে দে দৌড়।

পরিত্যক্ত ভিটে। দুই বছর আগেও মন্টুরা এ বাড়িতে থাকতো। কথা নেই, বার্তা নেই, হুট কোরে ওরা একদিন সকালে লা পাত্তা। শিমুল অর্চনা দিদির উপর রীতিমতো ঠোঁট ফুলিয়ে রেগে উঠেছিল। মনে মনে সে জেদ করেছিল- মন্টুর সাথে দেখা হোলে প্রথমেই কেনু আর বুড়ো আংগুল ঠেকিয়ে সে ওর সাথে আড়ি দেবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিমুল। ওর চোখে এখন ওইসব দিনের অনেক ছবি অস্পষ্টভাবে, ধোয়াশাচ্ছন্ন হয়ে ভাসে। পূজা পার্বণে অর্চনা দিদি সুন্দর কোরে সাজতো। মন্টুকেও সাজাতো, তার ছিটে ফোটা শিমুলের কপালেও নির্ঘাত জুটতো। কখনো সখনো শিমুল ভয়ে চমকে উঠতো বিশাল সব মূর্তির দিকে তাকিয়ে। একদম জীবন্ত যেনো। বিশেষ কোরে ওই মূর্তিটা– কুচকুচে কালো তার গায়ের রং, অনেকগুলো হাত, হাতে কত্তোসব কি! জিভটা কি টকটকে লাল। ভয়ে কাঁপতো শিমুল অথচ চোখ দু'টোর অদ্ভুত মায়া যেনো কানে কানে শিমুলকে ফিসফিসিয়ে বলতো, 'দূর বোকা, আমাকে তোর কিসের ভয়? এদিকে আয়, প্রসাদ নিবিনে?' হয়তো এ কারণেই শিমুল ভয় পেয়েও ওই মূর্তিটার কাছাকাছি প্রায়ই যেতো এবং ওখানে গেলেই ধর্ম স্যারের গলাটা স্পষ্টভাবে শুনতে পেতো শিমুল– 'মিথ্যে কথা বলবে না। মিথ্যে বললে পাপ হয়, ঈশ্বর অভিশাপ পাঠায়।' আর আশ্চর্য, একদম ভুলে যাওয়া মিথ্যা বলার সব ঘটনা তখন ওর মনে পড়ে যেতো এবং সত্যিকারের কাঁপণ লাগতো বুকে। অর্চনা দিদিটা যে কি! ঠিক ওই সময়টাতেই তাকে

খুঁজে পাওয়া যেতো না। তারপরই একসময় হাসতে হাসতে ছুটে এসে শিমুলকে কোলে নিয়ে নাক টিপে দিতো অর্চনা দিদি। কি ফুটফুটে রঙ ছিলো তার গায়ের! মায়ের চেয়েও সুন্দর। আর তার কোলে উঠলেই শিমুল বেলী ফুলের গন্ধ পেতো।

মাত্র বছর দুই হয়। কত্তো আয়োজন কোরে শিমুলকে ভাইফোটা দিয়েছিল অর্চনা দিদি। তার মাসখানেক পরেই সবাই রাতারাতি চলে যায়। ভারতে। কেনো, তা ঠিক বুঝে ওঠে না শিমুল। শূন্য ভিটেয় আসলেই ওর এসব কথা মনে পড়ে আর মনটা তখন খুব খারাপ হয়ে যায়। সব রাগ গিয়ে তখন জড়ো হয় ফেলু ফুপার উপর।

চারপাশে এখন শুধু ঝোপ ঝাড়। উঠোনের একাংশ পাকা থাকায় ওদিকটায় কোনো জঙ্গল হয়নি, তবে আশে পাশের দুর্বা ঘাস বেড়ে বেড়ে পাকাটুকু ঢেকে ফেলেছে প্রায়। পাকা উঠোনেও ফাটল ধরেছে। সেই ফাঁক গলিয়ে কয়েকটা তিল গাছ দিব্বি বেড়ে উঠেছে।

লিচু গাছের ডালে বাঁধা দোলনায় আস্তে আস্তে দোল খায় শিমুল। আগে সকাল দুপুর সন্ধ্যায় অর্চনা দিদি সোনা ব্যাঙের মতো গাল ফুলিয়ে শঙ্খ বাজাতো। কেমন গম্ভীর আর গমগমে সেই সুর। ঠিক ছোট দিদিমনির চোখ মুখের মতো। খুব সুন্দর, কিন্তু চাপা। আজকাল এদিকটায় সহজে কেউ আসে না। ভাঙ গাছের সাথে ভাট গাছ মিতালি কোরে ভিটের চারপাশ দখলে নেওয়ার গোপন তোড়জোড় চালিয়েই যাচ্ছে।
'টু-উ

শিমুলের মন ভালো নেই। শব্দটা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে সে বের কোরে দিলো। দোলনার দুলুনি কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ে। ওর পেট গুলিয়ে আছে। ক্ষিধেয়। সাথে মাথাটাও। রাগে আর অভিমানে।

দোলনা থেকে নেমে এলো শিমুল। দুর্বা ঘাসে ঢাকা পাকা উঠোনে গামছা বিছিয়ে সে শুয়ে পড়লো আর সাথে সাথেই ডান হাতের কনুইয়ের কাছে একটা লাল পিঁপড়ে ওকে কামড়ে দিলো।
টু-উ

রাগে পিঁপড়েটাকে পিষে একদম মিশিয়ে ফেললো ধুলার সাথে। তবুও রাগ যায় না। কনুইটা বেশ জ্বালা করছে। চুলকাচ্ছে। হঠাৎ কোরে ওর সব রাগ গিয়ে বাবার বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।
'টু-উ '

শিমুল গালি দেয়ই না বলা যায়। এখন কিন্তু ভেতরে ভেতরে হঠাৎ কোরে তেড়ে ওঠে সে। চেঁচিয়ে ওঠে মুখ খিস্তি কোরে- 'কুত্তা।'

রক্ত জবা গছের এলিয়ে পড়া ডাল সরিয়ে বিকু শিমুলের দিকে আসতে আসতে কিছুটা রেগেই বললো- 'ধূস! তুই আমার 'টু' হুনছ নাই?'

শিমুল বিকুর দিকে ফিরেও তাকালো না। ওর বরং ইচ্ছে হলো কষে বিকুর পাছায় একটা লাথি মারতে। রাগে সে একমুঠো ঘাস টেনে ছেঁড়ে।

বিকু অতোশতো খেয়াল করে না। সে শিমুলের পাশে বসতে বলে– 'গুলি খেলতি নে? ল ওঠ। আমরা আজকে দুইজন মিল্লে খেলুম। দেহি ওরা আইজ আমাগো ক্যামনে হারায়!'

'তেন্দ্রামি না কইরা তুই অহন যাবি? তুই গেলে খেলবার যা।'

'ওম্মা, তুই না গেলে হেগো লগে আমি একলা ক্যামনে খেলুম?'' বিকু আশ্চর্য হয়ে শিমুলের দিকে তাকিয়ে রাগের কারণটা বুঝতে চেষ্টা করে।

'কানের কাছে ভট ভট করিস না।' রাগে শিমুল হাতের ঘাসগুলো পাশে ছুঁড়ে ফেলে ফের আবার তাজা ঘাস ছেঁড়ে।

'ধূস! খালি বেহুদা রাগ দেহাস! কি হইছে তর? আমি তর কি করছি?'

'ক্ষিধেয় আমার পেট চো চো করতাছে, আর হ্যায় আইছেন গুলি খেলবার!'

বিকু এবার সোজা হয়ে বসে। চোখের ভ্রু কিছুটা কুঁচকে যায় ওর।

'খাস নাই?'

'তরে কওন লাগবো?'

বিকু কিছুক্ষণ চুপটি মেরে চুপচাপ বোসে থাকে। তারপর হঠাৎ কোরে সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো–' বুঝছি, শিলু আপায় কান্দে ক্যারে। তুই ব, আমি যামু আর আমু।'

ঝাপ-ঝোড় ঠেলে বিকু দ্রুত উধাও হয়ে যায়।

সময় যতোটা লাগার কথা, তারচে' কিছুটা বেশি সময় পরে বিকু ফিরে আসে। গলায় গামছার এক মাথা প্যাঁচানো। অন্য মাথায় একটা পোটলা মতো। শিমুলের সামনে বোসে পোটলা খুলতে খুলতে খুশি মনে বিকু বললো, 'বুড়িড্যা খুব হারামি, ঘর থাইকা নড়নের কথা মনে করে না। নে ওঠ, তাড়াতাড়ি খাইয়া ল।'

শিমুল ওঠে না। পাশ ফেরার ছল কোরে পোটলার দিকে তাকায়। মুড়ি। সাথে নাড়ু আর বাদাম দিয়ে বানানো খেজুরের পাটালি। জিভে ওর জল এসে গেলো সাথে সাথে। ইস, কতোদিন হয় বাদাম ছড়ানো খেজুরের পাটালি খায় না শিমুল। ওর খুব প্রিয়। বাবা বাড়ি ফেরার সময় কতো কি আনতো! একেক দিন একেক তা। তবে, এই বাদাম দেওয়া পাটালি প্রায় প্রত্যেক দিনই আনতো। বাবা কি কোরে যে শিমুলের মনের কথা বুঝে ফেলতো! আবার পাশ ফেরার ছল কোরে শিমুল গোপনে ঢোক গেলে।

বিকু তাড়া দেয়জ্জ 'খাস না ক্যা? ওঠ!'

'তুই খা।'

'ধূস, আমার পেট ভরা, ভাত খাইছি। তুই খা।' আলসেমিতে বিকু শিমুলের বিছানো গামছায় গা এলিয়ে দেয়।

'না।' শব্দটা শিমুলের গলায় খুব রুঢ় শোনায়।

'খাইতিনে?' কনুইয়ে ভর দিয়ে বিকু শিমুলের দিকে অবাক চোখে তাকায়।

'না।'

'না ক্যারে?'

'তরা আর ফেলু ফুপারা আমাগো সব জমি নিয়া নিছোস দেইখাইতো আমাগো অহন এতো কষ্ট। আমাগো না খাইয়া থাহন লাগে।'

বিকু হতভম্ব হয়ে যায়। ও খুবই চঞ্চল। ঘটে বুদ্ধিও একটু বেশি রাখে বোলেই গোপনে ওর মাঝে এই বয়সেই একটু আধটু গর্বও আছে। কিন্তু শিমুলের কথায় এখন সে সাথে সাথে কোনো জবাব দিতে পারলো না। শুধু চার পাঁচ দিন আগে শিমুলের হাত থেকে মার্গেটা ফুপু যেভাবে জাম্বুরাটা কেড়ে নিয়েছিল, সেই ছবিটা ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সবাই জানে, গাছটা শিমুলগো মা-ই সেই কবে লাগিয়েছিল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বোসে থাকে বিকু। গামছা ধোরে মুড়িগুলো নাড়াচাড়া করে। শেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে–'আমারে এইসব কথা কস কেরে? ঠিক আছে, আমি যহন বড় হমু, তহন তগো সব জমি ফিরাইয়া দিমু। আমার মার নামে কিরা কাইট্টা কইতাছি। অহন আগে খাইয়া ল। তর না ক্ষিধে লাগছে?'

'লাগুক গা, তর কি?'

লিচু গাছের দুই ডালের ফাঁক দিয়ে শিমুল উত্তরমুখি আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। সেই আকাশে শূন্যতা ছাড়া কিছুই নেই।

'ধূস।' বিকু এবার সত্যি সত্যি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ে। হতাশাটুকু রাগের আকারে বেরোতে গিয়েও ওর গলার কাছে আটকে থাকে। শুধু খুব আস্তে এবং মিনমিনে কষ্টের ধরা গলায় ঝুলন্ত দোলনাটার দিকে চোখ রেখে বলে–'মনে রাহিস, তগো মায় আমারে কিছু খাইবার দিলে আমিও তহন খাইতাম না। শিলু আপায় দিলেও না, লীনা আপায় দিলেও।'

শিমুল কোনো জবাব দেয় না। তবে ভেতরে বেশ নরম হয়ে ওঠে। বিকু তা বুঝতে পেরেই আবার বলে– 'দাদীরে কত্তো পটাইয়া ঘর থাইকা খেদাইয়া হের পরে আনছি। টের পাইলে জিভলায় আগুন জ্বালায়বো। খাইতিনে? নে, ওঠ।'

বিকু শিমুলের হাত ধোরে টান দিতেই শিমুল এবার উঠে বসে।

গড়াতে গড়াতে আগুনের বলটা পশ্চিমে অনেকটুকু হেলে পড়েছে। সন্ধ্যার আগে ভাগে বড়শিতে শিংমাছ বেশি ধরে। চাই কি, দুই একটা মাগুরও। শিমুল বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। তাতানো রোদ থাকতে থাকতে ডাঙ্গী-এর বাসা ভাঙ্গা সহজ। খুব বেশি কামড় খেতে হয় না।

উঠানে পা দিয়েই শিমুল থমকে চমকে উঠলো। ঘরে ঢুকলো সে এক দৌড়ে। মা ফেরেনি। কোথায় গেছে, তা-ও জানা নেই। তবে, কারণটা শিমুল অনুমান করতে পারে। তাতে ওর

একটু একটু লজ্জা হয়। শিলু আপাকেও সে কোথাও দেখতে পায় না। নাকি সুরে ট্যা ট্যা কোরে রানু কাঁদছে। কুঁকরে এতোটুকু হয়ে শুয়ে আছে। কপালে ফোটায় ফোটায় ঘাম। চোখ দুটো যেনো কোঠর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যেতে চাইছে। শিমুলের দিকেই তাকানো। কিন্তু উদভ্রান্ত। শিমুল দৌড়ে গিয়ে ওর কপালে হাত রাখলো। ছ্যাৎ কোরে উঠলো হৃদপিন্ড। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। শরীর থরথরিয়ে কাঁপছে। শিমুলের হাতের স্পর্শে রানু ভয়ে শব্দ কোরে চেঁচিয়ে উঠলো– 'উলি, উলি।' ওর শীর্ণ, মোমের মতো সাদা আর তুলতুলে দুই হাত শিমুলকে জড়িয়ে ধরলো। আতংকে গোটা মুখ ফ্যাকাসে, চোখের কোনা রক্তজবার মতো লাল। শিমুল যত্ন কোরে রানুকে আঁকড়ে ধরে। হালকা চাপ দেয় নিজের বুকের দিকে। নিশ্চয়তা। যেনো নিজের সাহস আর শক্তিটুকু ছোট্ট বোনটার দেহে মনে সে প্রচন্ড আকুলতায় ছড়িয়ে দিতে চাইছে। কি যে করবে, তাৎক্ষণিক ভাবে সে বুঝে উঠতে পারে না। মা ফেরেনি, শিলু আপাও নেই। কান্না পায় শিমুলের। জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরে। ঠিক তক্ষুণি রানু আবার চেঁচিয়ে ওঠে- 'উলি, উলি।'

কান্না মিশানো গলায় শিমুল রানুকে বুকে নিয়ে বলে– ' কিয়ের উলি বইনে? দূর, এই যে আমি! মা এই আইয়্যা পড়লো বইল্যা, ডরায় না বইনে। দেখ, দেখ এই যে আমি। উলিরে পিডাইয়া শেষ কইরা ফালাইতাম না? ও বইনে, বইনে-!' শিমুল দিশেহারা হয়ে মনে মনে ভূত তাড়ানোর মন্ত্রটা পড়তে থাকে।

রানু চোখ বুঁজে ঠোঁট নাড়ায়, কিন্তু শব্দ বেরোয় না। শিমুল রানুকে কোলে নিয়েই উঠে দাঁড়ায়। বারান্দায় গিয়ে গামছা ভিজিয়ে শরীর মুছে দেয়। আর কি করতে হবে, বুঝতে না পেরে তাল পাতার পাখা দিয়ে সে রানুকে বাতাস করে। আর পারছে না সে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর। বুকের ভেতরে কিসের যেনো কাঁপণ।

কলসি কাঁখে শিলু আপাকে আসতে দেখা মাত্রই শিমুলের কান্নার সব বাঁধ ভেঙ্গে যায়। কোলে শিথিল হয়ে পড়া রানু। শিমুল ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

রানুর মাথায় শিলু ও শিমুল অনেকক্ষণ পানি ঢালে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে পিটপিট কোরে একটু চোখ মেলে রানু। কিন্তু সাথে সাথেই 'উলি উলি' বোলে চেঁচিয়ে আবার জ্ঞান হারায়। জ্ঞান হারানোর আগে শিমুলকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে রানু ওর পেটের বেশ কিছুটা চামড়া ছিলে ফেলেছে। শিমুল একটুও রাগ করলো না, যেনো ওর কোনো জ্বালাই হয়নি। কি করবে, শিলুও বুঝে উঠতে পারে না। ঔষধ দরকার। সেই কোন সকালে কান্নাকাটি কোরে শেষে রানু আধখানা রুটি খেয়েছিল! তারপর থেকেই উপুস চলছে। বার্লি চিনি দরকার। কিন্তু পয়সা? নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো। উপায়ন্ত না দেখে সে ভাইয়ের দিকে তাকায়। গলায় জোর নেই, এমন স্বরে বললো–'তুই ইট্টু দোহানে যা ভাই। মার কথা কইস। এক পোয়া বার্লি আর আধা পোয়া চিনি দিবার কবি। একদৌড়ে যাবি আর আইবি। ঔষধ আনন লাগবো, দেরি করিস না।'

শিমুল দৌড়ায়। একটু বেশি জোরেই দৌড়ে গেলো সে। কিন্তু মন ওর ভেঙ্গে যায়। দোকানে বার্লি বা চিনি নেই। হিজল দীঘি হাটে যেতে হবে। তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু পয়সা?

ওখানে তো কেউ আর তাকে চেনে না যে, বাকি দেবে? শিমুলের মাথা বেশ ঝুলে পড়ে। ওর পা আর চলতে চায় না।

শিলু'পার কথায় শিমুল ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ালো। টিপু স্যার এমনিতেই আগের ঔষধের দশটা টাকা পায়। সেই টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত শিমুল বাঁকিতে ঔষধ আনতে যাবে না। 'শিমুল,লক্ষি ভাই আমার।' শিলু নরম সুরে আব্দার করে, বুঝাতে চায়। কিন্তু কাজ হয় না। শেষে রাগে ক্ষেকিয়ে ওঠে শিমুলের উপর। তাতেও শিমুল টলে না, আগের মতোই দরোজায় হেলান দিয়ে সে চুপচাপ রানুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সকালের টকটকে লাল সূর্যের মতো একটা বল হঠাৎ কোরে শিমুলের মাথায় এসে ঢুঁশ খায়। নড়ে ওঠে সে। এক মুহূর্ত ভাবে। চোখ তুলে তাকাতেই বেড়ার সাথে ঝুলানো দাঁওটা ওর চোখে পড়লো। এগিয়ে গিয়ে অনেকটা হ্যাঁচকা ধরনের টান দিয়ে দাঁওটা শিমুল হাতে তুলে নেয়। শিলু কিছু ঠাওর করতে না পেরে চমকে ওঠে। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে–'দাও দিয়া কি করবি?'

শিমুল কোনো জবাব দেয় না। বিশাল আর্মী-ট্রাংকের পাশঘেঁষা বাঁশের খুঁটির দিকে তাকালো সে। মুহূর্ত মাত্র। মাথা নিচু কোরে সে মাচার নিচে ঢুকে পড়ে। অনেকটা হামাগুড়ি দিয়ে, বাঁ থাই আর হাতের উপর ভর রেখে দাঁওয়ের আগা দিয়ে বাঁশে কোঁপ দেয় শিমুল– ঠুক-ঠুক....

প্রথম শব্দেই মাচার উপর থেকে কঁক-কঁ-কঁ শব্দ তুলে হুড়মুড়িয়ে একটা মুরগি রানুর সামনে উড়ে গিয়ে পড়ে, পরমুহূর্তেই দরোজা গলিয়ে উঠোনে।

দাঁওয়ের আগায় চল্‌টা তুলতেই বেশকিছু পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা আর পঁচিশ পয়সার মুদ্রা ঝনঝনিয়ে নিচে পড়লো। খুঁজে খুঁজে সবগুলো মুদ্রা গুছিয়ে আনে শিমুল। তারপর গভীর মনোনিবেশে বাঁশের খোড়ল থেকে– ওর জমানো ব্যাংক থেকে সবগুলো পয়সা বের করতে থাকে। পয়সার উপর পয়সা পড়ে টুংটাং শব্দ হয়। শিলু ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে সব কিছু চুপচাপ দেখে যায়।

অনেক কষ্ট কোরে শিমুল পয়সাগুলো জমিয়েছে। পাঁচ পয়সা দশ পয়সা কোরে। সিকির সংখ্যা বেশ কম। তবে, আধুলিও কয়েকটা আছে। টাকার মুদ্রা মোটে তিনটে। গ্রামেরই কেউ কেউ মাঝে মাঝে শিমুলের বরশিতে ধরা মাছ কেনে। দাদীও। বিকুটা মোটেই মাছ ধরতে পারে না। তাছাড়া অতুলদাদের বাড়িতে, ফেলু ফুপাদের বাড়িতে শিমুল মাঝে মাঝে কাজ করে। ক্ষেত নিড়ায়, ধান কাটে, মশুরি তোলে। ওরা খেতে দেয়। সাথে কখনো সখনো আট দশ আনা পয়সা। শিমুল তা খরচ না কোরে জমিয়েছে। ওর একটাও ভালো জামা নেই। জামার অভাবে স্কুলে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ মায়ের যেনো চোখ নেই। এছাড়াও সামনে পরীক্ষা। পরীক্ষার ফিস দিতে হবে। শিমুল আজ সেই সঞ্চয়ে এখন দাঁও চালিয়েছে।

উনিশ টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা। মনটা ওর খুঁতখুঁত করে। অনেক দিন ধোরে জমাচ্ছিল। সেই হিসেবে সময়ের তুলনায় সঞ্চয়ের পরিমাণটা বেশ কম কম ঠেকে। মুহূর্তের জন্যে টাকাটার উপর ওর একটু মোহ জাগে। খারাপ লাগে। কিন্তু মোহটাকে, খারাপ লাগাটাকে ঝেড়ে ফেলে শিমুল উঠে দাঁড়ায়। দাঁওটা জায়গা মতো রেখে, শিকা থেকে একটা চ্যাপ্টা খালি শিশি নিয়ে, একটিও কথা না বোলে সে রানুর দিকে তাকায়। রানুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, সারা মুখ সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাসে, চোখ দুটো বোঁজা। ঠোঁট দুটো একটু একটু কাঁপছে। শিমুল দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সারা দিনের হরেক কিসিমের ঘটনার উত্তেজনায় শিমুল বিমূঢ়। আম চুরির ঘটনা বা অতুলদা আর ইব্রাহিম স্যারের মেয়ের সেই ছবিটা সে ভুলেই গেছিলো। কিন্তু রাতে খেয়ে দেয়ে শুতে না শুতেই সব কিছু কেমন শুরশুর কোরে ওর মনের গলিতে ভিড় জমাতে লাগলো উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে। অভ্যাস। প্রতি রাতেই রানুর সাথে এ নিয়ে ঝগড়া হয়। ও না ঘুমানো পর্যন্ত মা শিমুলের দিকে ফিরতে পারে না। অথচ মা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে না দিলে, মাথায় ডেলা উকুন খোঁজার ওসিলায় বিলি না কাটলে, মায়ের বুকে কি শীতে, কি গরমে, সেঁটে গিয়ে পুটপুট কোরে সারা দিনের সঞ্চিত অদ্ভুত আর আজগুবি সব কথা আর প্রশ্ন বলতে না পারলে ওর ঘুম আসতেই চায় না। মায়ের বুকে মুখ রাখতেই ভারী মিষ্টি আর নরম আতাফুলের ম-ম গন্ধের নির্ভীক সাম্রাজ্যে শিমুল ডুবে যায় এবং তখন ওর মনে কোনো ধরণের কষ্ট থাকে না। সারাদিন না খেয়ে থাকার কারণে জমে ওঠা ক্ষোভও তখন একদম উধাও হয়ে যায়। এবং তখনই ওর চোখ বুঁদে আসে। কিন্তু বাধ সাধে রানু। শিমুলও তার শোধ নেয় মাঝেমধ্যে। মাকে জড়িয়ে ধরার ঢংয়ে হাত বাড়িয়ে কুটুস কোরে রানুকে চিমটি কাটে। ওহ, রানুর তখন সে কি ফালাফালি। খুব মজা পায় শিমুল। মায়ের আবডালে থেকে, পিঠে মুখ ঠেকিয়ে সে ফিকফিক কোরে হাসে।

ঔষধে কি যাদু! এক ডোজেই রানুর জ্বর প্রায় শেষ। এখন কাৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে। শিমুল কিছুটা গড়িয়ে রানুর পাশে গিয়ে কনুইয়ে ভর কোরে রানুর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকায়। খুব আলতো কোরে রানুর কপালে হাত রাখে। গরম আছে। কিন্তু জ্বরের মাত্রা বুঝতে পারে না সে। শেষে নিজের কপালেও হাত রেখে তুলনা করলো মনে মনে। বার কয়েক। তবুও ভালো কোরে কিছু ঠাওর করতে পারে না সে। ফের নিজের জায়গায় ফিরে যায় অনেকটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব মনে।

মা ও শিলু আপাকে রান্নাঘর থেকে এসে বড় ঘরে ঢুকতে দেখে শিমুল হারিকেনের সলতে কিছুটা বাড়িয়ে দিলো। শিলু দেরি না কোরেই শুয়ে পড়ে। মা পানের থালা হাতে নিয়ে বিছানায় এসে বসলো। কলা পাতার ভাঁজ খুলে হতাশ হয় সে। পান নেই। ধ্বক কোরে ওঠে শিমুলের বুক। হঠাৎ কোরেই এখন ওর ভীষণ কান্না পাচ্ছে। কি বোকা? চার আনার পান আনলেই মা এখন মজা কোরে খেতে পারতো। নিজের উপর খুব রাগ হয় শিমুলের। নিজেকে অপরাধী অপরাধী লাগে। কাচুমাচু হয়ে সে অসাড় হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে।

লতা পানের খালি থালা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে রাখে। কৌটা খুলে একফালি সুপারি মুখে দেয়। রানুর গায়ে কাঁথা ঠিকঠাক কোরে হেরিকেনের আলোটা একদম নিবুনিবু কোরে বাকি আলোটুক্ একটা পিঁড়ি দিয়ে রানুর দিক থেকে আড়াল কোরে শুয়ে পড়ে সে। শিমুলকে কিছুটা কাছে টেনে পিঠে হাত রাখে। শিমুল ঠোঁট কামড়ে কান্না থামানোর চেষ্টা করে।

বেশ কিছুটা সময় পরে শিমুল নড়ে উঠতেই লতা ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে– ঘুমাও নাই?

শিমুল মায়ের আরো কাছে সরে আসে।

'ওঁহো।'

'কয় ট্যাহা হইছিল?'

'দশ পাই কম পুঁনে কুড়ি ট্যাহা। আমার না ইট্টুও মনে আছিল না মা।'

'কি?'

'তোমার লাইগা পান আনি নাই।' মায়ের গলা পেঁচিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে শিমুল।

মুহূর্তের জন্য লতার হাত থেমে পড়ে। গভীর এক মমতায় তার গলা বুঁদে আসে, বুক ফেটে খলবলিয়ে ওঠে স্নেহের ঝর্ণা। শিমুলকে আরো কাছে টেনে নেয় সে। কেউ কোনো কথা বলে না কিছুক্ষণ। শুধু অনুভব, পারস্পরিক উষ্ণতা। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপা দিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় লতা বলে–'থাক গা। একদিন পান না খাইলে কি হয়। তুমি চিন্তা কইরো না, সামনের মাসে তোমারে শার্ট বানাইয়া দিমুনে। ইস্কুলের বেতনও।'

শিমুল কিছু একটা বলে কিন্তু লতা তা শুনতে পায় না। কয়েকটা শিয়াল এক সাথে ডেকে উঠতেই বাড়ির কুকুর কালু আর পাশের ফুপু বাড়ির বুলুটা একসাথে তেড়ে উঠলো। ডাকে রাতের পর্দা গমগমিয়ে কেঁপে ওঠে। শিয়ালগুলোও ভারি ফাজিল, শিমুল মনে মনে ভাবে। কুকুরের তাড়াকে তোয়াক্কা না কোরে ওরা অনেকক্ষণ ধোরে দল বেঁধে ডেকে চললো। কোরাসের মতো। ওরা যেনো কালু আর বুলুকে ভেংচি কাটার জন্যে জোট বেঁধেছে। কুকুর আর শেয়ালের ডাকে ঘরের পেছনের পেয়ারা গাছ থেকে ডানা ঝাপ্টিয়ে একটা বাঁদুর উড়ে গেলো। মঙ্গলা হয়তো কিছুটা ভয় পায়। খুব মৃদু সুরে ডাকে- 'ম্যাঁ-ম্যাঁ-এ্যা।' লতা আদর কোরে ধমক দেয়– 'চুপ।' মঙ্গলা সত্যিই চুপ হয়ে যায়।

'জানো মা, আজকে বিয়ানে না বইনের খুব জ্বর আইছিল। বইনে খালি 'উলি উলি' কইরা কানছে। ওমা, উলি কি?'

'উলি বইলা কিছু নাই বাবা। বইনের খুব জ্বর হইছিল তো, হের লাইগা উল্টাপাল্টা কথা কইছে। শরীল ভালা না থাকলে, মাথায় রক্ত উঠলে মানুষ নানা রহমের আজগুবি সব হিজিবিজি ছবি দেহে। বইনেরও এমন হইছিল।'

শিমুলের ধন্দ লাগে। মাকে অবিশ্বাসও করতে পারে না, আবার তার কথার পুরোটা মেনেও নিতে পারে না। সে চুপচাপ ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর আচমকা আবার প্রশ্ন করে–'মা, আমাগো জমিতে ফেলু ফুপা আর বিকুগো কামলারা বাদাম লাগাইছে ক্যা?'

আবারো থমকে যায় লতা। কি জবাব দেবে অবোধ ছেলের এই প্রশ্নের? প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে বারবার মৃত স্বামীকেই লতার মনে পড়তে থাকে, ভাসে তার চোখ মুখ। আচ্ছা একটা লোক ছিলো। সারাটা জীবন আয় কোরে মা আর ভাইদের পেছনে খরচ করেছে। জমি জমা যা করেছিল, তা-ও মায়ের নামে। মা-অন্ত প্রাণ ছিলো লোকটা। নিজের ছেলে মেয়ের কথাটা আলাদা কোরে ভাবতেই চাইতো না। তা চাইলে আজ তাকে ছেলের এই নিষ্ঠুর প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হতো না।

জবাব না পেয়ে শিমুল পীড়াপিড়ি করে না। বরং নতুন প্রসঙ্গে চলে যায়। গলার সুরটাও বেশ পাল্টে যায় সাথে সাথে।

'আমি আর ফেলু ফুপাগো বাড়ি কাম করবার যাইতাম না।'

'ক্যা?' অনেকটা তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো লতা জিজ্ঞেস করে।

'এ্যাত্তো কাম করি আমি, তবু খালি আমারেই গাইল পারে। জানো, গ্যাছে বুইধবারে রাইতে যহন খাইবার বইয়া নুন চাইছি, ফুপু কয়– নুন নাই। মিছে কতা। বড় এক পেলা নুন লইয়া আমার ইট্টু ডাইনে তহন মিতা ভাত খাইতেছিল। আমি নিজের চোখে দেখছি।'

'নুনের অনেক দাম যে বাবা, হের লাইগা দেয় নাই।'

'পিশাচ!'

'ছি বাবা, এমোন কতা কয় না।'

'কমু না ক্যা? হেরা তো আমারে পয়সাও দেয় না।'

'তারা তোমাগো আত্মীয় না?'

শিমুল এবার আরো জোরে রুখে দাঁড়ায়–' তাইলে আমাগো এতো অভাব ক্যারে? আমাগো জমি হেরা নিয়া নিছে ক্যারে? তাগো এত্তো ধান, গম, কলই! কত্তো কি! আমাগো দেয় না ক্যা?'

'তাগো জিনিস তোমারে দিবো ক্যারে? দিলেই তুমি নিবা ক্যারে?'

'দিলেও নিতাম না?'

'না।'

'আইচ্ছা।'

কিছুটা মিইয়ে পড়ে শিমুল। ভাবনায় ওর খেই থাকে না। যত্তোসব প্রশ্ন এসে ওকে জ্বালায়। উত্তরগুলোয় সে ঠিকঠিক সন্তুষ্ট হয় না। হঠাৎ কোরে ওর মনে পড়ে বিকুর কথা।

'বিকু ঠিকই করছিল।'

লতার ঝিমুনি ধরেছিল। তাতে ঢিল পড়ে, ঢেউ জাগে শিমুলের কথায়।

'বিকু আবার কি করছিল?'

'বিকুও আছিল। আমরা ফুপাগো মশুরি তুলতেছিলাম। হঠাৎ কইরা তুফানের মতো বাতাস উঠতেই বিকু মাডিতে শুইয়া কয়- ''পেট বিষ।'' মিছে কতা। ফুপা ধরবারই পারে নাই। ব্যাস, কাম ফাঁকি দিয়া বিকু চইল্যা আইলো আম টোকাইবার। অহন থাইকা আমিও ওর মতন করুম।'

লতা স্তম্ভিত হয়ে গেলো মনে মনে। সাথে সাথে কোনো কথাও বলতে পারলো না। শেষে ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো– 'না বাবা, এমোন কাম কইরো না। তার চাইতে তুমি কামেই যাইও না।'

'না গেলে যে খালি রাগ করে আর গাইল পাড়ে?'

'পাড়ুক। মনে রাইখো বাবা, যহন যেনে যেই কামই তুমি করবা, তা করবা মন দিয়া; ফাঁকি দিবা না। অন্যেরে ফাঁকি দিলে নিজেই একদিন ফাঁকির মইধ্যে পড়বা। কতায় কয় না-

''অন্যের লাইগা গর্ত কইরা যদি তুমি হাসো,
সেই গর্তে তুমি পইড়া দুঃখের মইধ্যে ভাসো।''

ঘুমাও অহনে। সকালে ইস্কুল আছে না?' লতা পাতলা কাঁথাটা শিমুলের কোমর পর্যন্ত টেনে দেয়। নিজেও হাই তোলে। সারাদিনে খাটুনিটাতো কম হয়নি। খুব ঘুম পায় লতার।

শিমুলের চোখে সহজে ঘুম আসে না। আম চুরি আর অতুলদার কথাটা ওর মনে পড়ে গেলো এতোক্ষণে। মাকে না বলা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না। আবার ভয়ও হয় কিছুটা। মা যদি মারে? ঈস, মা যে কি! এখন কতো ভালো। কেনো যে মাঝে মাঝে এতো রেগে যায় আর জোরে জোরে মারে! কি ভীষণ ব্যথা করে, তবুও! মা কি বোঝে না? শিমুল তবুও রাতের বেলায় সেই মার খাওয়ার কথা, ব্যথার কথা বেমালুম ভুলে যায়।

একসময় ভয়ের কথা ভুলে যায় শিমুল। পুটপুট কোরে আম চুরির কথা, অতুলদার কথা, ইব্রাহিম স্যারের মেয়ের কথা মাকে সে বলে ফেলে এবং তারপরই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে মায়ের শেষ দিককার কথা শিমুল আর শুনতে পায় না।

শীতের বিকেল। বিকেলটার উপর শিমুলের খুব রাগ। স্কুল ছুটির পরে বাড়ি ফিরে ফাঁসজাল দিয়ে সে মাছ ধরে। প্রায় রোজই। কচুরি ঢাকা কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে নেমে বিশ পঁচিশটা চলাপুঁটি ধরতে না ধরতেই ঠকঠকিয়ে দাঁত কাঁপানো শীত কাবু এসে হাজির। আর সেই শীতটাকে কাবু করতে না করতেই রোদটা কেমন মিইয়ে পড়ে, ডুবে যেতে পাঁয়তারা আঁটে সূর্য। অথচ রোদটা কি মিঠে। সেই মিঠে রোদে পিঠ ঠেকিয়ে একটু যে গুলি খেলবে, তাও হয়

না। তাই সূর্যটা যতো লাল হতে থাকে, শিমুলের রাগ মাখানো হিংসে ততো বাড়তে থাকে। মাঝেমাঝে সত্যি সত্যি জিভ বের কোরে সে সূর্যটাকে ভেংচি কাটে, দাঁত দেখায়।

আজও ছুটি হতেই সে এক দৌড়ে বাড়ি চলে আসে। লাউ আর গতকালের ধরা মাছ দিয়ে রান্না করা তরকারিতে বাসি রুটি ডুবিয়ে খেয়ে সে ঢেকুর তোলে। তারপর সে আসে মায়ের কাছে। ওর মন খারাপ হয়ে ওঠা বোধটা তখন ওকে একটা শক্ত ঝাঁকুনি দেয়। মাকে জড়িয়ে ধোরে খুব কোরে কাঁদতে ইচ্ছে হয় ওর। পারে না। পারে না বোলে ভেতরে ভেতরে কষ্টের ক্ষরণ হয়। ক্ষোভ জন্মে। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় কোথাও।

এই শীতের বিকেলে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বোসে লতা ঘামছে। চোখে মুখে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আধখোলা ঘোমটার আঁচল খোপায় আটকে আছে। কপালের দিকে চুলে ইঁটের মিহি গুড়ো ঘামের সাথে মিশে পানসুটে রক্তের রঙ নিয়েছে। ঝরছে ফোটায় ফোটায়। বাঁ হাতের তর্জনি আংগুলে মোটা খাকি কাপড়ের পট্টি বাঁধা। নিশ্চয় হাতুরি কিংবা ইঁটে থেঁতলে গেছে। ডান হাতে হাতুরি। একভুর খোয়ার উপর বসা। ইঁট ভাংছে। সারা মুখে বিষাদের বিপন্ন রঙ। কোলে রানু। রানুর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে হাসার চেষ্টা করছে লতা। হাসিটুকু কান্নার মতো তার সারা দেহে জড়িয়ে আছে।

শিমুলকে দেখে লতা হাতুরি রাখে। রানুর গালে চুমো দিয়ে আদর মাখে। মোমের মতো নরম গলায় রানুকে বলে– 'ভাইয়ের লগে অহনে ইট্টু খেলোগা মা, যাও। মাছ ধইরা আনো গা।'

রানু কোল না ছেড়ে মায়ের গলা আরো জোরে জড়িয়ে ধরে। শিমুলের দিকে তাকিয়ে পিটপিটিয়ে হাসে। দাঁত বের কোরে মাঝে মাঝে মুখ ভ্যাংচায়। সেই সাথে চোখেমুখে এক টুকরো ভয় আনাগোনা করে। মাথায় ইঁট নিয়ে শিলু আসে। অভিবাদনের ঢংয়ে রাস্তার পাশে ইটগুলো ফেলে মাথা থেকে। কৌশলটা ওর দারুন শেখা হয়ে গেছে। ইঁটগুলো গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকে। তেমন একটা শব্দও হয় না। ভাংগে না একটাও। গতকাল এবং আজ মিলিয়ে সেই পাকা রাস্তা থেকে প্রায় চারশো ইঁট এনেছে সে মাথায় কোরে। একশো ইঁটে দুই টাকা। পাশে হাসপাতাল হবে, সাথে কনভেন্ট। ত্রিশ চল্লিশ জন লোক খাটছে সেই কবে থেকে। ইঁট আনা, ইঁট ভেংগে খোয়া করা, মেপে মেপে রড কাটা, কত্তো কি। এখনো সব প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ।

লতা উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু সে প্রথমবারেই মাজা সোজা করতে পারে না। অনেকক্ষণ বোসে থাকার ফল। ধীরে ধীরে সইয়ে নিয়ে অবশেষে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। রানু তার বাম হাত ধোরে ঝুলছে।

বুকটা ভেংগে যেতে চায় লতার। এতোটুকুন মেয়ে! সব সময় কোলে কোলে থাকতে চায়। কিন্তু তা হোলে যে খোয়া ভাংগা হয় না। খোয়া ভাংগা না হোলে–, লতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সে আর ভাবতে চায় না। মনের উপর চোখ রাঙায়। রানু বুঝে ফেলেছে সব। সে এবার মায়ের

শাড়ি আঁকড়ে ধরে। কচি হাতের সেই বাঁধন খুলে ফেলে লতা। পাঁজর ভাঙ্গার যন্ত্রণা ঠোঁট কামড়ে সয়ে যায় সে। শিমুলের দিকে তাকিয়ে বলে- 'বইনেরে লইয়া যাও। মাছ ধরবা না? খেয়াল রাইখ্যো, বইনে যেন্ পানিতে না নামে।'

চিৎকার করে রানু। সেই চিৎকারে দুপুরের নির্জনতা, ধানি রোদ, উত্তোরে বাতাস থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে। লতা পরোয়া করে না। ভেতরের কান্না এখন স্থবির আর অথর্ব হয়ে গেছে। রানুকে শিমুলের হাতে দিয়ে সে খুলে যাওয়া খোপা ঠিক করে। রানু শিমুলকে খামচে দেয়। চুল ধোরে টানে। ব্যথায় শিমুলের মুখ চোখ লাল হয়ে যায়। তবুও সে হাসে। বোনকে বুকে জাপ্টে সে বাড়ির দিকে দৌড় দেয়। সেই দিকে তাকিয়ে শাড়ির আঁচলে মুখ চোখ মুছে লতা পুনরায় হাতুরিতে হাত রাখে।

বেশ মাছ পায় শিমুল। অনেকগুলো টেংরা। সাথে পাঁচটা মোটাসোটা শিং আর দুটো মাগুর। দাদী মাগুর মাছ দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। অনেকটা জোর কোরেই নিয়ে নেয়। বিনিময়ে শিমুলকে দিয়েছে মোটে দেড় টাকা। খুব রাগ হয় শিমুলের। হারামিটা কি হাড়কিপ্টুস! হাটে নিলে কম কোরে হোলেও তিন চার টাকা বেচা যেতো। শিমুল রাগে গজরাতে গজরাতে আরো পাঁচ দশবার করা প্রতিজ্ঞাকে পুনরাবৃত্তি করে- "মাছ পঁচে গেলেও বুড়িকে সে আর কোনোদিন মাছ দেবে না।"

তেনাছেঁড়া বটগাছ তলার দোকান থেকে শিমুল চার আনার বাদাম কিনে এনেছে। বাদাম ওর প্যান্টের পকেটে। রানু দৌড়ে আসে পুতুল ফেলে। শিমুল ওর দুই হাত ভরে বাদাম দেয়। তারপর মাকে। শেষে শিলুকে। শিলুকে দিতে গিয়েই ওর পকেট একদম ফক্কা হয়ে যায়। ওর মনটা হঠাৎ কোরে খারাপ হয়ে পড়ে। লতা বুঝে ফেলে। মায়ের চোখে চোখ পড়তেই শিমুল লজ্জা পায়। সে বোকা বোকা হাসি হাসে। লতাও হেসে ফেলে নিজের কোচর থেকে বাদাম নিয়ে শিমুলকে ডাকে। রানু কোনো সুযোগই দেয় না। মায়ের হাত থেকে জোর খাটিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে সবগুলো বাদাম নিজের ফ্রকের কোচরে নিয়ে জমা করে। শিমুলের দিকে তাকিয়ে হাসে আর জিভ দেখায়। শিমুল মায়ের খালি হাত দেখে, রানুর বাদাম ভরা কোচর দেখে, শিলুর হাতের বাদাম দেখে। হঠাৎ কোরেই ছোঁ মারে সে। শিলুর হাত থেকে থাবা দিয়ে বেশগুলো বাদাম নিয়ে নেয়। সাথে সাথে ভোঁ দৌড়।

হোঁচট খায় শিমুল। দৌড়াতে গিয়ে পড়ি পড়ি কোরেও শেষ পর্যন্ত সে টাল সামলে ফেলে। রানু খুশিতে লাফায়, হাততালি দেয়। লতার শংকিত অবয়বে হাসি ফুটে ওঠে। ভ্যাবাচেকা খাওয়া শিলুও শেষে হিহি কোরে হেসে ফেলে।

শেষ পর্যন্ত দারিয়া বান্ধা খেলা আর হয় না। অতুলদা এসে হাজির। ঘুঞ্চি লত কাটতে হবে। গরুর জন্যে। মিনিট দশেক সময় লাগে। এক বোঝা লতা কাটলেই হলো, ব্যাস! চকচকে

পাঁচ পাঁচটা চকচকে নতুন গুলি দেয় অতুলদা। চাইকি, একটা সফেদা ফলও দিতে পারে। ইস, কি মিষ্টি লাগে ফলটা! কিন্তু অতুলদা'টা ভারী কিপ্‌টেশ আছে। শিমুল প্রায়ই ভাবে, যদি একদিন পেট ভরে আচ্ছামতো সফেদা ফল খেতে পারতো!

লতা কেটে অতুলদের গোয়াল ঘরে রেখে শিমুল খালের ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালো। সুধীর, কাশেম আর দীলিপ এলেই অতুলদা মন্ত্র পড়ে ফু দেবে। আর কি আশ্চর্য, তারপর হাত ধূলে সত্যিই হাতে আর তেতো থাকে না। হঠাৎ কোরে মায়ের কথা শিমুলের মনে পড়ে যায়। মন্ত্রফন্ত্র বইল্যা কিচ্ছু নাই। ভালা কইরা সাবান দিয়া বা বালু দিয়া ডইল্যা হাত ধুইলে ঘুঞ্চি লতার তিতা উইঠা যায়। সত্যিই ওঠে? অতলদার যাদুও তাইলে মিছে? তা হয় কি কইরা? অতুলদা রুমাল দিয়া ব্যাঙ বানায়, রীতিমতো লাফায় সেই ব্যাঙ। কান দিয়া পানি বাইর করে, গামছা দিয়া ঢাইক্যা ম্যাচের কাঠি ভাইংগা মন্ত্র পইড়া তা' আবার জোড়া লাগাইয়া একদম আস্তো বানায়। শিমুল নিজের হাতে আট দশদিন ওই কাঠি ভেঙ্গেছে, অথচ গামছা সরিয়েদেখে, কাঠি ভাংগা নেই। মন্ত্র না থাকলে ভাংগা কাঠি জোড়া লাগে কি কোরে? শিমুল এইসব যাদু দেখে বড় হয়ে অতুলদার মতো মস্তবড় একজন যাদুকর হবার কতো স্বপ্ন দেখে!

'কিন্তু মা-ও তো মিছে কথা কয় না!'

বেলা ডুবে গেছে, তবে আলোর শেষ আভা হালকাভাবে সাদা আর কালো মেঘের জড়াজড়ি পাকানো কুণ্ডলীর ফাঁকে ফাঁকে তখনো কিছুটা লেপ্টে আছে। শিমুল খালের পাড় ঘেঁষে এক দৌড়ে পুলের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। উত্তেজনায় ওর শরীরটা একটু একটু কাঁপতে থাকে। মায়ের কথাটা পরীক্ষা কোরে দেখতে হবে। সে ধীরে ধীরে হাঁটু পানিতে নেমে দাঁড়ায়। বুকের ভেতরে অদ্ভুত একটা অচেনা শিহরণ। ধকধক করছে হৃদপিন্ড। বাঁক ভাঙ্গার উত্তেজনা।

পানিতে হাত ডুবিয়ে বালি তুললো শিমুল। ঝকঝকে বালি। বালি দিয়ে ডলে ডলে সে হাত ধোয়। কয়েকবার। নাকের কাছে হাত নিয়ে গন্ধ শোঁকে। নাহ্, কেমন যেনো একটা গন্ধ লেগে আছে। সন্দেহ মন থেকে সরে না। আরো একবার বালি তুলে হাত ধোয়। তিতে লেগে আছে কি-না, পরখ করার জন্যে জিভ দিয়ে আঙ্গুল ছোঁয় আলতো কোরে। কিন্তু স্বাদটা ভালো কোরে বোঝার আগেই সে পুল থেকে ডাক শোনে–'ভাইয়ে!'

বড়'পা! ভ্যাবাচেকা হয়ে শিমুল কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে। ডান হাতটা মাছি তাড়ানোর ঢংয়ে মুখের সামনে থেমে আছে। কি যে করবে, তাৎক্ষণিকভাবে শিমুল বুঝে উঠতে না পেরে পানিতেই দাঁড়িয়ে থাকে। পুল পার হচ্ছিল একটা কুকুর। লেজ গুটিয়ে কাঁইকুঁই কোরে বড় আপাকে পার হয় কুকুরটা। তারপরই দে দৌড়। কুকুরের দৌড় শিমুলকে ধাক্কা দিয়ে যায়। সে দ্রুত খলবলিয়ে পানি থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পাড়ে উঠে আসে, পাড় থেকে পুলে, বড় আপার পাশে। হাঁপাতে থাকে শিমুল। চোখেমুখে বিস্ময়ভরা খুশি। বড় আপার ডান হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে সে নি:শব্দে হাসে। বড় আপা শিমুলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। হাসতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বড় আপা কেঁদে ফেলে । ঠোঁট কামড়েও চোখের জল থামাতে ব্যর্থ হয়ে শিমুলের কাঁধে হাত রেখে বাড়ির দিকে পা বাড়ায় সে।

হঠাৎ কোরে আপা কেনো কেঁদে উঠলো, শিমুল তার কারণ বুঝতে পারে না। তবে, খুব ভালো লাগছে ওর। বড় আপার পাশে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কোরে কেনো যেনো অংক দিদিমনির কথা মনে পড়ে শিমুলের। কি সুন্দর দিদিমনিটা। কাঁটা হলুদের মতো গায়ের রঙ, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা আর কালো কুচকুটে চুল, যেনো কাল বোশেখীর শেষ বিকেলের ঝড় ডাকা পশ্চিমাকাশের মেঘ। ধন্ধ লাগে শিমুলের। সুন্দর কে বেশি? দিদিমনি, না বড় আপা? আর তক্ষুণি বড়'পার শরীর থেকে গোলাপ ফুলের গন্ধ পায় শিমুল এবং তখন আবার অর্চনা দিদির কথাও ওর মনে পড়ে যায়। তবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই অর্চনা দিদিকে বড় আপা বা দিদিমনির উপরে টেনে তোলে শিমুল। অর্চনা দিদি আরো বেশি সুন্দর, ঠিক বীণা হাতে পদ্ম ফুলের উপরে বসা মূর্তির মতো। কিন্তু সব মিলিয়ে বড়াপা'র হাত ধোরে পাশাপাশি হাঁটতেই ওর সবচেয়ে মজা লাগে। স্বপ্নের এক অনাবিল সুখের প্লাবনে সে নেয়ে উঠতে থাকে।

অনেকদিন পর রাতে পেট ভরে ভাত খেতে পেয়েছে শিমুল। রাতে ভাত! তা-ও আবার পেট ভরে! আহ্, কি মজা! কত্তো আরাম! এতো মজা কোরে কত্তোদিন খায়নি শিমুল। মা দিব্বি একটা মুরগি জবাই কোরে ফেললো! এ বাড়ি ওবাড়ি থেকে লোকজনকে আসতে দেখে আর মাকে বিশেষ একটু নরম হয়ে কথা বলতে দেখে শিমুল বুঝে নিলো বড় আপাকে সবাই একটু বিশেষ চোখে দেখে। তৃপ্তির ঢেকুর তুলে শিমুল বিছানায় গড়ায় আর মনে মনে ভাবে, সপ্তায় সপ্তায় কেনো যে বড় আপাটা আসে না!

রানু এলে ওর সাথে শিমুল অনেকক্ষণ খুনসুটি করে। আশ্চর্য, রানুও আজ অন্যদিনের মতো বিকট চিৎকার কোরে মাকে ডাকাডাকি করলো না। হাসতে হাসতেই একসময় ঘুমিয়ে যায়। শিমুল চোখ বন্ধ কোরে ঘাপটি মেরে মা আর বড় আপার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু ঘুম ওকে নিশ্চিত ফাঁকি দেয়।

খালের পাড়ে বাবলাগাছের নিচে চুপচাপ বোসে থেকে পানিতে ঢিল ছোঁড়ে শিমুল। পানিতে ঢেউ জাগে বৃত্তাকারে, কেঁপে কেঁপে তা সমান ব্যাসার্ধে ছড়িয়ে পড়ে। মিলিয়ে যাবার আগেই আবার টুক! ঢিল পড়ার নতুন শব্দ হয় পানিতে। অপসৃয়মান বৃত্তের ভেতরে নতুন বৃত্ত জেগে ওঠে। শিমুলের মনটা আজ মোটেই ভালো নেই। প্রচণ্ড খুশির জোয়ারে কখনো ঢেউ ওঠে উথাল পাথাল, আবার একটু পরেই মিইয়ে যায় বেদনার পিচ্ছিল কাদায় হুমরি খেয়ে। প্রচণ্ড অস্থির টানাপোড়েন। বুঝে উঠতে পারে না শিমুল সে কি করবে। আর একারণেই থেকে থেকে বড় আপার উপর ওর খুব রাগ হচ্ছে। মায়ের উপরও। মা যে কি! বড় আপা বলতে না বলতেই হুট কোরে রাজি হয়ে গেলো। ওর যে খুব কষ্ট হচ্ছে, মা কি তা বোঝে না? মা একবার না কোরে দিলেই হয়। এমনিতে মা খুব ভালো; শুধু মাঝে মাঝে ভীষণ রেগে যায় যখন, তখন শিমুল খুব ভয় পায়। তবুও আজ দুপুরে বড়পা' যখন ফুপুদের বাড়ি গিয়েছিল, মাকে একা পেয়ে শিমুল খুব আদুরে গলায় বায়না ধরেছিল– 'আমি যাইতাম না মা!'

লতা তাৎক্ষণিকভাবে ছেলের আসল কথা বুঝতে পারেনি। ভাতের মার গালতে গালতে জিজ্ঞেস করেছিল- 'কই?'

'বড়'পার লগে।'

শিম্লের কণ্ঠস্বর শুনে লতা ছেলের দিকে তাকায়।

'ক্যা?'

'আমি তোমার লগে থাকুম।'

'তুমি না ডাক্তার হইবা?'

শিমুল মায়ের শাড়ির আঁচল হাতে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলে– 'থাকগা, আমি আর ডাক্তার হইতাম না।'

'ছি: বাবা, এমোন কথা কইতে নাই। কত্তো দেশ দেখবা তুমি, কত্তো নতুন নতুন মানুষ। দেইখো, তোমার খুব ভালা লাগবো।'

'আমার ভালা লাগতো না।'

'এমোন কইরো না। তিন-চাইর মাস পরে ইস্কুল ছুটি হইলে তুমি বেড়াইবার আইবা। আমিও মাঝেমধ্যে তোমারে দেখবার যামুনে। দেইখো, তোমার কোনো কষ্টই হইবো না। মন খারাপ হইলেই আমার কাছে চিঠি লেখবা। যাওনের সময় তোমারে খাম দিয়া দিমুনে।'

'বড়'পারে তুমি না কইরা দ্যাও।'

লতা হাতের চামচ থামিয়ে ছেলের দিকে তাকায়। ঠাণ্ডা আর স্থির তার চোখের মনি দু'টো। শিমুল সেই চোখের দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে ওঠে।

'না।' ফের তরকারির দিকে চোখ ফিরিয়ে লতা উত্তর দেয়।

মায়ের ওই একটা শব্দ শিমুলের ভেতরটা যেনো পাল্টে দিলো। শব্দের ভেতরে কি যে ছিলো। আর কথা বাড়ানোর সাহস পায়নি সে। শুধু মাকে কেমন অচেনা অচেনা লাগছিল। ও রান্নাঘর থেকে নেমে উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় চলে আসে। কালু লেজ নেড়ে পাশেপাশে হাঁটছিল। শিমুল লাথি মারে কালুর পেটে। কালুর গায়ে বিদেশী উন্নত প্রজাতির রক্তের সংমিশ্রণ। ভীষণ বুদ্ধিমান আর প্রভুভক্ত। কিন্তু হঠাৎ কোরে মনিব বন্ধুর এহেন রাগের কারণ বুঝতে পারে না সে। ক্যাঁক কোরে লাথির ধকলটা সামলে নিয়ে সে একপাশে সরে যায়। আর এগোয় না। ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থেকে লম্বা কানদুটো স্থির কোরে রাখে। শিমুল ফিরেও তাকায় না। হতাশ হয়ে কালু ওখানেই পেছনের দুই পা' গুটিয়ে বোসে শিমুলের চলে যাওয়া দেখতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে শিমুল খাল পেরিয়ে পাকা রাস্তায় উঠে আসে। রাস্তার পশ্চিম পাশ ঘেঁষে বিশাল আমবাগান। এই ভরদুপুরেও বাগানের ভেতরে কেমন আবছা একটা অন্ধকার অন্ধকার ঘোর। দুই এক জায়গায় ডালের ফাঁক গলিয়ে সূর্যের আলো সন্ত্রস্ত একটা ভাব নিয়ে নরম ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছে। এখানে সেখানে বেশ খানিকটা জায়গা কোরে একটা পাতাও নেই। ঝাড়ু দিয়ে কুড়িয়ে নিয়েছে।

ভুত দেখার মতোই চমকে ওঠে শিমুল। ফেলু ফুপার ছোট মেয়ে মিতা হঠাৎ কোরে যেনো মাটি ফুঁড়ে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কি উদ্ভট চেহারা হয়ে আছে! শিমুল তাড়াতাড়ি বুকে থুতু ছিটায়। ওর বুকটা ধকধকিয়ে লাফাচ্ছে।

পরনে খয়েরী রঙের সালোয়ার আর সবুজ রঙের কামিজ। কামিজের বাঁ হাতাটা ছেঁড়া, ঝুলছে। সালোয়ারের ঝুল দু'পায়েই হাঁটু পর্যন্ত গুটানো। পা খালি। ওড়নাটা মাজায় বেল্ট বানিয়ে বাঁধা। রুক্ষ চুলগুলো বেণী করা। বেণীতে লাল ফিতে গিঁট দিয়ে বাঁধা। মিতা শিমুলের দিকে তাকিয়ে হি হি কোরে হাসে। ভয় পেয়ে দু'পা পিছিয়ে যায় শিমুল। মিতা খুব মজা পায়। হঠাৎ কি মনে কোরে কোনো কথা না বোলেই মিতা রাস্তার দিকে দৌড়ে চলে যায়। কি করবে, ভেবে স্থির করতে না পেরে শিমুল মনে মনে সাতবার ভুতের মন্ত্র পড়ে বুকে ফুঁ দেয়। ওর আপসোস হয় পাগোল দেখে ভয় পেলে সেই ভয় তাড়ানোর মন্ত্রটা ওর জানা নেই বোলে। তারপর আলগা ধূলির উপর নিজের পায়ের ছাপ ফেলে হাঁটতে হাঁটতে শিমুল একসময় মিতা বা ভুতের কথা বেমালুম ভুলে যায়।

গা বাঁচিয়ে চটের বেড়াটা পার হতে চায় শিমুল। পারে না। পা লেগে হালক কোরে একটা শব্দ ওঠে ঠিকই। পায়ের সেই সাবধানি শব্দে একঝাঁক কবুতর ডানা মেলে নীলাকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কি সুন্দর আকাশটা! শুধু নীল আর নীল। অনেক উঁচুতে কয়েকটা পাখি বৃত্তাকারে ঘুরছে, চোখে পড়ামাত্রই ওর মুখ তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে ওঠে। শকুন না চিল, বুঝতে পারে না। ইস, কবুতরগুলো যদি এখন ডিগবাজি খেতে শুরু করে?

বুড়িটা যে কি অদ্ভুত! গলা শুনেই শিমুলকে চিনে ফেললো। আচ্ছা মানুষ। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। নেতিয়ে পড়া পাতার গর্তে চোখ দু'টো দেবে গুলি খেলার পিল হয়ে গেছে। মাথা ভর্তি ইঞ্চি দুই তিন লম্বা ধবধবে সাদা চুল। শরীরে সব সময় ছন্দবদ্ধ মৃদু কাঁপন লেগেই থাকে। হাশেমের নানী, তাই শিমুলেরও নানী।

ডাক শুনে শিমুল নানীর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নানী তার হাড় জিরজিরে খিনখিনে হাত বাড়িয়ে শিমুলকে কাছে টানে। পিটপিটিয়ে ওকে দেখে। কাঁপা হাত বুলিয়ে পিঠে, মাথায় আদর করে আর বিড়বিড় কোরে কি যেনো বলে, শিমুল বুঝে উঠতে পারে না। নানীর গা থেকে উৎকট একটা আঁশটে গন্ধ বেরোচ্ছে। অন্য সময় হোলে শিমুল পালাতো। এখন তেমন খারাপ লাগছে না। বরং নানীকেও কত্তোদিন দেখতে পাবে না বোলে ওর খুব খারাপ লাগছে। আর হঠাৎ কোরেই ওর বুকে থাকা কষ্ট আর ক্ষোভ চোখ বেয়ে টপটপ কোরে ঝরতে শুরু করে।

দুপুরে খেতেও এলো না শিমুল। হাশেমদের জামরুলগাছ থেকে জামরুল খেয়েছে। এখনো চারপাঁচটা পকেটে আছে। রানুর কথা মনে পড়তেই এগুলো সেপকেটে ঢুকিয়েছিল।

সূর্য ডুবিডুবি সময়ের বেশ খানিকটা আগে শিমুল খালের ধারে বাবলা গাছের নিচে গিয়ে বসলো। ওর ডান পাশে নাটাই ঝাড়। কাঁটার আঁচর খেয়েও ঘুঘুর বাসাটা রীতিমতো পাহারা দিয়ে আসছে শিমুল। দলি ঘুঘু। ধবধবে সাদা দু'টো ডিম। আর মাত্র তিন চারদিন। তারপরই দু'টো বাচ্চা! একটা খাঁচাও বানানো হয়েছে। অথচ– দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিমুল।

শিমুলকে দেখে ঘুঘুটা উড়ে উড়ে বারবার সরে যাচ্ছে। বাসায় যাচ্ছে না। সতর্কতা। শিমুল উঠে দাঁড়ালো। চোখ বন্ধ কোরে সে বলে দিতে পারে, অন্য ঘুঘুটা এখন ডিমে তা' দিচ্ছে।

নাটাই ঝাড়ে ঢিল ছোড়ে শিমুল। শেষ পর্যন্ত বিকুকেই বাসাটা দেখিয়ে দিতে হবে।

'হাম', সোহাগী ঢংয়ে লেজ নেড়ে দৌড়ে এসেও কালু কিছুটা দূরত্ব রেখে থেমে যায়। বোধহয় দুপুরের কথাটা মনে পড়েছে। চোখেমুখে দুষ্টোমি। শিমুলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রভুর মতিগতি ঠিকমতো বুঝে উঠতে না পেরে ভোঁ দৌড়ে বাড়িতে ফিরে আসে।

আড়বাঁশে মায়ের কাপড় ছড়ানো। শিমুল হাত দিয়ে দেখে, ভালো কোরে শুকোয়নি। কুঁচকে থাকা যায়গাটা টেনে ছাড়িয়ে দিয়ে পা বাড়াতেই ধ্বক কোরে উঠলো ওর বুক। অতুলদার গলা। রানু চেঁচাচ্ছে। সাথে গলা মিলিয়েছে শিলু'পা। তৎক্ষণাৎ ইব্রাহিম স্যারের মেয়ের সাথে অতুলদার জড়াজড়ি করা ছবিটা ওর চোখে ভেসে উঠলো এবং অতুলদার উপর ওর হঠাৎ কোরে প্রচণ্ড রাগ হলো, রাগ হলো শিলু'পার উপরেও।

অন্য সময় মনেও থাকে না। কিন্তু অতুলদাকে দেখলে, বিশেষ কোরে শিলু'পার সাথে, ঘটনাটা শিমুলের মনে পড়ে যায়। কারণটা ঠিকমতো ধরতে না পারলেও তখন ক্ষোভের আর বিরক্তির একটা প্রতিবাদী শিং কল্পনায় তেড়ে ওঠে ওর ভেতর থেকে। ফলে সহজ কোরে কথা বলতে কেমন একটা সংকোচ হয়। সংকোচটা হয় শিলু'পার সাথেও। রাগে তখন শিলু'পার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

বিদ্যুৎ চালিতের মতো শিমুল দ্রুত উঠানের মাঝখানে চলে আসে। মুখ থমথমে। অতুলদা আর শিলু'পার দিকে তাকায়। চোখে সন্দেহ। তন্নতন্ন কোরে কি যেনো খোঁজে। শেষে নিজের উপরই রাগ হয় ওর। মঙ্গলা ঘাড় ফুলিয়ে বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে এসে ওর পা ঘেঁষে দাঁড়ালো। থাপ্পর মারতে গিয়েও শিমুল সামলে নেয়। উদ্যত হাতটা দিয়ে শেষে মঙ্গলার গলা চুলকে আদর করে সে। মঙ্গলা আরো কিছুটা গা ঘেঁষে আসে।

রানু আবারও চেঁচিয়ে ওঠে। শিলুর হাতে পলো। পলোর ভেতরে আট-দশটা মুরগির বাচ্চা চ্যাঁও চ্যাঁও করছে। বাইরে মা মুরগি। সাথে তিন-চারটে বাচ্চা। ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে কঁ কঁ কোরে পলোর চারপাশে ঘুরছে বাচ্চাগুলোকে ডানার আশ্রয়ে নেওয়ার প্রতিজ্ঞায়। অতুলদা রানুকে মুরগিটার দিকে টেনে আনার অভিনয় কোরে ভয় দেখাচ্ছে–' উলি, উলি... ।'

গা মুচড়ে ছাড়া পেয়েই রানু শিমুলের কাছে ছুটে আসে। শিমুল হাত বাড়িয়ে রানুর হাত ধরে কিন্তু চোখ দু'টো সর্বক্ষণ অতুল আর শিলুকে ঘিরে রাখে।

খুব সাবধানে আলতো কোরে ছেলের মাথার বালিশ ঠিক কোরে দেয় লতা। তবুও শিমুলের ঘুম ভেংগে গেলো। কিন্তু মায়ের উপর ওরতো রাগ। আপাকে একবার 'না' বললেই ওকে আর কোথাও যেতে হয় না। অথচ মা ওই 'না'টা করছে না। সেই রাগে অন্য পাঁচটা-সাতটা দিনের মতো হাত বাড়িয়ে শিমুল মায়ের গলা জড়িয়ে ধরলো না। ওর মুখ মায়ের উল্টো দিকে। সে পাশ না ফিরে ঘুমের মতো নি:শব্দে ঘুপটি মেরে পড়ে থাকে।

হাত বাড়িয়ে লতা হেরিকেনের সলতে একদম নিবুনিবু কোরে পিঁড়ি দিয়ে বাঁকি আলোটুকু আড়াল কোরে শিমুলকে নিজের দিকে টেনে শুয়ে পড়ে। হাত রাখে শিমুলের পেট পেঁচিয়ে।

লতার বাঁ হাতে দু'টো আর ডান হাতে একটি চিকন রূপার বালা। বাঁ হাতের দু'টো বালায় দু'টি সেফটিপিন আঁটকানো থাকে। সেই সেফটিপিনের একটা মাথা লতার হাতের চাপে শিমুলের কোমল পাঁজরে দেবে বসতে থাকে। খুব হালকা চিনচিনে ব্যথা। এরচে' কত্তোবেশি ব্যথায় শিমুলের কিচ্ছু হয় না। কিন্তু এখন এই সামান্য ব্যথাই ওর সহ্য হচ্ছে না। ওর খুব কান্না পাচ্ছে। ভীষণ কান্না। শিমুল তবুও নড়াচড়া না কোরে, মায়ের হাত একটুও না সরিয়ে, ঠোঁট কামড়ে পড়ে থাকে।

'ঘুমাইছো লীনা?'

লতা খুব হালকা গলায় তার বড় মেয়েকে ডাকে।'

'না মা। ক্যারে?'

'আর কয়ডা দিন থাকলে হয় না?'

'না মা, হাতে একদম ছুটি নাই। তাছাড়া ভাইয়েরে নতুন স্কুলে ভর্তি করতে হইবো না? কড়া স্কুল। এমনিতেই দেরি হইয়া গ্যাছে।'

'ভাইয়ে যে এক্কেবারেই যাইবার চাইতাছে না। রাগে আজ দুপুরে খাইবারও আহে নাই।'

'আমি সব ঠিক কইরা আইছি মা। বাইত্যে থাকলে ওর লেখাপড়া ঠিকমতো হইবো না।'

'এতোদূর গিয়া ও থাকবার পারবো?'

'তুমি কি যে কও না মা! আমি আছি না? মা, তুমি আর একটু শক্ত হও তো।'

লতা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে শব্দ কোরে। তার চোখেমুখে ঝুলে থাকা তাবৎ পৃথিবীর বিষলতার বিষন্নতা রাতের আঁধারে আড়াল হয়ে থাকে। খুব ধীরে ধীরে টেনে টেনে বলে– 'মাগো, অকালে তোমার বাবারে হারাইছি; মাইনষের বাড়ি কাম কইরা, ইঁট ভাইংগাও দুধের বাচ্চাগুলার পেট ভইরা খাইবার দিবার পারতাছি না, তোমার বিয়ে ভাইংগা দিবার হইতাছে। যেই যাদুডার আমার ফালাইয়া ছড়াইয়া না খাইলে পেট ভরতো না, হেয় অহনে একটা রুডি খাইয়া আমার দিকে চাইয়া কয়– 'মা পেট ভইরা গেছে। রুডিডে রানুরে দ্যাও! তারপরেও কও আমি শক্ত না?'

লতা সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলে। সেই কাঁদনে শব্দ হয় না, কাঁপন জাগে। শিমুল টের পায়। ওর এখন খুব ইচ্ছে হচ্ছে মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু ধরা পড়লে চলবে না। মায়ের হাতের বালায় আঁটকানো সেফটিপিন পাঁজরে এতোক্ষণে দাগ কেটে বসেছে। তবুও ব্যথাটা এখন খুব একটা লাগছে না ওর। হঠাৎ কোরে একটা মশা প্যান প্যান শব্দ তুলে উড়ে এলো। ঘুরে ঘুরে শেষে মশাটা শিমুলের কপালে বোসেই হুল ঢুকিয়ে দেয়। শিমুল তাতেও নড়ে না।

'তুমি এমন কইরো না মা। তুমি ভাইংগা পড়লে আমি সাহস পামু কই? খোদা যা করে তা তারই ভালো জানা আছে। দুঃখ কইরো না মা।'

আঁচল টেনে মা চোখ মুচছে, শিমুল টের পায়। ওরও দু'চোখ এখন ভেজা।

'লীনা, বিয়েডা না ভাংলে হয় না, মা?'

'না মা। খুব কষ্টে লীনা বুকে জমাট বাঁধা বেদনার দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখে।

'আরেকবার ভাইবা দেখলে হইতো না?'

'আমি অনেক ভাবছি, নতুন কইরা আর ভাবন লাগবো না।'

'পোলাডা খুব ভালা। তোমার বাবার পছন্দ আছিল। সামনের বছর ডাক্তারি পাশ করবো।

লীনা পাশ ফিরে শোয়। কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন কোরে বলে– 'ভাইয়ে বড় হোক আগে।'

'কি যে কও না তুমি! ততোদিন তুমি এমনই থাকবা?'

লীনা হাই তোলে। মায়ের গায়ে হাত রেখে সে কিছুক্ষণ চুপটি মেরে থাকে। নিজের মাঝে হঠাৎ কোরে জেগে ওঠা শূন্যতাকে হাতের তালুতে আটকে নেয়ার লড়াই চালায় একা এবং গোপনে। তারপর বলে–'এসব কথা থাক মা। সামনের বছর আমার চাকরিটা পারমানেন্ট হইবো। তখন শিলুরেও হোস্টেলে দিমু, তুমি একদম ভাববা না। আমি এখন বিয়া করলে ওদের কি হইবো?

'আমি তো মইরা যাই নাই।'

'যাও নাই, তবে বেশি দেরিও হইবো না। সকালে আয়না দিয়ে নিজের মুখটা একবার একটু দেইখো। শিমুলের চেহারাটাও কি হইছে? শিলুও বড় হইতাছে।'

'তা বইলা নিজের দিকে তুমি একবারও চাইবা না?'

'কইছি তো, সময় আসুক।'

লতা ভেবে পায় না, কি বলবে; কোন পথ ধোরে এগোবে। একদিকে শিলু আর রানু, অন্যদিকে লীনা। একদিকে স্বার্থপর লোভী মাতৃত্ব, অন্যদিকে সময়োপযোগী কর্তব্যবোধ। মাঝখানে নিজের অক্ষম ব্যর্থতা এবং নিষ্ঠুর গতিশীল কাল। লতা যন্ত্রনায় বারবার বিদ্ধ হয় এবং ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি দোল খায় তার মানসপটে। থমথমে নিঝুম অন্ধকারটা বড় বেশি কালো আর ভারী হয়ে ওঠে তার জীবনে। দূরে কোথাও একটা হুতুম প্যাঁচা গলা ছেড়ে ডেকে ডেকে থমথমে স্তব্ধতাকে আরো বেশি ভূতুরে কোরে তুলেছে। কালুটা হঠাৎ তেড়ে ওঠে। গড়্‌-ড়্‌-ড়্‌ শব্দ করে কতোক্ষণ। তারপরই নিস্তব্ধ শূন্যতায় নতুন কোরে অন্ধকার ঝুলে পড়ে। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও অনুভূত হয়।

'ঘুমাইয়া গ্যাছো?' নিস্তরঙ্গ নীরবতায় শব্দের দোলা তোলে লতা।

'কঁও।'

'ভাইয়ের ইস্কুলের বেতন কত?'

'তোমারে না এইসব নিয়ে ভাব্বার না করছি?'

'রাগ হও ক্যা, শুইন্যা রাখলে দোষ কি?'

'সবমিলে মাসে নব্বই-একশো টাকা লাগবো।'

লতা ভেতরে ভেতরে চমকে ওঠে। এই দুর্দিনে একশো টাকা! চাদর টেনে গায়ে ঠিক করতে করতে লীনা পাশ ফিরে বলে, 'অহনে আমি আড়াইশো টাকা পাই। আগামী বছর পারমানেন্ট হইলে সাড়ে তিনশো হইবো। তোমারে একশো দিলে হইবো না?'

আর পারে না লতা। শিমুলকে বুকে টেনে সে আবার কেঁদে ফেলে। বুকের গহনে বেদনার প্রকাশকে সে আর আটকে রাখতে পারে না। শিমুলও সেই ফাঁকে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। লীনা নিশ্চুপ। বাঁধা দেয় না। পূবাকাশে তখন গাছের ফাঁক ফোকরে হালকা রূপালী আভার রং লেগেছে। মরে যাওয়া চাঁদ উঠছে অন্ধকার ফুঁড়ে। যেনো নি:সঙ্গ আকাশের ব্যথার ফোঁড়া ফেটে পুঁজ ঝরছে একান্ত গোপনে।

আতপাতি কোরে খুঁজেও শিমুল একটাও আম পেলো না। বাড়িতে গাছে গাছে কত্তো আম! গতবছর মেলা থেকে দেড় টাকা দিয়ে কি সুন্দর মাছমার্কা বাঁট লাগানো একটা ছুরি কিনেছিল। বিকুরে ফাঁকি দিয়ে বড় বড় আম পেড়ে শুকনো মরিচপোড়া মিশানো নুন মেখে কি মজা কোরে খাওয়া যেতো! রাগে মট কোরে একটা ডাল ভাঙ্গে শিমুল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাছ থেকে নেমে আসে সে। পুকুরে কয়েকটা হাঁস দাপাদাপি করছে। একটা ইঁটের টুকরো পেলো সামনে। মাজা বেঁকিয়ে টুকরোটা তুলে জোরে হাঁসগুলোকে লক্ষ্য কোরে ছুঁড়ে মারে শিমুল। তারপর ডানদিকে মোড় ঘুরে সে পুকুরপাড় থেকে উঠানে উঠে আসে।

মায়ের গলা ছেড়ে থুপথাপ শব্দ তুলে বুবলি দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিমুলের দুই হাঁটু জাপ্টে ধরলো। মুখে খিলখিল হাসির উল্লাস। শিমুল ওকে আদর কোরে হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়াতে চায়।

রানুর চেয়ে ছোট্ট হোলেও বুবলিকে দেখলেই কেনো যেনো শিমুলের মনে কেবলই রানুর মুখটা নেচে ওঠে। রানুর কথা মনে পড়তে না পড়তে মায়ের কথাও ওর মনে পড়ে যায়। তাতে মন আরো বেশি খারাপ হয়ে ওঠে। মাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে আর কান্না পায়। কত্তোদিন মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর সে কেঁদেছেও, কিন্তু কেউ জানে না।

বড়'পা প্রায়ই আসে, এসে দেখে যায়। শেষপর্যন্ত বড়'পাই মত পাল্টিয়ে শিমুলকে নিজেদের স্কুলেই ভর্তি কোরে দেয়। থাকার সমস্যাও সমাধান হয়ে যায় প্রায় বিনা প্রচেষ্টায়। আপার সাথে হোস্টেলে থেকে জলি পড়াশুনা করে। সমস্যা শুনে জলিই প্রস্তাব দেয়। আপা তা' মেনে নেয়। সত্তর টাকায় জলিদের বাড়িতে শিমুলের থাকা খাওয়ার নিরাপদ ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

অতো সহজে বুবলি পা ছাড়তে নারাজ। সে আরো জোরে কচি হাতে শিমুলকে আটকে ধরে, হাঁটুতে মুখ গুঁজে হাসে, হাসতে হাসতে কচি দাঁতে হাটুতে কুটুস কোরে কামড় দেয়। কামড় দিয়েই চোখ তুলে সে শিমুলের দিকে চায়, চোখে দুষ্টুমির ঝিলিমিলি, দাঁত বসায় একটু একটু কোরে। শিমুল ওর দুই হাত ধোরে ছাড়িয়ে নেয়। বুবলি চেষ্টা করে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। শিমুল হাসে। হেসে বলে– 'ওঁহো, দুষ্টোমি করলে কিন্তু কোলে নেবো না, চকলেটও দেবো না।'

বুবলি বেশ কিছুক্ষণ চুপ কোরে থাকে, জোর করে না। ভাবে। শিমুলের কথাটা ঠিকঠাক বুঝতে চায়। 'তকলেত দাও,' হাত বাড়ায় বুবলি। শিমুলও সাথে সাথে মাথা নাড়ায়, 'ওঁহো, আগে দুষ্টোমি থামাও।'

বুবলি হেসে শিমুলের হাঁটুর নাগাল খোঁজে, কামড়াতে চায়। শিমুল ওকে আলতো কোরে সরিয়ে ধরে। বুবলি আবার ভাবে। জোরাজুরি থামিয়ে বলে– 'কয়তা তকলেত দেবে?'

'দশটা।' শিমুল চোখ বড় কোরে বলে।

'দশতা!' যেনো ভীষণ এক ধন্ধে পড়েছে বুবলি। দশতায় কয়তা তকলেত?

'এত্তোগুলো', দুই হাত ছড়িয়ে শিমুল বুবলিকে দেখায় এবং সাথে সাথে দুই বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে বুবলিকে কোলে নিয়ে চুমো খায়। শিমুল পকেটে হাতরে একটা চকোলেট বের কোরে আনে। বুবলি হাত বাড়িয়ে ধরতে চায়। শিমুল চকোলেটটা খুলে বুবলির মুখে ঢুকিয়ে দেয়। স্বাদে বুবলির চোখ বুঁদে আসে। দুই হাতে হাততালি দিয়ে শিমুলের গলা জড়িয়ে ধরে বুবলি। শিমুল বুবলিকে আবার চুমো দেয় এবং উঠানে নামিয়ে দিয়ে সে ঘরের ভেতরে গিয়ে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে দুই মিনিটের মাথায় আবার বাইরে বেরিয়ে আসে।

ইঁট বিছানো পথ। কোথাও ইঁট দেবে গিয়ে বা হাওয়া হয়ে, কোথাওবা ভেঙ্গে গিয়ে রাস্তাটা এখানে সেখানে এ্যাবড়ো-থ্যাবড়ো হয়ে গেছে। রাস্তার দক্ষিণ দিকটায় প্রাচীর ঘেঁষে সারি বাঁধা নারকেল গাছ, উত্তর পাশে মেহগনী; মাঝারি আকারের। তবুও শিমুলের সারা গায়ে রোদের মাতামাতি। হালকা দুই-এক টুকরো মেঘ আকাশের এদিক ওদিক ভাসছে। তাতে যেনো রোদের তীব্রতা আরো বেড়েই গেছে। শিমুল বুকের দুটো বোতাম খুলে শার্টের ফাঁক দিয়ে বুকে ফু দিয়ে শরীর জুড়াতে চায়। হেলে পড়া নেংটো সূর্যের দিকে তাকাতেই ওর চোখ ঝলসে ওঠে। সে বড় রাস্তা ছেড়ে স্কুল মাঠের পূবদিক দিয়ে দক্ষিণমুখি চলে যাওয়া রাস্তায় নেমে পড়ে।

খরখরে তীব্র তাপ উপেক্ষা কোরে মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে। মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় ক্লাবঘর। ক্লাবে দাবা আছে, ক্যারম আছে, টেবিল টেনিস, লুডুও আছে। শিমুল লুডু ছাড়া অন্য কোনো খেলা পারে না। তাছাড়া এখনো পর্যন্ত ওর কোনো ভালো বন্ধুও হয়নি। কম বেশি প্রায় সবাই বড় আপাকে চেনে। সেই সূত্রে শিমুলকেও। অবশ্য রাসেল একটু আলাদা ধাঁচের। অন্যান্যদের মতো শিমুলের আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে ওকে কোনোদিন ঠাট্টা করেনি। মাঝেমাঝে শিমুলকে নিয়ে ক্লাবে লুডু খেলে, দাবা খেলা বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু শিমুলের মাথায় দাবা খেলার জটিল সব চাল বারবার গুলিয়ে যায়।

শিশিরকে দৌড়ে আসতে দেখে শিমুল দাঁড়িয়ে পড়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে শিশির এসে শিমুলের হাত ধরে। কিন্তু দম নেয়ার জন্যে একটুও অপেক্ষা করতে সে নারাজ। ভীষণ চঞ্চল এই শিশির। এজন্যে ওকে প্রায়ই ভাইয়ার হাতে প্যাঁদানি খেতে হয়।

'ভাইয়া ডাকছে, এক্ষুণি।'

শিমুলদের উপরের ক্লাশ নেন বকুল স্যার। কি সুন্দর লম্বা আর ধবধবে ফর্সা। মাথায় ঢেউ খেলানো কুচকুচে কালো চুল। সবসময় হেসে হেসে কথা বলেন। শিমুলের সাথেও। বকুল স্যারকে সবাই কেনো যে এতো ভয় পায়, শিমুল তা বুঝতে পারে না। স্যার ওকে খুব আদর করেন। আর এ কারণেই স্কুলে শিমুলকে কেউ আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে প্রকাশ্যে ঠাট্টা করেনা। কিন্তু কাজল আর রফিকটা আস্তো হারামি। ফাঁক পেলেই শিমুলের কানের কাছে ঠোঁট এনে বলে–'তোর দুলাভাই তোকে ডাকে, যা।' ওদের কথায় শিমুল খুব লজ্জা পায়। মাঝে মাঝে ভীষণ রাগও হয়। তবে বকুল স্যারকে ওর ভালোই লাগে। কাজল আর রফিক ঠাট্টা করার পর থেকে সে মাঝে মাঝে বড়'পাকে ঘোমটা ঢাকা চেহারায় কল্পনা করে, পাশে বকুল স্যার।

শিশিরের সাথে শিমুল গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকেই থমকে যায়। কয়েকটা অচেনা মুখ। শিলু আপার চেয়েও বড় একজন মেয়ে হাসতে হাসতে প্রায় দৌড়ে এলো। চুলগুলো কি কালো! রোদ লেগে ঝিকমিক করছে। অথচ ঘাড়ের সামান্য নিচ থেকে কাটা! ডান হাতে ছোট্ট একটা ঘড়ি, ফিতেটা কুচকুচে কালো, আলতারাঙ্গা হাতে লেপ্টে আছে। শিমুল খুব সহজেই ঘাবড়ে যায়। মেয়েটা শিমুলের দুই হাত নিজের দুই হাতে তুলে নিয়ে হাসে। শিশির পাশ কটিয়ে বারান্দা পেরিয়ে ভেতরে উধাও।

মেয়েটা শিমুলের হাত ঝাঁকিয়ে বলে, নাহ্, বেয়াইটা তো বেশ খাশা, তাই নারে! বোনটা নিশ্চয় মন্দ হবে না, তাই না ?

শিমুল লজ্জা আর বিরক্তিতে কাচুমাচু হয়ে ভেতরের দিকে তাকায়। চোখ ফিরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাতেই মেয়েটি চোখ টিপে হেসে ওঠে। বারান্দা থেকে অন্য একজন মেয়ে হেসে বোলে ওঠে- 'এই রুবি, তোর বেয়াইতো কেঁদে ফেললো রে.. তোকে বোধহয় পছন্দ হয়নি।'

অন্য একটা মেয়ে হাসতে হাসতে মুখে হাত দিয়ে বলে– 'এই রুবি, জিজ্ঞেস করতো তোর বেয়াই হিসি দেবে নাকি?'

লজ্জা আর রাগে শিমুল থম মেরে যায়। কোনো ভাবেই মাথা তুলে তাকাতে পারছে না সে। রুবি তা' বুঝে শিমুলের কাঁধে হাত রেখে সোহাগী গলায় বলে–'ধ্যাৎ, এতো লজ্জা পেলে চলে? ওর নাম হলোগে অপি, আস্তো একটা ঠোঁট কাটা দজ্জাল। তো, আপনার নাম কি, বেয়াই?

রুবির গলায় আন্তরিকতা। শিমুল নরম হয় কিছুটা। কিন্তু কোনো জবাব না দিয়ে সে রুবির হাতে বন্দী হয়ে নিরুপায় ঢংয়ে বারান্দায় উঠে আসে। ওর ভেতরে কি যেনো একটা ঘটছে। খুব হালকাভাবে। তবে সে নিশ্চিত, ঘটছে কিছু একটা।

ঘরে শিমুলকে বসিয়ে রুবি পাশে বসলো আর তখনই শিমুল রুবির গায়ে গন্ধটা পায়। কেমন অচেনা এবং ধোঁয়াশে কিন্তু মাতালকরা গন্ধ। ধরনটা ঠিক ধরতে পারে না সে। গন্ধটা খুব হালকা; যেনো ছুঁয়ে দিলে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। গন্ধটা একটু একটু কোরে ভারী হতে থাকে। হালকা কাঁপন ওঠে বোধের গা বেয়ে। শিমুল অস্বস্তিতে পড়ে।

শিমুলকে বাঁচিয়ে দেয় বকুল স্যার। ঠোঁটকাটা মেয়েটা ভেতরে ঢুকতে এসে থমকে দাঁড়ায়। বকুল স্যারকে দেখে আর সাহস পায় না। স্যারকে দেখে সহজাত নিয়মে শিমুল উঠে দাঁড়াতে চায় কিন্তু পারে না। রুবির বাম হাত তখনো ওর গলা পেঁচিয়ে আছে। চেয়ার টেনে ফ্যানের নিচে গিয়ে বকুল স্যার বসলেন। হাতে সিগারেট। রুবিকে বললেন–'কিছু খেতে দিলিনে?'

শিমুল মাজা কিছুটা সোজা কোরে নড়ে বসলো। চোখ অবনত।
'আমি খাবো না।'

বকুল স্যার হাসেন। 'কেনো?'
'ভাত খাইছি।'
'সে তো দুপুরে খেয়েছো। এখন বিকেল হয়ে গেছে, তাই না?'

রুবি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শিমুল বেশ অস্বস্তিতে পড়ে। আজ ওর অন্যদিনের চেয়েও বেশি বেশি লজ্জা লাগছে। সে মিনমিনে গলায় আপত্তি তুলে বললো– 'আমার ক্ষিধে লাগে নাই।'

আয়েশ কোরে সিগারেট টানেন বকুল স্যার। ফ্যানের বাতাসে গন্ধটা ভূরভূর করছে। গন্ধটা শিমুল সহ্য রতে পারে না। তবুও উপায় নেই। মাথাটা ওর ঝিমঝিম করছে।
'মাকে তুমি চিঠি লিখেছো?'

শিমুলের মনে ছিলো ঠিকই, তবুও লেখা হয়নি। মায়ের কাছে আপার কথা জানিয়ে স্যার শিমুলকে চিঠি লিখতে বলেছিলেন। চিঠির কথা বড়'পাকে না জানাতে বলেছিলেন। কিন্তু শিমুল তা' পারেনি। আগে মাকে বলতো সব কথা, এখন বড়'পাকে। তবুও ইদানিং অনেক

কথা ওর না বলাই থেকে যায়। বলবো না বলবো না করেও শেষ পর্যন্ত শিমুল বড়'পাকে চিঠির কথা বলে দিয়েছিল। বড়'পা রাগও করেনি, আবার হাসেওনি। কেমন গম্ভীর গলায় শুধু বলেছিল– 'অন্যের কথায় তুই মাকে আসতে লিখবি কেনো? তোর নিজের যদি খুব ইচ্ছে করে মাকে দেখতে, তবে লিখিস। মাস দুই পরেই তো স্কুল ছুটি হবে। বাড়ি যাবিনে?'

শিমুল শেষ পর্যন্ত চিঠি লেখেনি। স্যারের কথায় মাথা আরো কিছুটা নিচু কোরে চুপচাপ বোসে থেকে ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে সে চেয়ারের হাতলে দাগ কাটতে থাকে। এ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে বকুল স্যার হাসেন। 'ভুলে গেছিলে, না?'

শিমুল আলতোকোরে মাথা নাড়ে।

'তাহলে লিখোনি কেনো?' স্যারের মুখে কৌতুহল।

'বড়'পা লিখতে বলেনি।' মেঝের দিকে তাকিয়ে শিমুল জবাব দেয়।

'বারে, তাকে তুমি বলতে গেলে কেনো? তোমাকে না চুপি চুপি লিখতে বলেছিলাম?'

রুবি ফিরে আসে। হাতে ট্রে। শিমুল এবার সত্যিই খুশি হয় রুবির আসাতে। শিমুল মনেমনে প্রার্থনা করে রুবি যেনো এখনই এখন চলে না যায়। সে আড়চোখে রুবির দিকে তাকায়। রুবি ঠোঁট টিপে হাসছে। শিমুল তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে বাইরে চোখ মেলে ধরে।

গেটের সামনে অন্যদিনের চেয়ে আজ বেশ কিছুটা সময় বেশি নেয় শিমুল। ভাবে। হাতে বকুল স্যারের গছিয়ে দে'য়া পলিথিনের ব্যাগ, ব্যাগে টিফিন ক্যারিয়ার। শিমুল প্রায় নিশ্চিত, টিফিন ক্যারিয়ারে পিঠে আছে। স্যারের মা রুবিকে দিয়ে পাঠিয়েছেন। একটা কাগজের ঠোঙ্গায় কয়েক থোকা আঙ্গুর। সাথে একটা চিঠি। চিঠির কথা স্যার শিমুলকে বলেননি। কি যে করবে, শিমুল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। এক মন বলছে– "খুলে দেখ চিঠিটা, মজা আছে; আরেক মন বলছে– 'বেয়াদব, ফাজিল হয়ে গ্যাছো, না?"

শেষ পর্যন্ত শিমুল প্রলোভনে ঢলে পড়ে। সে চকিতে একবার উত্তর-দক্ষিণমুখী রাস্তাটা দেখে নেয় যতোদূর তার চোখ যায়। থিরথির কোরে তার শরীরে কাঁপন ধরেছে। ঠোঙ্গার মুখ খুলে সে চিঠিটা বের করে। ধড়ফড়িয়ে লাফাতে থাকে তার বুক। হঠাৎ কোরেই ওর খুব হিসি পায়। চিঠির একটা ভাঁজ কাঁপা হাতে সে খুলে ফেলে। আর তক্ষুণি বজ্রাহতের মতো শিমুল থমকে যায়। হৃদপিন্ড ফেটে যাবার মতো তেড়ে ওঠে।

ভেতর থেকে গেট খুলে গেছে। রাসেল। ভাঁজ না কোরেই চিঠিটা তাড়াতাড়ি ঠোঙ্গায় ঢুকাতে যায় শিমুল। তাড়াহুড়োয় ঠোঙ্গা সামান্য ছিঁড়ে যায়। মাথা গলিয়ে রাসেল বাইরে এসে ওর দিকে তাকিয়ে বলে– 'পড়তে যাচ্ছিস বুঝি?'

শিমুলের গলা শুকিয়ে গেছে। জবাব এলো না সাথে সাথে। সে অতিকষ্টে মাথাটা একটু কাত করে। এই ফাঁকে জলি দৌড়ে এলো। ভেতরে টেনে নিয়ে শিমুলের গালে টুক কোরে চুমো

খায় জলি। হৈ চৈ কোরে আরো কয়েকজন মেয়ে ওকে ঘিরে নেয়। জলির হাতে শিমুলের বাঁ হাত বন্দী। হাতটা জলির পেট ছাড়িয়ে উপরে আলতো কোরে চেপে রাখা। হাতটা সরিয়ে নিতে চায় শিমুল। পারে না। কি এক অচেনা বোধ ওকে শক্তিহীন কোরে রাখে। রুবির গায়ের গন্ধটা একটু একটু কোরে জলিপা'র গা থেকেও ছড়িয়ে পড়ছে, টের পায় শিমুল। রক্তে কেমনতরো একটা শিহরন, মৃদু দোলা। নিজের উপর রাগ হয় ওর, কিন্তু কারণটা সে ঠিকঠাক ধরতে পারে না।

ওয়েটিং রুমে গিয়ে শিমুল আলাদা একটা চেয়ারে বসে। তাতে সে কিছুটা স্বস্তি ফিরে পায়। জলি ওর দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছে। অন্য একটা মেয়ে প্রায় দৌড়ে এসে শিমুলের হাত থেকে পলিথিনের ব্যাগটা কেড়ে নেয়। শিমুলের বুক আবার ধক কোরে ওঠে। চিঠি! লাফিয়ে ওঠে শিমুল। বড়'পা ছাড়া আর কারো হাতে কোনোভাবেই যে চিঠিটা যাওয়া চলবে না, তা' সে বোঝে। মনের অজান্তেই অনেকটা হিংস্র হয়ে ওঠে শিমুল। মেয়েটাকে ধাক্কা মেরে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। টাল সামলাতে না পেরে মেয়েটা দেয়ালে ঢুশ খায়। ভ্যাবাচেকা হয়ে পড়ে মেয়েটা। ফ্যালফেলিয়ে শিমুলকে, জলিকে, সবাইকে দেখে। সবাই হতভম্ব। কিন্তু একটু পরেই মেয়েটা ফিক কোরে হেসে ওঠে। তাতে সবাই আবার নতুন কোরে দম নেয়। শিমুলের নাকটা হালকা কোরে টেনে দেয় মেয়েটা। জলি ওর কাঁধে দুইহাত রেখে চোখ পাকিয়ে বলে- 'বাব্বা, কি ডাকাতরে! না জানি কি অমৃত না মানিক টানিক আছে ব্যাগে। কে পাঠিয়েছে রে?'

শিমুল অপরাধীর মতো আস্তে কোরে বলে- 'বকুল স্যার।'

'বকুল স্যার? যাহ্, শেষ পর্যন্ত তুইও পটে গেলি?'

'স্যার আনতে বললে আমি কি করবো?'

মেয়েগুলো নিজেরা ফিসফিসিয়ে কি যেনো বলাবলি কোরে হেসে হেসে একে অন্যের গাঁয়ে ঢলে পড়ে। ওদের সাথে জলিও যোগ দিয়েছে। জলিকে ওদের সাথে যোগ দেয়াতে শিমুল মনে মনে জলির উপর ক্ষেপে ওঠে।

'বুবলি কেমন আছে রে?' হাসি থামিয়ে জলি হঠাৎ কোরে শিমুকে জিজ্ঞেস করে।

'ভালো। তুমি বাড়ি যাওনা কেনো? বড়'পা তো প্রায়ই যায়।'

জলির মন কিছুটা বিষাদিত হয়ে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তার হাত আদুরে স্পর্শ নিয়ে শিমুলের পিঠে উঠে আসে। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা কোরে সে বলে- 'বারে, হোস্টেলের আইন আছে না! কেউ ইচ্ছা করলেই বাড়ি যেতে পারে না, বুঝলি? লীনা'পা তো মিস্ট্রেস, আর আমরা হলাম ছাত্রী। এক হলো?'

শিমুল পেটের কথা মুখে নিয়ে থেমে পড়ে। বড়'পাকে দেখে সবাই ধীরে ধীরে রুম থেকে কোনো কথা না বোলেই কেটে পড়ে। শুধু জলি ওর চুল এলোমেলো কোরে দিয়ে যেতে যেতে বললো- 'বুবলিকে কাল একবার নিয়ে আসিস।'

শিমুল হাতের ব্যাগটা বড়'পার দিকে বাড়িয়ে ধরে।

বড়'পার দিকে শিমুলের চোখ। বড়'পা ব্যাগের দিকে তাকায়। বড়'পার হাসিখুশি চোখমুখ কেমন থমথমে হয়ে উঠছে হঠাৎ কোরে। শিমুল ভয়ে ঢোক গেলে। লীনা ব্যাগ হাতে নিয়ে শিমুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে– 'কি?'

'পিঠা, বকুল স্যার দিছেন। আমারে ডাইক্যা নিয়ে দিছে।' চিঠির কথাটা বলা ঠিক হবে কি না, বুঝতে না পেরে শিমুল চুপ কোরে থাকে।

লীনা ব্যাগের দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যাগটা একপাশে সরিয়ে রাখে ধীর স্থির আর শান্ত ভাবে। বড়'পার এই শান্ত ভাবটুকুই শিমুলকে ঘামিয়ে তোলে।

'তোকে এসব দিলো, আর তুই অমনি নিতে এলি?'

'আমার কি দোষ।' শিমুল ঘাড় বেঁকিয়ে মাথা নিচু রেখে উত্তর দেয়।

শিমুলের উত্তরে লীনা সন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু শিমুলের দোষটা কোথায়? বড়'পার এই রেগে ওঠার কারণটা বুঝতে পারে না শিমুল।

'আবার কোনদিন এভাবে কিছু দিলে তুই আনবি না। বলবি- আপা না করেছে।'

শিমুল ঘাড় কাৎ করে।

ব্যাগটা নিয়ে লীনা বেরিয়ে গেলো। ফিরলো এক গ্লাস দুধ নিয়ে।

শিমুল ধন্ধে পড়ে। একটাও পিঠা আনেনি আপা। একটা আঙ্গুরও না। আজ পর্যন্ত শিমুল কোনোদিন আঙ্গুর খায়নি। দোকানে ঝুলানো টসটসে আঙ্গুরের থোকার দিকে তাকিয়ে সে কতোদিন কত্তো দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে! অথচ আপা একটা আঙ্গুরও আনলো না। মনটা ওর খারাপ হয়ে ওঠে এবং ঠিক তখনই নতুন কোরে সে ধড়ফড়িয়ে ওঠে। বড়'পা চিঠিটা পেয়েছে তো? খামের মুখ খোলা দেখে কোনো সন্দেহ হয়নিতো? শঙ্কা আর বেজার মুখে আপার হাত থেকে নিয়ে শিমুল দুধের গ্লাসে চুমুক দেয়। দুধে মিষ্টিটাও আজ বেশ কমকম লাগছে। গ্লাসে ঠোঁট রেখেই সে আড়চোখে আপার দিকে তাকাতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পেরে ওঠে না। গ্লাস শূন্য হওয়ার পরও শিমুল বেশ কিছুক্ষণ চেপে রাখে মুখে। লীনা হাত বাড়িয়ে সেই গ্লাস নেয় কিন্তু কিছু বলে না। মুখটা এখনো থমথমে হয়ে আছে।

আপা আজ ভালো কোরে পড়ায়নি। শিমুল তাতে মনে মনে খুশিই হয়। ইংরেজি পড়াটা আজ ভালো কোরে হয়ে ওঠেনি। পড়া ধরলেই সর্বনাশ হয়ে যেতো। মনটা ওর ফুরফুরে হয়ে ওঠে। পুরো পাঁচ টাকার একটা নোট এখন পকেটে। না চাইতেই আপা ওকে দিয়ে দিলো! এক টাকার গুলি কেনা যাবে। কাল রাসেলের কাছে তেরোটা হেরেছে। হাত একদম ফাঁকা।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে শিমুল আড়মোড় ভাঙ্গে। পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যটা লাল হয়ে উঠেছে, তাকিয়ে থাকা যায়। সামনেই বিল। বিলের পশ্চিম পাশে রাজাপুর গ্রাম। শিমুল এপর্যন্ত একবারই রাজাপুর গিয়েছিল। এখান থেকে সে ওর ক্লাশমেট ওহীদদের

বাড়িটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাজাপুর গ্রামের কোনো ঘরবাড়িই স্পষ্ট কোরে ওর চোখে পড়ছে না. শুধু সবুজ গাছের অস্পষ্ট একটা ছোপছোপ আল্পনা। সেই আল্পনার মাথায় মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রোদের ঝলকানি। সব মিলিয়ে ঠিক যেনো বইয়ে দেখা পাহাড়ের ছবি। ওদিক থেকে একঝাঁক বক উড়ে এলো শিমুলের মাথার উপর দিয়ে। 'এক-দুই-তিন ... ... এগারো'- আর গোনা হয়ে ওঠে না। হোস্টেলের তিনতলা হলুদ বিল্ডিংয়ের আড়ালে চলে গেছে। শিমুল পেছনে গেট ফেলে দক্ষিণের পথ ধোরে হাঁটতে শুরু করে।

প্রাচীর ঘেঁষে রাস্তাটি সরাসরি পূবে মোড় নিয়েছে। মোড়ে পাশাপাশি তিনটে লাটিমগাছ। রাস্তায় অজস্র লাটিমগোটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। শিমুল তিনটে লাটিমগোটা কুড়িয়ে নেয়। রাস্তার সামান্য ডানদিকে একটা বিশাল মজাপুকুর ঘিরে ঘন জঙ্গল। একটা লাটিমগোটা ছুঁড়ে মারে সে। সাথে সাথে পতপত শব্দ ওঠে। পাখিটি দেখা হয়না। শিমুল না দেখেও নিশ্চিত, ওটা ঘুঘু, বাসায় ছিলো। দাঁড়ালো সে। বিদঘুটে ধরনের নিরিবিলি। ওর সাহস হয় না। কয়েক পা সামনে গিয়েও সে দাঁড়িয়ে পড়ে। কাল রাসেলকে এনে ঘুঘুর বাসাটা অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। ঘুঘুটা নিশ্চয় ডিম পেড়েছে!

রাস্তা প্রশস্ত হোলে হবে কি, বৃষ্টির সময় কাদা হওয়াতে এখন এ্যাবড়ো থ্যাবড়ো হয়ে আছে। মাঝখান দিয়ে দেড় ফুট মতো প্রশস্ত জায়গা সমতল। শিমুল একপাশে সরে আসে। সাইকেলটা বেশ দ্রুতগতিতেই আসছিল। কিন্তু ওকে পাশ কাটিয়ে দশ-পনেরো হাত পেছনে গিয়েই সাইকেলটা থেমে পড়ে। সাত্তার। শিমুল লোকটাকে চেনে, তবে কোনোদিন কথা হয়নি। ক্লাশমেট মিনুর বড় ভাই। বুবলিদের বাড়ির পশ্চিমে তিনটে বাড়ির পরেই বিশাল টিনের দোতলা বাড়িটি এদের। এ তল্লাটে শুধু ওদের বাড়িতেই টেলিভিশন আছে।

'এই ছেলে, শোনো তো!'

নিজের নাম শুনে শিমুলের পিলে চমকে ওঠে। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই সাত্তারের চোখাচোখি হয়ে যায়। কেনো যে এই মানুষটাকে দেখলেই অতুলদার কথা মনে পড়ে শিমুলের! চেহারা প্রায় একই রকমের। দুইজনই কলেজে পড়ে। তবে এর মাথায় লম্বা ঝাঁকড়া চুল। আচ্ছা, অতুলদাও কি এখন এ রকম লম্বা চুল রেখেছে?

কখন যে শিমুল সন্মোহিতে মতো সাত্তারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ওর সেই খেয়ালই থাকে না। ইদানিং সে প্রায়ই অদ্ভুত একটা ঘোরের ঘোরে ডুবে থাকে। সাত্তারের কথায় ধোয়াশাচ্ছন্ন সেই ভাবটা হঠাৎ কোরেই আর থাকে না।

'তোমার নাম শিমুল না? মিনু আর তুমিতো একই ক্লাশে পড়ো, ঠিক?'

শিমুল মাথা নাড়ে।

'আমাদের দোকানটা চেনো?'

শিমুল মুখে শব্দ না কোরে মাথা কাৎ করে।

সাত্তার ফাঁকা এবং বিচ্ছিরি রকমের নিরিবিলি আর গুমোট হয়ে ওঠা আঁধারঘেরা রাস্তা বরাবর

সতর্ক চোখে তাকায়। সাইকেলটা প্রাচীরে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে পকেট থেকে সে একটা নোটখাতা বের করে। সাইকেলের সিটের উপর খাতা রেখে সে দ্রুত একটা চিঠি লিখতে শুরু করে। শিমুল কি করবে, বুঝে উঠতে না পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। অযথাই ওর ভেতরটা একটু একটু দাপাদাপি করতে শুরু করেছে।

সাত্তার আবারো রাস্তাটা একবার দেখে নেয়। নিশ্চিত হয়ে সে নিজের হাতে শিমুলের বুক পকেটে চিঠিটা ঢুকিয়ে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে, টেনে টেনে সে বললো– 'আমাদের দোকানের উত্তরে পরপর তিনটে দোকান বাদ দিলে চার নাম্বার দোকানটা মুদি দোকান, তাই না?'

শিমুল কিছু না বোলে সাত্তারের দিকে হতবিহ্বল চোখে চেয়ে থাকে।
'ওই যে– মুখে বসন্তের দাগ?'

শিমুল এবার চিনতে পেরে স্বস্তি বোধ করে। সে দ্রুত ইতিবাচব মাথা নাড়ে।
'চিঠিটা কিন্তু ওই লোককেই দেবে। সাবধান, অন্য কারো হাতে দিও না। কেউ যেনো বুঝতে না পারে। বাজারে রক্ষী বাহিনী এসেছে। তোমাকে কিছু বলবে না। পারবে তো?'
'পারবো।' শিমুলের গলা আলতোভাবে কেঁপে ওঠে। সাত্তারের বলার ধরনে সে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ। কোনো বিপদ হবে নাতো? কিন্তু মুখে সে সাত্তারকে না করতে পারে না।
'যাও। আমাকে তুমি আজ দ্যাখোইনি, বুঝেছো?'

এ আবার কেমন কথা? শিমুল বোকার মতো সাত্তারের দিকে চেয়ে থাকে। সাত্তার হেসে ফেলে। শিমুলের পিঠে আলতোকোরে থাপ্পর দিয়ে বললো– 'বোঝোনি, না? মানে হলো গে- কেউ যদি আমার কথা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে তা'হলে তুমি বলবে যে, দেখা তো দূরের কথা, আমাকে তুমি চেনোই না। এবার বুঝেছো ?'

কথা শেষ কোরে সাত্তার আবার হাসে কিন্তু সে আর দেরি করে না। সাইকেলে উঠেই সে স্পিড তোলে। বাঁকের আড়াল না নেওয়া পর্যন্ত শিমুল চলমান সাইকেলটার দিকে একদৃষ্টে ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে।

গোরস্তানের উত্তর পাশে পূবদিকের মোড় ঘুরেই শিমুল সত্যি সত্যি ঘাবড়ে যায়। বাজার প্রায় ফাঁকা এবং অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ। প্রথমেই কাঁচা বাজার। এখানে সেখানে কাঁচাকলা, লাউ আর থোকা থোকা পুঁই-পালং ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মাঝবয়স পার হওয়া চারজন বুড়ি একপাশে গা ঠেসাঠেসি কোরে দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে আর ফিসফাস করছে। শিমুলের ভয় করতে শুরু করে। সাথে একটা অচেনা উত্তেজনা। পারতেই হবে। ওকে ঘিরে অচেনা কিন্তু অনম একটা ঢেউ দোল খেতে থাকে একগুঁয়েমির আথালি পাথালি উন্মাদনায়।

খাতা কালি আর হেরিকেনের ভাংগা চিমনির কাচ বা রসুন কিংবা আটা– সব মিলেমিশে একাকার। জগাখিচুরী। দোকানের সামনে বেশ খানিকটা জায়গা ভিজে জবজবে হয়ে আছে। কেরোসিন তেলের উগ্র গন্ধ। দু'টো টিন পাশাপাশি দুমড়ানো চেহারায় পড়ে আছে। একটার গায়ে লেবেল আঁটা– প্রজাপতি মার্কা খাঁটি সরিষার তৈল। অন্যটার গায়ের

লেবেল বোঝা যাচ্ছে না, শুধু 'রোসিন' শব্দাংশটুকু পড়া যাচ্ছে। লন্ডভন্ড দোকান। শিমুলের পা আপনা থেকেই ভারী হয়ে ওঠে। পা টেনে টেনে টিউবওয়েলের পাশ গলিয়ে সে বাঁক নেয়। বড় জোর আর মাত্র হাত ত্রিশ চল্লিশ দূর হবে দোকানটা।

বাঁক ঘুরে সোজা রাস্তায় উঠেই শিমুল থমকে থেমে গেলো। ওর শরীর জুড়ে হীমেল প্রবাহ। আপনা থেকে পা দু'টো ভারী হয়ে মাটিতে গেঁথে পড়ে। খুব হিসি পায় ওর।

সূর্য ডুবে গেলেও অন্ধকার গাঢ় হয়ে জাঁকিয়ে বসেনি। সব দোকানে এখনো বাতি জ্বালানো হয়নি। অবশ্য আধাআধি দোকান এখন একদম বন্ধ। কয়েকটা খোলা দোকান ভূতুরে নি:স্তব্ধতায় নি:সঙ্গ হয়ে থমকে আছে। কেউ নেই তাতে। বাকি কয়েকটায় দুইএকজন লোক আছে। খরিদ্দার কেউ নেই। তারই কয়েকটায় বাতি জ্বলছে, কয়েকটায় এখনো জ্বালানো হয়নি। একশো গজ দূর থেকেও স্পষ্ট সব দেখা যায়। শুধু রক্ষী আর রক্ষী। মাথায় দড়ির জালে আটকানো লোহার টুপি। কারো হাতে, কারো বা কাঁধে বন্দুক আর বন্দুক। কোনোটার মাথায় আবার ছুরি আটকানো, এই ধূসর আলোতেও সেই ছুরির ধার কেমন ঝিকমিক করছে। খুব রাগ হয় শিমুলের। ধীরেণ স্যারের মাথার সুন্দর ঢেউ খেলানো মাঝারি আকারের চুলগুলো রক্ষীদের একজন ক্যাচকেচিয়ে কেটে ফেললো। স্যারকে কি বিদ্ঘুটে দেখাচ্ছে! অন্যসময় হোলে শিমুল হেসে গড়িয়ে পড়তো। কিন্তু শিমুলের এখন হাসি না পেয়ে বুক ভেঙ্গে শুধু কান্না আসছে। কান্নার সেই উচ্ছাসের সাথে মিশে আছে অনেক অনেক ঘৃণা।

এই ওর এক দোষ। কারণে অকারণে বুকটা নোটিশ ছাড়াই ভীষণ ধকধকিয়ে ওঠে। এখনও শিমুলের বুকটা হঠাৎ কোরে ধড়ফড়িয়ে উঠলো। ঘারে ধাক্কা মেরে স্যারকে তাড়িয়ে দিচ্ছে রক্ষী বাহিনীর লোকেরা। স্যারও যেনো সরে আসতে পারলে বাঁচেন, কেমন ভয়ভয় চেহারা তার। আর তক্ষুণি একজন রক্ষী বুটপরা পা দিয়ে স্যারের পিঠ বরাবর প্রচণ্ড জোরে লাথি মারে। টাল হারিয়ে ভিমড়ি খেয়ে স্যার ইট বিছানো রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। চেষ্টা কোরেও দেহের গতিশীল ভার হাত দিয়ে ঠেকাতে পারলেন না তিনি। সাথে সাথে তাঁর নাক মুখ দিয়ে গলগলিয়ে কি ভীষণ লাল রক্ত বেরিয়ে এলো। স্যার একটুও নড়ছেন না। তাঁর দেহটা নিথর হয়ে পড়ে আছে। পরপরই দুইজন রক্ষীর বন্দুকের বাঁট এসে দড়াম কোরে স্যারের পিঠে শব্দ তোলে। 'ক্যাঁৎ'- হালকা একটা শব্দ ওঠে স্যারের গলা কিংবা নাক দিয়ে, শিমুল অতোসব বুঝতে পারে না। আর সেই মর্মবিদারি শব্দেই শিমুল সম্বিত ফিরে পায়। সাথে সাথে সে ঘুরে দৌড় লাগায়। চোখ তার আধোখোলা আধোবন্ধ। কয়েক পা' যেয়েই, বুড়িগুলোকে যখন সে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, পুঁই শাকের ডাটায় পা পিছলে শিমুল হুমরি খেয়ে পড়ে যেতে থাকে। ঠিক তখনই সাত্তারের চিঠির কথাটা ওর মনে পড়ে যায়। এতো অসহায় অবস্থাতেও ওর বুক কেঁপে ওঠে। চিঠিটা বেহাত করা যাবে না। পতনের প্রচণ্ড আঘাতে ওর চোখের অন্ধকারে যখন অসংখ্য হলুদ আর সাদা বুদবুদ ছোটাছুটি করতে শুরু করেছে, তখন স্বনিয়ন্ত্রিতের মতোই ওর বাঁ হাত পকেটে রাখা সাত্তারের চিঠির উপর চেপে বসে।

রানু কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর চোখের কোনায় এবং গালে লোনা জলের শুকিয়ে যাওয়া দাগ স্পষ্ট। কেমন কালশিটে হয়ে আছে।

স্কুল থেকে ফিরেই ওর সে কি চেঁচামেচি– 'ভাত দ্যাও, আমি রুডি খাইতাম না।' লতা প্রথমে অনেক বুঝিয়েছে, কাজ হয়নি। বিরক্ত হয়ে হাত তুলতে গিয়েছিল সে। কিন্তু রানুর কালো আর মায়াভরা ছলোছলো ক্ষুধার্ত চোখের ন্যায্য চাওয়ার কাছে লতার সেই ক্রুদ্ধ হাত শেষ পর্যন্ত ন্যূয়ে পড়ে; ধীরে ধীরে শক্তিহীন মাধুর্যে ডুব মেরে ঝুলে থাকে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে লতা। মাঝেমাঝে তার কি যে একটা ইচ্ছে হয়! ইচ্ছেটার প্রকৃত ধরণের কোনো সজ্ঞা সে চেতনায় আঁকতে পারে না। শুধু বোঝে, কোথাও তার ভাঙ্গন ধরতে শুরু করেছে। কিন্তু কোথায়? বিশ্বাসে, না বাস্তবতায়; জীবন সংগ্রামে, না জীবনের জটিল আবর্তের জটিলতায়; আপন স্বকীয়তায়, না আপন যোগ্যতায়, ঠিকমতো ধরতে পারে না সে। এমন ঘুর্ণাবর্তে লীনার মুখ, শিমুলের চোখ দোল খায় অস্পষ্ট বেদনার আলোয়। হুহু কোরে ওঠে লীনার জন্যে। শিমুলের জন্যে বুক ভেঙ্গে কষ্টের বন্যা বয় বোধের সীমানা ডুবিয়ে। আহা, সোনা আমার, যাদু আমার! মনে মনে শব্দহীন লয়ে আপন অনুভবকে সে অস্পৃশ্য সোনালী রঙে আঁকতে চায়। শিমুলের এখনো মায়ের গলা জড়িয়ে ঘুমোনোর কথা। বাছারে আমার! কোনো বাঁধই মানে না দৃশ্যমান চোখ! লোনাজল গাল বেয়ে ঠোঁট স্পর্শ করে। লতা আঁচলে মুছে ফেলতে চায় সেই লোনা স্বাদ। কিন্তু তপোবনের নিভৃত আহাজারি মুছে ফেলার কোনো উপায় যে লতার জানা নেই। সে শুধু গুঙড়িয়ে মরে।

মায়ের অমন হঠাৎ কোরে মিইয়ে যাওয়া ভাব দেখে রানুও হতভম্ব। সচরাচর এমনটা হয় না। রেগে গেলে মা ইদানিং হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে বেদম মারে। কিছুদিন আগেও রানু কতো দুষ্টোমি করতো, অথচ মা তখন একটুও মারতো না। ইদানিং মায়ের এই চণ্ডাল রাগের কারণটুকু রানু বোঝে না, যেমন বুঝতে পারে না শিলুও।

মায়ের দিকে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে রানু। বাম হাতে মুখ ঢেকে ডান হাত দিয়ে লতা রানুর মাথা স্পর্শ করে। কিছু বলতে পারে না সে সাথে সাথে, শুধু তার হাতটা কাঁপতে থাকে

একটু একটু। শিলু সব দেখছিল। সে-ও কোনো কারণ না বুঝেই ভয় পেয়ে যায়। প্রায় সব সময়ই রানুর কারণে ইদানিং তাকেও পিটুনি খেতে হয়। সে ধীরে ধীরে রানুর কাছে এসে হাত ধরে, টান দেয়। অন্য সময় হোলে রানু ঠিকই চেঁচাতো। কিন্তু আজ লক্ষ্মি মেয়ের মতো সে শিলুর সাথে হাঁটতে শুরু করে।

নিজেকে ততোক্ষণে সংবরন কোরে নেয় লতা। বড় কোরে আবারো তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। খুব নরম স্বরে সে রানু ও শিলুর দিকে তাকিয়ে বুকে জমা কষ্টের ধারাকে আটকে দিয়ে বলে- 'ইট্টু খেলোগা মা, আমি ক্ষুদের ভাত রাইনধ্যা দিতাছি।

শিলু ও রানু ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরও একই জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক নিথর দাঁড়িয়ে থাকে লতা। মাথাটা তার মাঝেমধ্যেই কাজ করতে চায় না। কি কোরে যে সংসারের হালটা নিজের হাতে স্বার্থকভাবে নিতে পারবে, খুঁজে পায় না। লীনা প্রতি মাসেই টাকা পাঠায়। সেই টাকা হাতে নিয়ে অশ্রুহীন বোবা কান্নার অব্যক্ত ক্ষরণে লতা কতো যে ক্ষত বিক্ষত হয়, সে খবর কেউ রাখে না। গত মাসে শিমুল চিঠি লিখেছিল। সেই চিঠির ভেতরে আরও একটা চিঠি ছিলো। বকুল মাস্টারের লেখা । আপন ছেলের মতো কতো আবদার আর অভিযোগ! লতা তাকে দেখেনি। না দেখলেও সে প্রায় নিশ্চিত মানুষটা ভালো না হয়ে পারে না। অথচ লীনার এক কথা, এক রা'; সম্ভব নয়, এখন সে বিয়ে করবে না। লতার কষ্ট এখানেও। একটা পর্যুদস্ত সংসারের হাল ধরতে গিয়ে নিজের স্বপ্নের সংসারকে সমর্পন করছে অচেনা কোন দ্বীপে জেগে ওঠা প্রত্যাশার কাছে। এমন জটিল আবর্তে পড়লে লতা তার ভাবনা চিন্তাকে আপন আবর্তে ধরে রাখতে পারে না, পারে না নির্দিষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত এগিয়ে যেতে। সবকিছু গোলমেলে হয়ে যায়। আর লতার তখন শুধুমাত্র একটাই আশ্রয়– লোকটার আবক্ষ ছবির সামনে দাঁড়িয়ে হু হু কোরে কাঁদা এবং একটু একটু ঠোঁট নাড়া, যেখানে শব্দের কোনো স্পষ্ট উচ্চারণ নেই, অভিব্যক্তি নেই। শুধু এক পাথরভাঙ্গা নিস্তব্ধ অনুভব!

শাড়ির আঁচল টেনে লতা চোখ মুখ মুছে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে মাচার কাছে যায়। আর্মী ট্রাকটার ডানপাশে ডানো দুধের কৌটা। ওটা হাতে তুলে নিয়েই চমকে ওঠে লতা এবং হঠাৎ কোরে সব ক্ষোভ দু:খ অক্ষমতা রাগের ফণা হয়ে পুনরায় হিসফিসিয়ে ওঠে। নিজের নিশ্চিত সত্য জানাটুকুও মিথ্যে হয়ে যাক, এমন মুহূর্ত আসে অসহায় সময়ে ও অবস্থায়। লতা টিনের ঢাকনা খুলে দেখে একটাও 'খুদ' নেই।

'শিলু!' মুরগি ডিমে তা' দিচ্ছিল। লতার বিকট এবং কর্কশ শব্দে ধড়ফড় কোরে ডাক ছাড়তে ছাড়তে মুরগিটা উঠানে উড়ে এসে একদৌড়ে আড়ালে চলে গেলো।

দ্বিতীয়বার লতাকে আর ডাকতে হলো না। শিলু দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পাশে রানু। মায়ের চোখ মুখের অবস্থা দেখেই শিলু বুঝে ফেলে, পিঠে নির্ঘাত পড়বে।

'এহানে আয়।' লতা জায়গা থেকে একটুও নড়লো না। রাগে তার চোখ লাল হয়ে উঠেছে। হাতদু'টু একটু একটু কোরে কাঁপছে।

শিলু একটু একটু কোর মায়ের সামনে এগিয়ে যায়। ওর জামার ঝুল ধোরে এগোয় রানু।

'টিনে খুদ আছিল। খুদ কই?' কিছুদিন আগে শিলু একটা মরা সাপ ছুঁয়ে দেখেছিল বিকুর সাথে বাজি ধোরে। এখন হঠাৎ কোরে সেই স্পর্শের কথা ওর চেতনায় জেগে ওঠে মায়ের গলার আওয়াজে। কি ভয়ংকর রকমের ঠান্ডা মায়ের গলার স্বর!

সে কোনো জবাব দিতে না পেরে ভয়ে ঢোক গেলে।

'কথা কছনা ক্যা মাগি?' লতার গলায় এবার স্বভাবসুলভ চেঁচানো এবং কর্কশ স্বর।

'কালকে দুহুরে বইনেরে ভাইজা দিছিলাম। তুমি বাইত আছিলা না। ইস্কুলতে আইয়্যা বইনে খাওনের লাইগ্যা কানবার লাগছিল। ঘরে আটা চাইল কিচ্ছু আছিল না।'

বলতে বলতে শিলু ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে। কিন্তু লতার মন টলে না সেই ব্যাখ্যায়, সেই কান্নায়। এতোক্ষণে সে নড়ে ওঠে এবং ঝাঁপিয়ে পড়ার মত আচম্বিতে শিলুর বেণীকরা চুল বাঁ হাতে মুঠিবদ্ধ করে। এদিক ওদিক তাকায় আর বলতে থাকে, 'খাড়া, জন্মের মতোন তগো ক্ষুদ ভাজা খাওয়াইতাছি। এত্তো খাই খাই আহে কইত্তে? রাজদুলারী হইয়া জন্ম নিবার পারলা না? একজনরে তো খাইছো, অহনে আমার হাড্ডি খুইল্যা খাইবার পার না?'

লাঠি নেই। শেষাবধি লতা তরকারি রাঁধার চামচ দিয়ে শিলু ও রানুকে বেদম মারে। এবং শিলু ও রানুকে ঘর থেকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের কোরে দিয়ে লতাও হাউমাউ কোরে কেঁদে ফেলে। আর কি আশ্চর্য, মায়ের সেই কান্নার শব্দ শিলু ও রানুর সমস্ত ব্যথা যেনো মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। ওদের কান্না থেমে যায়। চুপচাপ মায়ের কান্না শোনে দু'জন। রানুর চুলে বিলি কেটে কেটে আঁচড়ানোর মতো গুছিয়ে দেয় শিলু।

মায়ের কান্না যখন আর শোনা যায় না, শিলু তখন রানুকে বললো– 'তুই মার কাছে যা। আমি মঙ্গলার নিগে ঘাস তুইল্যা আনিগে।

একটু আগে মা মেরেছিল, তা যেনো রানু একদম ভুলে গেছে। সে সাথে সাথে খুশি মনে মাথা কাঁৎ করে এবং হঠাৎ কোরে ওর খুব ঘুম পায়। সে ঘরে ঢুকে পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়ে এবং সাথে সাথে ঘুম তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আচ্ছন্ন কোরে ফেলে।

চুলোয় টগবগ করছে গরম ভাত। প্রায় ফুটে এসেছে। ঘন ফুটকীর ভেতর দিয়ে দু'টো বেগুন দেখা যাচ্ছে। পেঁয়াজ ছাড়াই ভর্তা করতে হবে। হাট থেকে গত পরশু পেঁয়াজ আনা হয়নি। শ্বাশুড়ির কাছে কত্তো পেঁয়াজ! জমির ফসল। লতা শ্বাশুড়ির কাছ থেকে পারতপক্ষে কিছু নেয় না।

শোরগোল বেশ দূরে ছিলো। কাছে আসতেই শিলুর কান্না ভেজা গলার শব্দ শুনতে পায় লতা। সে আর পরখ কোরে দেখে না চাল ভালো কোরে ফুটেছে কি না। দ্রুত মার গালে সে। তারপর প্রায় দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

শিলুর দুই হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা। একটা বেণী খুলে পিঠে চুল ছড়িয়ে পড়েছে। ছুটে যাওয়ার জন্যে কাঁদছে আর মোচড়াচ্ছে দুই হাত। এতে হাতের কয়েক জায়গা ছিলে গেছে। রক্তের হালকা একটা পর্দা ফুটে উঠেছে ছেলা জায়গায়। ওদিকে ফেলু মেম্বরের কোনো খেয়াল নেই, কারণ এসব খেয়াল করার আবশ্যিকতা অদ্যাবধি তার হয়নি। তার বাম হাতে এইংটে ঘাস, ডান হাতে শিলু। মুহূর্তেই প্রকৃত ঘটনা বুঝে ফেলে লতা। সে চাপা গর্জন কোরে ওঠে– 'মিতার বাপ, কামডা তুমি ভালা করতাছো না।'

খেঁকিয়ে ওঠে ফেলু মেম্বর– 'তোমার কাছে তাইলে শিখন লাগবো কোনডা ভালা কাম আর কোনডা খারাপ? একটা ইস্কুল খুইল্যা দেও। কই চোর মাইয়ারে শাসন করবো, তা না; আমারে ধমক দেয়। জিগাই, গলায় কট্টুক জোর আছে? এরেই কয় চোরের মার বড় গলা।'

'মিতার বাপ, তোমার লাহান একটা ইতরের লগে আমি কথা কাডাকাডি করবার চাইনে। তুমি যে এইংটের বীচি মুশুরি ডাইলের লগে মিশ কইরা বাজারে বেচবা, তা বুঝনের বুদ্ধি ওই মাইয়াডার হয় নাই। জাইন্যা শুইন্যা হেয় কোন অন্যায় করে নাই। তার হাত খুইল্যা দেও।'

'কি কইল্যা তুমি, আমি ফেরেপবাজ, আমি দুই নম্বইরী?'

লতা একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে এখন খুব বেশি উত্তেজিত মনে হচ্ছে না। সে ফেলু মেম্বরের কথার জবাবে বললো- 'কেডা যে কি, তা তার বিবেকেই জানে। অবশ্য তোমার বিবেকের গুরু ভাইতো ইবলিশ, হেয় কি কয়?'

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে ফেলু মেম্বর। তার বাম হাত থেকে ঘাস খসে পড়ে, আলগা হয়ে যায় ডান হাত। কিন্তু ছাড়া পেয়েও এখন আর শিলু ওখান থেকে সরে আসতে পারে না।

ফেলু মেম্বর গর্জে উঠে বলে– 'কি? যত বড় মুখ না ততো বড় কথা?' কথাটা মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে লতা বলে– 'কথাডা বড় না ছোটো, হেইড্যা কোনো কথা না, কথাডা হাচা না মিছে, হেইড্যা হইল আসল কথা।'

'লীনার মা, আমি তোমার জিভ টাইন্যা ছিড়ে ফালামু, অহনো চুপ যাও!'

'একজনের জিভ ছিড়েও ক্ষিধে যে তোমার মিডে নাই, হেই কবেই তা আমি বুঝবার পারছি। তয়, আমারে চোখ রাঙাইলে কাম হইবো না। অহনও সময় আছে, নিজের বিবেকরে চোখ রাঙাও, কামে দিবো।'

'বাহ্, খুব তো দেহি আইজকাল ভালাই কথা কইতে শিখছো, একদম তোতা পক্ষির লাহান। আমারে আবার ডরও দেহাও নাকি?'

'তোমারে আবারো কইতাছি মিতার বাপ, শিলুর বান্ধনডা খুইল্যা দেও।'

'বান্ধন খুইল্যা দিমু আমি? এই ফেলু মেম্বর?' কুৎসিত ভাবে হেসে ওঠে ফেলু মেম্বর। 'খাড়াও, খাড়াওলীনার মা, ইট্টু জিরাইয়া লও। তয়, আমারে তুমি অনেক গাইলমন্দ করলা, হাসাইলা,

কথাডা আমি ভুলতাম না লীনার মা। তয় কি জানো, যেই বান্ধন আমি একবার দেই, হেই বান্ধন এই হাত দিয়া আমি আর খুলিনে। আমার ইজ্জতে লাগে, বুঝলা!'

ভেতর থেকে জেদের লকলকে লাভার আভায় লতার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। সে আবারো বলে- 'তুমি বান্ধছো, তুমিই খুলবা। না খুললে বেশি ভালা হইবো না কইলাম?'

সামান্য দূরেই বিকুরা থাকে। হাত পঞ্চাশেক উত্তরে। লতার শ্বাশুড়ী এবং বিকু সব শুনছিল। বিকুর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল দৌড়ে গিয়ে শিলুর বাঁধনটা খুলে দিয়ে আচ্ছা কোরে একটা ইটা মারতে ফেলু মেম্বরের হালকা টাকে। কিন্তু সব ধরনের চঞ্চলতা এখন স্থবির। ফেলু মেম্বরকে মন থেকেই সে ভয় পায়।

লতার শ্বাশুড়ির পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল লতার কাটাকাটা কথা শুনে। 'কথায় কথা বাড়ে, ভোজনে পেট ভরে,' কি দরকার তোর এত্তো কথা কওনের? কি ভুলডা করছে মিতার বাপ! তারও তো গরু ছাগল আছে, হেগোও ঘাস লাগে। মাইয়াডা পিচ্ছি হইলে হইবো কি, শয়তানের একটা পাকনা হাড্ডি। একটা কথা কওন যায় না, মাটিত্তেন কুড়াইয়া নিয়ে আছাড় মারে। হেরে বান্ধুম নাতো বান্ধুম কারে? ইট্টু নরম হইয়া মাপ টাপ চাইয়া নিলেই হয়, তা না; যত্তোসব ফুসফাস! বিষ নাই, তার আবার কুলোপনা চককর! সে আতা ফল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গজরাতে থাকে ভেতরে ভেতরে। বিকু বুঝতে পারে দাদীর হাবভাব। এমন মুহূর্তে দাদীকে খুব ঘেন্না লাগে বিকুর আর তখনই ওর শুধু ইচ্ছে করে পালিয়ে যেতে।

লতার হুঁশিয়ারী শুনে শ্বাশুড়ি আর নিজেকে সংবরন করতে পারে না। সে এগিয়ে আসে। তবে শেষ মুহূর্তে মুখটা বন্ধ রাখতে সে সক্ষম হয়।

'কথা কানে যায় না? ওর বান্ধন খুইল্যা দাও।'

'আচ্ছা তো এক তেন্দরের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা? হোন, চাঁন আইসা তোমার কোলে মুখ রাখবার পারে, এই এইংটে গাছগুলান তোমার বাড়ির পাক্কা দালান হইয়া জন্মাইবার পারে, তবুও আমি বান্ধনডা খুলতাম না, বুঝলা কিছু?'

'তুমি তাইলে খোলবা না?'

'বেক্কল আর কারে কয়? হুনছিলাম লেহা পড়া নাকি ইট্টু আট্টু করছিলা! ধাপ্পা, না? কই, আমি কি এতোক্ষণ ল্যাটিন ভাষায় কথা কইছি, না বাংলায়?

'এইডাই তোমার শেষ কথা?'

'ইয়েস, মেডাম!'

লতা ঘুরে দাঁড়ায়। এখন আর ওর হাত কাঁপছে না, পা কাঁপছে না। সে দৃঢ় পায়ে ঘরে ঢোকে এবং বেরিয়ে আসে ঝকঝকে এক হাইস্যা হাতে নিয়ে।

এতোটা ভাবেনি ফেলু মেম্বর। তবুও অযাচিত একটা ভাবনা তাকে ধাক্কায়। তাছাড়া অনেক কথা হয়েছে এতোক্ষণ। একটু পান তামাক না হোলে আর জমছে না। কয়েক পা এগুতেই সে শ্বাশুড়িকে অতিক্রম কোরে ফেলে এবং তখনই হাইস্যা হাতে বেরিয়ে আসে লতা।

শ্বাশুড়িকে লতা পছন্দ করে না। কিন্তু বাড়ির বড়বউ হিসেবে সে তার যাবতীয় দায়িত্ব সাধ্যমতো পালনের চেষ্টা করে। পারতপক্ষে ঘোমটা ছাড়া শ্বাশুড়ির কাছে যায় না লতা. উঁচু গলায় কথাও বলে না। শ্বাশুড়ির বেলায় সব কিছুতেই তার একটা নিস্পৃহ ভাব। সেই শ্বাশুড়ি তার মেঝো জামাইকে আগলে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে আর সেই দিকে চেয়ে আছে রক্তের সারথী বেয়ে ধরায় আসা নাতনী শিলু। ঘৃণায় লতার মাথা আরো বেশি গরম হয়ে ওঠে। সে চিৎকার কোরে বলে- 'ওই মেহুরের বাচ্চা, গেলি ক্যা?'

ফেলু মেম্বর দাঁড়িয়ে পড়ে। পেছন ফিরে তাকায়। দুপুর গড়ানো রোদে লতার হাতে ঝিকমিক করছে হাইস্যার ধার। ফেলু মেম্বরের কপালে একটু ভাজ পড়ে। শ্বাশুড়ি তাকে সামনে ধাক্কায় আর বলে– 'যেই ডাহাইত্তে বেডি, বিশ্বাস নাই বাবা, তুমি ঘরে লও।'

লতা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে–'কি রে, অহন তর ইজ্জত কই? এক বাপের পোলা তো আগাইয়া আয়, নাইলে ওই বুইড়্যা বেডির শাড়ির তলে গিয়ে হুইয়া থাকগা। কুত্তার বাচ্চা কুত্তা কোনেকার।'

ঘুরে দাঁড়ায় ফেলু মেম্বর। শ্বাশুড়ি তাকে বাধা দেয়। ভেতর থেকে সত্যিকারের সাহসও পায় না ফেলু মেম্বর। শ্বাশুড়ির বাধা তাকে ইজ্জত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। সে নানা জাতের চোখ চেনে, মুখ বোঝে।

ঘরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় শ্বাশুড়ি ও ফেলু মেম্বর। লতা তার হাতের ধারালো হাইস্যা দিয়ে সামনের পাতাবাহার গাছের ঝোপে কোপ মারে। অবলীলায় কেটে যায় বেশ কয়েকটা ডাল। সে একটু একটু কোরে এগিয়ে যায় শিলুর কাছে। দড়ির বাঁধন খোলার জন্যে দড়িতে হাত দিয়েও থেমে পড়ে।

'দাঁড়িডে কাগো?'

'ফুপাগো। শুকনো এবং খিনখিনে গলায় শিলু জবাব দেয়।

লতা এবার গিট বরাবর হাইস্যা চালায়। বাঁধনমুক্ত করে শিলুকে শাসিয়ে বলে- 'রাইত্তে বুঝামুনে মাইয়ার পো! আর ক্ষেত চোহে দেহো নাই? গেছো ফুপাগো ক্ষেতে! কি আমার ঢংয়ের ফুপা গো! কোলে উইট্ট্যা নাচো গা, যাও!'

বাড়ির আড়াল থেকে লতা শ্বাশুড়ির গলা শুনতে পায়– 'হেয় মনে করছে ডা কি? গাও গেরামে বিচার নাই! আমি নিজের চইক্ষে সব দেখলাম, কানে সব হোনলাম। এর একটা বিহিত না কইরা আমি হেরে ছাড়ুম বুঝি? ছাড়ুম না।

লতা আজ ব্যতিক্রম। সেও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উত্তর দেয়– 'ডর দেহান কারে? আমার আর ডর করনের কিছু আছে? শালিশ করবেন? কবে? আপনেরা ভাবছেন ফেলু মেম্বরের বিরুদ্ধে রাও করার কেউ নাই? শালিশ ডাহেন, তহনই দেখবার পারবেন। এই আমি, আমি লতা, লীনার মা ফেলু মেম্বরের মুহে থুতু ছিডাইতাছি– 'থু -থু!'

লতা উত্তেজিত হয়ে শুকনো গাল থেকে থু থু ছিটায় বাঁয়ে ঘুরে, ডানে ঘুরে।

ফেলু মেম্বরের মুখে পান। রসে ভরে উঠেছে গাল। রসটুকু গিলে ফেলে সে এবার চেঁচিয়ে বলে– 'মাগী, ফেলু মেম্বরের তুই দেখছস কি? তর ভিডায় আমি ঘুঘু না চড়াইছি তো আমার নাম ফেলু মেম্বর না।

ঝংকার দিয়ে ওঠে লতা– 'আমিও কইয়া থুই, তর ওই ঘুঘুর বাচ্চা ঘুঘুরে ফান্দে আটকাইয়া একদিন তর বুহের খাচায় ভইরা দেওনের মানুষও বড় হইতাছে। মনে করছস, তরে হ্যায় ছাইড়্যা দিবো? আমি তারে দুধ খাওয়াইছিনে?'

'বাহ্, মাঝেমধ্যে মাগীডাতো ভালাই রঙ্গ করবার পারে। ফহিন্নির পোলা হইবো জজ ব্যারিষ্টার, সিদ্ধধানে পোয়াতী গাছ! আমার বদলা নিবো! দেইখ্যো, তোমার কথা শুইন্যে আমাগো টমি কুত্তাডা আবার হাইস্যা ফালাইবার পারে।

ফেলু মেম্বরের কথার জবাব দেয়ার আগেই লতার শ্বাশুড়ি আগবাড়িয়ে এসে বলে– 'কই বউ, লাজ শরমের মাথাডা চিবাইয়া চিবাইয়া বেবাকটুকু সাবাড় করছো, না অহনো ছিড়ে ফোডা আছে? বাড়ির জামাইয়ের লগে কেমনে কথা কওন লাগে, তাও শিহো নাই?

'এই ডাইনী বুড়ি, তোর চাপা পিডানী থো! ওই যে মাইয়াডা খাড়াইয়া রইছে, ওইডে তর কেডা? তর রক্ত নাই হের শরীলে? দেখ, অর হাতটা তর ডেমনা মাইয়া জামাই ছিলে কি করছে! কই, হের লাইগাতো বুড়ি বিবির ইট্টু দরদ দেখলাম না! সব খেমটা নাচ তো জামাই লইয়াই হইল। উনি আইছেন আমারে আদব কায়দা শিখাইতে! এই বুড়ি, শরম করে না তোর?'

লতা যা কোনোদিন করেনি, আজ তা-ই করে ফেলেছে। একটু একটু কোরে ভেতরে পুঞ্জিভূত হওয়া ব্যথা ক্ষোভ আজ প্রচণ্ড অনুকূল শর্ত পেয়ে বল্গাহীন রেষের ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠেছে ঘৃণার লাভা হয়ে। তাতে ধূলো উঠলো, শব্দ হলো, এক ধরণের উদ্বেগ-আতঙ্ক চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

লতা এ ধরণের কোমড় বেঁধে ঝগড়া করতে অনভ্যস্ত। আবার শত লাঞ্ছণা গঞ্জণা সত্যেও পারতপক্ষে শ্বাশুড়িকে অশ্রদ্ধা কোরে কোনোদিন কথা বলেনি, মুখে মুখে তর্ক করেনি। প্রথম দিকে গড়ে ওঠা অভ্যাস একটা মজবুত ভিত হয়ে আছে। কিন্তু আজ সব এলোমেলো হয়ে গেলো। শ্বাশুড়ির সাথে অশালীন কথা বলার শেষ দিকটায় এই বোধ লতার মাঝে জেগে উঠতে থাকে। লতার দম ফুরোতে আরম্ভ করে। শ্বাশুড়িও এতোটা কল্পনা করেনি। সাত চড়ে যে বউ 'রা' করে না, তার গলায় এতো ঝংকার, এতো বেশরম তার ভাষার সুরত! সে-ও আর কথা না বাড়িয়ে আস্তে আস্তে ঠোঁট নাড়তে নাড়তে মাথার আঁচল ঠিক করে। হতভম্ব চোখে শিমুলদের বাড়ির দিকে একবার তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে নিজের ঘরের আড়ালে চলে যায়।

রানু যে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, একটুও খেয়াল করেনি লতা। তার শাড়িতে টান পড়ে এবং তখনই সে রানুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। রানুকে কোলে নেয় লতা। আঁচল দিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে উঠানের দিকে পা বাড়িয়ে বলে- 'ক্ষুভ ক্ষিধে লাগছে, না?'

রানু দুই হাত দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। কাছে মুখ গুঁজে সে শব্দহীন মাথা নেড়ে নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে। কি যে হয় লতার। এতোক্ষণ পরে ব্যথার কঠিন একটা পাথর বুক বেয়ে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু গলার কাছে এসে বাধা পায়। তীব্র এক অব্যক্ত কষ্ট। কথা বলতে পারে না লতা, পারে না পা' চালাতে। কিছুক্ষণ সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে রানুর মাথায়, পিঠে, সারা গায়ে স্নেহের বর্ণমালার ছবি এঁকে চলে।

এ্যাক্সিডেন্টে আহতহওয়া বুড়োটা উঠে দাঁড়াতে গেলো। কিন্তু কিছুটা উঠেই আবার গা ছেড়ে দিয়ে সে কঁকিয়ে ওঠে। গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

শিমুলের হঠাৎ খেয়াল হলো। কিন্তু খুঁজেও সে আসেপাশে কোথাও সাইকেলটা দেখতে পেলো না। আর ঠিক তক্ষুণি যুবকটি ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে। গায়ে হালকা হলুদ রঙের টি শার্ট। গেঞ্জির বুকে টকটকে লাল চোখে আগুনের জিভ বের কোরে থাবা মারার ভঙ্গিমায় রুখে আছে জন্তুটা। শিমুল শুনেছে, ওটার নাম ড্রাগন। রিক্সার পেছনে অনেক আগেই এমন একটা ড্রাগনের ছবি সে দেখেছিল। বিকুও জন্তুটার নাম জানতো না। একদিন অতুলদাকে প্রায় একঘন্টা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল রাস্তায়। রিক্সাটা ওইদিন আসেনি। পরে– অন্য একদিন হঠাৎ কোরেই রিক্সাটা ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। অতুলদাই বলেছিল, জন্তুটার নাম -'ড্রাগন'। নামটা শিমুল ভুলে গেছিল। কিন্তু আজ দেখা মাত্রই নামটা ওর ঠিকই মনে পড়ে যায়।

মারমুখো জনতা সিদ্ধান্তহীনতায় থতোমতো হয়ে যুবকটিকে দেখে। যুবকটি শিমুল ও রাসেলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। বুড়োটাকেও।

'নাম কি?'

রাসেরের মাথা কিছুটা ঝুলে আছে। সে মাথাটা একবার উঁচু কোরে যুবকটিকে দেখেই আবার মাথা নামিয়ে ফেলে। মাটির দিকে তাকিয়ে থেকেই বলে– 'রাসেল।'

'বাড়ি?' যুবকটি রাসেলের ক্ষতস্থানের পাশে দরদী আঙ্গুলের স্পর্শ রাখে। চোখেমুখে উদ্বেগের আনাগোনা। কেমন মেয়েলি একটা ভার তার অবয়বে লেপ্টে আছে।

'শিমুলতলী।'

'কোথায়?' যুবক এবার মনযোগ দিয়ে রাসেলের দিকে তাকায়।

রাসেল আলতো কোরে মাথাটা তোলে।

'শিমুলতলী।'

বুড়োটা কাঁই কুঁই কোরে ওঠে। সে যুবকটিকে চেনে না। কিন্তু ছেলেটার যে ক্ষমতা আছে, তা বুঝতে পারে। প্রচণ্ড রাগ হয় বুড়োর ছেলেটার উপর। স্বার্থের জাল প্রায় ডাঙ্গায় তুলে এনেছিল। মাঝখানে উড়ে এসে বাগড়া বাঁধালো হতোচ্ছাড়াটা। পারলে চোখের চাহনিতে ভস্ম কোরে দিত। পারে না বোলে ভেতরে ভেতরে সে আরো বেশি ফুঁসতে থাকে। একই সাথে সে আবার করুণ চোখে কাতরতা জানায় জনতার উদ্যেশে। যুবকটি বুড়োকে হঠাৎ কোরে ধমকে ওঠে– 'থামুন! আহামরি কিছু হয়েছে বোলে তো মনে হয় না!'

ভেতর থেকে কে যেনো বোলে উঠলো- 'বুড়োটারে ভিমরতিতে ধরেছে। যত্তোসব ন্যাকামি।' বুড়োর কাঁই কুঁই আশ্চর্যজনক ভাবে থেমে যায়।

'এই ছেলে, তোমার নাম কি?'

শিমুল একবার রাসেল, একবার যুবকের দিকে তাকায়। আস্তে প্রায় অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে– 'শিমুল।'

'কি করো তোমরা?'

'পড়ি। সেন্ট লুইস হাইস্কুলে।'

'এদিকে কোথায় যাচ্ছো?' যুবকের স্বরে খানিকটা রুক্ষতা। পরিবর্তনটুকু টের পায় রাসেল। ওর মুখ একটু একটু কোরে আবার শুকিয়ে যেতে শুরু করে। রাসেল জবাব দেয়– 'এই বাজারেই আসছিলাম। তালুকদার দোকান থেকে বিড়ি কিনতে এসেছি।'

'বিড়ি!' যুবকটি অবাক চোখে একবার শিমুল আর একবার রাসেলের দিকে তাকাতে থাকে।

যুবক আশ্চর্য হয়ে রাসেলকে খুঁটিয়ে দেখে। রাসেলের মাথা আবার কিছুটা এলিয়ে পড়ে।

'এখান থেকে বিড়ি নিযে আমি শিমুলতলী বাজারে খুচরা বিক্রি করি।'রাসেল যুবকের সহানুভুতি আদায়ের চেষ্টা কোরে খুব মোলায়েম ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে

'নিশ্চয় ইন্ডিয়ান তরুন বিড়ি?' যুবকের জেরা।

রাসেল নিরুত্তর।

'মন্দ পাকোনি। বাবা-মা নেই?'

রাসেল এবার আরো বেশি নূয়ে পড়ে।

'এই কবীর, কি হয়েছে রে?'

গলার স্বরটা ধ্বক কোরে শিমুলের হৃদপিন্ডে আছড়ে পড়লো। তাকালো সামনের দিকে। ভিড় ঠেলতে হচ্ছে না। সমীহ কোরে সবাই সরে দাঁড়াচ্ছে। ভীষণ পাল্টে যায় পরিস্থিতির আবহাওয়া। পাল্টে যায় আগন্তুক যুবকের চেহারাও। শিমুল তাকে স্পষ্ট কোরে চিনেছে। স্বাস্থ্য প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। চোখের নিচে কালচে রং। পায়ে স্যান্ডেল নেই। পরনে লুঙ্গি আর ডোরা কাটা একটা শার্ট। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো বাতাসে একটু একটু উড়ছে। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। তবুও এক নজরেই শিমুল চিনে ফেলে। সাত্তার ভাই!

আর আশ্চর্য, এতোক্ষণ পরে কেনো যেনো দুই চোখ ফেটে শিমুলের লোনা জল বেরিয়ে আসে সব ধরনের বাধা এবং নিয়ন্ত্রণ ছাপিয়ে। কিন্তু শব্দ ওঠে না তার প্রকাশে। শিমুলকে দেখামাত্রই আশ্চর্য রকমের পাল্টে যায় সাত্তারের চেহারা। চকচক কোরে ওঠে তার চোখ দু'টো।

দ্রুত এগিয়ে এসে শিমুলের হাত ধরে সাত্তার।

শিমুল ঠোঁট কামড়ে কান্নার সার্বিক প্রকাশকে কষ্ট কোরে বাগ মানিয়ে সাত্তারের দিকে চেয়েই আবার চোখ নামিয়ে নেয়।

'কি হয়েছে? আহ্হা, কাঁদছিস কেনো, কাঁদিস না। বলতো কি হয়েছে?'

শিমুল ছেঁড়াছেড়া কথায় অগোছালোভাবে সব খুলে বলে। ওদেরকে একটু আধটু মেরেছে, কথাটা চেপে যায়। বলতে ওর লজ্জা হয়। সাত্তার এগিয়ে গিয়ে বুড়ো লোকটার সামনে গিয়ে বসে। পায়ে, যেখানে হাত রেখে লোকটা কাঁৎরাচ্ছিল, সেখানে হাত রেখে সাত্তার জিজ্ঞেস করলো– 'আপনার বাড়ি রাজাপুর, তাই না চাচা?'

লোকটার কাঁৎরানি মুহূর্তের জন্যে থেমে যায়।

লোকটার ডান হাত টেনে দেখে সাত্তার।

'করিম মুন্সী আপনার ভাইপো না?'

লোকটা হঠাৎ কোরে যেনো সম্বিত ফিরে পায়। মুখটা তার দ্রুত মুকিয়ে যেতে শুরু করে। সে তাড়াতাড়ি আবার কাঁৎরে উঠে কাৎরানির শব্দ দিয়ে সব কিছু চাপা দিতে চেষ্টা করে।

হঠাৎ কোরে হ্যাঁচকা টানে বুড়োকে দাঁড় করিয়ে ফেলে সাত্তার। ততোক্ষণে একজন দুইজন কোরে লোক সরে যেতে শুরু করেছে। সাত্তার কবীরের দিকে তাকিয়ে বললো– 'ভণ্ডটাকে কল্যাণ ফার্মেসীতে নিয়ে যা। ঔষধ টৌষধ লাগলে দিয়ে বিদেয় কর।'

শিমুলের দিকে ফিরলো সাত্তার।

'সাথে সাইকেল ছিল, না?'

শিমুলকে জবাব দিতে সুযোগ না দিয়ে রাসেল বললো, 'কমলা রঙের শার্ট পরনের একজন মাঝ বয়েসী লোক নিয়ে গেছে।'

'কোনদিকে?'

'বাজারে।'

'কবীর, আধঘন্টার মধ্যে সাইকেলটা যেনো ফার্মেসীর সামনে থাকে, তুই তা দেখ।' সাত্তার রাসেলের দিকে তাকায়। শিমুলের ডান হাত ওর বাঁ হাতে ধরা। 'চলো।'

ছোট্ট দুটি কুঁড়ে ঘর। মুখোমুখি। মাঝখানে এক টুকরো উঠোন। বিশালাকারের চার পাঁচটা আম কাঁঠাল গাছের ছায়ায় ঘর দুটো যেনো টুক কোরে লুকিয়ে পড়েছে। সাত্তারের বাঁ পাশে শিমুল, ডান পাশে রাসেল। উঠোনে পা দিয়েই সাত্তার বেশ জোরে ডাক হাঁকে- কইগো মামনি? দ্যাখো, মেহমান নিয়ে আসছি।

মহিলার বয়স পঁয়ত্রিশ কিংবা চল্লিশ। কোলে ছোট্ট বাচ্চা, বাঁদুরের মতো ঝুলে আছে। মাই খাচ্ছে। মহিলার হাসিখুশি মুখ। উত্তোরে ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের সামনে এগিয়ে এলো।

'মেহমান! আমার ভাই।' মহিলার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে সাত্তার বলে, 'তো, খাবার দাবার কিছু আছে, না খালি মুখেই মেহমানদের বিদায় দিতে হবে?'

শিমুল আর রাসেলকে একনজর দেখে নেয় মহিলা। তার মুখেচোখে সত্যিকারের হাসি উপচে পড়ছে। 'রুডি বানাই?'

'নাহ্ মামনি, তুমি দেখছি ডুবাবে সব। ওদেরকে তুমি রুটি খাইয়ে দাও, আর ওরা বাড়ি গিয়ে তোমার বদনাম করুক, না? তোমার হাতের রসুন পাতা আর কাঁচামরিচ বাঁটা দিয়ে গরম গরম রুটি খাওয়ার কি যে মজা, তা ওরা বুঝতে যাবে কোন দু:খে?'

'তাইলে ভাত পাকাই, কি কও?'

'এই সময়ে?'

'তাতে কি? কুমড়োর বড়া আছে।'

সাত্তার একটু ভাবে। আকাশে তাকিয়ে একবার বেলা দেখে নেয়। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো হাতের আঙ্গুলে ব্যাকব্রাশ করতে করতে বলে–'এক কাজ করো মামনি। আমার কথা বোলে রহিমের দোকান থেকে দুই প্যাকেট বিস্কুট, এক প্যাকেট চানাচুর আর দুই প্যাকেট আকিজ বিড়ি নিয়ে আসো গে।'

'কিন্তু-' মহিলার দ্বিধা ভাব মুখে লেপেট থাকে। সে সাত্তারের কথায় খুব একটা উৎসাহ দেখায় না। সাত্তারের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলি বলি কোরেও না বোলে, মুখের কথা মুখেই রেখে শেষে হেসে ফেলে। বলে, 'কতো বাকি পড়ছে, হিসাব রাখো?'

'কি যে বলো না তুমি মামনি! হিসেব না রাখলে চলে? রহিমকে তুমি বোলে এসো, পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে আমি অবশ্যই সব দেনা কুইট কোরে দেবো। একদম সব।'

মহিলা কোলের বাচ্চা ছাত্তারের দিকে বাড়িয়ে ধরে। কোলে নিয়ে সাত্তার আদর কোরে বাচ্চার গালে চুমো খায়। গালে গাল ঠেকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'কি গো ডিয়ার ভাইজান, কাঁদবে, না হাসবে?' বাচ্চাটা হেসে পা নাচায়। কচি নরম হাত দিয়ে সাত্তারের মাথার চুল ধরতে চেষ্টা করে মুঠি কোরে।

শিমুল ও রাসেলকে নিয়ে সাত্তার দক্ষিণ ভিটের ঘরে ঢোকে। বাঁশের চটা দিয়ে বানানো খাট। একজন সাত্তার ভাইয়ের বয়সী যুবক ঘুমিয়ে আছে। সাত্তার ওর পা' ঠেলে সরিয়ে বেশ খানিকটা জায়গা বের কোরে শিমুল ও রাসেলকে বসার জায়গা কোরে দেয়।

খাটের উপর বসার পরই প্রথমবারের মতো বিষয়টি শিমুলের চোখে পড়ে। সাত্তারের পায়ে মাটি শুকিয়ে আছে। হাতেও। মাথার ঝাঁকড়া চুলও বাদ পড়েনি। ঘামে কেমন কাদাকাদা হয়ে আছে। শার্টটা বেশি রকমের চিটচিটে, লুঙ্গিতে মাটি আর মাটি। শিমুলের হাবভাব বুঝে ফেলে সাত্তার। সে হেসে ফেলে। হাসিতে যেনো জ্যোস্নার বিশ্বাসী প্লাবন! সেই প্লাবনে ডুব সাঁতার খেলতে খেলতে সে প্রাণখুলে হাসতে হাসতে বলে- 'লাঙ্গল ধরেছিলাম, বুঝেছিস?। অভ্যাস নেই তো! এখন কিন্তু ভালোই পারি বলা চলে। এক কাজ কর, তোরা বস একটু, আমি হাতমুখ ধূয়ে আসি, ঠিক আছে?'

শিমুলও রাসেল একসাথে ঘাড় কাৎ করে।

ছাত্তার বেরিয়ে যেতেই শিমুল ফিসফিসিয়ে ওঠে- 'কিছু বুঝছিস?'

'কি?' কেমন নির্লিপ্ত শোনায় রাসেলের গলা। ওর চিন্তা সাইকেলের জন্যে। শেষ পর্যন্ত সাইকেলটা ঠিকঠাক পাওয়া যাবে তো?

'ধ্যুৎ, বুঝলিনে? সাত্তার ভাই লাঙ্গল বায়? পরনে ময়লা লুঙ্গি, পুরানা শার্ট, পায়ে স্যান্ডেল জুতা নাই। আগে সব সময় কেমন ফিটফাট থাকতো, সুন্দর সুন্দর ইস্ত্রি করা প্যান্ট শার্ট ছাড়া পরতোই না। ঘনঘন চুল আঁচড়াতো বোলে কত্তো মানুষ ঠোঁট টিপে হাসিঠাট্টা করতো! খালাতো তারে সব সময় টেরিসাহেব বোলে ক্ষ্যাপাতো।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'ধ্যুৎ, তুই কিচ্ছু বুঝিসনে।' হতাশ হয় শিমুল। হতাশ থেকে ক্ষোভ। সেই ক্ষোভ ঝুলে থাকে ওর কণ্ঠস্বরে।

'তুই বুঝছিস?' বিরক্ত হয়ে রাসেল শিমুলকে পাল্টা প্রশ্ন করে।

শিমুল জবাব দেয় না। হাসে। হাসিটুকু রাসেলের কাছে বোকাদের অনাবিল উচ্ছ্বাসের মতো মনে হয়। সে তা প্রকাশ করে না। বেশ খানিকটা গম্ভীরভাবেই বলে– 'ছাত্তার ভাই এখন কলেজেও যায় না।'

'বাড়িতেও থাকে না। কেনো রে?'

'ছাত্তার ভাই রাজনীতি করে।' অদ্ভুত নির্লিপ্ত লাগে রাসেলের কণ্ঠস্বর। শিমুল চেয়ে থাকে ওর দিকে। কিন্তু রাসেল তাকায় না। শেষে উত্তেজনায় শিমুল নিজেই ফুঁসে ওঠে।

'রাজনীতি করে? ধ্যুস, রাজনীতি করলে বুঝি কলেজে যাওয়া যায় না? বাড়িতে থাকা যায় না? তোর যত্তোসব আজগুবি কথা!

'দেখিস না, গ্রামে মাঝেমাঝে পুলিশ আসে! ছাত্তার ভাইকে ধরতে পারলে পুলিশ জামাই আদর করবে।'

'জামাই আদর করবে? মানে?'

'মানে– লাল দালানের ভাত খাওয়াবে।'

শিমুল বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে আর ভাবে। বাইরে ছোট্ট বাচ্চার কান্না শোনা যায়। কান্নার সাথে সাথে ছাত্তার ভাইয়ের হাসি। আরো একটা গলা। মেয়েলী।

'লাল দালান কিরে?'

শিমুলের আচম্বিত প্রশ্নে রাসেল এবার বিরক্ত হয়। অকেটা খেঁকিয়ে উঠে সে বলে–'অতো প্যাঁচাস ক্যা তুই?'

গামছা দিয়ে হাত মুছতে মুছতে সাত্তার ঘরে ফিরে এলো। ঘুমিয়ে থাকা যুবকের পাশে বোসে বিড়ি খুঁজতে গিয়ে সাত্তার কাপড়টা সরাতেই জিনিস দু'টো বেরিয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি আবার কাপড় দিয়ে জিনিস দু'টো ঢেকে ফেলে সে। শিমুল ও রাসেলের দিকে তাকায়। শেষে হেসে ওঠে। হঠাৎ কোরেই সে প্রায় লাফিয়ে ওঠে। খাটের নিচ থেকে একটা ব্যাগ টেনে বের করে। ভেতর থেকে ডেটল, তুলা আর ব্যান্ডেজ বের কোরে রাসেলের পায়ের সামনে বসে পড়ে। নিজের হাত দিয়ে প্যান্টটা আরো একটু উপরে টেনে তোলে।

রাসেল তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না সে কি করবে। সাত্তার নিজেই প্যান্টের ঝুল ভাঁজ কোরে নেয়। আস্তে আস্তে, যত্ন কোরে ক্ষতস্থানটা পরিস্কার কোরে, এক ধরনের সাদা পাউডার লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। শেষে পানি দিয়ে নিজের হাত ধুতে ধুতে বলে, 'আর চিন্তা নেই, সেরে যাবে।'

'লাল দালান' কথাটা শিমুলের মাথা থেকে একদম সরছে না। রাসেরের মাথা থেকে যাচ্ছে না সাইকেলের চিন্তা। সে একটু আতিপাতি করে সাত্তার ভাইকে জিজ্ঞেস করার জন্যে। কিন্তু সাত্তার ওপাশে বসতেই শিমুল প্রশ্নটা কোরে বসে। 'সাত্তার ভাই, লাল দালান কি?'

হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্নে সাত্তার খানিকটা চমকে ওঠে। কিন্তু মুহূর্তের জন্য মাত্র। হেসে সে শিমুলের মুখের দিকে তাকায়।

'লাল দালান? কার কাছে শুনেছিস?'

শিমুল নি:শব্দে রাসেলের দিকে তাকায়।

শব্দ না কোরে সাত্তার হাসে। বিড়ি জ্বালিয়ে আয়েশ কোরে টানে। চিকন কোরে ধোয়া ছাড়ে। রিং বানাতে চায়, হয় না। বাতাস ধোঁয়াটুকুকে ছড়িয়ে দেয় চারপাশে।

'লাল দালান মানে জেলখানা।' সাত্তার হেসেই জবাবটা দেয়।

শিমুল আঁতকে ওঠে। একটু নড়েচড়ে রাসেলের দিকে তাকায়। রাসেলের হাবভাবে কিছু বুঝতে পারে না শিমুল। 'জেলখানা!' শব্দটা অনেকবার অনেকের মুখে অনেক সময় শিমুল শুনেছে। হুশিয়ারী প্রদর্শনের এই জুজুবুড়ির ভয়টার ধরন ধারন সম্পর্কে বাস্তব কোনো ধারনা ওর নেই। বাস্তব জ্ঞান নেই বোলেই সেখানে আছে আকাশ ছোঁয়া আজগুবি সব ভীরু কল্পনা এবং

সেই ভীরু কল্পনা উপচে পড়ে বুকের ধুকধুকানি শব্দের তরঙ্গে তরঙ্গে। ভয়ঙ্কর ভয়ের স্পন্দনে শিহরিত শিমুল পরম কৌতূহলে ফের প্রশ্ন করে-'পুলিশ তোমাকে জেলে দেবে কেনো?'

'আমি রাজনীতি করি যে!' শব্দহীন হাসির তরঙ্গে সময়কে আলোকিত কোরে সাত্তার উত্তর দেয়। শিমুলের প্রশ্নে সে খুব মজা পায়।

'ফজলু স্যার, রহিম মেম্বর, গৌতম কাকা- তারাও তো রাজনীতি করে। করে না? তাদেরকে পুলিশ ধরে না কেনো?'

সাত্তার বিড়িতে জোরে দম দেয়। ফুসফুসে ধোঁয়াটুকু কিছুক্ষণ আটকে রাখে। তারপর নাক মুখ দিয়ে একসাথে ছেড়ে দেয়। ধোঁয়ার একটা মিহি আড়াল পড়ে সাত্তারের মুখে। সেই আড়ালের পর্দা কাঁপিয়ে বেশ দৃঢ়তার সাথে স্পষ্ট শব্দে সে বলে, 'করে। তবে, ওদের রাজনীতি আর আমার রাজনীতি এক রকম না।'

সাত্তারের মুখ থেকে এখন সবটুকু হাসি নির্বাসিত। সেখানে কি যেনো একটা কিছু লেপ্টে আছে। গোপন একটা আভা আছে তার, যার প্রকাশ সহজে ধরা যায় না কিন্তু মনের বনে অনুরণন তোলে।

'এক রকম না কেনো?' এতোক্ষণ পরে রাসেল প্রথম প্রশ্ন করে।

'আমরা চাই এই পঁচা সমাজটা ভেঙ্গে একদম নতুনভাবে তৈরি করতে, আর ফজলু স্যার, গৌতমরা চায়,' একটু থেমে সাত্তার গুছিয়ে নেয় কথামালা। 'এই সমাজটা যেমন আছে, তেমনই থাক; রহিম মেম্বরের ইচ্ছে, সমাজটা ভাঙ্গার দরকার নেই, একটু আধটু চুনকাম কোরে মূল কাঠামোটাকে ঠিক রেখে লেবাসটা সংস্কার করা। ভেতরে মধু আছে কি নেই, ওটা কোনো বিষয় নয়, কিন্তু টিনের গায়ে সুন্দর হরফে লেখা থাকা চাই- খাঁটি মধুর টিন। ওতেই খুশিতে ডুগডুগি বাজাও। কোন প্রশ্ন করা চলবে না।'

রাসেল ও শিমুল মুখ সামান্য ফাঁক কোরে চেয়ে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে কথাগুলো। কিন্তু ভালো কোরে বুঝতে পাছে না সাত্তারের সব কথা।

'বুঝলিনে তো?' সাত্তার হাতের বিড়ি মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে চেপে নিভিয়ে দেয়। 'ধর- একখণ্ড জমি।' হাতের চেটোয় সাত্তার মুখ মোছে। 'কোনো মানুষ যদি ঐ জমিতে কাজ না করে, কি হবে?'

'জংলা গাছে বা লতাপাতায় ক্ষেত ছেয়ে যাবে।' শিমুল দ্রুত জবাব দেয়।

'রাইট। অর্থাৎ– মানুষ চাষ কোরে ক্ষেতে বীজ না ফেললে কোনো জমিতেই আকাশ থেকে ফসল গজাবে না, ফলবে না। ফলবে?'

রাসেল ও শিমুল মাথা নাড়ে।

'অথচ মানুষের ওই কাজের চেয়ে জমির দামটা হাজার গুণ বেশি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখা হচ্ছে, দেখানো হচ্ছে। তোমাদের ফজলু স্যারের কথাই ধরো। সে কি কোনোদিন জমিতে কাজ করে? করে না। কামলা খাটায়। কামলারা জমি চাষ করে; কামলারা ফসল বোনে, ধান লাগায়; নিড়ানী দেয়, ফসল কাটে, মাড়ায়। এক কথায়– সব করে। কিন্তু ফসলটা কে পায়?'

'কেনো, স্যার?'

'স্যার, তাইতো? রাইট। কিন্তু শিমুল, ওই ফসল স্যার পাবে ক্যানো? সেতো আর কোনো কাজ করেনি, কাজ করেছে কামলারা।'

'বারে, জমি যে স্যারের!'

'এই তো মাথা খুলছে। ঠিক বলেছিস, জমিটা স্যারের। কিন্তু ইতিহাস বলে, জমাজমি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে ছিলো না। স্বার্থান্বেষী মানুষই নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এক এক সময়ে এক এক অজুহাত খাড়া কোরে ওই সব জমিজমা কব্জা কোরে নেয়, নিজেরা ধনী হয়ে বসে। ওইসব ফন্দি ফিকিরগুলোই আইন নামে চালিয়ে দেয়া হয়। ইতিহাস পড়লেই এইসব বিষয়গুলো বুঝতে পারবি। শোন, অন্যকে ঠকানো ছাড়া কেউ কক্ষণো কোনোভাবেই ধনী হতে পারে না।'

শিমুল বেশ দৃঢ়তার সাথে বলে, 'স্যারতো কামলাদের ঠিকমতো মজুরি দেন।'

প্যাকেট থেকে বিড়ি বের কোরে ডলতে ডলতে হাসিতে ঠাট্টার কাদা মেখে সাত্তার বলে, 'হ্যাঁ, মজুরি দেয়। আসল মারপ্যাঁচটা তো এই জায়গাতেই। তোদের স্যার ওইসব কামলাদের যা মজুরি দেয়, তা মোটেই ন্যায্য না, পাওনার চেয়ে অর্ধেকেরও কম।

রাসেল ও শিমুল পরস্পরের দিকে তাকায়। ওদের মনের আরশিতে প্রতিবিম্বিত একটা পর্দায় টান পড়ে, কেঁপে ওঠে পর্দাটা।

'এক বিঘে জমির হিসাব কোরে দেখো। ধান লাগানো থেকে মাড়াই পর্যন্ত ধর মোট বারোজন কামলা লাগে। পঁয়ত্রিশ টাকা কামলার দাম হলে লাগছে ধরগে চারশো' কুড়ি টাকা। ধর, ধানের চারা সাতশো টাকা; সার, পানি আর ঔষধ বাবদ আরো পাঁচশো। মোট কতো হলো? ষোলশো কুড়ি টাকা। দুই হাজারই ধর, কাটা মাড়াই আছে না? তো, ওই জমিতে ধান হবে কয় মন?

শিমুল রাসেলের দিকে তাকায়। রাসেলকে খুব একটা ভাবতে দেখা গেল না। সে সাত্তারের দিকে তাকিয়েই জবাব দিলো, 'পঁচিশ মণ তো হবেই।'

'কুড়ি মণই ধর। তো, দেড়শো টাকা মণ হোলেও ধানের মোট দাম হচ্ছে তিন হাজার টাকা। খেড়ের দাম বাদই রাখলাম। তোদের স্যার তো খরচ করেছেন সর্ব সাকুল্যে দুই হাজার টাকা। বাকি এক হাজার টাকা কোথায় গেলো? আসলে আইনের মাধ্যমে কামলাদের কাছ থেকে দিনে-দুপুরে তোদের স্যার এক হাজার টাকা ঠকিয়ে নিচ্ছে। যে সমাজে এইভাবে আইনের নামে ঠকানো হয়, জুলুম চলে, আমরা সেই সমাজও মানি না, আইনও মানি না; মানা উচিতও না।'

ঘুমন্ত যুবকটি পাশ ফিরে শোয়। সাত্তার যুবকের পিঠে হাত রেখে ডাকে- 'এই সাগর, উঠবি নে?'

কোনো জবাব না দিয়ে যুবকটি আরেকটু আয়েশ কোরে শোয়।

'ধনী-গরীব তো ঈশ্বরই তার পরিকল্পনা মতো বানিয়েছেন।'

রাসেলের প্রশ্ন শুনে সাত্তার প্রচন্ডভাবে চমকে ওঠে। সে নতুন কোরে বিড়ি জ্বালিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে আর ভাবে। রাসেলের কথাটা কতো স্বাভাবিক অথচ ভয়ঙ্কর। যে কোনো পারমানবিক বোমার চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে এই ধর্ম। অতীত তার প্রমাণ। ধর্মের সেই আফিম-ধোঁয়ায় অশিক্ষিত পশ্চাৎপদ মানুষগুলোকে কি চমৎকারভাবে বিমোহিত কোরে রাখা হয়েছে। চর্চাটাও শুরু হয় প্রথম পাঠ থেকে। কারো নিস্তার নেই এর নাগপাশকে এড়িয়ে চলার। কিন্তু এই বদ্ধ বাতাসের আবর্ত থেকে ওই সব ধর্মোন্মত্ত লোকগুলোকে স্বাধীন বাতাসে টেনে বের করতেই হবে। নইলে কিচ্ছু হবে না। সংগ্রামটা সত্যিই খুব টাফ। ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে ধ্বংসাত্মক আকারে ফুঁসলিয়ে তুলতে প্রতিপক্ষের এক সেকেন্ড সময়ও লাগে না। অথচ অদৃশ্য ওই আবর্ত থেকে একেকজন মানুষকে বের কোরে আনতে সময় নেয় অনেক অনেক বছর। সাত্তার গভীর মনযোগ দিয়ে রাসেলের দিকে চেয়ে থাকে। চোখ তার ওখানে কিন্তু মন ছুটে চলে অনেক গভীরে, গহীন তপোবনে; ভিন্ন সত্তার ধ্যানে সে অবচেতন ভাবেই মত্ত হয়ে ওঠে। সাত্তারের বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সে খাটের নিচে রাখা একটা ব্যাগ থেকে দু'টো বই বের কোরে আনে। গল্প বইয়ের পোকা শিমুল। সে ঔৎসুক্য চোখে বই দু'টো দেখে। 'তানিয়া' ও 'সহজ প্রশ্নোত্তরে সমাজ বিশ্লেষণ'। ছাত্তার আগের জায়গায় বোসে রাসেলের দিকে তাকায়।

'ধনী গরীব ঈশ্বর তার পরিকল্পনা অনুযায়ী বানিয়েছে, তাইতো? কিন্তু ক্যানো? তার সেই পরিকল্পনাটাই বা কি, এটা কি তোদের স্যার তোদের শেখান?'

শিমুল পুট কোরে বোলে ওঠে, 'তাঁর উপর মানুষের শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের পরীক্ষার জন্যে। কষ্ট আর দু:খ দিয়ে তিনি আসল নকল যাচাই কোরে নেন।'

তোতা পাখির বুলি বলে যাকে। ভেতরে ছক এঁকে গেঁথে দেয়া কিছু শব্দমালার হুবহু বমন। আত্মাকে হেরোইনের ডোপ দিয়ে অংকুরেই বৈকল্য কোরে দাও। তারপর– যেমন ইচ্ছে টোকা দাও, নাচ হবে। অনুকরণীয় নাচ। নিশ্চিন্তে নিজের ভোগের জন্যে মিছিল সাজাও। জীবনের মসৃনতা ঘিরে বাগান করো; ফুলের বাগান। ফুলকে ভালোবাসার মুকুট পরিয়ে দাও। তুমি এবার দিব্বি সুজন এবং নিরাপদ! সাত্তারের ভেতরে ভাবনার তোলপাড় হয় রাসেল ও শিমুলের কথায়। এরচে' কতো সাম্প্রদায়িক কথা হয়েছে, ঘটনা ঘটেছে কতো, অথচ– ঠিক এভাবে, এতো তীব্র হয়ে কখনো তার বিষাদিত অনুরণন সাত্তারের হৃদপিন্ডে এভাবে ঝংকৃত হয়নি।

সাত্তার শিমুলের চোখে চোখ রেখে মুখে হাসি ফুটানোর চেষ্টা কোরে জিজ্ঞেস করে– 'ধর্মে কতো পেয়েছিলি? একশো? তুইতো আবার যাকে বলে একদম গুড বয়, ভালো আর শান্ত ছাত্র। আসলে কি জানিস, প্রকৃত সত্য যেনো সব সময় আমাদের চোখের আড়ালে থাকে, সেই কারণে জন্মের পর থেকেই আমাদেরকে এ ধরনের অনেক আজগুবি কথা, যা আবার মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, আমাদের শেখানো হয়।' সাত্তার থামে। কেমন যেনো প্রাবন্ধিক ধাঁচের কথা হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টা সত্যিই জটিল। সেই জটিল বিষয়টি সহজ কোরে রাসেল ও

শিমুলকে বুঝাতে চাইছে সাত্তার। বিষয়টা কিভাবে আরো বেশি জীবন্ত আর সহজ করা যায়, তা ভাবতে ভাবতে সাত্তার আবার বলতে শুরু করে–'বুঝলি, ধনীরা এভাবেই সাধারণ মানুষকে জুজুবুড়ির ভয় দেখিয়ে তাদেরকে শোষণ আর অত্যাচার কোরেও নিরাপদে সুখের সাগরে ডুবে থাকতে পারে। খেয়াল কোরে দেখেছিস– কাদের বাড়িতে মসজিদ আর মন্দির ওঠে? ধনীদের বাড়িতেই। আসলে ওই সব মসজিদ, মন্দির আর গির্জা ধনীদের সবচে' বিশ্বাসী রক্ষাকবচ, পাহারাদার। গরীবরা ঠকতে ঠকতে আর মার খেতে খেতে যখন ন্যায্য আদায়ের জন্যে লড়াইয়ে নামে বা নামতে চায়, ওইসব ভণ্ড ধনী ব্যক্তিরা তখন আর্তচিৎকার কোরে বলে, 'হায় হায়! করছো কি? ধন-দৌলততো সৃষ্টিকর্তার হাতে। তুমি আমি, সে তো নিমিত্ত মাত্র, নামকো ওয়াস্তে পাহারাদার। ওরাই আবার ফতোয়া ঝাড়ে, 'গরীবরা নাকি ধনীদের চেয়েও পাঁচশো বছর আগে বেহেস্ত, মানে স্বর্গে যাবে। আচ্ছা বাবা, তাই যদি হয়, তবে তোমরা কেনো নিজেদের ধন দৌলত বিলিয়ে দিয়ে গরীব হয়ে যাও না? কেনো জেনে শুনেও পাঁচশো বছর আগে বেহেস্তে যাবার টিকেট কাটো না? ওসব ফাঁকা বুলি, বুঝলি,ফাঁকা বুলি। মানুষ মানুষকে একটা সময়ের পরে আর ভয় পায় না। কিন্তু- অন্ধত্বের কারণে মসজিদ, মন্দির আর গির্জার উপর ভয়টা থেকেই যায়। এগুলোই তখন শোষকদের বাঁচিয়ে রাখে।'

'আপনি তাহলে বলতে চান ঈশ্বর বলতে কিছু নেই!'

রাসেলের গলায় ঝাঁজ। শিমুলের মনও বেশ খারাপ হয়ে ওঠে সাত্তারের কথায়। রাসেলও শিমুলের মনোভাব সাত্তার বুঝতে পারে। কথাগুলো গ্রহণীয় কোরে বলতে পারছে না বোলে নিজের উপর ওর বেশ রাগ হয়। কিন্তু সে সেই রাগের প্রকাশ না ঘটিয়ে হাসতে চেষ্টা কোরে বলে, 'ওভাবে ভাবছিস কেনো? আসলে ঈশ্বর বা আল্লাহ্ আছে কি নেই, তা বড় কথা না। বড় কথাটা হলো, তার নামে ধনীরা গরীবদের চোখে ধূলো দিচ্ছে, শোষণ আর জুলুম করছে। মানুষের তৈরি এমন পক্ষপাতিত্বে ভরা আল্লাহ্ বা ঈশ্বর আমাদের কোনো দরকার আছে? নেই, তাই না? তোর যতো খুশি আল্লাহ্ বা ঈশ্বরের নাম নিতে চাস, নে। কিন্তু ঈশ্বরই ধনী আর গরীব বানিয়েছে, ধন দৌলত তার হেফাজতে– এইসব মিথ্যে কথা বোলে ইতিহাসকে অন্ধ বানাতে যাসনে, ব্যস! কি বলিস তোরা?'

বই দু'টো সামান্য নাড়াচাড়া কোরে শিমুলের দিকে তাকায় সাত্তার। খাট থেকে নেমে কলসি থেকে ঢেলে এক গ্লাস পানি খায়। দরোজার কাছে গিয়ে সে একনজর বাইরে তাকায়। কেউ নেই। মামনি এখানো ফেরেনি। উঠোনে কয়েকটা ভাটশালিক খুটে খুটে আধার খাচ্ছে। ছাত্তার আগের জায়গায় ফিরে আসে। বই দু'টো শিমুলের হাতে দিয়ে বললো, 'দুইজনে মিলে পড়বি। যেখানে বুঝতে না পারবি, সেখানে লাল কালিতে দাগিয়ে রাখবি। আমি পরে বুঝিয়ে দেবো।'

আমতা আমতা কোরে রাসেল শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্ত জানায়- 'আমি পড়বো না।'

সাত্তারের ভ্রু কুঁচকে ওঠে।

'কেনো?'

মাথা ন্যুয়ে মেঝের দিকে তাকায় রাসেল। হাতড়ে যুক্তি খোঁজে সে। কিন্তু তেমন যুতসই কোনো যুক্তিই সে খুঁজে পায় না।

'এইসব বই পড়লে পাপ হবে।' নরম কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণ রাসেলের গলায়। কোনো যথার্থ যুক্তি না পেয়ে সে প্রচলিত বিশ্বাসের উপর ভর কোরেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে।

'কি হবে? পাপ?' হো হো কোরে সাত্তার হেসে ওঠে।

'তোরা এখনো ভীষণ ছোট্ট রয়ে গেছিস। পাপ হবে না। পাপ কাকে বলে, জানিস? পাপ হলো মিথ্যে কথা বলা। পাপ হলো সত্যকে সত্য বোলে স্বীকার না করা, সত্যকে বাস্তব জীবনে প্রকাশ করতে না পারা। পাপ হলো অন্যায়ের সপক্ষে সাফাই গাওয়া। মোটকথা– পাপ হলো গিয়ে মানুষের অবিবেচনায় যে কষ্টের জন্ম হয়, তাকে মেনে নেয়া। সে যাকগে, এসব কথা এখন তোরা ভালো কোরে বুঝতে পারবি নে। আরো বড় হ', সব পানির মতো পরিস্কার হয়ে যাবে।

সাত্তার নিজেই রাসেলকে বিড়ি কিনে দিলো। ফার্মেসীর সামনেই সাইকেলটা দেখতে পেয়ে রাসেলের চোখ খুশিতে চকচক কোরে ওঠে।

মোড় ঘুরে সাত্তার দাঁড়ালো। সাথে রাসেল আর শিমুল। 'তোদেরকে আমি কোনো বাড়িতেই নিয়ে যাইনি, তাই না?'

সাত্তার হেসে হেসেই বলে। কিন্তু শিমুল ও রাসেল কথার অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে বোকার মতো চেয়ে থাকে।

'বুঝলিনে?' প্রশ্রয়ের হাসি ঝুলে থাকে সাত্তারের ঠোঁটে।

সেই অনেকদিন আগের কথা। হঠাৎ কোরে শিমুলের মনে পড়ে। গভীরভাবে তলিয়ে না দেখেই শিমুল এবার বলে ফ্যালে, 'বুঝেছি। আপনি আমাদেরকে যে বাড়িতে নিয়ে গেছিলেন, কারো কাছে তা' বলা যাবে না।'

'গুড।' শিমুলের পিঠ চাপড়ে দেয় সাত্তার। 'শোন, চিঠিটা সরাসরি মার কাছে দিবি। বলবি, টাকাটা আমার খুব দরকার। আর বলবি, আমি ভালো আছি। ঠিক আছে?'

মাথা কাৎ করতে যেয়ে শিমুল থেমে যায়। 'আপনার জন্যে জামা কাপড় পাঠাতে বলবো?'

'আরে না না, এসব কথা যেনো বলিসনে আবার। শোন, তোরা কিন্তু ভালোমতো লেখাপড়া চালিয়ে যাবি, কেমন? আর– যখন এদিকে আসবি, তখন ঔষধের দোকানে আমার খোঁজ নিস। যা তাহলে?

রাসেল সাথে সাথে সাইকেলে ওঠে না। ঠেলে ঠেলে কিছুটা পাথ ভাঙ্গে। সাত্তারকে মোড়ের বাঁকে হারিয়ে যেতে দেখলো শিমুল ও রাসেল পেছন ঘুরে। তারপরই রাসেল সাইকেলে ওঠে।

সেই কখন থেকে শিমুলের ভেতরে একটা কৌতুহল কেবলই আথালি পাথালি কোরে ঘাই মারছে। কিন্তু সময় এবং সুযোগ হয়নি প্রকাশের। খোলা মাঠের মাঝখানে ফাঁকা রাস্তায় পড়ে

শিমুল এবার কৌতুহলটা আর চাপা রাখতে পারে না। সে রাসেলের পিঠে টোকা দেয়। রাসেল ঘাড় না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে- 'কি?'

'ওগুলো কিরে?'

রাসেল উত্তাপহীন গলায় পাল্টা প্রশ্ন তোলে–'কোনগুলো?'

'আরে ওই যে, শুয়ে থাকা লোকটার মাথার কাছে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা, ওগুলো কি অস্ত্র, চিনিস?'

রাসেল পেছন ফিরে শিমুলকে দেখে। কিছুক্ষন চুপ কোরে থাকে দুইজনই। একটা ট্রাককে সাইড দিতে গিয়ে কার্পেটিং থেকে সাইকেল মাটিতে নামিয়ে আনে রাসেল। ঝাঁকুনি খেয়ে শিমুল নড়েচড়ে বসে। ট্রাকটা কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দৈত্যের মতো গর্জন তুলে ওদেরকে পার হয়ে যায়। সাইকেল চালিয়ে রাসেল আবার কার্পেটিং -এ উঠে আসে। স্বস্তি ফিরে পায় শিমুল। রাসেলও। এতোক্ষণে কথা বলে রাসেল- 'আমি একটার নাম জানি।' রাসেল নতুন কোরে দম নেয়। বেশ হাঁপ ধোরে গেছে, কথায় বোঝা যায়। 'যেটা ফুটো ফুটো মতো, ওটার নাম স্টেনগান।'

'স্টেনগান!' শিমুল কিছুক্ষণ বিভোর হয়ে থাকে স্টেনগান শব্দের মোহে। অনেকবার অনেকের কাছে নামটা সে শুনেছে। এই তা হোলে স্টেনগান? সে আবার হুট কোরে প্রশ্ন করে– 'আচ্ছা রাসেল, ছাত্তার ভাইরা অস্ত্র রাখে কেনো?'

'সোজা কথা– মানুষ মারার জন্যে।'

শিমুলের চোখ বেশ বড় হয়ে যায়। হতভম্ব বোধের সাথে অবিশ্বাস মেশানো। গলার স্বরে তার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে।

'সাত্তার ভাই মানুষ মারে!'

'মারেই তো!' কেমন নির্লিপ্ত একটা ভাব রাসেলের গলায়। 'না মারলে অস্ত্র দিয়ে কি করে? অস্ত্রের একটাই কাজ খুন করা।'

'সাত্তার ভাই এতো সুন্দর গান গায়! আচ্ছা, তুই জানলি কোত্থেকে?'

'কত্তো মানুষ বলাবলি করে! তুই যে কি বুদ্ধু না! মানুষ যদি না মারতো, তবে বাড়ি না এসে সাত্তার ভাই পালিয়ে থাকে কেনো? অস্ত্র রাখে কেনো?'

শিমুল কোনো জবাব খুঁজে পায় না। রাসেলের কথাগুলো মন থেকে মেনেও নিতে পারে না, খুব খারাপ লাগে ওর ভেতরে ভেতরে। কিন্তু তা' প্রকাশ না কোরে সে ঘাপটি মেরে সাইকেলের পেছনে চুপচাপ বোসে থাকে। যারা এতো সুন্দর গান করে, তারা মানুষ খুন করতে পারে? অচেনা এক পিচ্ছিল শ্যাওলায় শিমুলের চেতনা জড়িয়ে পড়ে, সে তলিয়ে যেতে থাকে চেনা আর অচেনা জগতের জটিল ঘুর্ণাবর্তে।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে শিমুল থমকে দাঁড়ায়। অনেক লোক জন। অজানা আশংকায় ভেতরটা ওর কেঁপে ওঠে। কিন্তু ক্যাসেট থেকে ভেসে আসা গানের শব্দ শুনতে পায় সে। শেষে নিজের কাছে নিজেই আশ্বস্ত হয়। কানের ভেতর দিয়ে বিকট একটা ফাটা বাঁশির সুর এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেলো। বুবলির গলা। ক্যাসেটের শব্দের সাথে সম্ভবত: পাল্লা দিচ্ছে পাঁজিটা। শিমুল এক পা দ'ু'পা' কোরে বাড়ির দিকে এগুতে থাকে। তারই এক ফাঁকে শিমুলের আগমনী জলির চোখে ধরা পড়ে। সে দৌড়ে এসে শিমুলের দুই হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে নাচায়। খুশিতে ওর চোখ দুটো নাচছে।

'এতোক্ষণ কই ছিলি?' জলি'পার গলায় আনন্দ আর খুশির মাতন। খুশির সেই ঢেউয়ের দোলা শিমুল বুঝতে পারে। বেশ ভালো লাগে ওর জলি'পাকে। 'সারা বিকেলে সাহেবের একটুও দেখা নেই। বলতো কে এসেছে?' জলি শিমুলের গাল টিপে জিজ্ঞেস করে। শিমুল জলির হাসিখুশি চোখেমুখে তাকায়। বোকার মতো হেসে ভেতরের দিকে চেয়ে থাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে। জলি ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে আনে– 'বাবা এসেছে। ইস, আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে না!' জলি খুশিতে শিমুলের গলা জড়িয়ে ধরে।

জলি'পাদের বাবাকে আজও সামনা সামনি শিমুল দেখেনি। অবশ্য ছবিতে দেখেছে। বিরাট একটা বাঁধানো ছবি আছে বারান্দায়। শিমুল কল্পনায় জলি'পার বাবার বাস্তব মুখটা খুঁজে বের করতে চায়। পারে না। তখন স্মৃতির ঝালর ঠেলে ঝাপসা একটা অস্পষ্ট ছবি শিমুলের মানসপটে আবছা ছায়া ফেলে। বাবা! শিমুল ছুটিতে যখন বাড়ি যাবে, তখন বাবার একটা ছবি জলি'পাদের বাবার ছবির চেয়েও বড় কোরে বাঁধিয়ে নেবার পরিকল্পনা করে।

শিমুল বড়'পাকে হঠাৎ কোরে দেখে চমকে ওঠে। এতোক্ষণ শার্টের কথা ওর মনে ছিলো না। বড়'পাকে দেখামাত্রই ওর বুক ধকধকিয়ে লাফিয়ে উঠলো। মুহূর্তে ওর মুখ শুকিয়ে যায়। লীনা এগিয়ে এসে শিমুলের এলোমেলো চুল আরো একটু এলোমেলো কোরে আদর করে। মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে দুই হাত দিয়ে বিলি কেটে চুলগুলো আঁচড়ে দেয়ার মতো কোরে গুছিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করে, 'কই গেছিলি?'

শিমুল ভেতরে ভেতরে ছটফট করে।

'এতো কোরে বলি, রোদে কম ঘোরাঘুরি করবি। কবে যে অসুখ বাধিয়ে বসবি!' হঠাৎ কোরেই শিমুলের শার্টের ছেঁড়া হাতা লীনা'র চোখে পড়ে। সাথে সাথে তার হাতের আঙ্গুল থেমে যায়। রাগে চোখ দু'টো জ্বলে ওঠে। কিন্তু এতোই স্বল্পস্থায়ী হয় সেই রাগ যে, শিমুল তা বুঝতে পারে না। তবে লীনার স্বর রীতিমতো ঠাণ্ডা আর গম্ভীর হয়ে ওঠে।

'শার্ট কি কোরে ছিঁড়েছে?'

আপার গম্ভীর আর চাঁপা কিন্তু তীক্ষ্ণ স্বরে শিমুল কুঁচকে ওঠে। এমনিতেই ওর মিথ্যে বলার অভ্যাস নেই। তার উপর সাত্তার ভাইও স্পষ্ট কোরে বোলেছে, 'মিথ্যে কথা বলাই পাপ, সত্যকে সত্য বোলে স্বীকার না করা, সত্যকে বাস্তব জীবনে প্রকাশ করতে না পারাই পাপ।' শিমুল ঘেমে ওঠে। লীনা চুপচাপ বোতাম খুলে শার্টটা খুলে নেয় এবং তখনই সাত্তারের পাঠানো চিঠির কথা শিমুলের মনে পড়ে যায়। ভয়ে ভয়ে, মাথা নিচু কোরে শিমুল বড়'পাকে সব কথা খুলে বলে।

লীনা সাথে সাথে কিছু বললো না, একটা থাপ্পরও মারলো না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো শব্দ কোরে। পকেট থেকে চিঠিটা বের কোরে শিমুলের হাতে দিয়ে বললো, 'এটা দ্বিতীয়বার এবং শেষবার, মনে রাখিস। প্রথমবার মাথা ফাটিয়েছিলি, আজ দ্বিতীয়বার জামা ছিঁড়েছিস। তৃতীয়বার ওর কাছে গেলে তোকে সোজা বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। এখন তোর লেখাপড়ার সময়। চিঠিটা দিয়ে আয়। যাবি আর আসবি।'

বড়পা' চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই শিমুল দেখলো, বাড়ির আবহাওয়াটাই সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। টেনে হিঁচড়ে শিমুলকে ক্যাসেটের কাছে নিয়ে আসে জলি। বোতাম টিপে টিপে শিমুলকে সে ক্যাসেট চালানো শিখিয়ে দেয়। কাছে এসে বুবলি চেঁচাচ্ছিল। জলি বোতাম টিপে তা রেকর্ড কোরে ফেলে। ফিতে ঘুরিয়ে ফুল ভল্যুয়মে তা' চালিয়ে দিতেই টেপ রেকর্ডার গমগমিয়ে উঠলো। বুবলির বিকট গলাফাটানো চিৎকার। বুবলি থমকে যায় নিজের গলা নিজের কানে শুনে। সে বোকার মতো ভয়ে ভয়ে যন্ত্রটার দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ কোরেই ভ্যা কোরে কেঁদে ফেলে বুবলি এবং এলোমেলো পা ফেলে দে-দৌড়। মায়ের খোঁজে। জলি হেসে হেসে শিমুলকে জড়িয়ে ধোরে গায়ে গড়িয়ে পড়ে। শিমুলও। কিন্তু শিমুলের বোধে হঠাৎ কোরে হালকা একটা ভিন্ন তারে টান পড়ে। ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হয় শিমুল। নিজের উপর। কিন্তু কারণটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

কাল রোববার। স্কুল নেই, সাপ্তাহিক ছুটি। বাবা বাড়ি এসেছে। চাইতেই জলি ছুটি পেয়ে গেলো। নিয়মের বাইরে এসে জলি আজ নিয়মের ধারে কাছেও গেলো না। একদিন না পড়লে খুব একটা যায় আসে না। সাথে তাল মিলিয়েছে শিমুল। জলি বোতাম টিপে নিজের গলার গান রেকর্ড করে, শিমুলকে নিয়ে শোনে। হেসে, 'ধূৎ- ভালো হয়নি,' বোলে মুছে ফেলে, আবার রেকর্ড করে। আবার মোছে। শিমুলেরও খুব ইচ্ছে হয় একটা গান তোলার জন্যে। সে মনে মনে মনক্ষুন্ন হয় জলির উপর। জলি'পাটা কি, খালি নিজের গানই তুলছে, ওকে একবারও

সুযোগ দিচ্ছে না। কিচ্ছু বোঝে না জলি'পা! বলি বলি কোরেও শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধতা পর্যন্ত গিয়ে শিমুল থেমে যায়। মনে মনে ভাবে, কাল জলি'পা যখন চলে যাবে, যখন বাড়িটা একদম ফাঁকা থাকবে, তখন তিন চারটে গান তুলে নিতে হবে। কোন কোন গান তুলতে হবে, সে তা' হাতরে খোঁজে। এবং তখন সে এমন একটা গানও খুঁজে পায় না, যেটি ওর সম্পূর্ণ জানা আছে। শিমুল হতাশ হয়।

অন্য দিনের তুলনায় রাতের খাবার অনেক ভালো হয়েছে। উৎসবের ম-ম গন্ধ অনেকদিন পরে এই অসময়ে এ বাড়িতে বয়ে চলেছে। মুরগির মাংস, সাথে ইলিশ মাছ ভাজি। স্বাদে স্বাদে আর জলির আদরে শিমুল আজ বেশি খেয়ে ফেলেছে। অস্বস্তি নিয়েই সে একা একা বিছানায় গড়াগড়ি করে। অন্যদিন বুবলি আসে। আজ ওর পাত্তা নেই। প্রথম দিকে যেতেই চায়নি, আর এখন বাবার কোল ছেড়ে নামছে না। জানালা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে। একটু শীতশীত ভাব। বেশ মজা লাগে এই শীতে আকাশের এক ফালি চিকন চাঁদ। অজস্র তারার মেলায় ঝুলে থাকা অনন্ত অন্ধকার ঝিলমিল করছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিমুল কোনো এক ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়ে।

একটাই ঘর। বেশ লম্বা। মাঝখানে কাঠের বেড়ার পার্টিশন দিয়ে দু'টো কামরা করা। কামরা দু'টোর যোগাযোগ রয়েছে দরোজার মাধ্যমে। শিমুল কোনোদিন দরোজার কপাট লাগায়নি। আজও। প্রথম দিকে একা একা থাকতে ওর ভয় ভয় হতো। খালাম্মা রাত বেরাতে মাঝেমাঝে দেখে যেতেন। এখন আর দরকার হয় না। ভয়টা কেটে গেছে।

বিরক্তিতে ঘুমের ঘোরেই শিমুল রেগে ওঠে। ধাক্কা খেয়ে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু ঘোর কাটেনি। ওর রাগ দেখে জলি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে আর তখনি অনেকটা চমকে গিয়ে শিমুল উঠে বসে। চোখ রগড়ে জলির দিকে বিরক্তির সাথে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর চৌকি থেকে নিচে নেমে আসে।

'কিরে, কোথায় যাস?'

'প্র'- লজ্জায় শিমুল কুঁচকে ওঠে। সে বাক্যটা শেষ না কোরে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। তলপেটে ভীষণ চাপ।

ঘুমের ঘোর আর থাকে না। ঘরে ফিরে শিমুল মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝে উঠতে পারে না, বালিশ দু'টো কেনো। হেরিকেনের আলোয় জলি'পার দাঁতগুলো কি সুন্দর ঝিকমিক করছে। বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে শিমুলের দিকে তাকিয়ে সে হাসছে।

'শুবি নে?'

শিমুল বুঝে উঠতে না পেরে জলির দিকে তাকিয়ে থাকে।

'কি রে, সবাই জানে তুই একটা আস্তো গোঁয়াড়! তা, কালা হলি কবে থেকে? উঠে আয়।' নিজের পা সরিয়ে জলি শিমুলকে জায়গা কোরে দেয়।

'তুমি যাও আগে।'

'যাবো মানে?' জলি আবার হেসে ওঠে। আমি এখানেই ঘুমাবো, বুঝলি বুদ্ধু? আর ঘর কোথায়? সারারাত দাঁড়িয়েই থাকবি. না শুবি? আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে। উঠে আয়।'

জলি হাই তোলে। হাত বাড়িয়ে শিমুলকে হাত ধোরে চৌকিতে টেনে নেয়। পাতলা চাদরটা যত্ন কোরে শিমুলের গায়ে টেনে দেয়। একাংশ নিজের কোমর পর্যন্ত টেনে জলি হেরিকেনের সলতা কমাতে কমাতে শেষ পর্যন্ত হারিকেনটা একদম নিভিয়ে ফেলে। অমনি ঘন অন্ধকারে ঘরটা তলিয়ে যায়। সুন্দর একটা গন্ধ। মিষ্টি আর ভারী। শিমুল বুঝতে পারে, গন্ধটা জলি'পার গায়ের। গন্ধটা লেবু ফুলের, না আতা ফুলের, শিমুল মেলাতে পারে না। ওর ভেতরটা সেই মিষ্টি গন্ধে শিরশির কোরে ওঠে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল, নাকি ঘুমের আবেশে জড়িয়ে যাচ্ছিল, শিমুল ঠিক কোরে ধরতে পারে না। সে এখন একদম জেগে আছে অথবা জেগে গেছে। জলির গায়ে কখন আর কি কোরে যে শিমুলের গা মিশে গেছে! ওর পেটের উপরে জলির হাত। শিমুল ভাবে, জলি'পা ঘুমের ভেতরে হাত তুলে দিয়েছে। সে জলির হাত সরিয়ে দিতে চায়। পারে না। আরো জোরে দেবে বসে সেই হাত। আলতো কোরে শিমুলের পেট চুলকিয়ে দেয় জলি, আদর কোরে হাত বোলায়। শিমুলকে সেই ফাঁকে আরো বেশি কাছে টেনে নেয়। শিমুলের সুড়সুড়ি লাগে। কিন্তু সেই সুড়সুড়িতে ওর এখন হাসি উঠছে না, বরং বিরক্তি আর এক ধরনের রাগ ফুঁসে উঠতে থাকে ওর ভেতরে।

জলি আচম্বিতে শিমুলকে বুকে চেপে ধরে; ঠোঁটে, গালে, গলায় চুমো খায়। ওহ্, নি:শ্বাস কি গরম! শিমুলের হৃদপিন্ড ধক কোরে লাফিয়ে ওঠে। জলির বুকের নরম মাংস ওর মুখে এসে চেপে বসে। জলি নিজের বুকে শিমুলের মাথা চেপে ধরে। জোরে। শিমুলের দম আটকে আসে। থরথরিয়ে কাঁপে সে। হঠাৎ ওর কি যে হলো ! যেনো গোটা শরীরের ভেতরে একটু একটু কোরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ উন্মাতাল ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। জলির পা' ওর পায়ের উপরে, হাতটা পেট থেকে নাভি, নাভি ছাড়িয়ে একদম লজ্জা স্থানে এসে যায়। মনে প্রচণ্ড ধাক্কা খায় শিমুল। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও পারে না। ঠিক হবে না ধরনের একটা বোধ ওর ভেতরে লতিয়ে ওঠে। ওর শরীর থরথরিয়ে কাঁপে, শুকিয়ে যায় গলা, ঠোঁট। সেই শুকনো ঠোঁটে জলির তৃষ্ণিত ঠোঁট। জলি সেই শুকনো ঠোঁট কি ভীষণ ভাবে চুষছে! হঠাৎ কোরে শিমুলের ভয় ভয় লাগে। অদ্ভুত অচেনা এক আতংকিত আবেশের ভেতরে ডুবে থাকা অবস্থায় ওর খুব তেষ্টা লাগে। সাথে হিসি। কিন্তু প্রথম দিকের খারাপ লাগা বোধটাও ওকে আর আগের মতো কোরে খামচায় না।

রুবিকে দেখা মাত্র শিমুল হাতের বাঁশি শার্টের তলায় ঢুকিয়ে ফেলে। বেঢপ হয়ে ফুলে থাকা বাঁশিটা চেপে দাবিয়ে ধীর পায়ে মাথা গুঁজে সে সামনে এগুতে থাকে। ঘামে ওর শার্ট ভিজে গেছে। চুল বেয়ে টপটপিয়ে ঘাম ঝরছে।

দবির কি কোরে যে এতো ভালো বাঁশি বাজায়! শিমুল অনেকদিন ধোরেই ওর পেছনে ঘুরঘুর করছে। এ বাঁশিটা দবিরকে দিয়েই সে কিনিয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ দবির কিছুই করছে না। নিজের প্রচেষ্টায় শিমুল বাঁশিতে ফুঁ দিতে শিখেছে। তা-ও ভালো হয় না। মাঝেমাঝে দবিরের উপর ওর খুব রাগ হয়। সারগামটুকু দবির কি দ্রুত বাজিয়ে ফেলে, কিন্তু একটু একটু কোরে শিমুলকে মোটেই শেখাচ্ছে না। অথচ আজ এক প্যাকেট বিড়ি কিনে দাও, কাল পাঁচটা পান– এই কোরে শিমুল ওর পেছনে বেশ কিছু টাকা ইতোমধ্যে খরচ কোরে ফেলেছে। অবশ্য দবিরের উপর রাগ হোলেও বাঁশি বাজনার উপর জেগে ওঠা নেশাটা ওর একতিলও কমেনি। এই বাঁশিই শিমুলকে রতনের ঠাকুমার নেশা থেকে বের কোরে এনেছিল।

খিনখিনে বুড়িটাও খটখটে শুকনো হাড্ডির মতো কিপ্টে আর শক্ত। দবিরের সাথে মিলে যায়। বুড়ি ফোকলা দাঁতে খ্যা খ্যা কোরে হাসে আর গল্প বলে। শিমুলকে কাছে পেলে বুড়ির গল্প বলার যেনো জোয়ার আসে, ফুরোতেই চায় না। অথচ আসল ব্যাপারে রা-শব্দ নেই, মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। রতনের মুখেই এই বুড়ির গল্প শুনেছিল শিমুল। বুড়ি নাকি দু'টো ভূত পোষে। মায়ের কথাটা তখন শিমুলের মনে পড়েছিল– 'ভূত বইল্যা কিছু নাই।' রতনের সাথে এ নিয়ে ওর অনেক তর্কও হয়। কিন্তু রতন চোখ বড় বড় কোরে গল্পটা বললো, সে নাকি কয়েকবার এই বুড়ি ঠাকুমার বিছানার তলা থেকে টাকা চুরি কোরে প্রতিবারই ধরা পড়েছে। কি কোরে? অবশ্যই তা একমাত্র ভূতেরই কাণ্ড। ঠাকুমা খুব মজা কোরে নাকি সে কথাই বলতো আর রতনের কান মলেদিত। রতনের কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও একদম ফেলে দিতে পারেনি শিমুল। কৌতুহলে একদিন সে বুড়িকে এক নজর দেখতে এসেছিল

মাত্র। আর সত্যি সত্যি বুড়ির ঘরের বারান্দায় সিঁদূর দেয়া দু'টো নারকেল দেখে শিমুল ভয়ে শিউরে উঠেছিল। সেই থেকেই হঠাৎ কোরে ওর মন্ত্র শেখার নেশা ধরে। ভূত পোষা মন্ত্র, সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্র, ব্যথা নাশ মন্ত্র, কোকশাস্ত্র মন্ত্র, বশীকরণ মন্ত্র– কত্তো কি, শিমুল বোঝেও না সব। ওর হাত দেখে সেই কবে একবার ময়েন কবিরাজ বলেছিল, ওর নাকি সাপে কাটা ফাঁড়া আছে, পড়া লেখাতেও নাকি মস্ত বড় ফাঁড়া। তাই সাপের মন্ত্র শেখাটা শিমুলের একান্তই দরকার। ময়েন কবিরাজের কথাটা শিমুল মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারে না।

শিমুলের নাকে দড়ি দিয়ে চার মাসে বুড়ি মোটে তিনটে মন্ত্র শেখালো। শিং মাছে কাটা ফুটালে বিষ ঝাড়া, ব্যথা নাশ আর সাপ তাড়ানো। আসল মন্ত্রের ধারে কাছেও বুড়ি ওকে ঘেঁষতে দেয় না। কিন্তু এরই মাঝে ওই লজ্জাকর ঘটনাটা ঘটে যায়।

রাস্তার পাশে খাদ। খাদ সেচে রাসেল মাছ ধরছিল। একসময় শিং মাছের কাটা ফোটে ওর বাঁ হাতের তর্জনী আঙ্গুলে। শিমুল তখন স্কুল থেকে বল খেলে বাড়ি ফিরছিল। মুহূর্তে ওর মন্ত্রের কথা মনে পড়ে যায়। আর অমনি ওর হৃদপিন্ডটা কিছুটা দ্বিধায়, কিছুটা লজ্জায় লাফিয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে শিমুল রাসেলের কাছে এগিয়ে যায়। মাটিতে বই খাতা রেখে রাসেলের বাঁ হাত টেনে নেয় শিমুল। বুকটা যে কি! এত্তো জোরে ধকধকিয়ে লাফাতে থাকে যে ওর খুব রাগ হয়।

মন্ত্র পড়ে শিমুল শিং ফুটানো আঙ্গুলে ফুঁ দেয়। তিন তিনবার। ওটাই নিয়ম। রাসেলের নির্বাক কিন্তু বেঁকিয়ে যাওয়া চোয়ালের দিকে চেয়ে শিমুল জিজ্ঞেস করে–'কমেছে?'

রাসেল যন্ত্রনায় কঁকিয়ে ওঠে, মুখ বেঁকিয়ে মাথা ঝাঁকায়, আর আগুনচোখে শিমুলের দিকে তাকিয়ে থাকে বিরক্তিতে।

শিমুল আবার মন্ত্র পড়ে, ফুঁ দেয়। গভীর আগ্রহ আর উৎকণ্ঠায় রাসেলের কাটাবেঁধা আঙ্গুলে চোখ রেখে সে আবার জিজ্ঞেস করে- 'কমেছে?'

রাসেল ব্যথায় নিশপিশিয়ে ওঠে। বিরক্ত হয়ে হেঁচকা টানে হাতটা সরিয়ে নিয়ে সে শুন্যে ঝাড়তে ঝাড়তে বলে–'ধুস!'

রাস্তায় কয়েকটা গলার সম্মিলিত খলবলিয়ে হেসে ওঠার শব্দ। শিমুল ঘাড় ফিরিয়েদেখে ছয় সাতজন ছেলেমেয়ে ওদের দিকে চেয়ে হাসছে।

শিমুলকে জেদে পেয়ে বসে। রাসেলের দিকে তাকিয়ে সে বেশ জোরে চেঁচিয়ে ওঠে– 'তুই মিথ্যে কথা বলছিস।'

রাসেল থমকে যায়। ব্যথায় কুঁচকে যাওয়া মুখ থমথমে। হঠাৎ কোরে সে দৌড়ে যায়। মাছ রাখার খালুই নিয়ে শিমুলের পাশে রেখে সে আচম্বিতে শিমুলকে চ্যালেঞ্জ জানায়, 'তোর হাতে কাটা ফুটা। তারপর বিষ নামিয়ে ফুটানি দ্যাখা। ভ্যানতারামি করার আর জায়গা পাসনে, না?

শিমুল রাসেলের কথায় থম হয়ে একটু ভাবে। কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব। শেষে সে খালুইয়ে হাত

ঢুকিয়ে দেয় এবং সামান্য পরেই ব্যথায় বেঁকিয়ে যাওয়া মুখের ঠোঁট কামড়ে সে হাত বের কোরে আনে। ওর অনামিকা আঙ্গুল চুইয়ে ফোটায় ফোটায় রক্ত ঝরছে।

রাস্তায় হাসির উত্তাল ঢেউ।

রাগে শিমুলের জেদ বহুগুন বেড়ে যায়। সাথে মিশে থাকা প্রচণ্ড লজ্জা। সে মন্ত্র পড়ে নিজের হাতে ফুঁ দেয়। ইতোমধ্যেই ব্যথাটা আঙ্গুল থেকে বুকের কোনায় ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। শ্বাস নেয়ার তালে তালে চিনচিনে ব্যথার তীব্রতা কেবলই বেড়ে চলেছে।

রাস্তায় আবারো হাসির দংগল, মেয়েগুলো কি ফাজিল! হাসতে হাসতে ওরা এর ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে, জড়িয়ে ধরছে।

'কিরে শিমুল, বিষ পানি হয়েছে?'

'মরিচ আনবো ওস্তাদ? একটু টেস্ট কোরে দেখতেন!'

'এই, ঠাট্টা করিসনে, শেষে আবার সাপ ভূত চালান না দেয়।' আবারো সেই উত্তাল হাসি। শিমুলের কাছাকাছি একটা ঢিল এসে পড়ে। খানিকটা কাদা ছিটকে এসে শিমুলের শার্টে লাগে। শিমুলের ভেতরে একটু একটু কোরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দানা বাঁধতে থাকে।

'মাইরি গুরু, পেন্নাম হই। একটু কামশাস্ত্র মন্ত্র শিখাইবেন?'

'কি ফাজিল ছ্যামরা, বেহায়া!'

'যাহ্, সেই কবে থেকে দাড়ি গোঁফ কামানোর রেওয়াজ চালাচ্ছিস দোস্ত, তবুও সেই ছ্যামরাই রয়ে গেলি? দোস্ত, পথটা বাত্‌লে ফেল।'

শিমুল মাথা নিচু কোরে বইখাতা নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। লজ্জায় সে রাস্তায় উঠে আসতে পারে না। ওহ্, কি ভয়ঙ্কর হাসি। শিমুল মাথা সোজা করতে পারে না। একবারও পেছন ফিরে তাকাতেও পারে না। সে হাঁটতে থাকে দ্রুত। অথচ পায়ে ছন্দ আসে না, জড়িয়ে পড়ে। এতে ওর রাগ দাউদাউ কোরে আরো বহুগুণে জ্বলে ওঠে।

সেদিন দুপুরে শিমুল খায়নি। আকাশউঁচু রাগ নিয়ে সে রতনের সেই বুড়ি ঠাকুমার সামনে গিয়ে হাজির। রেগে রেগেই বুড়িকে ঘটনাটা জানালো। সব শুনে বুড়ি মিটমিটিয়ে হাসে। 'সাধনা না করলে কোনো মন্ত্রই কাজ করে না ভাই।' বুড়ি হাসতে হাসতে অদ্ভুত গলায় শিমুলকে শান্ত করার প্রয়াস চালায়।

শিমুল তেড়ে ওঠে। এদিক ওদিক তাকায়। একদৌড়ে কয়েকটা ভাট পাতা ছিঁড়ে এনে বুড়ির দিকে ছুঁড়ে মেরে বলে, 'অবিশ্বাস আর সাধনা না কোরে খেয়ে দেখো তিতে লাগে কি না!

বুড়ি হতভম্ব। এমন কোরে আক্রমণ আসবে, সে ভাবতেও পারেনি। বুড়ি বেশ গম্ভীর হয়ে পড়ে। শেষে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে সে ফোকলা দাঁতে হাসে। হেসে হেসে বলে, 'শোনো ভাই, এই সব মন্ত্রফন্ত্র শিখতে নাই। তাতে মনে জোর থাকে না। যার মনে জোর নাই, জীবনে তার কিচ্ছু হয় না।'

মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে বুড়ির বকবকানি শুনেছিল শিমুল। তারপরই কোনো কথা না বোলে চলে এসেছিল। ফেরার পথে নারকেল দু'টোর উপর ওর চোখ পড়ে। জেদটা সাথে সাথে ওর সারা শরীরে তিরবিরিয়ে লতিয়ে ওঠে। মায়ের কথাটা নতুন কোরে ওর মনে পড়ে– 'ভূত প্রেত বইলা কিচ্ছু নাই।' ছোঁ মেরে শিমুল নারকেল দু'টো দুই হাতে তুলে নেয়। তারপরই ভোঁ দৌড়।

সেই শেষ। শিমুল আর কোনোদিন ওপথ মাড়ায়নি। তারপরই ওকে বাঁশির নেশায় পেয়ে বসে। কেউ যখন সুন্দর কোরে বাশিঁ বাজায়, শিমুল তখন সেই সুরের সাথে ঝাঁকে ঝাঁকে ধবল জোছনামাখা অযুত নিযুত কবুতরের বাকবাকুম ডাক শুনতে পায়। তখন ওর মনটাও হুট কোরে গাঁয়ের বাড়ি চলে যায়।

রুবি হেসে ফেলে। পায়ে পায়ে সে শিমুলের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করে- 'শার্টের নিচে কিগো বেয়াই সাব?'

লজ্জায় শিমুলের মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে।

'বাঁশি।' সে মুখ নিচু কোরেই জবাব দেয়। এই মেয়েটাকে লজ্জা হোলেও শিমুলের বেশ ভালোই লাগে। সব সময় কেমন হাসি হাসি মুখ!

'বাঁশি!' আশ্চর্য হয়ে ওঠে রুবি। 'বাজাতে পারেন নাকি? হায় হায়, আপনি এদিকে রাই সেজে বিনোদিনীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর আমি আপনার আশায় পথ চেয়ে প্রহর পার করছি গো! তো, শোনান না একটু আপনার মোহনীয় বাঁশির প্রেমময় বারতা!'

শিমুল বাঁশি বের কোরে হাতে নিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। রুবি হেসে ফেলে। প্রশ্রয়ের হাসি। 'বুঝেছি, এখনো শিখে ওঠেননি। বাড়ি যান বেয়াই, রোদে ঢু ঢু কোরে অসুখ বাঁধালে এই ভর রোদে কিন্তু কোন রাধাই আপনার পদতলে এসে সেবার আসনে বসবে না। শেষে আপনার বড়'পাকেই বসতে হবে।'

শিমুলকে পাশ কাটিয়ে হাসতে হাসতে রুবি চলে যায়। শিমুল হাঁপ ছাড়ে। কিন্তু নতুন একটা ধন্ধ ওকে পেয়ে বসে। রুবির উপস্থিতি বাতাসে ভুরভুর করা কাঁঠালি ফুলের মতো গন্ধ জানান দিচ্ছে। এমন সেন্ট জলি'পা ওকে একবার মাখিয়ে দিয়েছিল। শিমুল পেছন ফিরে রুবিকে দেখে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে চুলগুলো ঝলমল করছে। সে আজ শাড়ি পরেছে। শাড়ির রঙটা কি সুন্দর। একই রঙয়ের ব্লাউজ। রুবি মোটেই পড়'পার মতো সুন্দর না। তবুও মাঝে মাঝে ধন্ধ লাগে ওর। খুব সুন্দর কোরে যখন কেউ শাড়ি পরে, সাজগোছ করে, তখন কেনো যেনো শিমুল এক ধরনের ধন্ধে জড়িয়ে পড়ে। শুধু বড়'পার সাথে ওর তুলনা এসে যায়। শিমুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বড়'পার এতো সুন্দর কোনো শাড়িই নেই। কোনোদিন সেন্টও মাখে না বড়'পা। তেমন সাজগোছও করে না। অথচ রুবিরা, জলি'পারা সব সময় কি সুন্দর কোরে সেজে গুজে থাকে। কাপড় চোপড়ও মাঝেমাঝে কেমন কোরে পড়ে।

বাড়িতে ঢুকে শিমুল হকচকিয়ে গেলো। বারান্দায় উত্তরমুখি হয়ে বড়পা' বসা। মুখোমুখি দক্ষিনমুখি হয়ে বকুল স্যার বোসে আছেন। খালাম্মা পাশে। বুবলি মায়ের গা ডলছে। সামনে এগিয়ে যাবে, না পিছিয়ে আসবে, শিমুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ওকে বাঁচিয়ে দেয় বুবলি। শিমুলকে দেখে 'শিমুল ভাইয়া' বোলে দৌড়ে আসে। তখনই শিমুলের মনে পড়ে, বুবলির জন্যে আজ চকোলেট আনা হয়নি। ও বুবলিকে কোলে নিয়ে পুকুর ঘাটে চলে যায়। ছাড়া পেয়েই বুবলি পালিয়ে আসে। শিমুল পানিতে পা ডুবিয়ে হাতমুখ ধোয়, বাঁশিটাও ভিজিয়ে নেয়। হাতমুখ ধুয়ে ধীরে সুস্থে বাতাবীলেবু গাছের ছায়ায় ওর নিজের হাতে বানানো বাঁশের চটার খাটে বিছানো পাটিতে সে গা এলিয়ে দেয়। এখান থেকে বারান্দার সব কথাই শোনা যায়। শিমুলের খুব ইচ্ছে হলো, বেড়ার ফাঁক দিয়ে বারান্দাটা একবার দেখে নিতে। কিন্তু ওর খুব আলসেমী লাগছে। সে চিৎ হয়ে গাছের বাতাবী লেবু গুণতে শুরু করে। শিমুল মাঝেমাঝেই নিজে নিজে এই বাতাবী লেবু গোনার খেলায় মেতে ওঠে। গাছের ডালের ফাঁক গলিয়ে দুরের নীল আকাশ দেখা যায়। সে মাঝেমাঝে অপলক চোখে সেই নীলের গভীরে তলিয়ে থাকে।

'আমার থেকে কাজ নেই, তোমরা মন খুলে কথা বলতে পারছো না।' খালাম্মার গলা। শিমুলের কান জেগে ওঠে। বাতাবী লেবু গোনায় ওর বারবার ভুল হতে থাকে।

'তোমরা ছোটো নও। জীবনকে ভালো কোরেই বুঝতে শিখেছো। এখন বুঝে শুনে নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত নাও। আমি বরং চা বানিয়ে আনি। তবে, দুইজনকেই একটা কথা বলি, বলতে পারো এ আমার অভিজ্ঞতার সার-সংক্ষেপ। বুদ্ধি বিবেচনার কাজ আবেগ দিয়ে করতে যেয়ো না, করলে অধিকাংশ সময়েই ফলাফল ভালো হয় না।'

এতোক্ষণে শিমুল শুয়ে থেকেই খালাম্মাকে দেখতে পেলো। পাশে বুবলি। খালাম্মা রান্না ঘরে যেতে উঠোনে নেমে এসেছেন। শিমুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, রোদে টো টো কোরে কি কামাই কোরে এলি, হিসাব না দিয়ে ঘুমাসনে কিন্তু! আমি চা বানাচ্ছি।

বাতাবী লেবু গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে পশ্চিম দিগন্তে নূয়ে থাকা আকাশের খানিকটা চোখে পড়ে। শিমুল মেঘ-রোদের খেলায় কুণ্ডলী পাকানো থোকা থোকা মেঘের পাহাড়ে চোখ রেখে হাই তোলে। ঝিরঝিরে বাতাসে সত্যিই কেমন ঘুমঘুম আবেশে ওর চোখজোড়া জড়িয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু সেখানে তীব্র একটা নরম ঘাঁই দিয়ে ঢেউ ছড়িয়ে দেন বকুল স্যার– 'ইদানিং মা খুব তাগাদা দিচ্ছে। তোমার সাথে দুই-একদিনের মধ্যেই কথা বলার জন্যে মা বোধহয় এখানে আসবে।'

শিমুলের মনে হলো, বড়'পার গলায় কান্নার একটা দলা আটকে আছে। সে উঠে আসে খুব ধীর পায়ে। শিমুল স্পষ্ট ভাবে বড়'পার গলা শুনতে পায়– 'বকুল, তুমি আমাকে যতোই স্বপ্ন দেখাও না কেনো, আমার কিন্তু নতুন কোরে কিছু বলার নেই।'

'মানে?' বকুল স্যার একটু নড়ে বসেন।

শিমুল নি:শব্দে বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখে। বড়'পার মাথাটা মাটির দিকে ঝুলে আছে।

'আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' লীনা হাসতে চেষ্টা কোরেও পারে না।

পকেট হাতড়ে বকুল স্যার সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেটটা হাতে রেখেই বললেন. 'তা' না হয় বুঝলাম। কিন্তু কেনো?'

'সেতো তুমি জানোই।'

'ওসব কোনো কারণ নয় লীনা। আমার দিকটা কি তুমি একটুও ভাববে না লীনা? এটা কিন্তু তোমার ঠিক হচ্ছে না।'

লীনা মাথা উঁচিয়ে টিনের চালে চেয়ে থাকে। দৃষ্টিটা ভীষণ এলোমেলো। 'তুমি যদি আমার অবস্থানে থাকতে, তাহলে তোমার বোনদেরকে ঠেলে ফেলতে পারতে? ছোট্ট ভাইটাকে? মাকে?'

'ওভাবে বলো না লীনা, প্লীজ! যারা তা' পারে, তারা সত্যিকারের মানুষ না।'

'তাহলে?'

'তাহলে আবার কি? আমি তো বারবারই বলছি, ওদের দায়িত্ব তুমি আমি– আমরা ভাগ কোরে নেবো। তুমি আমার এই সহভাগিতার কোনো দামই দিচ্ছো না। এটা ঠিক নয় লীনা!'

লীনা হাসে কিন্তু সেই হাসিতে কেবলই বেদনা ঝোরে পড়ে। সেই বেদনার বিষন্ন আলো তার চোখে-মুখে। ভীষণ শান্ত গলায় সে বলে, 'শুনলে না খালাম্মা বোলে গেলো, বুদ্ধি বিবেচনার কাজ আবেগ দিয়ে করতে নেই।'

'আমি মোটেই আবেগের বশে কথা বলছি না।'

'ফস' কোরে ম্যাচ জ্বাললেন বকুল স্যার। সিগারেট জ্বালিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন চিকন কোরে। ট্যা ট্যা কোরে দু'টো মাছরাঙা পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেলো। চমকে যায় শিমুল। সে তাড়াতাড়ি বাঁশের খাটে এসে বসে। কিন্তু কান দু'টো তার সজাগ থাকে। বকুল স্যারের গলায় কিছুটা ক্ষোভ, কিছুটা হতাশা।

'বকুল, তুমি একটা কথা একদম বুঝতে চাইছো না। আচ্ছা বকুল, নিজে তুমি পুরোপুরি স্বাধীন? তোমার মায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে তুমি কি অনেকাংশে অঙ্গীকারাবদ্ধ নও? এটাই স্বাভাবিক, তাইনা?'

ঘনঘন ধোঁয়া ছাড়েন বকুল স্যার। ঝুলে থাকা ধানীরঙা রোদ থেকে চোখ সরিয়ে তিনি লীনার চোখে চোখ রেখে বললেন- 'তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

শব্দ কোরে লীনা হেসে ওঠে। বাঁ হাতের চুড়িতে হালকা শব্দ হয়। হাসতে হাসতেই বলে, 'বুঝতে পারলে না মানে? আমি বুঁজি হিব্রু ভাষায় কথা বলছি?'

'অনেকটা তাই। ভাষা তোমার বাংলা হোলেও অর্থটা হয়তো হিব্রু ভাষার চেয়েও জটিল। ওভাবে না হেসে ভনিতা রেখে খুলে বলো।'

'একটু আগেই তুমি বলছিলে না, মা তোমাকে তাগাদা দিচ্ছে।'

'সেটা কি মায়ের ভুল?'

লীনা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ হয়ে যায়। কেউ কোনো কথা বলে না কিছুক্ষন। লীনাই আবার শুরু

করে, 'মা মাঝেমাঝে আমাকেও অমন কোরে তাগাদা দেয়, রাগও করে। একবার তো মা রাগ কোরে পুরো একটা দিন ভাতই খায়নি। আমার সাথে একটা কথাও বলেনি।'
'উনি একদম ঠিক কাজই করেছিলেন। তিনিতো মা, মেয়ের কথা তাকে ভাবতেই হয়। আসলে তুমি একটু বেশি মাত্রায় জেদী, সেন্টিমেন্টাল।'

লীনা চুড়ির শব্দের মতো মুখে শব্দ নিয়ে আবারো হেসে ওঠে।

'সে-ও ভালো যে তুমি আমাকে আত্মত্যাগী বা অহংকারী বলোনি।'

'এতো সহজ কোরে কিভাবে যে তুমি হাসতে পারছো, লীনা!' বকুল স্যারের গলায় এবার ঝাঁজের তাপ ঝোরে পড়ে।

'বারে, পরে যদি সুযোগ না পাই?'

লীনার হাসি থামে না।

বকুল স্যার মন:ক্ষুন্ন হন। গলার স্বরে তা' আর চাপা থাকে না।

'সব কিছুতে তোমার হেঁয়ালী। সক্রেটিস কম দু:খে সেই বিখ্যাত কমেন্টটি করেননি!'

বুবলি বারান্দায় উঠে আসে। টালুমালু কোরে সে লীনার দিকে চেয়ে থাকে। বুবলি কি মনে কোরে আবার উঠোনে নেমে পড়ে এবং রান্না ঘরের দিকে হঠাৎ কোরে ছুট দেয়। ওইদিকে উদাস হয়ে চেয়ে থেকে লীনা বললো, 'বকুল, আমার জীবনটাই বাবা মারা যাবার সাথে সাথে হেঁয়ালীর অচেনা এক গোলক ধাঁধায় আটকা গ্যাছে, কি করবো বলো!'

'কথার প্যাঁচ কষা থামাবে?'

'তথাস্তু!' লীনা হাত জোড় করে এবং তার ঠোঁট থেকে হাসিটুকু একটু একটু কোরে মিলিয়ে যায়। সেখানে এসে ভিড় জমায় নিকষ আঁধার।

'আমি পরাধীন হলাম কি কোরে?' বকুল স্যার একটু নড়ে বসলেন।

'আমি বুঝি তাই বলেছি?' লীনা এতো কথা বলছে কিন্তু তার ঠোঁট থেকে হাসিটা একটুও সরছে না। তবে চোখের তারায় তার নেই কোনো উচ্ছাসের নাচন।

'বাদও রাখোনি।' বকুল স্যার যে মনক্ষুন্ন হয়েছেন তা তার গলার স্বরে স্পষ্ট।

সামান্য ভাবলো লীনা। তারপর বকুল স্যারের দিকে সরাসরি চোখ তুলে তাকালো।'আচ্ছা বকুল, তুমি তোমার ভাইবোন, মাকে, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে যে কোনো প্রয়োজনে পুরোপুরি অবহেলা করতে পারবে?'

'তুমি কি তাতে খুশি হবে?' কোনো ভাবনা চিন্তা ছাড়াই তিনি জবাব দিলেন।

'ছি বকুল, আমি তাই বুঝাতে চাইনি।'

বকুল স্যার স্থির চোখে লীনাকে দেখেন।

'না।'

'কেনো?'

'সেটা হবে অমানবিক। দায়িত্ব বলতে একটা কথা আছে।'

'হ্যাঁ, এই দায়িত্ববোধটাই হলো আসল কথা। আসলে এই দায়িত্ববোধের কাছে তুমি-আমি ভীষণভাবে বন্দী। বন্দী মানেই এক ধরনের পরাধীনতা। আমি যখন তোমাদের সংসারে ঢুকে পড়বো, তখন তোমাদের পারিবারিক কর্তব্যবোধ আমাকেও সীমাবদ্ধ কোরে ফেলবে। ওটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বকুল, আমি যে একটা অস্বাভাবিক সংসারের কাছে দায়বদ্ধ! এতোবড় স্বার্থপর হ'বার লোভ তুমি আমাকে দেখিও না বকুল, প্লিজ! বিশ্বাস করো, আমার ভীষণ কষ্ট হয়। আমার সেই কষ্টটার কথা তুমি একটুও ভাববে না?'

বকুল স্যার প্যাকেট থেকে আবার সিগারেট বের করেন। অন্যদিনের মতো লীনা আজ আর এতো ঘনঘন সিগারেট না খাওয়ার জন্যে বকুল স্যারকে কোনো ধম্‌কি-ধাম্‌কি করলো না। বকুল স্যার সিগারেট না জ্বালিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বৃদ্ধাঙ্গুলের নখে সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বলেন, 'আসলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না।' কিন্তু লীনা, জীবনের জটিল আবর্তে তোমাকে কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতেই হবে। মানুষ কিন্তু শখ কোরে সামাজিক হয়নি, হয়েছে সে তার আপন প্রয়োজনে, বাধ্য হয়ে।

'তুমি আংশিক ঠিক বলেছো বকুল, এটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়; প্রশ্নটা প্রয়োজনের। প্রশ্নটা ব্যক্তিত্বের। আমার ভাই বোনরা কোনো দয়ার মাঝে ভেসে বড় হোক, এটাতো আমি মেনে নিতে পারি না। পারি? তুমি নিজে হোলে পারতে? জানি পারতে না। কারণ ওই একটাইজ্জ প্রয়োজন। অবশ্য প্রয়োজনটা একেক জনের কাছে একেক রকম, এই যা।

জবাব দিতে গিয়েও বকুল স্যার চুপ হয়ে যান। খালাম্মার হাতে চিড়ে ভাজা, কেটলীতে চা। বুবলি মায়ের আঁচল ছেড়ে দৌড়ে এসে শিমুলের হাত ধোরে টানাটানি শুরু করে, 'তা খাবে, তলো। মা দাকে, তলো না!'

শিমুল বুবলির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বারান্দার দিকে হেঁটে আসে। সূর্য ডুবিডুবি করছে। গাছের উঁচু ডালে, পাতায় পাতায় শেষ রোদ ঝিলমিল করছে। শিমুল রোদের দিকে চেয়ে থাকে। ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, স্যারকে এতোক্ষণ পরে সালাম জানানো দরকার কি না। তাছাড়া ওর একটু লজ্জাও হচ্ছে।

বকুল স্যারই ওকে বাঁচিয়ে দেন। একই জায়গায় একটু নড়ে বসতে বসতে তিনি হেসে বললেন, 'উঠে আসো। তো, পরীক্ষা কেমন হয়েছে?'

শিমুল বারান্দায় গিয়ে বড়'পার পাশে বসে। কেনো যেনো বড়'পাকেও ওর লজ্জা লজ্জা লাগছে। বুবলিকে পাশে বসিয়ে শিমুল মাথা নিচু কোরেই জবাব দেয়, 'ভালো।'

'ফার্স্ট প্লেস থাকবে তো?'

শিমুল জবাব না দিয়ে বুবলির আঙ্গুল ফুটাতে থাকে।

বকুল স্যার চিড়ার প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'নাও। তো, অংকে নিশ্চয় লেটার থাকবে?

শিমুল বুবলির ছোট্ট হাতে চিড়ে দিতে দিতে মাথা নাড়ে।

'স্কলারশিপ দেবে না?'

শিমুল বড়'পার দিকে তাকায়।

লীনা কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলে, 'দেবে না কেনো? স্কলারশিপ পেলে আমার তরফ থেকে একটা ঘড়ি পাবি।'

তিন তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ শেষ কোরে শিমুল বুবলিকে নিয়ে আগের জায়গায় ফিরে যায়। খালাম্মাও কাপ আর কেটলী নিয়ে রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকে। বুবলি কি যেনো বলে শিমুলের থুত্নী নেড়ে। কিন্তু শিমুলের ওদিকে খেয়াল নেই। ওর কান বারান্দায়।

'ওকে এখানে আর রাখা যাবে না। হোস্টেলে দেবো। রানুকেও। বাড়ি থেকে বর্নী কাছেই। মাঝে মাঝে মা গিয়ে দেখে আসতে পারবে।

শিমুলের বুক ধড়ফড়িয়ে ওঠে, সে চমকে যায়।

'এখানে অসুবিধাটা কি?' বকুল স্যার সিগারেট জ্বালতে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়েছেন। কিন্তু সেই কাটি তার হাতেই জ্বলতে থাকে। তিনি অবাক হয়ে লীনার দিকে তাকান।

'এখানে ওর অনেক আজেবাজে বন্ধু জুটে গেছে। সাত্তারের সাথেও একটা ভাব হয়ে গেছে। আরো একটা সমস্যা হয়েছে। তাছাড়া ওখানকার স্কুলটাও তুলনামুলকভাবে ভালো।

'তোমার তো তা'হলে ঝামেলা কমলো।' তিনি নতুন একটা কাঠি জ্বাললেন।

'ঝামেলা বলছো কেনো?' লীনা চোখ তুলে তাকায়। 'বকুল, দায়িত্বটা কিন্তু কেউ আমার ঘাড়ে জোর কোরে চাপিয়ে দেয়নি।'

'তোমার এই এক সমস্যা, খালি তর্ক কর। কই আমি একটু জোক করলাম আর সেটা তুমি কারণ কোরে নিচ্ছ। সে যাকগে, তুমি মত পাল্টাচ্ছো তো লীনা?'

'বকুল, আরো পাঁচটা মেয়ের মতো আমারও স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে হয়, ঘর বাঁধতে ইচ্ছে জাগে, সাধ হয়। কিন্তু বকুল, তবুও আমি নিরুপায়। কেনো বারবার প্রলোভন দেখাচ্ছো? আমি আমার মত পাল্টাতে পারলে আমিই বোধহয় পৃথিবীর সবচে' সুখী নারী হতাম। কিন্তু বকুল, স্বাধীন মন ছাড়া প্রেম ভালোবাসা কি ফুল পাখির নীল আকাশের গভীরতায় কাঙ্খিত তৃপ্তি পেতে পারে? পারে না। প্লিজ বকুল, অন্তত তুমি আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো।'

লীনার কণ্ঠস্বর শেষ দিকে রুদ্ধ হয়ে যায় অনুচ্চারিত অনুভবের উথাল পাথাল উচ্ছ্বাসে। কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস উপচে পড়ছে তার চোখে, মুখে, ঠোঁটে, এমনকি হাতের আঙ্গুলেও।

বকুল স্যার সিগারেটটা উঠানে ছুঁড়ে ফেলেন। একটা মুরগি দৌড়ে এসে ঠোকর দেয়। তারপরই কিছুটা সরে দাড়ায়, মাটিতে ঠোঁট ঘষে। কিছুটা সময় নিয়ে শেষে তিনি বললেন, ' 'তা'হলে মাকে আমি আরো কিছুদিন পরেই আসতে বলি,কি বলো?'

'বারে, মাকে তুমি কি বলবে না বলবে , আমি তার কি জানি! বকুল, ঘটকালী করবো?'

আবারো চমকে ওঠে শিমুল। ঘটকালী শব্দের অর্থ তার জানা আছে। হঠাৎ কোরে আপাকে বদলে যেতে দেখে ও খুব অবাক হয়ে যায়।

'তুমি কি, লীনা!' বকুল স্যারের গলায় ক্ষোভ।

লীনা হাসে। কিন্তু সেই হাসিতে শব্দ নেই। যেনো সে অচেনা দ্বীপের কোনো এক দূরবর্তী বাসিন্দা। পরিবেশকে হালকা করার জন্যে বকুল স্যারের প্রশ্নোত্তরে সে বলে, 'আমি কি? কেনো, আমি খুব সাধারণ একটা মেয়ে।'

ফ্যালফেলিয়ে বকুল স্যার লীনার দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'আমার অতো তাড়া নেই। তুমি আরো ভালো কোরে ভেবে দ্যাখো। দরকার হোলে তুমি তোমার মায়ের সাথে এ নিয়ে একবার আলাপ কোরে দ্যাখো।'

লীনার হাসি মিইয়ে যায়। সে উঠোনের দিকে তাকিয়ে থেকে বেশ গম্ভীরভাবে বলে, 'আর ভাবাভাবি! সুদূর ভবিষ্যতের কথা জানিনে, তবে অদূর ভবিষ্যতে কিছু হবে না। মা ওই দিন রাগ কোরে কিছু খায়নি ঠিকই, কিন্তু আমি ঠিকই জানি, আমার সিদ্ধান্তে মা সেদিন চূড়ান্তভাবে খুশিই হয়েছিল। অবশ্য আমি তাকে এজন্যে কোনো দোষও দিইনে। এটাই তার জন্যে ঠিক ছিল। এছাড়া তার তো ভিন্ন কোনো পথও নেই।

'কিছু মনে কোরো না, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?' বকুল স্যারের গলা একদম তলিয়ে যায়। হঠাৎ কোরেই তিনি সম্পূর্ণ নতুন প্রসঙ্গে কথা বললেন– 'আচ্ছা লীনা, তুমি কি কনজুগাল লাইফ সম্পর্কে কোনো পেনিক ফীল করছো?'

থমকে তাকায় লীনা। থমথমে চোখমুখ। শেষে ফিক কোরে হেসে ওঠে।

'আমি স্বয়ংপূর্ণ এবং পুরোপুরি সুস্থ্য এক নারী। ওসব থাক। তুমি আর কোথাও বিয়ে করো, বকুল। মেয়ে দেখবো?'

বকুল স্যার এবার রেগে যান। থমথমে মুখ। তিনি সিগারেটের প্যাকেটটা নেড়েচেড়ে আবেগকে চেপে রেখে শব্দ কোরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লীনার দিকে তাকালেন।

'ওটা একান্তভাবেই আমার বিবেচনার বিষয়।'

'তুমি কিন্তু রেগে গ্যাছো বকুল!' লীনার গলা বেশ মিইয়ে আসে।

'আমি কিন্তু রোবট নই, লীনা।'

'আমি আবার অনেকটা তাই। বকুল, পারো তো অন্তত: এ কথাটা বিশ্বাস কোরো, এই রোবটটার একটা মস্তিষ্ক আছে, যেখানে ভালোবাসার সুক্ষ্ম জগতে একটা পচা কাঁটা নিরন্তর খচখচিয়ে বিঁধেই যাবে বাকী সারাটা জীবন ধোরে। বকুল, তোমাকে আমি সত্যিই শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। সে কারণেই পচা কাঁটার দংশিত নীল অস্তিত্বটুকুকে আমি আমার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে মেনে নেবো। তাই, তোমার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছিনে।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বকুল স্যার ঘড়ি দেখলেন। নি:শব্দে উঠে দাঁড়ালেন। লীনাও। দু'জনেই উঠোনে

নেমে আসে। বিষাদের একটা মিহি পর্দায় দুইজনই ঢেকে আছে।

লীনা অপরাধীর মতো নিচু গলায় বললো, 'আজ আমি এখানেই থাকবো। কাল ন'টার দিকে বাড়ি রওনা দেবো।

নিজের চুলে আঙ্গুল দিয়ে ব্যাকব্রাশ করতে করতে বকুল স্যার খোলা আকাশের দিকে তাকান, সেখান থেকে সরাসরি লীনার চোখে।

'মাকে আমি আসতে নিষেধ কোরে দিচ্ছি, কি বলো?'

'আমাকে যে তা'হলে সত্যি সত্যি বদলীর প্রেয়ার দিতে হবে, বকুল।'

বকুল স্যার আর একটিও কথা না বোলে উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় উঠে গেলেন। লীনা ছলোছলো চোখে, গোধূলীর বিষন্নতার বিষফোঁড় বুকে ধারণ কোরে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে বকুল স্যারের চলে যাওয়া দেখে।

শিমুলের বুকটা ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে। সে বোবার মতো ফ্যালফেলিয়ে আপার দিকে কেবল চেয়েই থাকে।

বিকু সাত সকালে এয়ার গান নিয়ে হাজির। প্রায় আট মাস পরে গত সন্ধ্যায় শিমুল বাড়ি এসেছে। ওর কাছে সব কিছু কেমন নতুন লাগে। পরিবর্তণের স্পষ্ট একটা ছাপ সব কিছুতে। কাঠের পুল এখন পাকা। পুল পেরিয়ে রাস্তাটা যেখানে গিয়ে মিশেছে, বিকু আর শিমুল সেখানে একটা বটগাছ লাগিয়েছিল। ওটা কত্তো বড় হয়ে গেছে। শিমুল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। বিকুর আচরণেও সে কম অবাক হয় না। ও আরো বেশি বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। ফাজিল ফাজিল ইশারা কোরে হি হি কোরে হাসে। শিমুলের চোখ মুখ সেইসব কথায় লাল হয়ে যায়। সেই যে রাতের কথা– জলি'পার ঘটনাটা, লজ্জায় কেঁপে ওঠে শিমুল। ঘটনাটা ভাবতে এখন ওর এক ধরনের ভালো লাগে। বলা যে ঠিক হবে না, তা বুঝতে পেরে ঘটনাটা সে বিকুকে বলে না ঠিকই, কিন্তু বলার জন্যে ওর ঠোঁট নিশপিশ করে।

শিমুলের মন এতোক্ষণে সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে ওঠে। জামরুল গাছ তিনটি নেই। পাশেই খুব বড় একটা কাচামিষ্টি আম গাছ ছিলো। আম বরাবরই কম ধরতো, তবে খুবই মিষ্টি। সেই আমগাছটিও নেই। জায়গাটা একদম নেংটো হয়ে আছে। শিমুলের ভেতরটা সেই শূন্যতায় হু হু কোরে ওঠে।

"কক-ক-কক-ক," শিমুল চমকে তাকায়। কয়েকটা সাদা পালক ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। পেছনে পেছনে কিছু দূর ছুটে যায় বিকু। শেষে হতাশ হয়ে থেমে পড়ে। জায়গা মতো লাগেনি। এয়ার গানটা শিমুলের হাতে সে বেশ হতাশ হয়েই এগিয়ে দেয়।

বাগানের পশ্চিম পাড় ঘেঁষে মরা খাল। ওপারে ফসলের ধূ ধূ মাঠ। এপারে আম বাগান। খালের পাড় ঘেঁষে একটা পেঁপে গাছ। গাছে মাঝারি আকারের একটা পাকা পেঁপে। কি চমৎকার লালচে-হলুদ রঙ ধরেছে একটা পেঁপের গায়ে! সেই পেঁপের উপর বসেই বুলবুলিটা ঝুটি নেড়ে ঠুকরে ঠুকরে পেঁপে খাচ্ছে। বাম চোখ বন্ধ কোরে শিমুল বুলবুলিকে নিশানা করে। চোখে সূর্যের ছটা এসে লাগাতে সে সামান্য বাঁয়ে সরে যায়। শুকনো পাতায় পা পড়াতে খচখচিয়ে শব্দ ওঠে। পাখিটা সেই শব্দ গ্রাহ্যই করলো না।

শিমুল গুলি ছোঁড়ে। গুলিটা কোনদিক দিয়ে গেলো, শিমুল বুঝতেই পারলো না। বুলবুলিটাও ফিরে তাকালো না কোনো দিকে। শিমুল আবার গুলি ভরে, ট্রিগার টানে। আবার। পঞ্চমবারের মাথায় খাওয়া বন্ধ কোরে বুলবুলিটা থমকে যায়। এদিক ওদিক তাকায়। তারপরই দে উড়াল।

টিয়েটা কেনো যে বেলগাছে এসে বসেছিল, শিমুল তা' কখনোই বুঝে উঠতে পারে নি। ওর হাত নিশপিশ করে। আজই প্রথম এয়ারগান হাতে নিয়েছে। সে সন্তর্পণে ভালো একটা পজিশন খোঁজে টিয়েটাকে চোখে চোখে রেখে। এয়ার গানের নলের হাত তিনেক দূরে কয়েকটা পাতার মাঝখান দিয়ে ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে আরো কিছুটা দূরে ডাল গলিয়ে অন্য একটা ফাঁক বরাবর শিমুল টিয়েটাকে নিশানা কোরে ট্রিগার টেপে।

টিয়েটা কোনো শব্দই করতে পারলো না। শুধু দু'পা দিয়ে ডাল আঁকড়ে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে। শিমুলের সাত আট হাত সামনে মটকিলা গাছের উপরে ডানা মেলে টিয়েটা পড়ে যায়। ওহ্, কি আনন্দ! খুশিতে শিমুলের বুক লাফিয়ে ওঠে। বিকু দৌড়ে গিয়ে টিয়েটা ধোরে আনে।

কি সুন্দর! বুকের ভেতরে বিজয়ের যে গান বাজছে, ঠিক তারই মতো সুন্দর টিয়েটা। টুকটুকে লাল বাঁকানো ঠোঁট। কচি কলাপাতা রঙয়ের পালকগুলো কি নরম! গুলি কোথায় লেগেছে, দেখার জন্যে শিমুল ডানা মেলে ধরে। টিয়েটা খুব নিচু গলায় ট্যা ট্যা কোরে ওঠে, ডানা ঝাপ্টায়। সাথে সাথে কয়েকটা পালক খসে পড়ে। বুকের কাছটা রক্তে জবজবে হয়ে গেছে। হঠাৎ কোরেই টিয়ের চোখ দু'টো শিমুলের চোখে পড়ে। আর কেনো যেনো, তক্ষুণি ওর মনটাও খুব খারাপ হয়ে ওঠে। একটা কষ্ট বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। টিয়ার চোখে কি মায়াবী আর করুণ চাহনী! বিকুর হাতে এয়ারগান দিয়ে শিমুল টিয়েটাকে গাছের ডালে বসিয়ে দেয়। টিয়েটা ডানা ঝপ্টায়। শেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু উড়তে পারে না। সামনেই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। নড়াচড়াও নেই। শিমুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে কয়েক মুহূর্ত অপলক ভাবে চেয়ে চেয়ে টিয়েটাকে দেখে।

'ল বিলে যাই।' সাথে সাথে কি যোনো মনে পড়লো বিকুর। সে মত পাল্টে আবার বলে, 'না থাক, ল মোল্যাগো বাঁশ ঝাড়ের খাদে যাই। হেনে অনেক ডাহুক আছে।'

শিমুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার ভালো লাগছে না, বাড়ি যাই চল।'

বিকু 'থ' মেরে শিমুলের দিকে তাকায়।
'মুন্সী চাচারে এতো কইরা পটাইয়া এয়ার গানডা আনলাম, আর তর ভালা লাগতাছে না? নাহ্, তুই জানি ক্যামন হইয়া গ্যাছোস গা'।

ঘুরপথ ধোরে ওরা তেনা ছেঁড়া বটগাছের পাশে আসে। এইটুকু পথ আসতেই বিকু পটাপট দু'টো ঘুঘু মেরেছে। এয়ার গানে ওর টিপটা সত্যিই ভালো। শিমুল আজই প্রথম। খালের পাশ ঘেঁষা টেলিফোনের তারে বোসে একজোড়া ঘুঘু ডাকছে। পাশে ভাট গাছের জঙ্গল, পজিশন নেয়ার সুন্দর সুযোগ। বিকু শিমুলের দিকে এয়ারগান বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'মিস করবি না কিন্তুক! মিস করলে দশ গুলি জরিপানা।'

শিমুলের চোখে তখনো টিয়ের চোখ দু'টো কি গভীর বেদনায় চেয়ে আছে, সে চোখ শিমুল কিছুতেই সরাতে পারছে না। সে এয়ার গান না নিয়ে বললো- 'থাক গে। দু'টোতো মারলি, আর লাগবো না। বাড়ি চল।'

বিকু শিমুলের দিকে বোকা বোকা চোখে তাকায়। আশ্চর্যের ধাক্কাটা সহজে সামলে নিতে পারে না। শেষে তারে বসা ঘুঘু দু'টোর দিকে চেয়ে বলে- 'যা, তগো মায় আজকে লাউপাতা বিলাইছিল, হের লাইগা তগো আইজ নিজগুনে মাফ কইরা দিলাম।' হঠাৎ কোরেই প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে বিকু-'চা খাবি? ল ইট্টু চা খাইয়া লই।'

শিমুল এবারও কাচুমাচু করে, 'পয়সা আনিনি যে?'
'ল যাই, আমার কাছে আছে।'

শিমুল ঘুঘু দু'টোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এগুলো?'

বিকু খুব সহজভাবেই জিজ্ঞেস করলো,'কাওরে দিয়া দেই?'

শিমুল সামান্য ভাবে, ভেবে মাথা কাৎ করে।

একদম কোণার বেঞ্চটা খালি পেলো ওরা। শিমুল ভেতরে বসা সবাইকে কৌতুহলী চোখে চেয়ে দেখে। গফুর মুন্সীর পাশে হীরু মাস্টার। হীরু মাস্টারের ডানপাশে যে যুবক ছেলেটা বোসে আছে, মুখটা খুব চেনাচেনা; তবুও শিমুল স্মৃতি হাতড়ে চিনে উঠতে পারে না। ওই টেবিলের পেছনের বেঞ্চে রহিম বক্স। আগে, শিমুল তখন আরো ছোটো, লোকটা ঘোড়ার গাড়ি চালাতো। এলাকার সবচে' নামিদামি ঘোড়া ছিলো লোকটার। ঘোড়াটার নামটাও খুব সুন্দর। "ঝটিকা"। হঠাৎ কোরে কি যে হলো, দশ মিনিটের রোগে ঘোড়াটা মরে গেল। আর

সেদিন থেকেই রহিম বক্স বেকার হয়ে পড়ে। এখন কামলা টামলা দিয়ে সংসারটা টেনে নিচ্ছে কোনো রকমে। রহিম বক্সের মেঝো ছেলে মুক্তা। শিমুলের সাথেই একসময় পড়তো। এখন বদলি পেলে রিক্সা চালায়। একার পক্ষে কষ্ট হয় বোলে মুক্তার সাথে সমান তালে রিক্সার প্যাডেল মারে মুক্তা'র ছোটো ভাই বাদশা। দুই ভাইয়ের যৌথ রিক্সা চালনার কসরত দেখে ভদ্রলোকের দল হাসে, হেসে তৃপ্তি পায়।

হীরু মাস্টার মাথাটা সামান্য ঝুলিয়ে যুবকটির দিকে ফিরে বললো- 'এতো লম্বা কোরে চুল রেখেছিস কেনো? কেটে ফেলবি। মামার হাতে পড়লে ঠাট-এর ডাঁট বেরিয়ে যাবে। খবর টবর শুনছিস তো? খুব ধর পাকড় হচ্ছে।'

শিমুল যুবকটির দিকে তাকায়। ওর মনে হলো না মাথার চুলগুলো আহামরি ধরনের লম্বা। যত্ন কোরে আঁচড়ানো চুলগুলো সত্যিই সুন্দর লাগছে। কৌতুহলে মনের অগোচরে আরো কিছুটা সরে আসে শিমুল।

গোপন সোপন কথার ধার খুব কমই ধারে গফুর মুন্সী। কিন্তু তার গলাও কেমন যেনো ম্লান ম্লান মনে হলো শিমুলের কানে। সে হীরু মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ধান্ধাবাজের কাজকামই হইলো গিয়া ধান্ধা করা। ভাবছো আসল চীজ ধরা পড়বো? একটাও না। তারা তো সেই সময়ই ফুড়ুৎ- উড়ে গেছে। খবর পেলেও সময় মতো পুলিশ টালবাহানা করে, উড়ে যাবার সুযোগ কোরে দেয়।

টেবিলে আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিচ্ছিল রহিম বক্‌স। টোকা মারা থামিয়ে এবার চ্যালেঞ্জের সুরে সে বলে ওঠে, 'পরাণে ভয়ডর আছে না? অস্ত্রপাতি তো পার্টির কাছেও কম নাই, তাইনে? পুলিশ করে চাকরি, জীবনের দরদ তাগো অনেক বেশি। আর পার্টির লোকেরা জান বাজি রাইখা ঘর ছাড়ে, ভয়ডরও তাগো কম।'

হীরু মাস্টার রহিম বক্‌সকে ধাক্কা মারে, 'আস্তে কথা বলতে পারো না?' গফুর মুন্সী নিজের পূর্ব বক্তব্যের রেষ ধোরে বলে, 'খোঁজ নিয়ে দ্যাখোগে, পুলিশের সাথে পার্টির লোকদের কোনো না কোনো গোপন হট লাইন ঠিকই আছে। ওরে বাপ, বাইরে বাইরে কি হম্বিতম্বি- রয়েল বেঙ্গল টাইগার মারেঙ্গা হাতের তুড়িতে। আসলে ঘটেটা কি? নিরীহ লোকদের উপর জুলুম আর ধরপাকড়! মালপানি হাতিয়ে নেয়ার কি মজাদার খেলা। ছাড়ো মাল, লও খালাস। বদমাইশগুলোর উপর ক্যান যে লানত নামে না!

যুবকটি গফুর মুন্সীর কথায় মিটমিটিয়ে হাসে। দোকানদারের উদ্দেশ্য সে চেঁচিয়ে বলে, চা হলো? তারপরই গলা অনেক নিচুতে নামিয়ে হীরু মাস্টারকে জিজ্ঞেস করে, খুব বুঝি ফাইট হয়েছে ?'

'ফাইট না ঘোড়ার ডিম!' রহিম বক্‌স-এর গলায় ক্ষোভ। গুলির খই ফুটলেই বুঝি ফাইট হয়? যত্তোসব ফাঁকা পায়তারা। কই, একজনও মরেছে?

হীরু মাস্টার সাথে সাথে জবাব দিলো না। তাকাতেই শিমুলের সাথে হীরু মাস্টারের চোখাচোখি হলো। হীরু মাস্টারের দীর্ঘশ্বাসের শব্দটুকুও শিমুল টের পায়।

'মারা গেছে। অপচয়! পূর্ব বাংলাদের একজন মারা গ্যাছে।' তার গলা আরো নিচু হয়ে আসে, 'জাসদের অতুল আহত। অবস্থা নাকি বিশেষ একটা সুবিধের না।'

শিমুলের বুক ধক কোরে লাফিয়ে ওঠে।

'কথাটা পালের, না কেনা?'

'পালের কথা, একদম সত্যি।'

গফুর মুন্সী বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ কোরেছিল। এবার সে সোজা হয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। গলায় হতাশা আর ক্ষোভের মিশেল ঝাঁজ–'কি যে হলো দেশটার! অতুলটার কথাই ধরো! হোক না হিন্দু, কি ভালো ছাত্রটাই না ছিলি, এ্যাঁ! যোগ দিলি গিয়ে জাসদে, মাথায় রাখলি মাইয়া মানুষের লাহান লম্বা চুল। কি দরকার ছিলো তোর পড়াশুনা শেষ না কোরে দলধাপ করনের? চান্দু, এইবার ঠেলা বোঝো, কতো ধানে কতো চাল।

যুবকটি এবার গফুর মুন্সীর দিকে তাকিয়ে বেশ ব্যাঙ্গাত্মক গলায় বলে, 'অতুল খুব চালাক ছেলে, চাচা; পাতায় পাতায় চলে। জানেন, ও ক্যানো জাসদে যোগ দিয়েছে? স্রেফ এনিমি প্রোপার্টি বাঁচানোর জন্যে। সমাজতন্ত্রের ও বোঝেটা কি? কচু বোঝে! আমার মনে হয় না ও আহত হয়েছে। টোপ দিয়ে পাড়ে বোসে মাছ ধরার সে একজন ওস্তাদ প্লেয়ার।'

'তা, তোমরা চাওটা কি, এট্টু বুঝাও তো বাপ।' রহিম বক্স আগ্রহের সাথে জানতে চায়।

'আমরা মানে?' রহিম বক্সের কথায় যুবকটা যেনো ভালো কোরেই একটা ধাক্কা খায়।

'আরে, চমকাও ক্যারে? ওইটা কথার কথা। ওই যে পূর্ব বাংলারা আর জাসদ মাঝে মধ্যেই একে অন্যের উপর চড়াও হয়, ক্যান? সমাজতন্ত্র তো দুই দলই চায়, চায় না?'

'মুখে বললেই তো আর সমাজতন্ত্র পাওয়া যায় না, তার জন্যে সত্যিকারের কাজ করতে হয়।'

'খালেক মাতুব্বর একজন জল মহালের মালিক। তার ছেলেরা জাসদ করে। অথচ জাসদ নাকি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র চায়। বুঝো ব্যাপারটা!'

গফুর মুন্সী রহিম বক্সের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কি গো রহিম বক্স, তুমি কারে সাপোর্ট করো?'

সামান্য হাসে রহিম বক্স। খালি গ্লাসটা হাত দিয়ে সরিয়ে সামান্য ডান পাশে রেখে, ওটা আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনে। ঘুরোয় গ্লাসটা। ঘুরাতে ঘুরাতে গ্লাসের দিকেই চোখ রেখে সে বলে, 'হাজার কথার এক কথা আমার, আমি গরীব মানুষ, পূর্ব বাংলাও বুঝিনে, জাসদও বুঝিনে। আমাদের মতো গরীবের যারা ভালো করবো, আমি তারই পক্ষে, ব্যস! ভালোটা মুখের চিনিগুড়ি হাসি আর মিষ্টি কথার বুলিবিলাস হইলে হইবো না, কাজে কর্মে দেখাইতে হইবো।'

চা এলো। নিজের কাপ নিয়ে হীরু মাস্টার যুবকের কানে ফিসফিস কোরে কি যেনো বলে। আর কোনো কথা হয় না ওদের। চারজনই নি:শব্দে চা খাওয়ায় মগ্ন হয়ে যায়। রাগ হলো বিকুর। ওদের চা দেয়া হয়নি। সে এবার খেঁকিয়ে ওঠে, 'আমাগো চা?' দোকানদার বিকুকে ভালোই চেনেন। শিমুলের মনে হলো, দোকানদার যেনো কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন বিকুর কথায়। তিনি হেসে বিনয়ের সাথে বললেন- 'দেই বাহে, আর যে কাপ নাই! ইট্টু বও।'

গফুর মুন্সী উঠে দাঁড়ালো অন্য তিনজনের সাথে। যেনো এতোক্ষণ পরে হঠাৎ খেয়াল হয়েছে মুখের ভাব তেমন কোরে শিমুলকে জিজ্ঞেস করে, 'চাচা, বাড়ি আইছো কবে?'

গুডবয় ধরনের লাজ মিশানো হাসি হাসে শিমুল,বলে– 'কাল।'
'পড়াশুনা ঠিকমতো চলছে তো?'

শিমুল জবাব না দিয়ে হাসে।

পেছনে পড়ে যায় গফুর মুন্সী। 'সময় কোরে এসো একবার' বলতে বলতে সে দোকান থেকে বেরিয়ে যায়।

শিমুলের ভেতরে এতোক্ষণ ধোরে কৌতুহলটা আতিপাতি করছিল। দোকানে ও আর বিকু। অন্য কেউ নেই। শিমুল তবুও বিকুর আরো কিছুটা পাশে সরে বসে।
'অতুলদা' রাজনীতি করে?'
'করেই তো।'
'কোন দল?'
'হুনলিনে, জাসদ'। সব কয়ডারে গুলি করবার পারলে আমি শান্তি পাইতাম।

শিমুল চোখ কুঁচকে বলে, 'কেনো?'

'ক্যান মানে? নিজের কানে শুনলিনে, জাসদরে কি গালাগালি কইরা গেলো?'
'গালাগালি করেছে? কই? আর করেও যদি, তোর কি?'
বিকু এয়ারগানের নলটা হাত দিয়ে মুছতে মুছতে খুব আস্তে কোরে বললো, 'আমিও জাসদ করি। শিমুলের দিকে তাকিয়ে বিক হাসে। আরো চুপিচুপি বললো, 'অতুলদারে দেখবার যাবি?'

ভেতরে বেশ জোরে সোরেই ধাক্কা খায় শিমুল। বিকু পার্টি করে? জাসদ পার্টি? ভ্যাবাচেকা হয়ে অবাক চোখে শিমুল বিকুর দিকে চেয়ে থাকে।
'জানোস, অতুলদাগো অনেক অস্ত্র আছে। আমারে অস্ত্র চালানি শিখাইছে। ল যাই, তরে আমি শিখাইয়া দিমুনে। তয়, কাওরে কবিনে কিন্তু, খবরদার!'

বিকুর পিছুপিছু শিমুল পাকা রাস্তা ছেড়ে পায়েহাঁটা মেঠোপথে নেমে পড়ে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে বিকু। গোল্ড ফ্ল্যাগ। শিমুল আবারো হোঁচট খায়। বিকুর ঠোঁটে ডোন্ট

কেয়ার ধরনের হাসি। সিগারেট বের কোরে বিকু ঠোঁটে গোজে। শিমুলের দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধোরে বলে- 'নে।'

শিমুল হতভম্ব হয়ে একবার বিকুকে দেখে, একবার সিগারেট। ওর ভেতরে অন্য রকমের অনুভব জন্মাতে থাকে। না রাগ, না ভালো লাগা, না অন্যকিছু, ঠিকমতো ধরা যাচ্ছে না। সে সরাসরি বিকুর দিকে চোখ রেখে রুক্ষ মেজাজে বললো, 'আমি খাই না।' শিমুল সামনে পা বাড়ায়।

'একটা খাইলে মহা ভারত অশুদ্ধ হইবো না। খাইয়া দেখ একটা, নে ধর।'

নিষিদ্ধ জিনিসের মোহই আলাদা। নিষিদ্ধ টানে শিমুল শেষ পর্যন্ত দ্বিধার সাথেই হাত বাড়ায় এবং প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের কোরে সে কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।

'ফস।'

বিকু ম্যাচের কাঠি জ্বালায়। ছোট্ট শিখা দুই হাতের তালুর আড়ালে হালকা হালকা দুলছে। মুখ নামিয়ে সে সিগারেট ধরায়। তারপর আগুনটা শিমুলের দিকে এগিয়ে ধরে। শিমুলের দ্বিধাদ্বন্দ্ব তখনো কাটেনি। কি করবে, ভাবছে। ইতোমধ্যে কাঠি পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে যায়। বিকু তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে বিরক্ত হয়ে শিমুলের দিকে তাকায়। নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে শেষে সিগারেটের আগুন শিমুলের সিগারেটে ছুঁইয়ে বললো- 'নে, টান দে।'

শিমুল সিগারেট জ্বাললো এবং সাথে সাথে ভীষণভাবে কেশে উঠলো।

বিকু বাহবা দেয়। চোখ মুছে শিমুল আবার সিগারেটে টান দেয়।

কাশতে কাশতে পেট ধোরে শিমুল ক্ষেতের আইল-এ বোসে পড়ে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে। বিদ্‌ঘুটে এক স্বাদে ওর মুখ তিতিয়ে উঠেছে। থুতু ফেললো সে। শব্দ কোরে। সিগারেটটা আছড়ে ছুঁড়ে ফেললো দূরে।

বিকু হাসছে। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে শিস বাজালো হালকা কোরে। হেসে হেসে বললো, 'নাহ্, তর অহনো মার দুধ খাওন দরকার। শেয়ানা হবি কবে?'

শিমুল শার্টের হাতায় চোখ মুছে ঘুড়ে দাঁড়ায়। 'যাবি তো হাঁট।'

বিকু পিটপিট কোরে হেসে পা বাড়ায়। ওর কাঁধে এ্যারো কোরে ধরা এয়ারগান।

এ রাস্তা ওরাস্তা কোরে, এর ওর উঠোন আঙ্গিনার কিনারা ঘেঁষে ওরা মসজিদ বাঁয়ে ফেলে রাস্তা পার হয়ে আরো কিছুটা দক্ষিণে এগিয়ে যায়। তিন ভিটেয় তিনটে টিনের ঘর। বাড়িটা আম কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা। উঠতি পথেই একটা আতা ফলের গাছ। ছোট ছোট প্রচুর ফল ধরেছে। গাছটার নিচে পাখি খোঁজার ওসিলায় বিকু দাঁড়িয়ে পড়ে। পাশে শিমুল। বিকু চারদিকটা দেখতে দেখতে বলে 'একদম আমার লগে লগে হাঁটবি। আয়-'

অতি দ্রুত পাটকাঠির বেড়ার আড়াল নিয়ে বিকুর সাথে শিমুল বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। যুবকটিকে শিমুল আগে কখনো দেখেছে বোলে মনে পড়ে না। যুবকের ডান হাত দ্রুত বালিশের নিচে চলে গিয়েছিল। সে কেবল এক মুহূর্তের ব্যাপার। বিকুকে ভালোই চেনে, বোঝা গেলো। হাত বের কোরে যুবকটি হেসে ফেলে– 'তুমি!'

বিকুর সাথে শিমুল বারান্দায় উঠে আসে। যুবকটি চৌকির উপরে টিনের বেড়ায় হেলান দিয়ে বোসে আছে। সে বিকুকে চোখ দিয়ে ইশারা করলো। বিকু শিমুলের দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে উত্তর দেয়, 'আমার ভাই, অসুবিধে নাই। অতুলদার খুব ন্যাওটা ছিলো।' বারান্দায় না দাঁড়িয়ে বিকু দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। পাশে শিমুল।

সবার মাথায় ঝাঁকড়া চুল। শিমুল গুণে দেখলো অতুলদাসহ ওরা ছয়জন। চারজন তাস খেলছে। সবাই প্রায় এক সাথে তাকিয়ে ওদের দেখলো। তারপর আবার খেলায় মন দিল। ওদের একজন ঘুরে ফিরে খেলা দেখছে। হাতে তার জ্বলন্ত সিগারেট। অতুল শুয়ে আছে ঘাড়ের নিচে উঁচু উঁচু তিনটে বালিশ দিয়ে। আধশোয়াও নয়, আধবসাও নয়– এমন একটা অবস্থা। হাতে সিগারেট। কোমর পর্যন্ত গাঢ় নীল রঙয়ের একটা চাদর টানা। শিমুল আর বিকুকে দেখেই অতি উৎসাহে সে উঠে বসতে চাইলো। কিন্তু প্রথমবার পারলো না। ব্যথার অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার কপালে ভাঁজ পড়ে, সে ঠোঁট কামড়ে ধরে। সে আগের অবস্থায় গিয়ে সামলে নেয়। তারপর রয়ে সয়ে উঠে বোসে মিষ্টি কোরে হাসে।

'কি রে, কবে এলি? ভালো আছিস তো?'

শিমুল চাদর দিয়ে ঢাকা জায়গাটুকুর দিকে চেয়ে থেকে মাথা ঝাঁকায়- 'কাল।'

'কয়দিনের ছুটি পেলি? অতুল উত্তরের অপেক্ষা করে না। 'ওরে ব্বাব্বা, তুই যে একদম তালগাছ হয়ে গেছিস রে? তোর বাবাও কিন্তু খুব লম্বা ছিলো। বাপ কা ব্যাটা, কি বলিস?' অতুল হো হো কোরে হেসে ওঠে।

শিমুল কিছুটা লজ্জা পায়। কিন্তু ওর ভাবনা অন্যত্র, চাদর দিতে ঢাকা দেহটায়। শেষ পর্যন্ত সে উদ্বেগ মাখানো কৌতুহল চেপে রাখতে পারে না। সরাসরি অতুলকে সে জিজ্ঞেস করলো. 'তোমার নাকি গুলি লেগেছে?' সামান্য চমকে ওঠে অতুল। বিকুর দিকে তাকায়। কিছুটা কাৎ হয়ে চাদরটা টেনে ঠিক কোরে শিমুলের দিকে তাকিয়ে সে আবার হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, 'কোত্থেকে শুনলি?'

শিমুলকে জবাব দেয়ার সুযোগ দেয় না বিকু। ওর গলা কেমন গম্ভীর আর রাগী রাগী। 'মাস্টরে কইছে। হীরু মাস্টর, গফুর চাচা আর বক্স চাচা হোটেলে বইসা জাসদের নাম কইরা খুব উল্টাপল্টা কথা কইছে। তাগো লগে দীপক মালায়োনও আছিল।'

এবার হুট কোরে শিমুল সেই যুবককে চিনে ফেলে। দুই তিন বছর দেখা নেই বোলে দীপককে সে প্রায় ভুলেই গেছিল। অতুলদা খেলতো ব্যাকে, দীপকদা ফরোয়ার্ডে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে..... ওর ভাবনার মাঝখানে ঢিল পড়ে। বিকু এয়ারগানটা অতুলদার শুয়ে থাকা খাটের

সাথে হেলান দিয়ে রেখে বললো, 'খুব বাইড়া গেছে হীরু মাস্টর। দীপকরে শেল্টারও দেয়। সাহস কি!'

অতুল নতুন একটা সিগারেট জ্বালিয়ে হাত উল্টিয়ে ঘড়ি দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করে, 'তুই নিজে শুনেছিস?'

'তয়! এই চোখ দিয়া দেখছি আর এই কান দিয়া শুনছি।' বিকু বেশ দৃঢ়তার সাথে ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে নিজের চোখ আর কান ছুঁয়ে দেখায়। শিমুলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'শিমুলকে জিগাও, ও আমার লগেই আছিল।'

ইতোমধ্যে তাস খেলা থেমে গেছে। সবাই বিকুর কথা শুনছে। হলুদ টি-শার্ট গায়ের হাতে বালা পড়া যুবকটি হাতের তাস শব্দ কোরে আছড়ে ফেলে। সে বেশ ক্ষোভের সাথে বলে ওঠে, 'কবে থেকেই আমি বলে আসছি, হীরু মাস্টার একটা শেয়ানা ঘুঘু আর গফুর মুন্সী আস্তো একটা ইবলিশের চাচাতো ভাই। দুই দুইবার আমাদেরকে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়েছে। কার জন্যে? ওই হীরু মাস্টার।'

মাথার নীল টুপিটা খুলে আবার যত্ন কোরে টেনেটুনে ঠিক কোরে অন্য একজন বললো- 'বিষয়টা আগামী মিটিংয়ে সিরিয়্যাসলী উত্থাপন করতে হবে।'

যুবকটি তাস নাড়াচাড়া করছিল। এবার ছড়ানো তাসগুলো গোছাতে গোছাতে বললো, 'প্রমাণ ছাড়া তো আর সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। প্রমাণ কই?

'কেনো, বিকু?'

যুবকটি নড়ে বসে। লুঙ্গির গাঁট থেকে ক্যাপস্টান সিগারেটের প্যাকেট বের কোরে একটা সিগারেট জ্বালায়। এখন ওর দিকে কয়েক জোড়া চোখ। শিমুল মনে করতে পারে না একে আগে কখনো দেখেছে কি না!

যুবকটি ধোয়া ছাড়লো চমৎকার একটা রিং কোরে। ফুঁ দিয়ে নিজেই রিংটা ভেঙ্গে ফেলে বললো- 'দীপক আর হীরু মাস্টার একই কলেজে পড়তো। ওরা বন্ধু। বন্ধুর সাথে বন্ধুর দেখা হোলে কথা বলবে না? আদর্শগত সম্পর্কের বাইরেও একটা সম্পর্ক থাকে, ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। তাছাড়া, আমি নিশ্চিত, দীপক পূর্ব বাংলার কোনো কর্মী নয়, খুব জোর একজন সমর্থক। কেউ যেমন আমাদেরকে সাপোর্ট করার অধিকার রাখে, তেমনি কেউ একজন পূর্ব বাংলাদেরও সাপোর্ট করার অধিকার রাখে। আমাদের দায়িত্ব নিজেদের সঠিকতা দিয়ে ওদের বেঠিকতাকে তুলে ধরা, রাজনৈতিক লড়াই চালানো।'

'কিন্তু হীরু মাস্টার আর গফুর মুন্সী?' তিন যুবকের সম্মিলিত ক্ষুব্ধ কণ্ঠ। আগের যুবক একটুও উত্তেজিত হলো না। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সে আগের সুরেই বললো, 'বিকু কিন্তু বলেনি হীরু মাস্টার বা গফুর মুন্সী কি কি বোলে আমাদের পার্টিকে গালাগালি করেছে! এরপরও কথা থাকে, হীরু মাস্টার বা গফুর মুন্সী কোন ভাষায় কথা বলেছে, তা মোটেই বড়

কথা নয়; বড় কথা– কি বলেছে তারা। তাদের সমালোচনা যদি সঠিক হয়? আমাদের মেনে নেয়া উচিত হবে না?'

'তুই যা-ই বলিস না কেনো, হীরু মাস্টারকে এখনই ঠেকাতে না পারলে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক ভোগান্তি আছে।

'ভুল। আমাদের আদর্শ আর পথ যদি ঠিক হয়, তবে হীরু মাস্টারের সংখ্যা মোটেই বেশি হবে না। অল্প কয়জন হীরু মাস্টার আমাদের কি ক্ষতিটা করতে পারবে? কিচ্ছু না। আসলে আমরা বোধহয় নিজেদের সঠিকতার প্রশ্নে নিজেরাই আস্থা রাখতে পারছি না।'

'হোয়াট!' অতুল চেঁচিয়ে ওঠে। এতোক্ষণ সে শুয়ে শুয়ে চুপচাপ শুনছিল। এবার সে মাজা সোজা কোরে উঠে বসে।

শেষ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যুবকটি মাটিতে টিপে সিগারেটের আগুন নিভিয়ে শার্টের হাতায় ঠোঁট মোছে।

'আমার তো মনে হচ্ছে, জলমহাল দখলের লড়াইয়ে ওদেরকে বাধা দেয়া আমাদের ঠিক হয়নি।'

'রাজা, ইউ স্যুড কন্ট্রোল ওভার দি টাং।' হলুদ টিশার্ট পড়া যুবকের গলার রগ উত্তেজনায় বেশ ফুলে ওঠে।

'রাজা, তুই কিন্তু সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভাঙ্গছিস।' অতুল যুবককে সাবধান করিয়ে দিলো। তার গলার সুরে তিরিক্ষে মেজাজ।

এবার রাজাও কিছুটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ' আত্ম-সমালোচনা–সমালোচনা করার অধিকারও আমাদের নেই?'

'তুই কি লিডারশিপকে চ্যালেঞ্জ করছিস?'

'লিডাররা কি তোর চেয়ে কম বোঝে, রাজা?'

'আমার ব্যাখ্যাটা তোরা ধরতে পারছিস নে।' রাজা তাসগুলো হাতে তুলে নিতে নিতে বলে, আচ্ছা বলতো, আমরা কি নেতার পেছনে ছুটবো, না নীতির পেছনে?'

'নীতিকে এগিয়ে নেয় নেতা।'

রাজা ম্লান হাসে। 'তোর বক্তব্যটা আংশিক সত্য আর আংশিক মিথ্যে, সজল। লেভ তলস্তয়ের War and Peace পড়েছিস? না পড়লে পড়ে নিস, দারুন বই। যা বলছিলাম। ধর, নেতা ভুল করলো। তখন?'

'রাজা, তুই কিন্তু সত্যিই শৃঙ্খলা ভঙ্গের মতো কোরে কথা বলছিস। ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানোর মতো তোর কথাবার্তা।'

'মোটেই না। শৃঙ্খলা কিসের জন্যে? সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার যে লড়াই, তার জন্যে, তাই না? অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মিথ্যে আর ভুলের বিরুদ্ধে কথা বললে তা মোটেই শৃঙ্খলা ভঙ্গের আওতায় পড়ে না। তোরাই বল, আমাদের লক্ষ্য কি? বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র মানে

যেহেতু মেহনতী নির্যাতিত মানুষের সপক্ষে কাজ করা, তাহলে জলমহালের ইজারাদার খালেক মাতুব্বর আমাদের বন্ধু হয় কি কোরে? কি কোরে জলমহাল দখল লড়াইয়ে লড়াকু খেটে খাওয়া সব জেলেরা হয় আমাদের শত্রুপক্ষ? আমাদের ভিত কি জল মহালের ইজারাদার, না জেলেরা?'

'তুই জানিসনে খালেক মাতুব্বরের দুই ছেলে আমাদের পার্টি করে?'

রাজা এবার নড়েচড়ে আরো সোজা হয়ে বসে। মুখে বিদ্রুপের সূক্ষ্ণ হাসির রেখা। 'তার মানে– পার্টির লোক শোষণ করলেও তা লিগ্যাল, এই তো? সমস্যাটা এখানেই, বুঝলি? খালেক মাতুব্বরের সাথে হীরু মাস্টারের দ্বন্দ্ব চলে আসছে অনেক বছর ধোরে। সুযোগ বুঝে খালেক মাতুব্বর তা' আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে ফায়দা লুটতে চাইছে। এক ঢিলে দুই পাখি, হীরু মাস্টারও শেষ হলো, জলমহালও দখলে থাকলো। তার ইনভেস্টমেন্টটুকু কি? দুই ছেলে পার্টির কর্মী আর মাঝেমধ্যে আমাদেরকে ভুড়ি ভোজন করিয়ে দুই একটা পাঁচশো টাকার নোট ধরিয়ে দেয়া।'

'তুই শুধু একপেশে কথা বলছিস, রাজা। তুই কি বলতে চাস, ওইসব জেলেরা পূর্ব বাংলার লোক না?'

নতুন কোরে সিগারেট ধরায় রাজা।

জেলেরা শোষণ মুক্তির লড়াইয়ের সপক্ষের শক্তিশালী পক্ষ, সৈনিকই বলা যায়। আমরা ওদের স্বার্থ নিয়ে ওদের কাছে যেতে পারিনি, কিন্তু পূর্ব বাংলারা গ্যাছে। আসলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সত্যিকারের শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে।'

একদম ধূমায়িত চা! হাড়ি ধোরেই ঘরে নিয়ে ঢোকলেন মাঝ বয়েসী এক মহিলা। বিকু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাড়িটা ধরে। আর তখনই যেনো অতুলের খেয়াল হলো বিষয়টা। বিকুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুই তো এখানে মেতে আছিস, রাস্তায় কে?' বিকু হাড়িটা মাটিতে রেখে তাড়াতাড়ি বললো, 'আমি তাইলে বাইরে যাই?'

'আর যেতে হবে না, চা খা।'

মহিলা কোনো কথা না বোলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শিমুল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। কেমন যেনো খাপছাড়া লাগে ওর কাছে।

বিকু একদৌড়ে বাইরে গেলো, ফিরেও এলো দৌড়ে। হাতে কাঁচের গ্লাস। খুব ব্যস্ত আর উৎসাহের সাথে সে চা ঢালে।

অতুল সজলকে জিজ্ঞেস করলো, 'ফরিদ ভাইয়ের ওখানে কে যাবে?'

'আপনিই ঠিক করেন।'

'তুমি যাবে?'

'ওখানে প্রায় সবাই আমাকে চেনে।'

'ফরিদ ভাই তোমাকেই যেতে বলেছেন। এক কাজ করো, সাথে বিকুকে নিয়ে যাও।'

'ওকে কেনো?'

'সাবধানে মার কম। ওকে কেউ সন্দেহ করবে না। জিনিসটা ওর কাছে থাকবে। বিকেলে তোমরা যখন সেল্টার পাল্টাবে, তখন ওকে ছেড়ে দিও। আগেভাগে ছেড়ে দিও না আবার।'

বালিশের নিচ থেকে অতুল জিনিসটা বের করে। শিমুল বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ কোরে জিনিসটা ওকে হকচকিয়ে দেয়। এই ধরনের জিনিস আরো আগে সাত্তার ভাইয়ের কাছে শিমুল দেখেছিল। পিস্তল!

শিমুলের দিকে অতুলের চোখ পড়ে। অতুল শব্দ না কোরে হাসে।

'কি রে, হা কোরে কি দেখছিস? চালাতে পারিস? শিখবি? আয়, শিখিয়ে দিই।'

বিকু কাঁধ দিয়ে শিমুলকে ধাক্কা দিয়ে অতুলের সামনে চায়ের গ্লাস নামিয়ে রাখে।

শিমুল পিস্তলের দিকে চোখ রেখে নেতিবাচক মাথা ঝাঁকায়।

অতুল আশ্চর্য হয়ে যায়, তাকিয়ে থাকে শিমুলের দিকে।

'শিখবি নে?'

'না।' শিমুল স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে।

অতুল চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সিগারেট জ্বালায়। সে ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে বলে, 'আসলেই তুই নাদান মার্কা একটা গুড বয়।'

শিমুল ক্ষোভের সাথে বলে, 'মানুষ মারলে পাপ হয়।'

হো হো কোরে হেসে উঠতে গিয়ে অতুল পায়ে ব্যথা পায়। ঠোঁট কামড়ে সে তাড়াতাড়ি সামলে নেয় ব্যথাটা। 'এই জন্যে শিখবি নে?'

বিকু বেশ বিরক্তির সাথে শিমুলকে চায়ের গ্লাস দেয়। গ্লাস হাতে নিয়ে শিমুল বললো, 'পিস্তল দিয়ে তো মানুষই মারে।'

যুবকগুলো চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছে। নীল টুপি মাথায় দেয়া যুবকটি তুড়ি মেরে বললো, 'দারুন বলেছো কমরেড!'

অতুল বেশ শান্ত গলায় হেসে হেসে বলে, ' কেনো, পিস্তল দিয়ে হাতি-বাঘ বা শেয়াল-কুকুরও তো মারা যায়; কিরে, যায় না? '

শিমুল জবাব দিতে পারে না। শুধু অপলক চোখে অতুলের হাতের পিস্তলের উপর চোখ দুটো ছড়িয়ে রাখতে বাধ্য হয়। কি অদ্ভুত শক্তি পিস্তলটার! শিমুলের দুই চোখ কি গভীর কোরে নিজের গায়ে পিস্তলটা আটকে ধরেছে।

'আচ্ছা শিমুল, তোদের জায়গা জমি কারা তোদেরকে ঠকিয়ে নিয়েছে, তা তো তুই জানিস, তাই না? তুই কি তোদের জমি জিরাত ফেরত চাস না?'

অন্য দিন শিমুল যা মেনে নিতে পারে না, আজ অতুলের প্রশ্নের উত্তর তা' দিয়েই, মায়ের মুখে অজস্রবার শোনা কথাটা দিয়েই দিলো, 'ওদের বিচার খোদা করবে।' শিমুল উত্তরটা দিয়েছে বটে, কিন্তু ওর চেতনায় তখন ফেলু মেম্বরের মুখটা ঠিকই ভেসে ওঠে।

'খোদা তোমার কচু করবে, ইডিয়ট!' শিমুলের উপর অতুল বেশ ক্ষেপে ওঠে। 'শোন, ওই ফেলু মেম্বররা তোর ওই খোদারে নিজেদের বানানো আইনে কাগজের দলিলে বন্দী কোরে রেখেছে। আর তোর দাদী তাতে সীলমোহর মেরে পাকা পোক্ত কোরে দিয়েছে। তো, তোর ওই বন্দী করা খোদারে কি কোরে মুক্ত করবি? তার জন্যে এটা চাই, বুঝলি, এটা!' অতুল হাতের পিস্তলটা শূন্যে নাচাতে থাকে।

সাত্তার ভাইয়ের মুখ শিমুলের মনে পড়ে যায়। একই ধাঁচের কথা, একই সুর। শিমুল কিছুটা অবাক হয়। একটা অচেনা কাঁটা শিমুলের অন্তরে খচ খচ কোরে বিঁধতেই থাকে, রক্ত ঝরায়।

'খোদারে তোমরা মানো না?' শিমুলের কণ্ঠে এবার বিস্ময় জেগে ওঠে।

অতুল হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা সজলের হাতে দিয়ে বললো, 'ওটা যার যার বিশ্বাসের ব্যাপার। তবে বিশ্বাসটা শক্ত হয় জ্ঞান দ্বারা। বড় হয়ে তুই যখন আরো বেশী জ্ঞান অর্জন করবি, তখন হয়তো পিস্তল বন্দুক তোরও এক বিশ্বাসী সহযোগী বন্ধু হয়ে যেতে পারে। তবে একটা কথা মনে রাখিস, মারতে হলে মারবি বাঘ, ডাকাতি করলে-ব্যাংক।'

বিকু ও সজল দক্ষিণের রাস্তা ধোরে বাঁকের আড়াল হোতেই শিমুল একদম একা হয়ে ওঠে। ওর মন ছটফট করতে থাকে হাজারো ধারণার জটলায়। বিকুটা সাথে থাকলে আলোচনা করা যেতো। বিকুকেও আজ শিমুল নতুন ভাবে দেখলো। কেমন অচেনা অচেনা, বড় বড়। ভাবতেও ওর ভারী আশ্চর্য লাগে। বিকু নাকি আবার পার্টিও করে।

বেশ আনমনা হয়ে শিমুল একা একা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। আকাশে হালকা মেঘের আলসেমী আনাগোনা। তারই ফাঁক ফোঁকড় দিয়ে তাতানো রোদ গলে গলে পড়ছে। বাতাস নেই বোলে ভারী গুমোট একটা অস্বস্তিদায়ক গরম। দুটো তিনটে বেজে গেছে। ক্ষিধেও পেয়েছে ভীষণ। অতুলদা এতো কোরে খেয়ে আসতে বললো, ভূনা মাংসের কি মজাদার একটা ঘ্রান জিভের ডগায় লকলকিয়ে উঠেছিল, তবুও শিমুল রাজি হয়নি। খুব লজ্জা লাগে ওর। তাছাড়া শিমুল নিশ্চিত জানে, বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত মা ওর জন্যে ভাত খাবে না। মা নিশ্চয় এতোক্ষণে ভেতরে ভেতরে রেগে উঠেছে! চোখ মুখ দেখলেই শিমুল বুঝতে পারে। মা তখন 'থ' মেরে শুধু চেয়ে থাকে, কিছু বলে না। খুব খারাপ লাগে শিমুলের। ওর তখন ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে। এরকম না কোরে মা যদি মারতোও, মেরে টেরে যদি ভাত বেড়ে পাশে বোসে ছোটো বেলার মতো খাওয়াতো, সে-ও ভালো হতো।

চমকে ওঠে শিমুল।

'হি-হি-হি. হি: হি: হি:'

'মিতা!'

ফেলু ফুপার এতো সুখ, কিন্তু মিতা যেনো সেই সুখের মাঝে অদ্ভুত ধরনের একটা বিপরীত দেয়াল; একটা দগদগে ঘা। শুকোয় না, শুধু পচা গন্ধ ছড়ায় অহর্নিশি। মিতাকে দেখলেই ইদানিং এ ধরনের একটা ধারণা শিমুলের মাথায় দৌড়াদৌড়ি করে। কি সুন্দর চেহারা মিতার। অনেকটা মার্গেটা ফুপুর আদল পেয়েছে। চোখ দুটো কি কালো আর গভীর। কেবল চুলগুলো বিশ্রী রকমের জট হয়ে গেছে। শিমুল আগে বিকুর কথাটা বিশ্বাস করতো, মিতার ওই চুলে জ্বেন থাকে। নইলে হঠাৎ হঠাৎ এ রকম পাগোল হয়ে যায় কেনো! কথাটা এখন পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও সম্পূর্ণ অবিশ্বাসও করতে পারে না শিমুল।

কাঁচা হলদে রংয়ের গায়ে টুকটুকে লাল রংয়ের কামিজ আর কলাপাতা রংয়ের সালোয়ারে মিতাকে কি সুন্দর লাগছে। উড়না নেই। শিমুল চোখ নামিয়ে নেয়। আবার তাকায়। কামিজটা নতুনই প্রায়, তবুও পেটের কাছটায় ছেড়া। তাকাতে লজ্জা লাগে। লজ্জাটাই আবার ঘুরে ফিরে শিমুলকে হাতছানি দেয়। শিমুলের দিকে মিতা সেই যে একবার তাকিয়েছে, তারপরই যেনো সব ভুলে গাছে হেলান দিয়ে বোসে সে পা দু'টো ছড়িয়ে ছাগল বাচ্চার লাফালাফি দেখছে আর হাসছে। হাসছে তো হাসছেই। হঠাৎ হাততালি দিয়ে ওঠে মিতা। হাসির সেই ঢেউয়ে ওর সারা শরীর দুলে দুলে উঠছে।

শিমুলের হঠাৎ কোরে এক ধরনের ভয় হয়। অন্য কেউ মিতাকে এভাবে দেখতে পেলে যদি কিছু একটা হয়ে যায়! অন্যদিন যা করে না, শিমুল আজ তাই করলো। কেনো যেনো মিতার উপর ওর খুব মায়া জাগে। সে এগিয়ে গিয়ে মিতার বাঁ হাত ধোরে টেনে বললো, 'বাড়ি চল।'

মিতা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয়। বাব্বা, কি শক্তিরে গায়ে! মিতার চোখে যেনো হঠাৎ কোরে আগুন জ্বলে উঠলো। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। যেনো শিমুলকে সে চিনতে পেরেছে ঠিকঠাক! ছাগল বাচ্চাটার দিকে ফের তাকিয়ে সে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো। হঠাৎই আবার হাসি থামিয়ে সে শিমুলের দিকে তাকালো।' তুই আমার জামাই হবি? আমারে চকলেট খাইবার দিবি?'

শিমুল হকচকিয়ে যায়। হঠাৎ ওর কারকের উদাহরণটা মনে পড়ে, পাগলে কি না কয় ! শিমুল হাসে। লজ্জা পায় একটু। আমতা আমতা কোরে সে বলে, 'হবো, আগে বাড়ি চল।'

মিতা মহা উৎসাহে লাফঝাপ করা ছাগলের বাচ্ছাটার দিকে আংগুল উঁচিয়ে বলে, 'দেখ শিমুল দেখ, আমারে দেখাইয়া দেখাইয়া নাচতাছে। আমিও নাচুম।'

মিতা সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়ায় এবং ধেই ধেই কোরে লাফাতে শুরু করে। সাথে হি হি হাসি। শিমুল ঠিক কোরে উঠতে পারে না সে কি করবে। ছাগলে বাচ্চাটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে, পরে

এক দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে তিন-চার টান দুধ খেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে। মুখ অন্যদিকে।

হোঁচট খেয়ে পড়ি পড়ি কোরেও শেষ পর্যন্ত গাছে হাত ঠেকিয়ে টাল সামলে নেয় মিতা। রাগে গাছের গায়ে সে থুতু ছেটায়। যেনো অভিমান হয়েছে, ভাবটা এমন। কিছুটা দূরে গিয়ে সে মাটিতে বোসে পড়ে। কেমন নাকি নাকি সুরে কেঁদে বলতে থাকে– 'আমার বুঝি ক্ষিধে লাগে নায়?'

শিমুল এগিয়ে গিয়ে আবার মিতার বাঁ হাত ধরে। 'বাড়ি চল, ভাত খাবি না?'

নিশ্চল পাথরের মতো মিতা চুপচাপ শিমুলকে দেখে। চোখ ঘুরিয়ে আশ-পাশটায় তাকায়। আধলা কিসিমের একটা ইঁট। ডান হাতে ক্ষিপ্র গতিতে মিতা ইঁটটা তুলে নেয়। কথা নেই, বার্তা নেই, শিমুলের দিকে সে ইটটা ছুঁড়ে মারে। কি ঘটতে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেই শিমুল লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ায়। ইঁটটা ওর কানের পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে হাত ছয়-সাত পেছনে গিয়ে পড়ে।

শিমুলের বুক লাফিয়ে উঠলো। রাগতে গিয়েও সে শেষ পর্যন্ত রাগতে পারে না। মিতা ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। শিমুল যেদিক থেকে এসেছে, সে সেই দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। মুখের পাশ দিয়ে হালকা লালা ঝরছে। নড়ছে ঠোঁট দুটো। মিতা গালি দিচ্ছে শিমুলকে– 'কুত্তা -কুত্তা- কুত্তা!' একসময় কেবল ঠোঁটই নড়ে, গালির শব্দটা আর বেরোয় না। শিমুলের কেনো যেনো নতুন কোরে বিশ্বাস হতে চায়– মিতার চুলে ভূত-টুত থাকলে থাকতেও পারে।

চাচাতো-ফুপাতো ভাই-বোনদের সবই ফেলু ফুপারে এড়িয়ে চলে। শিমুলও। কিন্তু এখন শিমুল এড়িয়ে যেতে পারলো না। গরুর খোঁটা নেড়ে ফেলু মেম্বর সরকারি রাস্তায় লাগানো তার দখলীকৃত কলাগাছের এক ছড়ি বতি হয়ে ওঠা কলার ছড়ি দেখছিল কাটার সময় হয়েছে কি না। শিমুলকে সে দেখেনি। শিমুলই এগিয়ে গেলো। মিতার কথাটা বলা দরকার। ধোরে না আনলে কোথায় না কোথায় চলে যায়, কি না কি ঘটে!

পেছন ফিরে তাকাতেই শিমুলের চোখে ফেলু মেম্বরের চোখ পড়ে। শিমুলকে দেখেই ফেলু মেম্বর ব্যাঙ্গাত্মক সুরে বোলে উঠলো–' কেডা গো তুমি?' হঠাৎ কোরে শিমুল দ্বিধা-দ্বন্ধে পড়ে যায়। মিতার কথাটা ফেলু ফুপাকে এভাবে বলা ঠিক হবে তো? যদি আবার নানা রং ঢংয়ের প্রশ্ন করে?

'কালা নাকি , কথা কওনা ক্যা? ঢং দ্যাখো! ছাল নাই কুত্তা, বাঘা তার নাম। আরে বাহে, সিদ্ধ ধানে গাছ হয় না; অতো ফুটানি আহে কোখাইকা?'

লজ্জা আর অপমানের যন্ত্রনায় শিমুলের মাথা ঝুলে পড়ে। ও ভেবেই পায় না ফেলু ফুপা কেনো ওর সাথে এভাবে কথা বলতে শুরু করেছে। প্রায় সাত-আট মাস পরে দেখা, অথচ....! মিতার কথাটা স্রেফ ভুলে যায় শিমুল।

'তোমার বড় আপারে একবার আইতে কইও। ইস্কুলে মাস্টারী কইরা জজ ম্যাজিস্ট্রেটের মত ফেটিংস করলে হয়! তার চাইতে মান আমার কম না, কইও হেরে। তা, হোনছো নি কিছু?'

অনেক কষ্টে আর ক্ষোভে শিমুল মাথা কিছুটা উঁচু করে সামান্য ঝাঁকায়।

'তোমাগো তো নতুন একটা বাপ হইতাছে। দ্যাখছো তারে?' কথাটা বোলেই ফেলু মেম্বর ফিক ফিক কোরে হেসে ওঠে।

শিমুলের সারা শরীর মুহূর্তে জমে ওঠে। প্রচন্ড রকমের ধাক্কা লাগে ভেতরে। ধাই কোরে ফেলু মেম্বরর নাক বরাবর একটা ঘুষি মারতে ইচ্ছে হয় ওর। কিন্তু শিমুল কিছুই না কোরে নিশ্চল দাঁড়িয়েই থাকে। নড়ার শক্তিও যেনো সে হারিয়ে ফেলেছে।

'ভালাই । তয় তোমার মায়রে কইয়া দিও, তোমাগো ওই হবু বাবাডারে আমি, এই ফেলু মেম্বর ইট্রুও পুছিনা। ভালায় ভালায় তোমাগো মায় যেন্ ভিটাডা ছাইড়া যায়।'

নিজের পাছায় মনে মনে শিমুল নিজেই লাথি মারে। ঘাড়ের রগটা, গোয়ার্তুমির ভূতটা ওকে নতুন কোরে ধাক্কাতে থাকে। সেই সাথে ওর চোখ দুটো জলে টলমলিয়ে ওঠে। শরীরটাও একটু একটু কাঁপে। সে মাথাটা সোজা কোরে ফেলু মেম্বরের চোখে চোখ রেখে বলে– 'এসব কথা মাকে আমি বলবো না, বড়'পাকেও না!'

সামান্য হোলেও হোঁচট খায় ফেলু মেম্বর। গলার ব্যাঙ্গাত্মক ভাবটা তাই আরো বেশি কর্কট হয়ে ওঠে– 'ওম্মা, এ যে দেখতাছি গ্যারামের কইতর শহরে গিয়া পায়রা হইছে গো! এক্কেবারে কটকটানী বইয়ের ভাষায় ফটফটানী! তিন দিনেই ভাতেরে অন্ন কইবার লাগছে!'

শিমুল জ্বলন্ত চোখে আরো একবার ফেলু মেম্বরকে দেখে। সে আর কোনো কথা না বোলে ঘুরে, পা ফেলে রাস্তা পার হয়ে বট গাছের তলা দিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু তার মনে ফেলু মেম্বরের কথার গুবরে পোকা গুনগুনাতে থাকে–নতুন বাবা মানে? শুদ্ধ কোরে কথা বলাটাও কি দোষের? ওর সব রাগ ধীরে ধীরে মায়ের উপর গিয়ে গড়াতে শুরু করে এবং এতোক্ষণ পরে সে সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলে।

পাকা পুলটার যেনো একটাই কাজ– খালের উত্তর পাড়ের বাজারের সাথে এ পাড়ের স্কুলের মিতালী পাতানো, মিতালীকে পাকা পোক্ত করা। প্রথম দৃষ্টিতে এমনই মনে হয়। বাজারটা বেশ জমজমাট। সপ্তায় দুই দিন হাট বসে। শনিবার আর মঙ্গলবার। এ পাড়ে, স্কুলের ঠিক সামনে দিয়ে খালের পাড় ঘেঁষে বেশ বড়ো সড়ো একটা কাঁচা রাস্তা পূব-পশ্চিমমুখি চলে গেছে। রাস্তার পূর্ব দিকে এঁকে-বেঁকে, এ-গাঁও ও-গাঁওকে ছুঁয়ে,কোথাও বুকে জড়িয়ে শিমুলদের বাড়ির সামনে দিয়ে উত্তর-দক্ষিনমুখি পাকা রাস্তার সাথে মিশে শেষ হয়েছে।

হোস্টেলের দোতলা থেকে রাস্তাটা স্পষ্ট দেখা যায়। রাস্তা আর হোস্টেলের মাঝামাঝি জায়গায় এল প্যাটার্ণের একতলা পাকা স্কুল। স্কুল আর হোস্টেলের মাঝখানে বেশ বড়োসরো মাঠ। শিমুল হোস্টেলের দোতলা থেকে জানালা দিয়ে মাঠে তাকায়।

এই সাত-সকালের সোনালী রোদে মাঠে চুন দিয়ে বানানো বিভিন্ন আকারের বৃত্তগুলো ঝকমক করছে। ঝিলমিল করছে রাতে জমা শিশির ফোটা। পি.টি. স্যারের সাথে ছয়-সাতজন উপরের ক্লাসের ছাত্র কাজ করছে। কারো হাতে দড়ি, কারো হাতে কোদাল বা চুনের শুকনো গুড়ো। তিনজন ছাত্র পূর্ব দিকে মাঠের প্রান্ত ছুঁয়ে কাগজের রঙ্গীন নিশানা লাগানো দড়ির বেড় দিচ্ছে খুঁটি গেড়ে। আকাশে ছোটো ছোটো দু'এক টুকরো সাদা মেঘের স্তূপ। দু'টো মাইকে দেশাত্মবোধক গান বাজছে–'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা'। গুনগুনিয়ে মাইকের সাথে সুর ভাঁজে শিমুল। উত্তর পশ্চিম কোনার দিকে তাকাতেই সে দেখলো সাইকেল থেকে হেডস্যার নামছেন। পাশে দেশাই স্যার। শিমুল যত্ন কোরে আরো একবার মাথা আঁচড়িয়ে দোতলা থেকে দ্রুত নিচে নেমে আসে। আজ ১লা মার্চ, স্কুলের স্পোর্টস-ডে। এই স্কুলে ভর্তি হবার পর এটাই ওর প্রথম স্পোর্স ডে।

কোনো খেলায়ই শিমুল অংশ নেয়নি। ফুটবল সে ভালোই খেলে। দাবাও। কিন্তু দৌড় ওই পর্যন্তই। ক্লাশে আকারে উচ্চতায় সবচে' ছোটো শিমুল। আবার নিচু ক্লাশের ছেলেদের সাথে নামাও যায় না। এ কারণে কোনো বছরই শিমুল স্পোর্টস-এ সক্রিয় অংশ নেয় না, নিতে পারে

না। এবারও নেয়নি। তবুও ওর ভেতরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। অনেক কাছে থেকে এবং অনেকক্ষণ ধোরে রিয়াকে দেখা যাবে, কথা বলা যাবে। হোস্টেলের পূর্ব পাশের স্কুলে যাবার পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শিমুল বারবার প্রতিজ্ঞা করে– যে কোরেই হোক, সে আজ রিয়াকে লজ্জা করবে না, অনেক কথা বলবে।

শিমুল শেষ পর্যন্ত মাঠে না থেমে এক পা দু-পা কোরে প্রেমতলায় চলে আসে। প্রেমতলা! প্রথম দিন শুনে শিমুল খুব হেসেছিল এবং কেনো যেনো সেই হাসিতে এক ধরনের লজ্জাও ছিল। বেহায়াপনার লজ্জা। আজকাল ওর আর তেমন কোনো অনুভূতি হয় না। রাস্তাটা ইঁট বিছানো। রাস্তাটা মেয়েদের হোস্টেলের গেট থেকে স্কুলকে গজ ত্রিশেক পুবে রেখে খালের পাড় ঘেঁষা কাঁচা রাস্তায় এসে মিশেছে। রাস্তার দুই পাশে দুই সারিতে নারকেল গাছ। রাস্তার শেষ প্রান্তে কাঁচা রাস্তার মিলনস্থলে বিশাল একটা গেট দিয়ে ইঁট বিছানো রাস্তাকে আলাদা কোরে আলাদা মর্যাদা দেয়া হয়েছে। গেটটা দিনের বেলায় কখনো বন্ধ হয় না, দারোয়ানও থাকে না। গেটের কাছে প্রাচীর ঘেঁষে দুই পাশে বিশাল দু'টো কৃষ্ণচূড়া গাছ। ভীষণ নিরিবিলি এলাকা। কৃষ্ণচূড়ার এই ছায়াটুকু, এই নিরিবিলি জায়গাটুকুর নামই কবে যে কে প্রথমে প্রেমতলা রেখেছিল, তা কারো জানা না থাকলেও নামের স্বার্থকতায় কারো মনে কোনে প্রশ্ন জাগে না।

কৃষ্ণচূড়া গাছ দুটো লালে লাল হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে থোকা থোকা কচি সবুজ পাতা ফুলের লাল রঙকে আরো বেশি মাতাল কোরে দিয়েছে। কৃষ্ণচূড়ার লাল রঙ শিমুলের চোখে মাদকতার প্রলেপ এঁকে দিলো। সে তাকালো এদিক-ওদিক। কেউ নেই। পকেট থেকে চাবি বের করলো সে। চাবি দিয়ে সে দাগ কাটতে থাকে। দাগগুলো একসময় বর্ণ হয়। তারপর শব্দ- "রিয়া+শিমুল।" লেখা শেষ কোরেই শিমুল দ্রুত সরে পড়ে। সে আস্তে আস্তে মেয়েদের হোস্টেলের দিকে হাঁটতে থাকে। ওখানে রানু আছে। রিয়ার পরিচয় ওই রানুর কারণেই। একই ক্লাশে পড়ে। খুশির দোলা লাগে শিমুলের। প্রথম দিনই কি অবলীলায় শিমুলের সামনে রিয়া হেসে হেসে ঝগড়াটে সুরে বলেছিল, 'এই রানু, আমি তোর সাথে পড়ি, না তুই আমার সাথে পড়িস?' চমকে উঠেছিল শিমুল। এতো সুন্দর গলার স্বর! এতো শুদ্ধ ভাষা এই গ্রাম্য স্কুলে? হাসলে মুখের ভেতরের দিকে বাঁকা একটা দাঁত দেখা যায়। শিমুলের ভারী সুন্দর লাগে সেই দাঁত, সেই মুখের হাসি।

সেই যে শিমুলের কি হলো, ঘুরে ফিরে কেবলই রিয়াকে দেখতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে কথা বলতে। হয়ও, তবে পকিল্পনার সিকি ভাগও না। কেনো যেনো অদ্ভুত একটা লজ্জা রিয়াকে দেখামাত্রই শিমুলকে ঘিরে ফেলে! পরে নিজের উপরই রাগ হয় ওর। রিয়াও যেনো বোঝে। শিমুলকে দেখলেই সুন্দর কোরে হাসে, রানু থাকলে খুনসুটি করে। কাঁটাটা শিমুল সত্যিই বেশ যত্ন কোরে রেখে দিয়েছে। রিয়াটা ভারী দুষ্টো । এইতো সেদিন সে স্কুলে আসছিল। পথে শিমুলের সাথে দেখা। শিমুলকে দেখেই কি মিষ্টি কোরে রিয়া হাসলো। তারপরই, কথা নেই বার্তা নেই, হুট কোরে এগিয়ে গিয়ে চারা খেজুরগাছ থেকে একটা কাঁটা ভেংগে আনে। শিমুল প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি। রিয়া হাসতে থাকে। পেছন ফিরে ফাঁকা রাস্তাটা একবার দেখে নেয় সে। চোখে মুখে দুষ্টোমির ঝিলিক। শিমুলের একদম সামনে এসে দাঁড়ায়। শিমুলের

তখন দম বন্ধ হবার অবস্থা। এতো কাছে এবং এতো নিরিবিলি আর একা রিয়াকে আগে কখনো দেখেনি সে। রিয়া খেজুর কাঁটাটা শিমুলের দিকে বাড়িয়ে ধোরে হাসতে হাসতে বলেছিল– 'নাও।'

শিমুল হতভম্ব। কি করা উচিত তা সে সাথে সাথে বুঝে উঠতে পারছিল না।

রিয়া হেসে আবারো বলেছিল– 'কি, নেবে না!'

সম্মোহিতের মতোই শিমুল হাত বাড়িয়ে সেই খেজুরের কাঁটাটা নিয়েছিল।

কি অদ্ভুত রুনুঝুনু হাসির শব্দ। যেনো অজস্র চুড়ির টুংটাং মাতাল উল্লাস! পাশ কাটিয়ে রিয়া চলে গিয়েছিল আর একটিও কথা না বোলে, মুখে বই চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে।

মাঠের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণায় কাঁঠাল গাছে হেলান দিয়ে শিমুল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে। কিন্তু রিয়ার কোনো পাত্তা নেই। একটু একটু কোরে ওর রাগ হতে শুরু করে। রেগে মেগে চলে যাই, চলে যাই কোরেও শিমুল ঘন ঘন পেছন ফিরে তাকায়। কত্তো ছাত্র-ছাত্রী আসছে-যাচ্ছে, কিন্তু রিয়া ও রানু নেই। মাইকে বার বার বলা হচ্ছে যেনো স্বেচ্ছা সেবকরা বদরুল স্যারের কাছ থেকে নিজ নিজ ব্যাজ নিয়ে লাগিয়ে নেয়। বদরুল স্যারের উপরও হঠাৎ কোরে শিমুল মনে মনে মেজাজ খারাপ কোরে ফেলে। এতো তাড়া কিসের? কিন্তু উপায় নেই। কাঁঠাল গাছের একটা ডাল হেঁচকা টানে ভেংগে ফেলে শিমুল মাঠে নেমে পড়ে।

কাজের ফাঁকে রিয়া ও রানুর উপর থেকে শিমুলের সবটুকু রাগই এক ফাঁকে টুক কোরে উবে যায়। সেই সাথে রিয়া বা রানুর কথাটাও। কিন্তু দুইজন ফাইভ-সিক্সের ছাত্র ওর পাশ কাটিয়ে দৌড়ে পশ্চিম দিকে যেতেই শিমুল চোখ তুলে তাকালো এবং রানুকে দেখতে পেলো। কিন্তু রিয়া নেই। ওর চোখ-দু'টো ক্ষিপ্রতায় এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে। নেই, কোথাও রিয়া নেই। রাগে সাথে সাথে সে মনে মনে ঠিক কোরে ফেলে, রিয়া আসলেও শিমুল যাবে না, কথাও বলবে না। এসব ভাবতে ভাবতে শিমুল একটু একটু কোরে রানুদের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। রানুরা মাঠে ঢুকে গেছে। ওরা পাঁচজন। রানু, তটিনী, ছন্দা আর রিয়ার বড় বোন পর্শী; অন্য মেয়েটাকে শিমুল মুখে চেনে, নাম জানে না। ওরা পাঁচজন একটা ভ্যান ঠেলে আনছে। ভ্যানের হ্যান্ডেল ধোরে সীটে বোসে আছে তটিনী। ওর বাঁ পাশে মুখ-চেনা মেয়েটা, ডান পাশে রানু। পেছনে পর্শী আর ছন্দা ভ্যান ঠেলছে।

ভ্যানে নিশ্চল একটা মূর্তি। দাঁড়ানো ভঙ্গীমাটা কেমন চেনা চেনা। হঠাৎ কোরে ওর মনে পড়লো– ভঙ্গিমাটা রাধা কৃষ্ণের। মূর্তির চুল এবং শরীরের খোলা সব অংশ কাদা দিয়ে লেপা। কাদা আর রঙ দিয়ে রাঙ্গানো মূর্তিটি নারীর। পরনে আগুনরংগা লাল একটা শাড়ি, পাড় ধবধবে সাদা রংয়ের। কলাপাতা রংয়ের ব্লাউজ। পায়ে আলতার ছোপ, কপাল থেকে

গাল ও চোয়াল পর্যন্ত চমৎকার আল্পনা আঁকা। শাড়ির আঁচল পিন দিয়ে কাঁধের কাছে আটকানো, বাতাসে হালকা ভাবে উড়ছে। শাড়ি গাছকোমর কোরে পরা। চমৎকার ছদ্মবেশ। হঠাৎ কোরে সারা মাঠ প্রাণের উচ্ছলতায় দুলে উঠলো। শিমুল নারী মূর্তিটিকে চিনতে পারলো না।

ডাক্তারটা যেনো মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো। ইয়া লম্বা গোঁফ তার আর হাঁটু ছাড়ানো শার্ট। একপায়ে বেশ দামি একটা পলিশকরা জুতা, অন্য পায়ে ছেঁড়া সাদা একটা কেডস। দেখা মাত্র হাসি লাগে। ভ্যানে লুটিয়ে পড়া মূর্তির ছায়ার এখানে সেখানে নারকেলের খোল দিয়ে বানানো স্টেথিসকোপ লাগিয়ে সে মূর্তির নাড়ি দেখে কলাপাতায় প্রেসক্রিপশন লিখলো। ঝোলা থেকে তিনটে গোবরের শুকনো ঘুঁটি বের কোরে ভ্যানে রাখতেই পাগোলটা হো হো কোরে হেসে এগিয়ে আসে। হাঁটার ছন্দে সেকি কাঁপুনি, এই বুঝি হাটু ভেংগে পড়ে যায়। ভূতের অনুকরণে হাত আর ঠোঁট বেঁকিয়ে পাগোলটা কমিক করলো, নাচলো। ছেলে মেয়েরা হেসে এর ওর গাঁয়ে গড়িয়ে পড়ে। শিমুলও হাসে। কিন্তু মূর্তিটা নিশ্চল, মূক; যেনো সত্যিই ওতে প্রাণ নেই, ছিলো হয়তো কোন একদিন। মূর্তিটাকে হাসাতে ব্যর্থ হয়ে শেষে ডাক্তার ও পাগোল ফিরে যায়।

রাগ আর উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত শিমুল ঢেকে রাখতে পারে না। ছদ্মবেশটা দারুন হয়েছে। ঢংটা নতুন আর সুন্দর।। কিন্তু সে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। রানুর দিকে তাকিয়ে সে ঠোঁট ঠেঁকিয়ে বলে, 'ওঁ, কি আমার ডিসগাইজিং রে!'

রানু শিমুলের শ্লেষ গায়ে না মেখে সামনে থেকে পেছনে সরে পর্শীর জায়গায় গেল। পালা বদল। বসতে বসতে সে হেসে বললো– 'রিয়ারে দেখছোস ভাইয়ে?

শিমুলের গলায় ক্ষোভ– 'কি আমার ঠেকা রে, আমার তো কাজ নেই আর, রিয়ার খোঁজ নিতে সারাদেশ ঘুরে বেড়াই!'

রানু একটুও রাগ করলো না। হেসে হেসেই আবার বললো– 'তুই না একটা কানা।'

প্রথমটায় শিমুল বুঝতে পারে না। তারপরই চমকে সে মূর্তিটার দিকে তাকায়। ভ্যান তখন মাঠ ছাড়িয়ে রাস্তায় উঠে গেছে। ঝাঁকুনি লাগে ভ্যানে। তাতে মূর্তির গায়ে সামান্য কাঁপন ওঠে। শিমুল মূর্তির চোখের দিকে তাকায়। এবার সে বুঝতে পারলো মূর্তির মুখাবয়বের আদলটা কেনো ভীষণ রকমের চেনা চেনা লাগছিল। রিয়া! শিমুলের চোখে মুখে বিস্ময় মিশানো আনন্দধারার কৌতুহল। আর এমন সময়ে মূর্তির চোখ দুটো খুব অল্প কোরে কেঁপে ওঠে কয়েকবার, তাকায় পিটপিট কোরে। এবং মুখে হাসির একটা তরঙ্গ নেচে উঠেই তৎক্ষণাৎ লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু তারও আগে শিমুলের দিকে মূর্তিটা বাঁ চোখ টিপে দেয়। শিমুলের বুক সাথে সাথে লাফিয়ে ওঠে এবং এক মুঠো লজ্জার আবিরতা ওর চোখ মুখ রাঙ্গিয়ে দিয়ে যায়। ভ্যানটা ধীরে ধীরে চলে যেতে শুরু করে। শিমুল আর পিছু পিছু না হেঁটে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে মূর্তিটা অপলকে দেখতে থাকে। শিমুল কোনোভাবেই আর কাজে মন বসাতে পারে না। স্পোর্টস আরম্ভ হয়ে গেছে সেই কখন, ইতোমধ্যে বেশ কিছু খেলাও শেষ। ঘেমে শিমুল একদম অবজবে হয়ে আছে। বাতাসও হঠাৎ কোরে এমন একটা দিনে কেনো যে থেমে গেছে! সে শার্টের বুক-বোতাম খুলে বুকে মুখ দিয়ে ফুঁ দিয়ে রাস্তার দিকে তাকায়।

রিয়ারা ফিরে আসেনি। গোসল কোরে ঠিকঠাক হতে কতোটুকুইবা সময় লাগে? অথচ প্রায় একঘন্টা ইতোমধ্যেই পেরিয়ে গেছে। এদিকে ভলান্টিয়ারদের বেশ কয়েকজনের খোঁজ নেই। সব ফাঁকিবাজ। শিমুল ওদের উপর সত্যি সত্যিই রেগে ওঠে। কিছু বলাও যায় না, সিনিয়র! কাজে ফাঁকি দেয়া শিমুর মোটেই সহ্য করতে পারে না।

ছোট্ট ঘন্টির টুনটুন শব্দে শিমুল কাঁঠাল গাছের দিকে তাকায়। আইসক্রীমওয়ালা। শিমুল হেসে ফেলে। মাঝ বয়সী লোকটাও যেনো স্থান-কাল বুঝে নিয়েছে। মাথায় চোঙা জাতীয় টুপি, কোমরে লেজ লাগানো বেল্ট। ওর খুব আইসক্রীম খেতে ইচ্ছে হলো।

একটা আইসক্রীম কিনে মুখে দিয়ে শিমুর উত্তর দিকে তাকিয়ে মাঠের দিকে মাত্র দুই পা এগিয়েছে, এমন সময় ওদের দেখা গেলো। পাঁচ-সাত জনের জটলা। রিয়াও আছে। শাড়ি পাল্টে কালো রংয়ের সালোয়ার কামিজ পরেছে। শিমুল চোখ ফেরাতে পারে না, আবার লজ্জায় তাকিয়েও থাকতে পারে না। ধীরে ধীরে ওর পা দুটো একটু একটু ভারী হয়ে ওঠে। রানুটা যে কি! এমন একটা সময়, অথচ ও এখন হাওয়া।

রিয়ার হাতে বাদামের প্যাকেট। শিমুলের দিকে তাকিয়ে সে হাসলো। হেসেই জিজ্ঞেস করলো–'রানু কোথায়?'

প্রশ্নটা শিমুলের, অথচ কোরে বসলো রিয়া! শিমুল হতভম্ব হয়ে পড়ে। কিন্তু সাথে সাথেই কথা আরম্ভ করার রিয়ার কৌশলটা সে ধোরে ফেলে। নিজের উপর রাগ হয় শিমুলের। রিয়ার কাছে বার বার সে কেবল হেরেই যায়। ডান হাত থেকে আইসক্রীমটা বাঁ হাতে নিয়ে এবার শিমুল জবাব দেয়, 'কি জানি, এখনো বোধ হয় আসেনি। আমিতো ওর অপেক্ষায়ই দাঁড়িয়ে আছি।'

রিয়া যেনো এবার একটু বেশি কোরে হেসে ফেললো। শব্দ নেই সেই হাসিতে। শিমুলের মনে হলো, হাসির ভেতর দিয়ে রিয়া যেনো ওকে বলছে- 'অপেক্ষা, না? মিথ্যুক কোথাকার! আচ্ছা একটা ভীতুর ডিম!

রিয়া বাদামের প্যাকেট এগিয়ে ধরে– 'বাদাম নাও। শিমুল লজ্জার সাথে হাত বাড়ায়।'

তটিনী বোলে উঠলো–'শিমুল ভাই, আমাদের আইসক্রীম খাওয়াবেন না?' শিমুল সাথে সাথে রাজি। রিয়া আরেকটু সরে এসে বলে, 'আমি তোমার হাতেরটা খাবো।' শিমুল হাসে। হেসে বলে, 'আমি মুখে দিয়েছি যে!'

'সে জন্যেইতো তোমারটা খাবো।'

শিমুল রিয়াকে বুঝে উঠতে পারে না। রিয়া হাত থেকে আইসক্রীমটা নিয়ে হাসতে হাসতে মুখে দেয়। শিমুলের দিকে আর একবারও না তাকিয়ে সে অন্যদিকে পা বাড়ায়।

পাশে দাঁড়ানো সিনিয়র ছাত্রের হাতঘড়িতে শিমুল তাকিয়ে দেখলো ,'একটা বেজে সাত মিনিট। এইমাত্র হেড স্যার স্পোর্টস ডে'র শুভেচ্ছা বাণী শেষ কোরে পুরস্কার বিতরণের কথা ঘোষণা

করেছেন।। ঝিমিয়ে পড়া দর্শক, গার্জিয়ান, ছাত্র-ছাত্রী ও খেলায় অংশ গ্রহনকারীরা যেনো নতুন উদ্দীপনায় নড়ে চড়ে উঠলো। একটা মৃদু গুঞ্জন।

'এক্সটেন।'

'নিউটেন!'

শিমুলের রক্তের কানায় কানায় টান। এবার নাইন।

হেডস্যার মাউথ পীসের সামনে মুখ নিয়ে স্বভাবসুলভ হাসি-খুশি মুখে ডাকলেন– 'ক্লাশ নাইন। ফাস্ট বয়-শিমুল!'

চারদিকে গতানুগতিক হাততালি। কিন্তু শিমুলের মনে হলো, হাততালির শব্দটা এবার যেনো বহুগুণ বেড়ে গেছে। ওর শরীর কাঁপছে। এই একই পুরস্কার ও প্রতিবছরই পেয়ে আসছে। গতবছরও পেতো, কিন্তু স্কুল বদলানোর জন্যে পায়নি। তবে এবারের অনুভূতিটাই ভিন্ন। ভীড়ের মাঝখান দিয়ে গাঘেঁষা রাস্তা দিয়ে শিমুল স্টেজের দিকে এগিয়ে যায়।

একটা পকেট ডিকশনারী, একটা ফাউন্টেন পেন, এক দোয়াত কালি, সাথে বেশ মোটা সোটা একটা সাদা খাতা– বাউন্ড বুক ফার্স্ট বয় হিসেবে শিমুলকে পুরষ্কৃত করা হয়। ফিরে এসে আড় চোখে শিমুল রিয়াকে খোঁজে। খুশির ভাগটুকু চোখের ভাষায় জানানোর তীব্র এক ছটফটানী। কিন্তু আশে পাশে রিয়াকে সে খুঁজে পায় না।

আরো একবার শিমুলের ডাক পড়ে। ডাকটা অপ্রত্যাশিত। বয় অব দি স্কুল। এবার আর আগের সেই এলামেলো ভাব হলো না, তবে বুকের হার্টবিট ঠিকই বহুগুণ বেড়ে ওঠে। এবার পেলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছোটোদের ভোলানাথ' আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মেজদি'। শিমুল ভীষণ খুশি। আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে পূর্বের পুরস্কারগুলো নিয়ে সে আস্তে আস্তে ভীড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে। দুই হাতে প্রাইজ। সে আড়চোখে মেয়েদের জটলার দিকে তাকায়। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর রানুর সাথে ওর চোখাচোখি হয়। রানু রিয়ার হাত ধোরে শিমুলের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসে। ওদের সাথে ছন্দা আর মলী। মলী রিয়ার ছোটো বোন।

শিমুলের হঠাৎ কোরেই ইচ্ছেটা হলো রিয়াকে দুটো বইয়ের যে কোনো একটা দেয়ার জন্য। 'পড়ার জন্য নাও' বোলেই দেয়া যাবে। শিমুল খুব দ্রুত পকেট থেকে কলম বের কোরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর মেজদি বইয়ের ভেতরে সাদা পাতাটায় শুধুমাত্র নিজের নাম লিখে নিচে তারিখ দিয়ে ফিরে তাকালো। রানুরা ততোক্ষণে ওর পেছনে এসে গেছে। রিয়ার চোখেই শিমুলের প্রথম চোখ পড়ে। সাথে সাথে ধাক্কা খায় শিমুল।

কেমন একটা বিদ্রুপের ভাবভঙ্গিমা। রিয়া ঠোঁট বেঁকিয়ে শিমুলের হাত থেকে নেয়া রানু ও মলীর হাতের প্রাইজগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে– 'কি আমার হাতি-ঘোড়া প্রাইজ রে! আমাকে দিলে আমি ফেলেই দিতাম!'

ছন্দা সাথে সাথে জবাব দেয়– 'তুই পেলে তো? অংকে কতো পেয়েছিলি? তিন তিরিশে তেত্রিশ। ইংলিশে? তাছাড়া তোর কম্মো না ওর মতো গার্ল অবদি স্কুল হওয়া।' রানু হেসে বললো– 'গ্রেপস আর সাওয়ার।' মলী রানুর হাত থেকে ছোটোদের ভোলানাথ বইটা কেড়ে নিয়ে দৌড়ে একটু সরে গিয়ে সুর কোরে বললো– 'এটা আমি দেবো না।'

এক ফালি মেঘের ফাঁদে রোদ আটকে পড়ে। শিমুলের মাথা ঝিম ঝিম করছে, শরীর কাঁপছে। রাগ, লজ্জা আর অপমানের সংমিশ্রিত অনুভূতির বিষন্ন ধুসরতায় ওর চোখ-মুখ ম্লান হয়ে ওঠে। শিমুল চোখ তুলে তাকাতে পারে না। মাথাটা ওর একটু একটু কোরে ঝুলে পড়ছে। একটু আগেও কতো আনন্দ ছিলো, ছিলো স্বপ্নচারী অনুভূতির আদিগন্ত রঙধনু সিঁড়ি। সব যেনো এক ফুৎকারে গুঁড়িয়ে গেছে। ভেতরে কেবল একটা প্রশ্নের ডানা ঝাপটানি অনুরণন– 'রিয়া, এভাবে বলতে পারলে?' এক দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে হলো ওর। কিন্তু সত্যি সত্যি দৌড় না দিয়ে শিমুল মাথা নিচু কোরে, জোরে ঠোঁট কামড়ে ধীরে ধীরে হোস্টেলের দিকে হাঁটতে শুরু করে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়ার মতো এক ধরনের আড়ষ্টতা। পায়ের ওঠা-নামায় ছন্দ মেলে না।

রানু পেছন থেকে ডাকে– 'এই ভাইয়ে, এই গুলো নিবিনে? নিয়ে যা।'

শিমুল দাঁড়ায় না, একবারও তাকায় না পেছন ফিরে। সে এখন পালাতে পারলে বাঁচে।

রুটিন অনুযায়ী প্রাত্যহিক সব কাজ সেরে শিমুল স্টাডি রুমে যায়। নিজের ডেস্ক-এর চেয়ারে গিয়ে স্টাডি রুমে এ সময়টায় সচরাচর কেউ থাকে না। হাতে এখনো অনেক সময়; সেই আটটায় স্কুল। শিমুল 'দস্যু ফ্লাইং হুড' বইটি ডেস্ক থেকে টেনে বের করতে যায়। মাত্র কয়েক পাতা বাকি থাকতেই রাতে লাইট অফ হয়ে গিয়েছিল। এক শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তখন ফ্লাইং হুড! ফ্লাইং হুডের সাথে শিমুলও যেনো যন্ত্রচালিত কুকুরের হিংস্র আওতায় পড়ে গিয়েছিল!

বইটি টান দিতেই খাতাটি নিচে পড়ে গেলো। পিঠ বেঁকিয়ে শিমুল খাতাটি তোলে। ভাজখোলা পাতায় কবিতা। কাল রাতে শিমুল লিখেছে। ক্লাশের পড়া কমপ্লিট করতে ওর তেমন একটা

বেগ পেতে হয় না। কিন্তু নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সবাইকে স্টাডি রুমে থাকতেই হবে। ওই সময়ে আবার গল্পের বইও পড়া চলে না। তেমন একটা সময়েই কাল সে কবিতাটি লিখেছিল। মাঝে মাঝেই লেখে। গতরাতে লেখা কবিতাটি সে পড়তে শুরু করে এবং তখনই মোটর সাইকেল এসে থামে। অতুলদা! শিমুল অবাক, হতভম্ব। এই সাত-সকালে অতুলদা কোত্থেকে এলো, কেনো এলো, সে ভেবে বুঝে উঠতে পারে না। তবে ওর বেশ আনন্দই হচ্ছে। হতভম্ব ভাবটুকু কেটে যেতেই সে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে! মোটর সাইকেল নিয়ে অতুলদা ওকে দেখতে এসেছে!

অতুল ধীরে সুস্থ্যে মোটর সাইকেলের স্টার্ট বন্ধ কোরে নেমে এসে শিমুলের পিঠ চাপড়ে দেয়। 'কিরে, কেমন আছিস?'

'ভালো।'

'পড়ছিলি বুঝি?'

শিমুল মোটর সাইকেলের হেড লাইটে হাত রেখে ঘাড় কাৎ করে।

'গুড'। অতুল কব্জি ঘুড়িয়ে ঘড়ি দেখে। 'এক কাজ কর শিমুল, তুই দুই সেট জামা-কাপড় গুছিয়ে নে, সেই ফাঁকে আমি তোর স্যারের সাথে কথা বোলে নিই।'

শিমুল প্রশ্নবোধক চোখে অতুলের দিকে তাকায়।

সামান্য হাসে অতুল। 'বুঝলিনে? বাড়ি যেতে হবে। কারণটা যেতে যেতেই বলা যাবে। নে, তাড়াতাড়ি করতো।'

শিমুল ছটফটিয়ে ওঠে– 'মা'র কিছু হয়েছে?'

'মারবো থাপ্পর!' অতুল হেসে ফেলে। 'তোর মা সম্পূর্ণ ভালো আছে। দাঁড়িয়ে রইলি যে? অনেক কাজ ফেলে এসেছি আমি, তাড়াতাড়ি কর। আমি তোর স্যারের কাছে গেলাম।'

দো'টানায় দুলতে দুলতে শিমুল দোতলায় উঠে কাপড় গোছায়। কই, মা'রতো তেমন কোনো বড় ধরনের অসুখ নেই! তবে কি দাদীর কিছু হয়েছে? না শিলু'পার?

মোটর সাইকেল চালাতে চালাতে শেষে অতুল মুখ খোলে– 'তোর দাদীর অসুখটা ইদানিং বেশ বেড়ে গেছে। বুড়িটা তোকে খুব কোরে দেখতে চাইছে।'

শিমুলের মন এবার আরো বেশি খারাপ হয়ে ওঠে। দাদীর অসুখ তো ওর কি? মন থেকেই শিমুল দাদীকে অপছন্দ করে। সেই ছোটো বেলায় বুড়ির চাহনিটা শিমুলের কাছে গল্পে শোনা ডাইনি বুড়ির মতো মনে হতো। সেই মনে হওয়াটা শেষ পর্যন্ত মনে স্থায়ী একটা ছাপ মেরে গেছে। না মেরেই কি হবে! বুড়িটা শুধু বিকুকেই আদর করতো। শিমুল গাছ থেকে একটা আম বা নারকেল কিংবা আতা পারলেই মুখ খিস্তি কোরে বুড়ি তেড়ে উঠতো। অথচ বিকুটা চোখের সামনে থেকে গন্ডায় গন্ডায় চুরি কোরে বেচছে, বুড়ি তাতে রাও করতো না, দেখেও

না দেখার ভান কোরে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখতো। তা ছাড়া শিমুল যতোই বড় হচ্ছে, চাপা একটা ক্ষোভ আর বিদ্রোহ ওর ভেতরে একটু একটু কোরে ততোই তেতে উঠতে থাকে। ওরই বাবার টাকায় কেনা প্রায় সব জায়গা-জমি। অথচ শয়তানি বুড়িটা প্রায় সব জায়গা-জমি ছোটো চাচা আর মার্গেটা ফুপুর নামে দলিল কোরে দিয়েছে। বাকিটুকু বিকুর নামে। শিমুলকে কিচ্ছু দেয়নি। তাইতো বাবা মারা যেতে না যেতেই ওরা এতো গরীব হয়ে গেছে, মাকে এতো কষ্ট করতে হচ্ছে। লোক মুখে শুনে শুনে শিমুল ইদানিং এইসব কথা বিশ্বাস কোরে নিয়েছে। এইতো সেদিন কথাটা মাকেও সে জিজ্ঞেস করেছিল। মা কোনো জবাব দেয়নি। শুধু ওর মাথার চুলগুলোয় এলোমেলো ভাবে বিলি কাটতে কাটতে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। শিমুল তাতেই জবাবটা পেয়ে গিয়েছিল।

অতুল্‌দার উপরই শিমুল রেগে উঠলো মনে মনে। আগে জানলে শিমুল মোটেই আসতো না। পাপ করেছো, ফল ভোগ করবেনা? বুনেছো ধান, পাট পাবে কোথায়? শিমুল মনে মনে দাদীর উপর বেশি কোরে ক্ষুব্ধ হতে থাকে।

শিমুলেরই লাগানো বটগাছটা। তারই ছোট্ট ছায়ায় শিমুলকে নামিয়ে অতুল চলে গেলো দক্ষিণ দিকে। রোদ এখনো ততোটা তেতে ওঠেনি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিমুল ধীরে সুস্থে পা ফেলে বাড়ির দিকে এগুতে থাকে। পেয়ারা গাছের ডাল হেলিয়ে শিলু পেয়ারা পাড়ছিল। শিমুল শিলু'পার দিকে তাকিয়ে হাসে। হাসিতে আনন্দ নেই। কেমন বোকা বোকা আর বেদনা চুয়ে পড়া হাসি। শিলু ডালটা ছেড়ে দিতেই ঝপাৎ কোরে বাতাসে শব্দ ওঠে। হাতে একটাই পেয়ারা। কোনো ভাবনা চিন্তা না কোরেই শিমুলকে পেয়ারাটা দিয়ে শিলু চেঁচিয়ে ডাকে– 'মা, ভাইয়ে আইছে।'

শিমুল ঘর থেকে মায়ের গলা শুনতে পায়। 'হাত মুখ ধুইয়্যা তারে এহানে আইবার কও।' শিমুল দাদীর ঘরটা এড়িয়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢোকে। কাপড় পাল্টিয়ে নিজেই কলসী থেকে পানি ঢেলে এক গ্লাস পানি খায় । কেমন যেনো বমি বমি ভাব হচ্ছে ওর। সামনেই আয়না ঝুলানো। একটু বেঁকে মুখটা দেখে বাইরে বের হতেই ওর খেয়াল হলো– বিকুটা বাড়ি নেই। কেনো? শিলুকে কাছে পেতেই জিজ্ঞেস করলো– 'বিকু কই গ্যাছে, আপা?'

'ওর বাবাকে আনবার গ্যাছে। আইতে আইতে কাইল-পরশু হইয়া যাইবো। হেই পর্যন্ত কুটনী বুড়ি থাকলেই হয়!'

'অবস্থা বুঝি খুব খারাপ?'

'ডাক্তার কিছু কয় নাই। আমি মুখ দেইখাই বুঝবার পারছি। বুড়ির অহনে ঢং কতো, তিন চাইর দিন ধইরা প্যা প্যা কইরা কাইন্দা কাইন্দা খালি তোর নাম করতাছে। যা, একবার দেহা দিয়ে আয় গা।'

বারান্দায় ওর দিকে তাকিয়ে কালুটা শুয়ে আছে। কেমন নির্বিরোধী গো-বেচারা হাব-ভাব। কান দু'টো স্থির। চোখের দিকে তাকালেই সব জারি-জুরি শেষ, শয়তানী ভাবটুকু কেমন উথাল পাথাল করছে চোখ ভরে। শিমুল ওর বাঁ কানটা মলে দিয়ে দরোজার সামনে গিয়ে

দাঁড়ায়। কেমন উৎকট একটা গন্ধ! ভারী এবং অসহনীয়। প্রায় বমি কোরে ফেলছিল শিমুল। দ্রুত সামলে নিয়ে মনকে সে অন্যদিকে সরিয়ে আনে। মায়ের সাথে চোখাচোখি হয়। মাথার পাশে বোসে দাদীর ধবধবে সাদা চুলে বাঁ' হাতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর ডানহাত দিয়ে বাতাস করছে। পাশেই, বাক্সের উপরে বেশ কিছু ঔষধের বোতল আর ট্যাবলেট, কাপসুল। তিনটে ট্যাবলেট আর একটা খোলা ক্যাপসুল মেঝেতে পড়ে আছে।

লতা ছেলেকে ডাকে- 'ভিতরে আহো।'

আর তাতেই যেনো ঔষধের বিশ্রী আর ভারী গন্ধটা শিমুল ভুলে যায় । সে ধীরে ধীরে ভেতরে এসে মায়ের গা ঘেঁষে দাড়ায়।

দুই হাত একটুও বন্ধ না কোরে লতা বললো- 'মোড়াডা আইন্যা দাদীর মাথার কাছে বও বাবা। দাদী তোমার লগে কথা কইবো।'

কোন জবাব না দিয়ে শিমুল মোড়া এনে দাদীর মাথার পাশে বসে। লতা বৃদ্ধার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো- 'মা, শিমুল আইছে, তারে দেখবেন না?'

খুব ধীরে, অতি কষ্টে জেগে উঠছে শিমুলের দাদী। কেঁপে কেঁপে তার চোখের পাতা আলতো ভাবে খুলে যায়। চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত, উদভ্রান্ত দৃষ্টি শিমুলকে খুঁজে ফেরে কিন্তু পায়না। শিমুলের মন নরম হতে শুরু করে। নিজ থেকেই কানের কাছে মুখ নিয়ে সে ডাক দেয়-'দাদী, ও দাদী! এই যে আমি।'

শিমুলের ঝুলিয়ে রাখা মুখের দিকে বৃদ্ধা অনেকক্ষণ ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে। একবারও চোখের পাতা পড়ে না। যেনো চোখ দুটি পাথরের। ডান চোখ তুলনামূলকভাবে বেশি ঘোলাটে। দুইঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। মুখের দাঁতহীন মাড়ি দেখা যাচ্ছে। রক্তহীন, সাদাটে।

যেনো পাথর ফেটে জল বেরোচ্ছে! চমকে ওঠে শিমুল। দাদীর চোখে জল! জলের ফোটা দু'টো গড়িয়ে নাকের পাশে চামড়ার ভাজে জমে থাকে। বৃদ্ধা তার শীর্ণ ডান হাত নিজের বুকের উপর দিয়ে অতি কষ্টে এবং ধীরে ধীরে টেনে এনে শিমুলের হাত ছুঁয়ে দেয়। হাতটা কেমন বিশ্রীভাবে কাঁপছে। চামড়ায় ফাটা ফাটা দাগ, ঝুলে আছে।

অনেক চেষ্টা কোরেও বৃদ্ধা নিজের হাত শিমুলের পেট ছাড়িয়ে উপরে তুলতে পারেনা। প্রচেষ্টায় কি আকুতি! অদ্ভুত একটা অনুভূতি শিমুলের বুক দুমড়িয়ে দেয়। আবেগে ওর গলা বুঁজে আসে। ঠোঁট কামড়ে ধরে সে। দাদীর শীর্ণ হাতটা দুই হাতে আঁকড়ে ধোরে নিজের গালে, মাথায় ছোঁয়ায়। টুক কোরে ওর চোখ থেকেও ফোটায় ফোটায় জল গড়াতে শুরু করে। বৃদ্ধার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। পিনপিনিয়ে শব্দ হয় ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে। শিমুল সেই শব্দের অর্থ বুঝতে পারে না।

মায়ের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। শিমুল শার্টের হাতা দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে মায়ের দিকে তাকায়। শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখ মুছে মা বললো- 'দাদী জিগাইতাছে, তার উপরে তুমি রাগ কইরা আছো নাকি।'

শিমুল কোন জবাব দেয় না।

খুব নরম গলায় মা আবার বলে- 'কও বাবা, হ্যার উপরে তোমার কোন রাগ নাই।'

শিমুল মায়ের দিকে তাকায়। মা যে কেনো বুঝতে চায়না! তাছাড়া, দাদী মরে যাচ্ছে, তাকে কি মিথ্যে কথা বলা উচিত?

লতা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ছেলের দিকে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে।

'দাদী মইরা যাইতাছে। দীলে শান্তি দেওনের লাইগা একটু-আধটু মিছে কথা কইলে কিছু হইবো না। কও বাবা, দেহ না দাদী কানতাছে?'

এক মুহূর্ত ভাবলো শিমুল। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সংঘাত। শেষে দাদীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেলো- 'তোমার উপরে আমার কোনো রাগ নাই,দাদী।'

'দাদীরে তোমার লাইগা দোয়া করবার কইলা না? বাবা, মানুষ মরনের সময় যে দোয়া করে, তা' কামে লাগে। দাদীর কাছে দোয়া চাও, বাবা।'

লতা নিজেই মুখটা বৃদ্ধার কানের কাছে এনে বললো-'মা, আপনার নাতিরে তো কিছুই দিয়া গেলেন না। তার লাইগ্যা আমাগো দুঃখ নাই। তয়, আপনি হেরে পরাণ ভইরা দোয়া কইরা যান যেনো মানুষ হইবার পারে।'

শিমুল স্পষ্টতই বুঝলো, প্রচন্ড বেদনার একটা দলা মায়ের কণ্ঠনালীতে এসে আটকে আছে। কিন্তু সেই কষ্টটার কথা মা কাউকেই বুঝতে দিতে চায় না।

'কই, দোয়া চাইলা না বাবা?'

দাদীর হাতটা ধীরে ধীরে শিমুল পাশে নামিয়ে রাখে। চোখ দু'টো আরো একবার হাতের চেটো দিয়ে মুছে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট কোরে বললো– 'না। আমার কারো দোয়া লাগবে না।'

আর না দাঁড়িয়ে থেকে শিমুল ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

উঠানে নেমেই শিমুল পায়ের গতি বাড়িয়ে দেয়। শিলু পেছন থেকে ডাকে– 'কই যাস ভাইয়ে, নাস্তা খাবিনে? নাস্তা বাড়া হইছে, খাইয়া যা।'

শিমুল একবার পেছন ফিরে তাকায় ঠিকই, কিন্তু জবাব না দিয়ে সে উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় চলে যায়। আর ওখানেই সে মার্গেটা ফুপুর একদম মুখোমুখি গিয়ে পড়ে। কাচুমাচু হয়ে শিমুল থমকে দঁড়ায়। মার্গেটা ফুপু শিমুলের দিকে কুতকুতে চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে দেখে। তারপর সাপের হিসহিস শব্দে বিষের শ্লেষ ঢেলে বলে, 'আইয়া পড়ছো বাপধন! মাছি তাইলে ঠিক সময়েই শকুনের কানে খবরটা পৌছাইয়া দিছে! তয়, মাছিডে কেডাগো, বাপ?'

ফুপুর কথায় শিমুলের সারা শরীরে ঘৃণার কাতুকুতু লাগে। শিরায় শিরায় বয়ে যায় রাগ আর ক্ষোভের উন্মত্ত আথালি-বিথালি। সে অতি কষ্টে আত্ম-সম্বরন কোরে মাথাটা একবার তুলে ফুপুর দিকে তাকিয়ে বলে– 'ভালো আছো, ফুপু?'

চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় মার্গেটার।

'ওমা, এইডা যে দেহি দুই কান কাডা বেহায়া গো, শিয়ানা ঘুগু! ত, ভালাই। যেমন মা, তেমন তার পোলা। তয় বাবা,ভুল যায়গায় হাতড়াইতাছো,কাম হইবো না। মার কই কি গয়না-গাড়ি আছে,কোন জায়গায় আছে ট্যাহা-পয়সা, আমার তা ভালাই জানা ।কোনো ফায়দা হইবো না।' চোখ কুঁচকে নতুন কোরে শিমুলকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বাদুর চোষা ক্ষুধাতুর চোখে দেখতে দেখতে সে আবার বলে-'এরই মইধ্যে দুইএকটা সরাও নাই তো?'

শিমুল আর সইতে পারে না। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। প্রায় ধমকে ওঠে সে। সেখানে শুধু ঘৃণা আর ক্ষোভ– 'চুপ করো ফুপু, ছি! দাদী মারা যাচ্ছে, আর তুমি তার গয়না-গাটির হিসাব নিয়ে মরছো? তোমার একটুও বিবেক-বিবেচনা নেই? শরম করে না তোমার?'

'ওমা, এযে দেহি চোরের মার বড় গলা গো, কুলোপনা চক্কর! এই হারামজাদা,এদিকে আয়, আয় কইতাছি! তর পকেট দ্যাহা।' মার্গেটা হাত বাড়িয়ে শিমুলকে ধরতে যায়। রাগে গা ধাক্কা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিলো শিমুল। পাশ কাটিয়ে সে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে। মার্গেটা চেঁচিয়ে ওঠে– 'চোর, চোর,ডাকাইত! আমারে মারলি, তোর এতো সাহস! খাড়া,তরে ওলার গু খাওয়াইয়া ঝাটা মাইরা যদি ভিটা ছাড়া না করছি, আমি বাবর আলীর মাইয়াই না।'

জবাব না দিয়ে শিমুল দ্রুত দুরত্ব বাড়িয়ে দেয়।

বটগাছ তলার চাস্টল থেকে একটা ক্রীম বিস্কুট আর চা খেলো শিমুল। ওর কিচ্ছু ভালো লাগছে না। দোকানে বেশ কিছুক্ষণ বোসে থাকলো, যদি অতুলদা ফিরে আসে! কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি। ধীরে ধীরে সে হাসেমদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে।

চৌরাস্তার কাছাকাছি গিয়ে বেশ আশ্চর্য হলো সে। এখন হাসেমের স্কুলে থাকার কথা। অথচ হাসেমের হাতে কোদাল। ছয়-সাতজন মিলে মাটি কাটছে। জাম গাছের সামান্য পূবে বেশ উঁচু কোরে তোলা ভিটেয় একটা অসমাপ্ত কুঁড়ে ঘর। কুঁড়ে ঘরের সামনে বাঁশ দিয়ে একটা সাইন বোর্ড টাঙ্গানো, কাঁচা হাতের লেখা– 'উত্তরণ সংঘ'।
শিমুলকে দেখে হাসেম মহাখুশি– 'কোন সময় আসালি?'
শিমুল জাম গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। 'সকালে। স্কুলে যাসনি?'
'স্কুলে গেলে এখানে থাকতাম নাকি? ক্লাব ঘরের মাটি তুলছি।'
'কিসের ক্লাব?'
'ওহ্‌হো, তুইতো শোনছনায়। অনেক পরিকল্পনা আছে, বুঝলি? চাঁদা জমিয়ে ওই যে মনি মোহনের জমিটা, ওটা কিনে নেবো; ফুটবল খেলার দারুন মাঠ হবে। লাইব্রেরীও থাকবো। ষাট-সত্তরটা বই আমরা জোগাড় করছি। পত্রিকাও থাকবো। এই গাছের তলায় বোর্ড টাঙ্গিয়ে

ঝুলাইয়া দেবো। অতুলদা' তোরে কিছু বলে নাই? সামনের ইলেকশনে তগো ফেলু ফুপা চেয়ারম্যান ইলেকশন করবো। আমরা তার ইলেকশন কইরা দিলে একটা টেলিভিশন কিনে দেবে বলেছে।'

রহিম বক্সের ছেলে মুক্তার মাজা থেকে গামছা খুলে মুখ মুছতে মুছতে বললো– 'ফেলু মেম্বর দিব টেলিভিশন! আর মানুষ পাইলিনে! যা হারামির বাচ্চা হারামি, কেপ্টুশের এক শেষ।'
'দিলে দিবারও পারে। গম চুরির ট্যাকা তো,মহব্বত কম থাকে।'

শিমুল এবার আসল জায়গায় খোঁচা দিয়ে বলে– 'তোরা তা'হলে ফেলু মেম্বরের গম চুরিকে হালাল বানাতে চাইছিস?'

হাসেম আঁতে ঘা খেয়ে কঁকিয়ে ওঠে– 'মানে?'

শিমুল হাসলো। 'খুব সোজা কথা। চুরি করা গম বেচা পয়সায় তোদের টেলিভিশন কিনে দেবে, তোরা তা নিবি। সবাই এসে তোদের টেলিভিশন দেখবে, কথায় কথায় দাতা যে ফেলু মেম্বর, তা জানবে; প্রসংশা করবে। গম চুরির কথাটাই টেলিভিশনের আনন্দের পেছনে আড়াল হয়ে যাবে।'

মাটিতে কোপ মেরে হাসেম হাতের কোদাল দাবিয়ে নেয়। হাতলে বোসে শিমুলের দিকে তাকেয়ে বেশ অসহায় ভাবেই বলে– 'আমি তো আর তোর মতো ভালো ছাত্র না, তোর মতো বুঝিও না। অতুলদা তোরে ঠিকই বুঝাইতে পারবো। তুইও কিন্তু ক্লাবের সদস্য আছোস।ওহ্‌হো, ভালো কথা, তোর না দাবা আছে?'
'তাতে কি? খেলবি নাকি একচাল? শিখেছিস?'
'তোর খালি তেড়া কথা। তুই দাবাটা ক্লাবে দিয়া দে।'
'দিয়ে না হয় দিলাম। কিন্তু খেলবে কারা?'
'ক্যান, আমরা!'
'খেলতে শিখেছিস বুঝি?'
'তুই দুই একবার শিখিয়ে দিলেই পারবো। অতুলদা বলেছে।'
'যা, ধোরে নে দাবাটা তোরা পেয়ে গেছিস। দশ-বারোটা বইও আমার আছে, তা-ও দেবো। বলতে পারিস এটা তোদের কায়িক পরিশ্রমের বদলে আমার তরফের একটা ঘুষ।'
মুক্তার আবার ফোড়ন কাটলো– 'বাছুরের নাম নাই, দোনা লইয়া টানাটানি!'
শিমুল হাসেমের দিকে তাকিয়ে বলে- 'শুরুতেই তোদের কেমন কথা রে?'

হাশেম বেশ ক্ষোভের সাথেই জবাব দেয়– 'আর বলিসনে! আমরা এতাদূর এগিয়ে গেছি, আর এখন সবিতা গো মা বাধা দিচ্ছে। এই জমিটুকু নাকি ওদের! তুইই বল, এ একটা কথা হইলো? জন্মের পর থেকেই দেখছি, জমিটা আমাগো।'

রাস্তা দিয়ে গফুর মুন্সী হেঁটে যাচ্ছিলেন। হাসেমের কথায় তিনি থেকে দাঁড়ান। স্বভাব সূলভ ভঙ্গিমায় ডান হাত দিয়ে মুখ ভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়িগুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে তিনি খেলা

করতে করতে হাসেন। জ্ঞানী গুণী লোক হিসেবে এলাকার সবাই তাকে জানে, কম-বেশি মানেও। তিন তিনবার হজ্ব পালন করেছেন। প্রায় সময়ই হাতে কোনো না কোনো বই থাকে. একটু ফাঁক পেলে পাতা ওল্টান বেশ মনোযোগের সাথেই। মুখের হাসিটুকু সবসময় ঠোঁটের কোনায় উঁকিঝুঁকি করে। হাসেমের কথার রেষ ধোরে তিনি বললেন- 'জন্মের পর থেকেই দেখছিস, জমিটা তোদের, তাই না? ঠিকই আছে। কিন্তু দাদু, জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত, ঠিক এই মুহূর্ত পর্যন্ত তোরা বাইরে থেকে যা যা যেমনভাবে দেখেছিস, এখনো হয়তো বা যা দেখছিস, তা যে সবই সত্য, এমন কোনো নিশ্চিত সত্য কথা কিন্তু নেই। বাইরের খবর আর ভেতরের খবরের মধ্যে অনেক সময় যোজন যোজন ফাঁরাক থাকে। আমরা অনেক কিছুই বাহির থেকে দেখে মনে করি এটাই বুঝি একমাত্র সত্য, হক কথা। কিন্তু তলিয়ে দেখতে গিয়েই আঁতকে উঠি, গোমর ফাঁস হয়ে যায়। মেকি, একদম ফাঁকিটা ধরা পড়ে যায়।'

হাসেম কিছুটা হতাশ হয়। একটা কোনঠাসা ধরনের ভাব। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে একটু জোরেই সে বলে ওঠে- 'আপনি কি বলবার চান জমিটা আমাদের না?'

'না না দাদু, তা' আমি কোন সাহসে বলি? আমি তো আর তোদের বা সবিতাদের জমির হিসাবপাত্তির রাখি না!

'তবে?'

'আমি শুধু তোদের বলতে চাই, তোরা যা শুনিস, তা-ই বিশ্বাস করিস না। আল্লাহ্ চোখ দিছেন কেনো? চোখ দিয়ে ভালো কোরে দ্যাখ, কান দিয়ে শোন, তারপর নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার কর কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যে। সত্য-মিথ্যের এই ধন্ধ মানুষকে রাতারাতি অমানুষ বানিয়ে ফ্যালে, জীবনকে নষ্ট কোরে তোলে। তোদের যে এখনো অনেক পথ হাঁটতে হবে, দাদুরা! চোখ থেকেও অন্ধ আর কান থেকেও বধির হয়ে তোরা আর আমাদের সব কথায় জ্বি জ্বি কোরে ছোট্ট একটা গোলক ধাঁধাঁয় আটকে থাকিসনে।'

শিমুল বেশ আশ্চর্য হয়ে গফুর মুন্সীর দিকে তাকিয়ে থাকে। আজ সত্যি সত্যিই তাকে ভালো মনে হলো। এ-ও শিমুলের জন্যে একটা ধন্ধ। মানুষ এতো দ্রুত পাল্টে যায় কি কোরে? গফুর মুন্সী আজ কি সুন্দর বুদ্ধির কথা বললো। অথচ এই একই মানুষটা মাঝে মাঝে কি যে করে আর বলে, হিসেবে মেলে না। প্রচণ্ড গোঁয়াড়ের মতো চোখ কান বুঁজে থাকে, এক চুলও খোলে না। এই তো সেদিন বটতলায় হীরু মাস্টারের সাথে সে কি তর্কাতর্কি! অন্য সময় দুইজনের গলায় গলায় ভাব থাকলেও ওইদিন তা' একটুও ছিলো না, অন্তত ওই মুহূর্তে। কথা প্রসঙ্গে হীরু মাস্টার টেলিভিশনের কথা বলছিলেন। বুঝিয়ে বলছিলেন যন্ত্রটা কি! কিন্তু কেনো যে পাড় মাতালের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে গফুর মুন্সী হীরু মাস্টারের কথাগুলোকে পাত্তাই দিচ্ছিল না। তার এক সুর, ওসব না-ফরমানী কথা। শোনাও হারাম। ওই সব টেলিভিশন-টিশন সব বুজরুগি কথা, গাঁজাখুরী গল্প, একদম বাজে আর মিথ্যে।

স্বাভাবিক ভাবেই হীরু মাস্টারও ক্ষেপে উঠেছিলেন। তিনিও চ্যালেঞ্জ কোরে বসলেন, 'যে কোনো দিন বিকেলে বা সন্ধ্যায় আমার সাথে চলুন, খরচপাতি সব আমার। নিজের চোখেই

দেখে আসবেন।

গফুর মুন্সীর একই কথা, 'দূর, দূর; তওবা, তওবা। তার আগে আল্লাহ্ যেনো আমার চোখের নূর কেড়ে নেন।' মনে মনে কি যেনো আওড়ে চলেন গফুর মুন্সী। দ্রুত শব্দহীন ঠোঁট নড়ে, সাথে দাড়ি।

হীরু মাস্টারও ছেড়ে কথা বলতে নারাজ। ব্যঙ্গ মিশিয়ে তিনি জবাব দেন- 'ওটা তিনি আগেই কেড়ে নিয়েছেন, চোখ থাকতেও আপনি একটা অন্ধ। আসলে ওই যে আপনি মাঝেমাঝে জ্ঞানীর মতো আচরণ কোরে একটা ভড়ং ধরেছেন, লোকজন তা' একটু একটু কোরে বুঝে ফেলছে।

'মাত্রা ছাড়িও না মাস্টার, আল্লাহর লানোত পড়বো।'

'রাখেন আপনার লানোতের পিণ্ডি। আমি কি মিথ্যে কথা বলছি যে, লানোতকে ভয় পাবো? ওভাবে মিথ্যে ভয় আর লোভ দেখিয়ে কতোদিন চালাবেন, চাচা?'

'কি, আমি লোভ আর ভয় দেখাই?'

'আল্‌বত দেখান! কথায় কথায় আপনি দোজখের ভয় দেখান না?'

'মাস্টার, আল্লাহ্‌রে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছো তুমি? তামাশা করছো? উত্তেজনা থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে গফুর মুন্সী হতভম্ব হয়ে যান।'

হীরু মাস্টার আগের ধাপেই রয়ে গেলেন। আপোস করতে নারাজ। তিনি গফুর মুন্সীর কথা বলার ধরণ-ধারণে টললেন না। চিরাচরিত কিন্তু প্রায় অনতিক্রম্য ফাঁদটা অবলীলায় ডিঙ্গিয়ে তিনি বললেন, 'মোটেই না। আমাকে কিন্তু এবারও ভয় দেখানো হলো, দেখালেন আপনি। আমি ধর্মের নামে অধর্মের কথা, সংস্কারের ভয়ে কুসংস্কারে ডুবে থাকার পরিণাম আর লানোতের জুজুবুড়ির নামে বিজ্ঞানের সত্যকে অস্বীকার করার মতো বোকামির কথা বলছি। চাচা, পৃথিবীটা এক জায়গায় বোসে নেই, বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আপনি আমি মানি বা না মানি, মানুষের পা চাঁদে পড়েছে এবং তা টেলিভিশন নামক যন্ত্রের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ এই পৃথিবীতে বোসে থেকেই দেখেছে।

গফুর মুন্সী আর তর্ক করেননি। অতিদ্রুত নি:শব্দে ঠোঁট নেড়ে কিছু একটা আওড়াতে আওড়াতে চলে গিয়েছিলেন। সেই গফুর মুন্সীর সাথে আজকের এই গফুর মুন্সীকে শিমুল কিছুতেই মেলাতে পারে না। একই মানুষের মাঝে এতো পার্থক্য? কেনো? শিমুল কুল-কিনারা খুঁজে পায় না।

শেষ বিকেলে শিমুলের দাদী অনেকটা সুস্থ্য হয়ে ওঠে। মায়ের হাত ধোরে একবার উঠেও বসেছিল। কাটা কাটা বাক্যে কথা বলেছে। নাকি নাকি ভুতুড়ে ধরনের উচ্চারণ। বেশ মজা পেয়েছিল শিমুল। কিন্তু বেলাটা লালচে হতে না হতেই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। মায়ের কাকুতি মিনতি শোনেনি শিমুল। সকালের ঘটনাটুকু না বললেও শেষ পর্যন্ত মার্গেটা ফুপুকে সে ডাকতে গেলো না। শেষে শিলু গিয়ে ফুপুকে ডেকে নিয়ে আসে।

মার্গেটা ঘরে ঢুকতেই লতা উঠে যাচ্ছিল। বৃদ্ধা ক্লান্ত ফ্যাসফেসে গলায় বললো- 'বউ, তুমি

যাইও না, আমার কাছে বও।' বৃদ্ধা দম নেয়। সামান্য কাৎ হয়ে খুক খুক কোরে সামান্য কাশে। লতা মাথার পাশে দাঁড়িয়ে। বিছানার দক্ষিণ পাশে বোসে মার্গেটা মায়ের ডান হাত ধোরে থাকে।

'কইরে মার্গেটা, মতির বাপ যে একবারও আইলো না?'

মার্গেটা মুখ নিচু কোরে বলে– 'হেয় তো বাড়ি নাই মা, পাট লইয়া হাটে গ্যাছে।' বৃদ্ধা হতাশ হয়ে চোখ বন্ধ করে। চোখ না খুলেই বলে– 'বউ, বিয়ালের গাড়ি গ্যাছে গা?' লতা কোমর বেঁকিয়ে নিচু হয়ে উত্তর দেয়– 'হ মা। বিকুরা মনে হয় রাইতের গাড়িতে আইবো।'

'আর রাইত! মা মরা ছেড়াডারে গু-মুত কাইচ্ছা এতো বড় করলাম, আর শেষ বেলায় দেখবার পারলাম না।' শিমুলের দাদী কোঁকাতে থাকে।

'পারবেন না ক্যা? পারবেন। মনে সাহস আনেন।'

'আর সাহস বউ!'

বৃদ্ধা হঠাৎ কোরে প্রায় সবটুকু চোখ মেলে তাকায়। তারপরই ঠোঁট কামড়ে ধরে। মুখ কেমন বিকৃত হয়ে ওঠে। চোখ বন্ধ কোরে কি যেনো ঠেকিয়ে রাখার প্রাণান্ত লড়াই চালায় সে। মাচা থেকে মিন্টি বেড়ালটা মেঝেতে লাফিয়ে নামে। আড়মোড় ভেঙ্গে সামনের বাঁ পা দিয়ে মাথার কাছটায় চুলকে লতার দিকে তাকিয়ে ডাক ছাড়ে- 'ম্যাও।' কোনো ধরনের সারা না পেয়ে শেষে আরো একবার ডেকে ধীরে ধীরে বিড়ালটা বাইরে বেরিয়েই কালুর সামনে পড়ে।

'মার্গেটা'.........' যেনো গভীর অতল থেকে ডাকটা কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলো।

'কি মা? কষ্ট হইতাছে? তেল মালিশ কইরা দিমু?'

ফুপুর কথায় দাদী যেনো বিরক্ত হয়েছে; শিমুলের এমনই মনে হলো।
'আমার আর বেশি সময় নাই।' বৃদ্ধা চোখ মেললো। দৃষ্টি শূন্যে, উদভ্রান্ত।

'মার্গেটা?'

'কও মা।' মার্গেটা ফুপু কান নামিয়ে আনে।

বৃদ্ধা একটু সময় নিয়ে গুছিয়ে নেয়।

'বউগো তো আমি কিছুই দিলাম না। শিমুলডারেও এতিম কইরা দিলাম। খোদার কাছে আমি কি জবাব দিমু, মা?'

'তুমি কি যে কও না মা! জমাজমি তোমার। তুমি যারে ভালা মনে করছো, তারে দিছো। আল্লার তো আর খাইয়া কাম নাই, তোমারে তার লাইগা জেরা করবো।'

'হক কথা মা! তয় কি মা, জমাজমিতে শিমুলের বাবার রক্ত লাইগা রইছে যে!' বৃদ্ধা হাঁপিয়ে ওঠে। চোখ দু'টোয় যা-ও একটু সজীবতা ফিরে এসেছিল, খুব দ্রুত তা' হারাতে শুরু করেছে। মুখের সব কথাই ঠোঁটের কাঁপণে আটকে যাচ্ছে। 'যাগো এতিম করলাম, আমার শেষ যাত্রায় হেরাই মাসের পর মাস আমার গু-মুত কাচলো, হাতে তুইলা খাওয়াইল।'

'বাড়ির বড় বউ হইছে, শাশুড়ির যত্ন করবো না?'

'তাতো হাচাই। তয় মা, আমার একটা দায়িত্ব আছে না?'

'তুমি কি কম করছো? বিপদে আপদে এইডা-ওইডা দিছো, এহনও ভিটায় থাকবার দিছো। কম কিসে?'

বৃদ্ধা চোখ বন্ধ কোরে চুপ হয়ে পড়ে থাকে। মিনিট দুই। তারপর চোখ মেলে আবার ডাকে– 'মার্গেটা, তুই কি আছোস?'

'এই তো মা, আমি।'

'আমার মাইঝা মাইয়া তুই। তরে একটা কাম দিয়া যাই?'

'কি কাম, মা?'

'তুই স্বাক্ষী রইলি, মরনের সময় আমি এই ভিটেডা শিমুলরে দিয়া গেলাম।' নিজের নাম শুনে শিমুল দাদীর চোখেমুখে তাকালো। ইস, চোখ দু'টো কি সাদা, একফোটা রক্তও বুঝিনেই।

লতা তাড়াতাড়ি বললো– 'এইডা আপনি কি করলেন, মা? এতে খালি কাইজ্যা আরো বাইড়া যাইবো।'

বৃদ্ধা লতার কথার জবাব না দিয়ে বলে– 'আমার মাথাডা তোমার কোলে নেও, বউ।'

লতা মাথার কাছে বসলো। পা সামান্য ছড়িয়ে দিয়ে যত্নকোরে শ্বাশুড়ির মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে চুলে হাতিয়ে দিতে দিতে দাঁত দিয়ে সে ঠোঁট কামড়ে ধরে। দু'চোখ ভেঙ্গে জলের বন্যা বইতে চাইছে। হেরে যাচ্ছে লতা।

'শি-' সবটুকু শব্দ বৃদ্ধার ঠোঁট গলিয়ে বেরোলো না।

শিমুল এগিয়ে গিয়ে দাদীর বাঁ হাত ধরে। তাকিয়ে দেখে- 'ঠোঁট দু'টো ভীষণভাবে কাঁপছে।

শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে লতা বললো- 'দাদী পানি খাইবো, দৌড় দেও, বাবা।'

শিমুল এক দৌড়ে বেরিয়ে যায়। কালুটা বুঝে উঠতে না পেরে ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে, শিমুলকে রান্না ঘর থেকে গ্লাস ভর্তি পানি নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে।

ঠোঁট ফাঁক কোরে মার্গেটা মাকে পানি দেয়। পানি ঠোঁট গলিয়ে বাইরে চুঁইয়ে পড়ে। খিঁচুনি ওঠে সাথে সাথে। শরীর বেঁকিয়ে যায়। আছড়ে পড়ছে বৃদ্ধা। কোঠর ভেঙ্গে চোখ দু'টো ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। তারপরই হঠাৎ কোরে দেহটা শীথিল হয়ে লতার কোলে কাৎ হয়ে গড়িয়ে পড়ে। লতা ডুকরে কেঁদে উঠে বৃদ্ধার কপালে নিজের কপাল ঠুকতে থাকে।

শিমুলও কেঁদে ফেলে। মার্গেটা ফুপুর বিকট চিৎকারে শিলু দৌড়ে আসে। বাইরে কালুটা বিকৃত গলায় কাউ-কাউ কোরে ডেকে যায়।

শিমুলের বুকের গভীর তল থেকে কষ্টের বিরামহীন একটা ঢেউয়ের দোলানো স্রোত উঠছে তো উঠছেই। চোখ দু'টো পানিতে ঝাপসা। গাল গলিয়ে লোনা জলের স্বাদ লাগলো ঠোঁটের

ছোঁয়ায়। লতার খোপা খুলে গেছে। এক দঙ্গল চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে, ঘাড় ছাড়িয়ে মুখের দুই পাশে। মাথায় ঘোমটা নেই। কোলে শাশুড়ির মৃত দেহ। পাথরের মূর্তির মতো সে ঠাঁই বোসে থাকে। চোখ দু'টো কাঠের বেড়ার দিকে, স্থির। শিমুল ধীরে ধীরে মায়ের পাশে যায়, গলায় হাত দিয়ে পাশে বসে। জামার হাতলে সে নিজের চোখ মুছে নেয়।

কেনো যেনো শিলুর দিকে শিমুলের চোখ গেলো। দরোজার কপাট ধোরে শিলু সেই প্রথম থেকেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখ অনুসরণ কোরে শিমুল ঘরের মাচার দিকে তাকালো। মার্গেটা ফুপু। সামনে বাক্স। খোলা। ভেতরে হাতড়িয়ে কি যেনো খুঁজছে। বাম পাশে গামছায় কাপড় চোপড় জমা করছে।

শিমুল প্রচণ্ড রকমের হোঁচট খায়। ওর সারা শরীরে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের একটা তরঙ্গ বয়ে যায়। উঠে দাঁড়ালো সে। ইচ্ছে হলো ফুপুর চুলের মুঠি ধোরে জোরে একটা লাথি মারার। অতি কষ্টে নিজেকে সে সামলে নিলো। অসহ্য। অকল্পনীয়। দাদীর নিথর হয়ে পড়া মুখটার দিকে তাকায় সে। আর আশ্চর্য, এতোক্ষণ যে গন্ধটা একদম সম্পূর্ণভাবে শিমুল ভুলেছিল, কোনো অস্তিত্বই যার ছিলো না, সেই উৎকট ভারী আর বিশ্রী দুর্গন্ধটা প্রচণ্ড বিক্রমে ফিরে এসে শিমুলের নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ভক কোরে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

'ওয়াক......'

শিমুলের স্নায়ু গুলিয়ে যায়।

মার্গেটা ফুপুর মুখ বরাবর মুখের সবটুকু থুতু শিমুল ছুঁড়ে দেয়। কোথায় পড়লো, লাগলো কি লাগলো না, তাতে ওর মাথা ব্যথা নেই। সে খুব দ্রুত শিলুর পাশ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ছুটি মানেই বর্ষা মওসুমের নদীতে-খালে-বিলে থই থই করা ঢেউয়ের মতো আনন্দ আর আনন্দ। স্কুলের ছেলেমেয়েরা এক ছুটি পার হতেই আরেক ছুটির দিকে লোভাতুর চোখে চেয়ে থাকে। হোস্টেলের ছাত্র-ছাত্রী হোলে তো কথা-ই নেই। কিন্তু শিমুলের বেলায় এবারকার

ছুটি তেমন কোনো আনন্দের কারণ হলো না। তবে, ছুটিটা জুটেছিল বেশ কায়দা কোরে। ঈদ আর বৌদ্ধপূর্ণিমার জাতীয় ছুটির মাঝখানে বিশ্ব শ্রমিক দিবস ১লা মে এসে ছুটিটাকে বিরতিহীন সাত দিনের কোঠায় টেনে নিয়েছে। হোস্টেল বন্ধ। বেশ খুশি হয়েছিল শিমুল। সেই দিনই রানুকে নিয়ে সে বাড়ি চলে এসেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই ওর সব আনন্দ আর সুখের হৈ চৈ করাটুকু মুখ থুবড়ে পড়েছিল। সামনে দারিদ্র এসে দাঁড়ালো এবং তা বীভৎস কোরে তুললো ফেলু মেম্বর, স্বয়ং শিমুলের ফুপু।

শিমুলদের অবস্থা এখন তখন। মায়ের থমথমে মুখে কোনোদিন হাসি ছিলো কি -না, এখন তা বোঝার কোনো উপায় নেই। একটা আতংকিত মুখ। দুই চোখের নিচেই বিশ্রী রকমের কালো দাগ পড়েছে। দাগগুলো চোখের জমিন ছাড়িয়ে দুই গালে কেমন ঘিনঘিনে একটা কাচা টাকার আকারে গোলাকার হয়ে ভেংচি কাটছে সুখকে, আনন্দকে। শিমুল মায়ের দিকে প্রায়ই আড়চোখে তাকায়। সরাসরি তাকাতে ওর খুব কষ্ট হয়, লজ্জা হয়। সে বোঝে না অপরাধটা কি বা কোথায়, তবে এক ধরনের অপরাধবোধ ওকে গোপনে গোপনে তাড়া করে। ইচ্ছে করে সব ছেড়ে ছুড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে। পরের জায়গায় এভাবে থাকা যায় না, সওয়া যায় না মার দুশ্চিন্তাযুক্ত মনের আর্তনাদ।

দাদী মারা যাবার সময়ে মার্গেটা ফুপুকে সাক্ষী রেখেই দাদী শিমুলকে ভিটেটা দিয়ে যায়। অবশ্য সেটা ছিলো মৌখিক দান। লতা প্রসঙ্গটা সেই যে একবার তুলেছিল, ফেলু মেম্বর তখন একজন নারীর সবচে' স্পর্শকাতর জায়গাকে ইঙ্গিত কোরে মুখ খিস্তি করেছিল, তারপর থেকে কথাটা লতা ভুল কোরেও আর মুখে আনেনি। শিমুল প্রথম দিকে দুই একবার প্রসঙ্গটা তুলেছিল। কিন্তু তার সামনে দিয়েই ফেলু মেম্বর ও তার ছেলেরা যেদিন ভিটের উত্তর-পূব কোনার বেলগাছ থেকে সবগুলো বেল পেড়ে নিয়ে গিয়েছিল, শিমুল বেশ ক্ষোভের সাথেই কাঁদো কাঁদো গলায় মায়ের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। অনেকদিন পর শিমুল সেদিন আবার মায়ের হাতে মার খায়। শিমুল বোধহয় কোনো খারাপ শব্দ মুখে এনেছিল বুকের ঘৃণাকে প্রকাশ করার জন্যে। অথবা অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। কোনো কথা নেই বার্তা নেই, শিমুলের কথা তখনো শেষ হয়নি, লতা ঠাস কোরে শিমুলের গালে চড় মেরে বলেছিল– 'স্কুলে পড়, ভদ্র মানুষের মতো কথা কও; তয়, যা কও, তা ভদ্র হয় না ক্যা? আমার সামনে থাইক্যা দূর হও।' শিমুল মায়ের ওই দিনকার এতো ক্ষেপে ওঠার কারণ আজও বুঝে উঠতে পারে না। তবে, সেদিন সে মায়ের গলায় কান্নার একটা আটকিয়ে রাখা ঢেউয়ের আনাগোনা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল।

যে কোনোদিন শিমুলরা ভিটেটা ছেড়ে দেবে, দিতে বাধ্য হবে। ফেলু মেম্বর এখানে সেখানে অশ্লীলভাবে হেসে ওঠে রসিকতা কোরে। সরে যাওয়া ছাড়া পথ নেই। ভিটের পাশেই দশকাঠা ধানী জমি আছে। শিমুলদেরই ছিলো।

অনেক দিন আগে, বিকুর বাবা যখন বড় ধরনের অসুখে পড়েছিল, জমিটা শিমুলের বাবার মতামতেই দাদী মোহাম্মদ আলীর কাছে বেচে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল। জমিটা এখন দরকার। স্বামীর ভিটের মোহ বা মায়াই আলাদা। যতোই লাথি-গুতা মারো না ক্যানো,

স্বামীর ভিটের মোহ বোলে কথা; বাতি দিতে হবে না? অন্তত: সেই ভিটের গাঁ ছুয়ে থাকতে পারাটাও কম কিসে?

সমস্যা জানিয়ে লতা বড়মেয়ে লীনাকে চিঠি লিখেছিল। মোহাম্মদ আলীকে লতা রাজীও করিয়েছে। কিন্তু লীনা লতাকে খুব দুঃখ কোরে জানিয়েছে , তার হাতে অতো টাকা নেই। লতা তবুও আশা ছাড়েনি। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ভিন্ন ধরণের একটা ভাবনা ভেবে এগুতে থাকে।

ছুটিটা এমন এক সংকটময় সময়ে হলো।

মাটভরা আমন ধানের মাতামাতি। আউস ধান কোথাও কাটা হয়েছে, কোথাও হয়নি। পাট গাছগুলো মাথা বের কোরে বৃষ্টির আশায় আতিপাতি করছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে ওঠার গোপন প্রস্তুতি।

শিমুলদের এখন কোনো ভিটেই নেই।, আবাদি জমি থাকে কোত্থেকে? মনে মনে শিমুল দাদীকে ঠিকই গালি দেয়। ফেলু ফুপার চেয়ে মার্গেটা ফুপুর উপর শিলু বেশি ক্ষিপ্ত। শিমুল শিলুর সাথে একমত। ফুপুটা এতো হারামি না হোলে ফুপা এতো রক্তচোষা ভাব দেখাতে সাহস পেতো না।

যাদের ওপর এতো ঘৃণা, শিমুল বাধ্য হলো তাদেরই ধান ক্ষেত নিঁড়িয়ে দিতে। সে একা নয়। কামলার এখন প্রচুর চাহিদা। ত্রিশ টাকার নিচে পাওয়াই যায় না। তাও আবার প্রয়োজন মতো মেলেনা। ওদিকে বৃষ্টির আগেভাগেই ক্ষেতে দ্বিতীয় নিড়ানী দিতে না পারলে ফসল প্রায় আধাআধি কমে যাবে। ফেলু মেম্বর নিজেই দ্বিতীয় দিন সাত-সকালে এসে শিমুলকে নিয়ে যায় ক্ষেতে কাজ করানোর জন্যে। মায়ের দিকে মতামতের জন্যে শিমুল তাকিয়েছিল। নিজের একটুও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সে খুবই হতাশ হয়। লতা বেশ শান্ত গলায়ই বলেছিল -'যাও। একটু আধটু কাম করলে শরীল ক্ষয় হইয়া যাইবোনা। মাথায় কিছু দিয়া লইও।'

দুপুরে গোসল কোরে শিমুল রান্না ঘরেই খেতে বসেছিল। সাথে ফেলু ফুপাও। মিতা,মতি আর বাঁশীও ছিল। খাওয়াচ্ছিল ফুপু। অন্তত: এই একটা ব্যাপারে শিমুলের বেশ ভালো লাগে, খুশি হয়; ওকে কামলাদের সাথে বোসে খেতে হয় না। খাওয়ার মাঝখানে মিতা হুট কোরে নিজের থালার বড় শোল মাছের মাথাটা শিমুলের থালে তুলে দিয়ে হিহি কোরে হেসে উঠেছিল। উপায় নেই। ফেরত দিলেই মিতা ক্ষেপে যাবে। ফুপুও সেই তালেই হয়তো আরো এক মুঠো ভাত ওর পাতে ঢেলে দিয়েছিল।

খেয়ে দেয়ে শিমুল বাড়ি ফিরেছিল। রানু তখন শাক দিয়ে ভাত মেখে খাচ্ছিল। দেখে শিমুলের মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনটা ঠিক করার জন্যেই রানুর থালা থেকে দুই তিন নলা ভাত শিমুল খেয়ে ফেলে। তারপরই সমস্যা ঘটিয়ে ফেলে। বারান্দায় গিয়ে বিছানো পাটিতে শুতে না শুতেই ঘুম ওকে জড়িয়ে নেয়। রানু বা শিলু ওকে ডাকে নি। লতাও না। কালুটা গো গো কোরে ডেকে উঠতেই ওর ঘুম ভেংগে যায় এবং সাথে সাথে সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। সূর্যের

দিকে তাকিয়ে সময় বোঝার চেষ্টা করতে করতেই উঠোনে নেমে আসে সে। লতা ও রানু নেই। শিমু রুমালে সেলাই কোরে একটা ছন্দ লিখছে। শিমুল গামছাটা মাজায় বাঁধতে বাঁধতে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। চোখ তুলে শিলু ওকে একবার দেখালো, কিছু বললো না।

হাসেমদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই শিমুলের মন বেশ ছোটো হয়ে যায়, লজ্জা লাগে। সে যে ভীষণভাবে অসহায়, নতুন কোরে মনে পড়ে। কামলা ছাড়া আর কি সে? এ কারণেই ইদানিং সে হাসেমকেও এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

আকাশে মেঘও নেই, বাতাসও নেই। গনগনে সূর্যটা সামান্য হেলে পড়লেও তেজ এখনো একটুও কমেনি। স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলে শিমুল। ক্ষেতে ফুপা বা মতি বাঁশী কেউ নেই। আপাতত: কোনো কৈফিয়তও দিতে হচ্ছে না। সামান্য পূব থেকে কে যেনো একজন গান ধরেছে। ধানগাছের আবডালে তলিয়ে থাকা লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না, সুর ভেসে উঠছে। সুরটা কি করুণ আর দরদী! শিমুল আল-এর উপরে রাখা কাচি নিয়ে ধানক্ষেতে নেমে কামলাদের পাশে চলে যায়।

এই হলো ওর সমস্যা। খুব তাড়াতাড়ি শিমুলের হাত-পা ধান পাতায় চিড়ে গেলো। অথচ কামলাদের এমনটা হয় না। অন্তত: ওর তাই ধারণা। সকালের জ্বলুনীটা যেনো এতোক্ষণে নতুন কোরে মাথা চাড়া দিলো। পানি তেষ্টা পেলো ওর। গায়ের জ্বালাপোড়া ভাবটাও সেই সাথে বেড়ে উঠলো।

তাতানো রোদের রঙ ধানী রঙা হয়ে আসতেই করিম চাচা হুকোয় আচ্ছা কোরে দম দিলেন। পানি খেয়ে গুনগুনিয়ে একটা সুর ভাজলেন। পালায় ফিরে মিনিট পাঁচ-সাত সেই সুরের রেষ ধোরে রেখে তিনি দ্রুত কাচি চালালেন। নিড়ানীতে তিনি ফাঁকি দেন না। তিনি হঠাৎ কোরেই গান থামিয়ে কিসসা শুরু করলেন- 'বুঝলানি, বড় রাণীর চক্রান্তের ফান্দে রাজার সাত পুত্তোর ধরা দিলো। যেমন কথা তেমন কাম- রাজার সাত পুত্তোর পঙ্খী নাও সাজাইয়া কাক ডাকা ভোরে রওনা দিলো। একমাস এক রাইত চলার পর তারা আইসা পড়লো অচেনা এক দ্বীপে, সেহানে আইসা এক লগে মিলছে। সাত রাজ পুত্তোরের চোখতো ছানাবড়া– সাত নদীর পানির সাত রঙ।

প্রতিদিন বিকেলেই করিম চাচা নিড়ানী চালাতে চালাতে কিসসা বলেন। মাঝেমাঝে বেশ ভালো লাগে, আবার কোনো কোনো সময় খুব বিরক্তও লাগে। কিন্তু অন্য সব কামলাদের অখণ্ড মনযোগ দেখে শিমুল আশ্চর্যও কম হয় না। এসব আজগুবি গল্পে ওরা এতো মজা পায় কেনো? কি আছে মজা পাওয়ার মতো। এরচে' দস্যু বনহুর বা কুয়াশা কতোবেশি মজাদার! মাঝেমাঝে ওর ইচ্ছে হয় একটা গল্প শুনিয়ে দিতে। কিন্তু তখনই আবার আপনা থেকেই ইচ্ছেটা বাতিল হয়ে যায়। কেমন সংকোচ লাগে।

করিম চাচার রূপকথা যেনো একটা গুয়ে পোকা। গত কয়দিনে শিমুল যে প্রশ্নটি করতে পারেনি, আজ বেশ ঝাঁজের সাথেই আচম্বিতে সে প্রশ্ন কোরে বসলো- 'করিম চাচা, তুমি

এতো গরীব মানুষ, অথচ তোমার সব গল্পই যত্তোসব রাজা-মহারাজাদের নিয়ে। কেনো চাচা? এইসব গল্প বলতে তোমার খারাপ লাগে না?

করিম চাচা হাসলেন। করুণ হাসি। সুখের হাসি আর দু:খের হাসির মাঝখানের ফাঁক আর ফাঁকিটুকু এখন আর শিমুলকে অতো ফাঁকি দিতে পারে না।

বুঝলানি চাচা, আমি হইলাম গে মুখ্খো সুখ্খো মানুষ। তয় চাচা, তোমার পরশ্নটা কিন্তুক এই ধানগাছ গুলার লাহান তাজা। রাজা-বাদশাগো সুখে আমরা হাসি, তাগো দু:খে আমরা কান্দি। কিন্তু ক্যান্ চাচা, জানো? আমাগো যে সুখ-দুখ বইলা কিছু আছে, হেইডা তাগো কথা মনে কইরা আমরা ভূইলা থাকবার চাই। আমরা আবার মানুষ! আমরাতো রাজা-বাদশাগো জীবনে সুখ দিবার লাইগাই পয়দা হইছি, আল্লার খায়েশও তাই।

কিছুকাল আগেও ঝটিকা ঘোড়ার মালিক রহিম বক্স এখন কামলা বেচলেও তার জিভটায় বড়ো ধার। এই জিভটার কারণেই মাস ছয় আগে সে তিন মাসের হাজত খেটে এসেছে। সে নাকি সর্বহারা করে। পুলিশরা বেশ মারধোরও করেছিল। ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুলটা এখনো ভাঙ্গা। অমাবশ্যা-পূর্ণিমায় পা'দুটো ফুলে ঢোল হয়ে যায়। করিম চাচার কথায় সে প্রতিবাদ কোরে ওঠে- 'ঠিক কইলেন না চাচা। আপনার কথায় অনেক ঝুট আছে। আসল কথা কি জানেন, আসলে এই যে আপনি যেসব গল্প কিস্‌সা কন, এইসব গল্প-কিস্‌সা অনেকদিন আগে যারা মুখে মুখে কইতো বা লিখতো, তারাতো আর আপনার-আমার মতো লাথ্থি-গুতা খাওয়া অশিক্ষিত্ কামলা না। তারা রাজা-বাদশাগো লগে থাকতো, সুখ-দু:খের কথা লিখতো, রাজা-বাদশাগো সুখের লাইগা নিজেরা সব সময় জিভ দিয়া পা চাইট্টা দিতো, চামচামি করতো। রাজা-বাদশাগো সুখের প্রাসাদ বানাইবার জন্যে, তাগো রাজ্য আর মান রাখবার জন্যে কত্তোসব যদু-যাকোব আর জমিরউদ্দীনরা যে বুকের লুহু পানি বানাইতো, জান দিতো কারণে-অকারণে, অকালে; ওইসব চামচারা এইসব সত্য কথা লেখে নাই। লিখবো কি কইরা? আর লেখা যদি নাই হইলো, তুমি-আমি পামু কই? তয় একটা কথা চাচা, ওই যে রাজা-বাদশা গল্পের সব রাক্ষস-খোক্কস, এইগুলান আসলে দেশের সব গরীব মানুষের একটা দলা পাকানো চেহারাই আমার মনে হয়। যার শক্তিটা বিরাট কিন্তু নির্বোধ; নিজের জান নিজের লগে না রাইখা তারা রাইখা যায় পুকুরের পানিতে লুকানো কৌটার ভোমরার গায়ে, রাজ পুত্তুরের হাতে। রাজাগো ছেলে যার কারণে দৈত্যগো অতো সহজে কাবু কইরা ফেলবার পারে। চাচা, জানটা আপনি দৈত্যের লগে জোড়া দিয়া একটা গল্প বানাইবার পারেন না? দেখি রাজার পুত কি কইরা রাক্ষস মাইরা সুখ নামের অপরূপা কণ্যারে ছিনাইয়া আনে! হক কথা হইলো- ধনীরা কোনোদিন এমন কিছু ইচ্ছা কইরা লিখবো না, যাতে গরীব মানুষ জানবার পারে, তারাও মানুষ; চাইলে তারাও সুখ ছিনাইয়া নিবার পারে।'

গায়ের চামড়ায় বেশ ঝুল পড়েছে। দবির নানা। কাশতে কাশতে মাঝে মাঝে কুঁজো হয়ে যান কিন্তু হুক্কা খাওয়াটা কিছুতেই ছাড়েন না। বয়স হয়েছে। একান্ত টান না পড়লে আজকাল কেউ তাকে কামলা নিতে চায় না। কলকেয় তামাক সাজাতে সাজাতে তিনি রহিম বক্সের সব কথাই

শুনছিলেন। রহিম বক্স কথা থামাতেই তিনি তামাক টিপতে টিপতে বললেন- 'বড় সুন্দর একটা কথাই কইছো রহিম মিয়া। আমার নাতি, বুঝলানি, সাইফুল, আমার মাইঝা মাইয়ার বড় ছাওয়াল, লেখাপড়া করে। আমি গেছি বেড়াইতে। যা কইবার লাগছিলাম– সাইফুল পড়া লেখা করতাছিল। মোগল-বাদশা আর ইংরেজ রাজত্বের কথা। বেশ জোরে জোরেই পড়তেছিল নাতিটা। জিনিস পাত্তির দাম তহোন কত্তো সস্তা আছিল! গোয়াল ভরা ছিল গরু, গোলা ভরা ধান আর পুকুর ভরা মাছ। ক্যান যে ওইদিন হঠাৎ কইরা আমার নানা ভাইয়ের চেহারাটা মনে পড়লো! ইংরেজ রাজত্বের সময় তার জন্ম হয়, জীবন-যৌবন শেষ কইরা মরনও হয় ওই ইংরেজ আমলেই। আমি তখন এই এতোটুকুন পিচ্চি। নিজের চোখেই দেখছি, নানা ভাই আমার অভাবের লাইগা নেংটি পড়তো। ইয়া বপু ছিলো তার, কিন্তু না খাইতে খাইতে শেষ কালে বুকের হাড্ডিগুলা নেংটি ইঁদুরের লাহান গোলাভরা ধান আর গোয়াল ভরা গরুর কিস্সারে দাঁত বাইর কইরা মুখ ভ্যাংচাইতো! আমার নাতির পড়া শুইনা আমার যা হাসি পাইতেছিল না! সেই আমলে আমার নানা ভাইয়ের লাহান নেংটি পড়া মানুষগো জীবন কাটতো কি দু:খ-কষ্টে, একটা ট্যাকা কামাইতে তাগো যে দেড়-দুইমাস লাইগা যাইতো, কতই, তা তো লেখা নাই? ধনী গৃহস্থগো গোয়ালে গরু থাকতো ঠিকই, পুকুরেও মাছ থাকতো, গোলায় থাকতো ধান। কেন, অহন বুঝি নাই? আছে রহিম মিয়া, অহনও আছে। তয়, তখনো হাজার-বিজার লেংটি পড়া হাভাইত্যা মানুষ আছিল, অহন যেমুন আমরা আছি।'

পালা শেষ হয়ে গেছে। সবাই উঠে দাঁড়ালো। দবির নানা মাজা বেঁকিয়ে ঘোলাটে চোখে আকাশের দিকে তাকান। রহিম বক্স খুঁটির আগুন দিয়ে কলকেয় আগুন জ্বালিয়ে দবির নানার হুক্কায় লাগিয়ে পশ্চিমের আলের দিকে হাঁটতে শুরু করে। সাথে বাদবাকি সবাই। শিমুল দবির নানার পাশে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। কেনো যেনো দবির নানাকে আজ ওর খুব ভালো লাগছে।

নতুন পালায় বোসে আল থেকে ক্ষেতে ঝুলে পড়া দুর্বাঘাস নিড়ানী দিয়ে নিড়িয়ে দিতে দিতে রহিম বক্স বেশ উত্তোজিত ভাবেই বলে- 'বুঝলা চাচা, গরীবগো যায়গা বেহেস্তেও নাই। সব জায়গায় গরীবের উপর চলে জুলুম আর ঠগবাজী। যারা গল্প বানায়, তারাহবা না ঠকাইয়া থাকে কি কইরা? তোমার-আমার ভাই-পুত যদি কোনোদিন গল্প-নাটক লেখে, তখন আমাগো কথা ঠিকই তাজা কইরা লেখা হইবো, তার আগে না। আমাগো তো ঠকাইতে আছে সেই নূহ নবীর আমল থাইকা, চলবো কেয়ামত পর্যন্ত। এমনিতেই আমরা চোখ থাকতেও কানা, তারপরেও যদি কেউ কোনোদিন চোখ খুইলা চাও, দেখবা আরো বেশি আন্ধার কথা। বইতে হক কথা থাকলে তো আসল গোম্বর ফাঁস হইয়া যাইবো, একদম চিচিং ফাঁক! ভাইবা দেখছো, আমরা যদি কামলা না বেচি তাইলে গৃহস্থগো, ফেলু মেম্বরগো অবস্থা কি হইবো? তিন দিনে শুকাইয়া আম চূর হইয়া যাইবো।'

'চুপ কর হারামজাদা, তর আর আক্কেল হইলো না।' করিম চাচা রহিম বক্সের উপর তেড়ে ওঠে। আড় নজরে একবার শিমুলকে দেখে নেয়। 'এইসব কথা জানবার পারলে কেউ তরে

কামলা নিবো? তখন আম চূর কেডা হইবো? হাতি মরলেও লাখ ট্যাহা, আর ঠেনি কুত্তারা বাঁচলেই কি, মরলেই কি!'

রহিম বক্স দবির নানার হাত থেকে হুক্কা নিয়ে জোরে জোরে দম দেয়। চোখ বন্ধ কোরে মুখ দিয়ে নাক দিয়ে ভকভকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। আরো একটা সুখ টান দিয়ে হুক্কোটা করিম চাচার হাতে দিতে দিতে বলে- 'জানো নানা, ক্যান আমরা এতো লাথ্থি-গুতা খাই? আমাগো আসলে মেরুদণ্ড থাইকাও নাই। আমরা ভাবি, ফেলু মেম্বররা দয়া কইরা আমাগো কামলা লয়। একদম মিছে কথা নানা, তুমি তার প্রমাণ। গৃহস্থরা আমাগো কোনোদিন ভালোবাসে নাই, বাসবোও না। তারা ভালাবাসে তোমার আমার গায়ের তাগদ্‌রে, পয়সা দিয়া কিন্না লয় বেশি পয়সা বানাইবার লাইগা। তোমার একদিন কত্তো আদর আছিল। আর আইজ? তোমারে পোছে কেডা, নানা? তোমার যে তাগদ নাই তাগো ফসল ফলাইয়া দিবার!'

করিম চাচা সত্যি সত্যি বিরক্ত হন।

'তর কথার যে কি ছিরি, কোন কথার ডাল কোন কথা নিয়া জোড়া দ্যাস!'

'কথার লগে কথার জোড়া আমি ঠিকই দিছি চাচা। আইচ্ছা চাচা, আমরা যদি সবতে এক হইয়া কামলা বেচন বন্ধ কইরা দেই?'

খিঁচিয়ে ওঠে করিম চাচা- 'হইবো আর কি, না খাইয়া বালবাচ্চা লইয়া আমাগো শুকাইয়া মরতে হইবো! মরনডা হইবো দুইদিন আগে, এই যা।'

'খালি আমাগোই মরতে হইবো, না ফেলু মেম্বরগোও?'

'আমাগো হাড্ডিতে দুবলা ঘাস গজাইয়া যখন ফুল ফুটবো, তখনো তাগো গোলার ধান ফুরাইবো না, ব্যাংকের ট্যাহা শেষ হইবো না।'

'ক্যান শেষ হইবো না? শেষ ঠিকই হইবো।'

'আইজ-কাল ভাং টাং খাস নাকিরে?'

'নাহ, তুমি খালি ঘোচাইন্না কথা কও। কেরে, আমরাই তো ধান ফলাইয়া, মাড়াইয়া তাগো গোলা ভইরা দেই, দেই না? আমরা তাগো গোলা ভাইঙ্গা ধান কলই দখল কইরা লমু! তাইলে?'

আঁৎকে ওঠেন করিম চাচা- 'রহিম্ম্যা, তুই আবার জেল খাটবার চাস?'

রহিম বক্স সাথে সাথে জবাব দেয় না। সে মাজায় বাঁধা গামছা খুলে কপালের ঘাম মুছে। সবুজে সবুজে ভরে ওঠা মাঠটার উপর দিকে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে সে কি যেনো ভাবে একটু। তারপর খুব দৃঢ়তার সাথে বলে- 'চাচা, রক্তরে পানি বানাইয়া ফসল ফলাই আমরা, আর সুখ করে গৃহস্থরা, ফেলু মেম্বররা; এইডে হক কথা, না এর বিরুদ্ধে রুইখ্যা দাঁড়ান্‌টা হক কথা? জেলের কথা কইলা তো? চাচা, জেল তো বানাইছেই তোমারে-আমারে ডর দেহানের লাইগা। তয়, জেলের ডর আমি আর করি না। জানই যেহানে বাঁচে না, জেলরে ডরাইয়া কি হইবো?'

ফেলু মেম্বর স্বয়ং। শিমুলই প্রথম দেখতে পায়। শিমুল বুঝে উঠতে পারে না দক্ষিণ দিক

থেকে সে কি কোরে আসছে। ওদিকটায় বিশাল মাঠ আর মাঠ! তবে অতো ভেবে দেখার সময় নেই। ফেলু মেম্বর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। শিমুল তাড়াতাড়ি ফিসফিসিয়ে রহিম বক্সকে বলে– 'চাচা, ফুপা আসতাছে!'

সবাই চুপ। হাতের নিড়ানী আগেও চলছিল। তবে, আগে নিড়ানীর সাথে মুখও চলছিল, এখন তা' হঠাৎ কোরেই থেমে যায়। তাই মনে হচ্ছে কাজের গতি যেনো অনেকগুন বেড়ে গেছে। করিম বক্সও থেমে গেছে। তবে অতো তাড়াহুড়ো নেই ওর ভেতরে। লুঙ্গির টেমর থেকে বিড়ি বের কোরে শব্দ কোরে একদলা থুতু ফেলে সে। দবির নানার দিকে তাকিয়ে বলে– 'চাচা, ম্যাচটা দ্যাও।'

শিমুল তৃতীয়বারের মতো চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললো। মোটেই মন:পুত হচ্ছে না। যা ভাবছে, লেখায় তা আসছে না। আবার যা লিখছে, পড়তে গিয়ে নিজেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠছে। তাছাড়া, এবার ওর মনে হলো, হাতের লেখাটা মোটেই ভালো হয়নি। এরকম লেখা দেখলে রিয়া নিশ্চিত হেসে গড়িয়ে পড়বে। হয়তো রানুকেও দেখিয়ে ফেলতে পারে। ভীষণ ধরনের আজব মেয়ে একটা! হয়তো রানুর সামনেই চিঠিটা মেলে বলবে- 'দেখ, তোর ভাইয়ার হাতের লেখা কেমন অগের ঠ্যাং-বগের ঠ্যাং।' যদিও রিয়াকে শিমুলের চেয়ে সুন্দর হাতের লেখা বের করতে বললে সে ভীষণ মুশকিলে পড়ে যাবে।

রাত ন'টার পরই রাতের স্টাডি শেষ। এরপর ঘুম। বাধ্যতামূলক। তখন ডায়নামোও বন্ধ কোরে দেয়া হয়। ফলে নিঝুম স্তব্ধতার মাঝে অন্ধকার ধেয়ে এসে রাতটাকে হঠাৎ কোরেই বড় বেশি অচেনা আর থমথমে বানিয়ে তোলে এবং সব ছাত্ররা তখন সত্যি সত্যিই খুব দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ে।

শিমুল নবম শ্রেণীর ছাত্র। নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যে সার্বজনিন আইনের মাঝেও কিছুটা ফাঁক রাখা হয়েছে। ওরা রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত হেরিকেন জ্বালিয়ে পড়তে পারে। এ সুযোগটা ওরা সবাই নেয়। শিমুল, সাগর, খোকন, বাবুল আর যোকিম।

পড়ার জন্যে যতোটা না, তারচে' একান্ত নিরিবিলিতে নিজেদের বয়সী-উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করার জন্যে। এ সময়টা একান্ত ভাবেই ওদের। দশম শ্রেণীর যারা, তারা দোতলার পশ্চিমের রুমটা ব্যবহার করে। পূবেরটা শিমুলদের।

এ সময়টায় হেরিকেন জ্বালিয়ে টেবিলে বসলে রিয়াকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয় শিমুলের। তখন বাইরের আকাশে তাকিয়ে থাকতে ওর খুব ভালো লাগে। তাকানোটা একদম কারণ ছাড়া। সেখানে আকাশের তারা বা চাঁদ অথবা অনন্ত শূন্যতায় ঝুলে থাকা নক্ষত্র খচিত কালো গভীর একটা চাদরের উপস্থিতি– এর বাইরে আর কিছুই ধরা পড়ে না। তবুও ভালো লাগে এবং কেবলই রিয়ার কাছে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে। শিমুল লেখেও। প্রতিনিয়তই লেখে। দিনের বেলায় যেমন যেখানে সেখানে রিয়ার নাম লিখে তাড়াতাড়ি কেটে দেয় বা মুছে ফেলে, রাতের বেলায় তেমনি চিঠি লেখে আর ছেঁড়ে।

সে হেরিকেনের সলতে অযথা কিছুক্ষণ উঠালো নামালো। এই প্রচুর আলো, এই প্রায় অন্ধকার। শিমুল গালিভার্স ট্রাভেল বইয়ের মলাট খুললো। না, খোকনরা আপাতত: এদিকটায় আসছে না। মলাটের ভেতর থেকে শিমুল চিঠিটা বের করলো। বইয়ের ভেতর রেখেই সে চিঠিটা মুখের কাছে উঠিয়ে আনে। যেনো খোলা বইয়ে মুখ ঢাকছে। তারপর সে আলতো কোরে চিঠির উপরে ঠোঁট রেখে চোখ বুঁদে ফেলে। লজ্জা হয়। ভেতরে ভিন্ন ধরনের বোধ শিরশিরিয়ে নড়াচড়া করে।

ভাজ না খুলেই শিমুল চিঠির উপর হাত রেখে বেশ কিছুক্ষণ বোসে থাকে। চিঠির প্রত্যেকটা শব্দ ওর মুখস্থ হয়ে গেছে পড়তে পড়তে। রিয়ার চিঠি। রিয়ার মতোই চিঠিটা অদ্ভুত। সেই যে কোনো বিশেষণ ছাড়াই তোমাকে দিয়ে শুরু, শেষ হয়েছে রিয়ার ইতি- আমিতে। এক পৃষ্ঠার চিঠি। অথচ একটাও দাড়ি নেই, কমা নেই। প্রথম দিকে পাঁচ-সাতবার শব্দগুলো কেবলই খাপছাড়া জটলা পাকিয়ে উঠতো। এখন পড়তে কোনো অসুবিধে হয় না। শিমুল ভেবে পায় না এতো ছটফটে রিয়া কি কোরে এতো গুছিয়ে আর এতো সুন্দর সুন্দর শব্দ বেছে চিঠিটা লিখতে পেরেছে।

মনে মনে শিমুল ছটফটিয়ে ওঠে। যে কোরেই হোক, রিয়াকে একটা জবাব দিতেই হবে। খুব সুন্দর কোরে, গুছিয়ে। গত ষান্মাষিক পরীক্ষায় সে বাংলা প্রথম পত্রে ৭৭ নম্বর পেয়েছে। অথচ রিয়াকে লিখতে গেলেই খালি দু:খ দু:ক একটা ভাব এসে জড়ো হয়। প্রচণ্ড একটা প্রতিজ্ঞা কোরে শিমুল আজ খাতা টেনে নেয়। বাইরে মিশমিশে কালো রাত। চাঁদ নেই। আকাশ তারায় তারায় ভরা। এতোক্ষণ পরে হঠাৎ কোরে ঝিঁঝি পোকার একটানা তীব্র একটা ডাক ওর কানে এসে ধাক্কা খায়। সে কব্জি ঘুরিয়ে তাকায় ঘড়ির দিকে। দশটা আটত্রিশ। সময় চলে যাচ্ছে। মাস তিন পরে ফাইন্যাল পরীক্ষা। রুটির অনুযায়ী পাঁচটা ইলেকটিভ ম্যাথ শেষ করার সময় এটা। গতকালও ফাঁকা গেছে সময়টা। আজও ওর অংকের দিকে মন নেই। সে মন প্রাণ ঢেলে খুব ধীরে ধীরে লিখলো- 'প্রিয়তমাসু। এবং বিরক্ত হলো সাথে সাথে। এতো

যত্ন কোরে আর সময় নিয়ে আস্তে ধীরে লিখতে শুরু করেছে, অথচ প্রথম শব্দেই গলদ। শব্দের বর্ণগুলো ছোটবড় আর বাঁকা হয়ে গেছে। শিমূল টেনে খাতা থেকে পাতাটা ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে খোলা জানালা দিয়ে অন্ধকারে ছুঁড়ে মারে।

কি উদ্ভট আর দৈত্যাকৃতি ছায়াগুলো। সামনে সাগর। শিমুলের ফুপাতো ভাই। পেছনে, ওর দুই কাঁধে হাত রেখে খোকন। তারও পিছনে বাবুল ও যোকিম, পাশাপাশি। চারজনই নেংটো। পুরোপুরিভাবে। পাতার উপর ভর রেখে তালে তালে ওরা ভেতরে ঢুকে শিমুলকে ঘিরে ধরে। নাচছে ধেইধেই কোরে, নেংটো অবস্থায়। সাগরের ভাষায়, এটা পরী নাচ। প্রতিবাদ কোরে লাভ নেই, শিমুল জানে। তাতে বরং ফল উল্টোই হয়। কিছুদিন আগে অতিষ্ঠ হয়ে স্যারের কাছে সে একবার নালিশ করেছিল। স্যারের সামনে শিমুল কোনো কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। ওরাও তেমন কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। পাঁচদিনের মাথায় মাঝরাতে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেছিল। বিছানায় লাল পিঁপড়ে। একটা দুটো নয়, শত শত। সারা গায়ে কামড়ের গুটি গুটি ফোলা আর জ্বালা। কে বা কারা শিমুলের বিছানার চার পাশে ফোটায় ফোটায় গুড় ফেলে রেখেছিল।

জসিম– হোস্টেলের মনিটর। নিজ চোখে এক রাতে ঘটনাটা দেখে ফেলে। নালিশ জানাতে তার দেরী হয়নি। দুই দিন পরেই ভোরে ওকে নেংটো অবস্থায় বিছানায় অঘোরে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা গেলো। গোপনাঙ্গ দড়ি দিয়ে জানালার সাথে টেনে বাঁধা। এতো হৈ-চৈ চেচামেচি, তবুও জসিমের ঘুম ভাঙতে চায় না। যা-ও ঘুম ভাঙ্গানো হলো, একটু পরেই সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। স্কুল কামাই। কেউ জানে না সেদিন কেনো তার এতো ঘুম পেয়েছিল আর কে বা কারা ওকে দিগম্বর কোরে রেখেছিল।

শিমুল কিছু দেখবে না সিদ্ধান্ত নিয়ে চোখ বন্ধ করে। শেষ পর্যন্ত সামান্য হেসে ফেললো ও, তবে চোখ বন্ধ রেখেই। ওদেরকে শুনিয়েই বললো- 'কি ফাজিলরে, শরম বলতে কিছু যদি থাকতো।'

সাগর বাবুলের কানে কানে কি যেনো বলে। বাবুল শব্দ কোরে হেসে ওঠে এবং নাচও থামিয়ে দেয়। নিজের ডেস্ক-এ গিয়ে স্টার সিগারেট বের কোরে ম্যাচ জ্বালায়। ইচ্ছে কোরেই শিমুলের দিকে ফু দিয়ে সে ধোঁয়া ছাড়ে। শিমুল জানালার কাছে উঠে গিয়ে থুতু ফেলে। এতোক্ষণে ওর একটু একটু রাগ হতে শুরু করে।

জানালা গলিয়ে ওরা চারজন নি:শব্দে অন্ধকারে নেমে যায়। শিমুল জানে, ওরা এখন নারকেল পাড়বে। ওদের এতোটা বাড়াবাড়ি শিমুলের মোটেই ভালো লাগে না। অবশ্য মাস খানেক আগে এমন এক নিশি অভিযানে সে-ও গিয়েছিল। সেটাই প্রথম এবং শেষ। দিনটার কথা মনে পড়লে আজও ওর শরীরে কাঁটা দেয়।

ওরা পাঁচজন ঘুরতে ঘুরতে প্রধান শিক্ষকের বাসা পেছনে ফেলে মেয়েদের হোস্টেলের পশ্চিম প্রাচীর ঘেঁষে দাঁড়ালো। যোকিম এদিক-ওদিক তাকায়। ওর আগেই খোকন দৌড়ে গিয়ে দুটো ইঁট নিয়ে আসে। ইঁটগুলো প্রাচীরে ঠেস দিয়ে সে-ই দাঁড় করায়। কিন্তু ইঁটে পা দিয়ে প্রথমে তাকায় সাগর, তারপর একে একে সবাই।

পুকুর। একটা মেয়ে কাপড় কাচছে। আর কেউ নেই। মেয়েটা থাকাতে পুকুরের নির্জনতা যেনো অনেক বেশি বেড়ে গেছে। পুকুরের উত্তর পাড়ে দুই সারি চারা নারকেল গাছ. মাঝখানে পাকা ঘাট। দক্ষিণ পাড়ে কলা বাগান।

সাগরের ইশারায় খোকন প্রথমে দেখলো। খোকনের কাঁধে ভর দিয়ে আর পা মাড়িয়ে শিমুলও তাকায়। সব্‌রি কলা! কি টসটসে, মোটা! পাঁচজন তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্রুত সরে পড়ে।

রাত সাতটা থেকে আটটা– খাওয়া ও রিক্রিয়েশনের সময়। শিমুলরা পাঁচজন দক্ষিণের নির্জন ও অন্ধকার ঢাকা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে মেয়েদের হোস্টেলে ঢুকে পড়ে। চারজনের হাতে ছুরি। শিমুলের ছুরি নেই। ওর হাতে তরকারী কোটার বটি।

খুব সামান্যই শব্দ হলো। মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই যোকিম ও বাবুল কলাগাছটি আটকে ফেলে আস্তে কোরে মাটিতে শুইয়ে দেয়। শিমুলের এই হলো সমস্যা; কোনো সিরিয়াস কাজ করতে গেলেই ওর শরীরে কাঁপুনি ওঠে।

খোকন অনেকগুলো লাউগাছ কেটে ফেলে। সাগর এই ঘুটঘুটে অন্ধকারেও ডাল ঝাঁকিয়ে কোনো তোয়াক্কা না কোরে গাছে উঠে পড়ে। মিনিট দুইয়ের মধ্যেই সাত-আটটা ডাঁসা পেয়ারা পেড়ে আনে ছোটো ছোটো ডাল ভেঙ্গে। ডালগুলোয় বেশকয়েকটা কাঁচা পেয়ারা। যোকিম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করে প্রচণ্ড তৃপ্তি নিয়ে প্রশ্রাব করে।

'চল এবার ফিরে যাই।'

শিমুলের কাঁপা কাঁপা ফিসফাস গলা।

সাগর ফিসফিসিয়ে বললো- 'তুই যা। ভিতুর সেক্রেটারী। এই বাবুল, ওদের কিচেনে যাবিনে? 'ল' যাই।'

'দেখে ফেললে?' বাবুলের আগে শিমুলই উত্তর দেয়।

'দেখবে না। চল দেখে আসি ওরা কি দিয়ে খাচ্ছে?'

অসহায়ভাবে শিমুল ছোটো ছোটো কলাগাছের ফাঁক দিয়ে সাগরদের পিছু পিছু এগিয়ে চলে। যোকিমকে নাগালে পেয়ে আবার বলে- 'এই যোকিম, দেখে ফেলবে তো? ওদের বল, ফিরে যাই।'

যোকিম শিমুলের কথার জবাব দেয় না। সে সাগর ও বাবুলের সঙ্গ ধরার জন্যে ছুটে যায়। খোকন তরতরিয়ে বাতাবি লেবু গাছে উঠে পড়ে। শিমুল কলাগাছের আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এতোক্ষণ পরে রিয়ার কথা মনে পড়ে ওর এবং কেনো যেনো ওর মন আরো বেশি খারাপ হয়ে যায়। এতোসবের কোনো মানে হয় না।

দু'জন মেয়ে। শিমুলের বুক ধ্বক কোরে উঠলো। রিয়া নাতো?

এদিকটায় এখন নির্জন। রান্না ঘরের বারান্দার আলো পড়েছে মেয়ে দুইজনের বুক বরাবর। ভূতুরে দুটি ছায়া নড়াচড়া করছে। একটা মেয়ে টিউবওয়েলের হাতল ধোরে আছে। অন্যজন

শিমুল চমকে উঠে আরো কিছুটা পিছিয়ে আসে। বাবুল হাল্কা কোরে শিস বাজিয়েছে। মেয়ে দুটো প্রথমে খেয়াল করেনি। এদিকটায় আগের মতোই পেছন ফিরে আছে। পাশে দাঁড়ানো মেয়েটা হঠাৎ কোরে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বাবুল আবার শিস বাজায়। দু'জন মেয়ে এবার একই সাথে চমকে উঠে ফিরে তাকায়। কয়েক পা সরে দাঁড়াতেই লাইটের আলো ওদের চোখে পড়ে। পর্শী ও নদী। ওরা পরস্পর মুখোমুখি তাকায়। মুখে কিছু বলে না। পেছন ফিরে আবার তাকায়। দৌঁড় দেবে, এমন একটা ভাব। বাবুল ততোক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ওর সারা গায়ে আলো এসে পড়েছে।

দৌঁড় দিতে গিয়েও পর্শী পারলো না। নদীর হাতে ওর হাত। কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে নদীর সাথে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। এবং শিমুল আশ্চর্য হয়ে দেখলো, নদী বেশ চঞ্চলতার সাথেই বাবুলের দিকে এগিয়ে আসে। সাগর ততোক্ষণে ওর পাশে চলে গেছে।

নদী হাত ইশারায় ওদেরকে সরিয়ে নেয়। আধো আলো আধো ছায়ায় ঘেরা রান্না ঘরের পশ্চিম-উত্তর কোনা। কানে কানে পর্শীকে কি যেনো বললো নদী। সে চলে যায়। শিমুলের খুব রাগ হয়। ওদের সাথে এভাবে আসাটা ঠিক হয়নি বোলে ওর মনে হচ্ছে। সে কয়েক পা দক্ষিণে সরে আসে। স্টাডি আওয়ার আরম্ভ হবার সময় হয়ে আসছে। এখনই না ফিরলে মহা সর্বনাশ! একাই ফিরে যাওয়াটা উচিত হবে কি-না, সে তা ভেবে ঠিক করতে পারছে না। আর এমন সময় ওড়না দিয়ে ঢেকে বাটি হাতে পর্শী ফিরে এলো। ওর সাথে নতুন একটা মেয়ে। শিমুল চিনতে পারে না। সে অন্ধকারে ঘড়ির দিকে তাকালো কিন্তু মিশমিশে অন্ধকারে শিমুল ঘড়ি বা নিজের হাত কিছুই দেখতে পেলো না।

'ওম্মা যো-'

নদী মুখের কথা শেষ করতে পারলো না। যোকিমকে অন্ধকার থেকে হঠাৎ এগিয়ে আসতে দেখে বেশ জোরে ওর নাম ধোরে নদী চেঁচিয়ে উঠছিল। বাবুল নির্দ্বিদায় নদীর মুখ আঁটকে ধরে। শিমুল 'থ' মেরে তাকিয়ে থাকে। নদী বা বাবুল এতটা সাহসী, শিমুল কখনো ভাবেনি।

বাটি পর্শীর হাতে। ওরা তিনজন বাটি থেকে কি যেনো কাড়াকাড়ি কোরে তুলে টুপ কোরে মুখে পুরে দিলো। বাবুলের স্বভাবই আলাদা। শরীরটা যেমন বয়সের তুলনায় বেশি তাগড়া, গলাটাও তেমন; কেমন ভরাট আর ফ্যাসফেসে। আস্তে কথা বলা ওর স্বভাব নয়। ফিসফাস করতে গিয়েও জোর হয়ে যাচ্ছে ওর কথায়।

নদী গ্লাসে কোরে টিউব-ওয়েল চেপে পানি খাওয়ালো। শেষের পালা যোকিমের। গ্লাসটা সে হাত ছাড়া করলো না। পর্শী ওড়নার একটা পাশ এগিয়ে দেয় মুখ মুছার জন্যে। সাগর মুখ মুছলো এবং ঝটকা টানে পুরো ওড়নাটাই টেনে নিলো। পর্শী হতভম্ব হয়ে যায়। 'কি ফাজিলরে।' হেসে ফেলে পর্শী। সেই সাথে দৌড়ে চলে যায়। হঠাৎ কোরে শিমুলের খেয়াল হলো, খোকন ওদের সাথে নেই। এবং ঠিক তক্ষুণি দূরে দুই-দুটি বিদেশী কুকুরের তেড়ে ওঠা গর্জন শোনা গেলো। বাবুলরা দ্রুত কলাবাগানে ছুটে আসে। প্রাচীরটা হাত পঁচিশ-ত্রিশ পেছনে। ওরা ধুপধাপ শব্দ কোরে দৌড়াতে থাকে।

ওরা হাঁপাতে হাঁপাতে যখন স্কুল মাঠে এসে পৌঁছেছিল, তখনই স্টাডি আওয়ার শুরু করার হাত তালি পড়েছিল। শিমুলের নিশি অভিযান ওটাই প্রথম, ওটাই শেষ। মিনিট পাঁচেক দেরি হোলেই এ্যালসেশিয়ান দুটোর পাল্লায় পড়তে হতো। শিমুল ভেতরে ভেতরে শিউরে ওঠে। আর নয়, সে নিজেই সত্যি সত্যি নিজের কান মলে দেয়।

শেষ পযর্ন্ত আজও রিয়াকে চিঠি লেখা হলো না। মাঝখান থেকে ইলেকটিভ ম্যাথ করার রুটিন বাধা সময়টা গচ্ছা গেলো। শিমুল আরো আধঘন্টা ফিজিক্স বই পড়লো, একটা প্রশ্নের উত্তর লিখে বইয়ের সাথে মেলালো। বইটা বন্ধ করতেই বিশাল একটা হাই উঠলো। গা ম্যাজমেজ করছে। শিমুল ঘড়ির দিকে তাকায়। এগারোটা চল্লিশ। সাগররা ফেরেনি। সে হেরিকেন নিভিয়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠাণ্ডা একটা বাতাসের ঝাপ্টা এসে লাগছে ওর মুখে-বুকে এবং তখন রিয়ার মুখটা নতুন কোরে ওর মনে জেগে ওঠে। 'এই রিয়া, কি করছো? ঘুমোচ্ছো?' মনে মনে ফিসফাস করে শিমুল। মিনিট পাঁচ-সাত জানালায় দাঁড়িয়ে থেকে অর্থহীন কথা বলে আর ছবি আঁকে। সবই রিয়াকে নিয়ে। 'আচ্ছা, রিয়াকে একটা চেইন বানিয়ে দিলে কেমন হয়?' হাত খরচ থেকে কালই জমাতে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে শিমুল। বেশ খুশি খুশি মনে সে বিছানায় এসে শোয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমে ডুবে যায়।

স্কুল মাঠ পেরোলেই হোস্টেলের ধূসর রঙয়ের দোতলা দালান। মাঠ থেকে হোস্টেলের এলাকাটুকু বেশ উঁচু। তাতেই সীমানা আলাদা হয়ে গেছে। শিমুল মাঠ পেরিয়ে বাঁক নিলো এবং দেখলো, রান্না ঘরের সামনে বড়ো সরো একটা জটলা। সে দ্রুত এগিয়ে আসে। জটলার মাঝখানে একভূর নারকেলের ছোবড়া। পাশে চারটে নারকেল এবং ছয়টি ডাব। এসব সামনে নিয়ে কিছুটা পিছিয়ে বোর্ডিং ইনচার্জ সোহান স্যার চেয়ারে বোসে আছেন। থমথমে মুখ। কপালে হালকা কুঞ্চন। খয়েরী রঙয়ের চশমার নিচে চোখ দু'টো। তিনি কি ভাবছেন বোঝা যাচ্ছে না। তিনি সিগারেটের আগুন দিয়ে নতুন সিগারেটে আগুন জ্বালালেন। শিমুল জটলার মধ্য থেকে বাবুল ও সাগরকে খুঁজে বের করলো। ওদের মুখ পাংশুটে। সহজ হতে চেষ্ট করছে, পারছে না।

সোহান স্যার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। সিগারেটের আগুন পায়ের জুতা দিয়ে চেপে নিভিয়ে ফেললেন। তাকালেন ঘড়ির দিকে। কোনো রাগটাগ না কোরে থমথমে গলায় বললেন- 'সবাই খেয়ে নাও।' তিনি আর কোনো কথা না বোলে নিজের অফিস রুমের দিকে চলে গেলেন। জটলাটা কলবলিয়ে উঠলো।

স্কুল ছুটি হয় সাড়ে তিনটায়। তখন থেকে পৌঁনে ছয়টা পর্যন্ত ফ্রি, খেলা-ধূলার জন্যে অবারিত সময়। আজ খেলা হলো না। অসময়ে ঘন্টার শব্দ শুনে শিমুল ঘন্টা ঝুলানো আম গাছটার দিকে তাকায়। তারপর হাতঘড়ির দিকে। চারটা দশ। ওর মন খারাপ হয়ে যায়। রিয়ার সাথে আজ হয়তো দেখাই হবে না। সাথে সাথেই বুকটা ধক কোরে ওঠে। মনে পড়ে নারকেলগুলোর কথা। তবুও অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়মের চোখ রাঙানিতে সে স্টাডি রুমের দিকে এগিয়ে চলে।

ঘন্টা বাজানো মানেই- 'স্টাডি রুমে জড়ো হও।'

স্টাডি রুমে ঢোকা মাত্রই শিমুলের পানি তৃষ্ণা পায়। কিন্তু সে পানি না খেয়েই চুপচাপ নিজের ডেস্কে গিয়ে কোনো শব্দ না কোরে বোসে পড়ে। ওর ডানপাশে সাগর ও খোকনের ডেস্ক। বাঁয়ে যোকিমের। সামনে বাবুল। সবাইকে সে আড়চোখে একবার দেখে নেয়। স্যারকেও। স্যার টেবিলে ভর রেখে দাঁড়িয়ে চুপচাপ চশমার কাচ মুছছেন আর স্টাডি রুমের সবাইকে দেখছেন। নিজের উপর শিমুল জোর খাটায়। বাবুলদের দিকে তাকানো যাবে না। এমনিতেই ওদের মুখ শুকিয়ে আম্‌শে হয়ে আছে। কেবল খোকনটাই যা পাজি। শিমুলের চোখে চোখ পড়তেই পুট কোরে কেমন চোখ টিপে সে হেসে ফেললো।

স্টাডি রুমে নিশ্ছিদ্র স্তব্ধতা!

স্যার মনিটরের দিকে তাকালেন।

'ছেলেরা, আমার বিশ্বাস, তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো কেনো তোমাদের ডাকা হয়েছে। তাই না?'

কেউ কোনো জবাব দিলো না। পেছনের দিকে কে যেনো মেঝেতে স্যান্ডেল ঘষে খসখস শব্দ করলো একটু।

'কারা কারা কাল রাতে নারকেল চুরি করেছো, আমি তা জানি। আমার কাছে প্রমাণও আছে। কিন্তু ছেলেরা, আমাকে প্রমাণ করতে যাওয়া এক জিনিস আর তোমরা তোমাদের দোষ স্বীকার করা আরেক জিনিস। আশা করি তোমরা তোমাদের দোষ স্বীকার করবে। নারকেলগুলো গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছু না, গুরুত্বপূর্ণ হলো চুরি করা। তোমরা যেনো চুরি না করো, এ কারণে মাত্র পঞ্চাশ পয়সায় তোমাদের কাছে এক একটা নারকেল বিক্রি করা হয়। তবুও তোমরা চুরি করেছো।'

স্যার থামলেন এবং সাথে সাথেই স্টাডী রুমে নীরবতা নেমে এলো।

নীরবতা ভাঙলো খোকন- 'নারকেলগুলো কোথায় পেলেন, স্যার?'

স্যার জবাব না দিয়ে খোকনের দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

'সত্য কথা বললে আমি হয়তো মাফ কোরে দিতে পারি। না বললে তাকে আর হোস্টেলে রাখা হবে না। ছেলেরা, আমার সাথে চালাকি করতে যেয়ো না। বলো, কারা কারা ছিলে?'

সবাই নিরুত্তর। শিমুল মনের অগোচরে সাগরের দিকে তাকায়। দেখে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে সাগর খোকনকে ইঙ্গিতে কি যেনো জানান দিচ্ছে।

সোহান স্যার ঘুরে টেবিলের ড্রয়ার টানলেন। ড্রয়ার টেনে একটা ছুরি বের করলেন। এবং যাদের চোখে ছুরিটা পড়লো, তারাই রবিনের দিকে তাকালো। স্যার আগের জায়গায় ফিরে এলেন। দম নিলেন একটু।

'ছুরিটা কার?'

রবিনের তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। সে উঠে দাঁড়ালো।

'আমার স্যার!'

'কাউকে দিয়েছিলে?'

'না স্যার।'

'কবর স্থানের ভাঙ্গা একটা কবরের কোঠরে নারকেল আর ছোবড়াগুলো ছিলো। এই ছুরিটাও ওসবের সাথেই পাওয়া গ্যাছে। তোমার ব্যাখ্যা কি?'

'আমি কিছু জানিনে স্যার।'

রবিন ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে।

'তুমি বসো। কান্নাটা থামাও এবার।' বিরতি নিলেন তিনি। সেকেন্ড দশেক। 'শিমুল...' উঠে দাঁড়ানোর সময় শিমুল বাবুলের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে ফেলে। ওর শরীরটা একটু একটু কাঁপছে। কি জবাব দেবে?

'তুমি কিছু জানো?'

শিমুল মাথা নূইয়ে নিজের ডেস্কের উপর তাকায়।

'আমি নারকেল চুরি করিনি, স্যার।'

'যারা চুরি করেছে, তাদেরকে চেনো না?'

শিমুল মাথা সামান্য উঁচু করে। 'আমি পড়ছিলাম স্যার, খেয়াল করিনি।'

'এই ছেলে! মিথ্যুক কোথাকার! সত্য কথা বলো।'

'আমি পড়ছিলাম স্যার।'

'কিচ্ছু জানো না?' স্যারের গলাটা এবার খিঁচিয়ে ওঠে।

'আমি খেয়াল করিনি।'

'সাট-আপ! লায়ার।'

'কাল সকালেই তুমি হোস্টেল ছেড়ে চলে যাবে।'

সাথে সাথে শিমুলের চোখমুখ কালো হয়ে ওঠে। মায়ের খরখরে আর শুকনো মুখটা ওর মনের আয়নায় ভেসে ওঠে, যেখানে শত দু:খকষ্টে আজও দোল খাচ্ছে একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন। 'বাবা পড়ালেখা কইরা তোমারে মানুষ হইতে হইবো।' এই স্বপ্নের জায়গায় এখন লজ্জা আর অপমান। সবার চোখ এখন ওর দিকে। ওর বগল দিয়ে ফোটায় ফোটায় ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। তবে কাঁপুনিটা থেমে গেছে। ঢোক গিললো সে। হঠাৎ কোরে রিয়ার মুখ ওর চোখে ভেসে ওঠে। ছি ছি, রিয়াকে সে কি কোরে মুখ দেখাবে? সে এবার সত্য কথা বলতে গেলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে- 'আমার অপরাধ কি স্যার?'

সোহান স্যারের ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দু'টো হালকাভাবে কাঁপছে। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন- 'আমি বলছি, ব্যস। তুমি কালই চলে যাবে।'

'আমি তো স্যার নারকেল চুরি করিনি!'

'তুমি লায়ার, সত্য কথা গোপন করছো।'

শিমুলের জেদ একটু একটু কোরে বাড়তে থাকে।

'আমি কাউকে নারকেল চুরি করতে দেখিনি।'

'আবার মিথ্যে কথা? ঠিক আছে, কালই তুমি হোস্টেল ছেড়ে চলে যাবে।'

'আমি যাবো না স্যার।'

'হোয়াট!' বিকটভাবে সোহান স্যার চেঁচিয়ে উঠলেন। 'আমি বলছি তুমি যাবে।'

'আমি হোস্টেলের কোনো আইন অমান্য করিনি।'

'তাই বুঝি? রিয়াকে তুমি চিঠি লিখো না?'

লজ্জায় আর অপমানে শিমুল আরো বেশি নূয়ে পড়লো কিন্তু ওর জেদটাও সেইসাথে বেড়েই চললো।

'কি, জবাব দিচ্ছো না কেনো?' রাগে ক্ষোভে সোহান স্যার চেঁচিয়ে ওঠেন।

'ওটা হোস্টেলের আইনের আওতায় পড়ে না। প্রয়োজন মনে করলে আপনি হেডস্যারকে নালিশ জানান।'

সাগর ও খোকন আশ্চর্য হয়ে শিমুলের দিকে তাকায়। শিমুলের জেদী অজগরটা একটু একটু কোরে আড়মোরা ভাঙতে শুরু করেছে।

'তুমি বিড়ি খাও না?'

'স্যার, আপনি বড় আপার কাছে আমার নামে মিথ্যে নালিশ করেছিলেন। আমি বিড়ি সিগারেট খাই না।'

'কি, তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী বলতে চাও?'

'স্যার, আমি জানি আমি বিড়ি খাই না।'

'অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে আমি নিজের চোখ দিয়ে তোমাকে বাবুল আর সাগরের সাথে বিড়ি খেতে দেখেছি। আমার চোখের দেখাকেও অবিশ্বাস করতে বলছো?'

'আপনি ভুল দেখেছিলেন স্যার।'

'অসম্ভব! তুমি একটা মিথ্যুক, এ লায়ার।'

শিমুল সাথে সাথে জবাব দিলো না। ডেস্কের উপরে তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে আনমনে সেকেন্ড আট-দশ গোল গোল বৃত্ত আঁকলো সে। ভাবলো একটু। তারপর চোখ তুলে সরাসরি স্যারের দিকে তাকালো। মুখচোখ থমথমে। তবে ভেতরের প্রবল ফোসফোসানি বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই।

'স্যার, অন্যায়ভাবে বেশ কয়েকবার আপনি আমাকে লায়ার বলেছেন। আমি সত্যিই বিড়ি খেতাম না। আমি আজ অথবা কাল থেকে বিড়ি খাবো। অন্ধকারে লুকিয়ে আমাকে ধরতে যাবেন না স্যার। চোর সন্দেহে আপনার গায়ে ইঁট পড়তে পারে।'

'হোয়াট! আমাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছো? তোমার এতো বড় সাহস?'

'যা হতে পারে, আমি শুধু সে কথাটা বলছি।'

'তুমি অবশ্যই কাল হোস্টেল ছাড়বে। আমি তোমাকে বাধ্য করবো। এই ছেলেরা, তোমরা সবাই শুনলে তো?'

'আমি হোস্টের ছেড়ে যাবো না। স্যার, আপনি নারকেল চোর ধরার জন্য আমাদের ডেকেছিলেন।'

'তারা কে কে?'

'আমি দেখিনি, আর দেখলেও আপনার কাছে বলতাম না।'

'তুমি সবই জানো। তোমাকে বলতেই হবে এবং তা' আমার কাছেই।' স্যার রবিনের দিকে তাকালেন।

'রবিন, আমার রুম খোলা আছে। বেত নিয়ে আসো।'

রবিন তাৎক্ষণিভাবে মনস্থির না করতে পেরে দাঁড়িয়ে থাকে। স্যার ধমকে ওঠেন- 'দাঁড়িয়ে রইলে কেনো?'

রবিন সামান্য চমকে লাফিয়ে ওঠে। তারপরই দরোজার দিকে মাথা নিচু কোরে হাঁটতে শুরু করে এবং অস্বাভাবিকভাবে দরোজার কপাটে ওর মাথা ঠুকে যায়। কপালে হাত দিয়েই তবু সে দরজা পেরিয়ে গেলো। স্যার আগের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। চোখমুখ রাগে থমথম করছে। তাকালেন শিমুলের দিকে 'আমি তোমাকে কলাগাছ উল্টো কোরে লাগাতে বললে তুমি তাই লাগাবে, লাগাতে বাধ্য।'

'আমি হোস্টেলের কোনো আইন ভাঙ্গিনি স্যার। ইচ্ছে করলে আপনি হেড স্যারকে ডাকতে পারেন। নালিশ করতে পারেন।'

'নালিশ করছি, দাঁড়াও।'

'আমি পাগোল নই স্যার। কলাগাছ উল্টা কোরে কেউ লাগায় না, মারা যাবে। আমি কখনোই উল্টা কোরে লাগাবো না।'

'তুমি একশোবার লাগাবে। আমি বলছি, তুমি লাগাবে, লাগাতে বাধ্য।'

সোহান স্যার এক পা, দু'পা কোরে শিমুলের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁর বাঁ হাতে চশমা। চশমাটা কাঁপছে। শিমুল চশমার কাঁপণ দেখছে।

'বলো, লাগাবে?'

'না।'

ঠাস কোরে শিমুলের গালে চড় পড়ে। সে টুল উল্টিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। মনিটর এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে। মনিটরের হাত সরিয়ে শিমুল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

'বলো, কলাগাছ উল্টো কোরে লাগাবে?'

'না।'

আবার চড় পড়ে। কিন্তু শিমুল এবার পড়ে গেলো না।

'আপনি অন্যায়ভাবে আমাকে মারছেন।'

'বলো লাগাবে?'

'না।'

আবারো চড় পড়লো।

শিমুল সরাসরি সোহান স্যারের দিকে তাকায়। স্টাডি রুমে কবরের স্তব্ধতা। দম নিতেও যেনো সবাই ভুলে গেছে। শিমুল 'থু' কোরে দেয়ালে থুতু ফেললো। থুতুতে রক্ত। বাঁ হাতের কব্জি দিয়ে ঠোঁট মুছে বললো- 'মিথ্যে শাস্তি দিয়ে আপনি একটা মিথ্যেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন স্যার। আমি কাল হেড স্যারের কাছে নালিশ কোরে টি.সি চাবো।

'স্টুপিড!'

ফুঁসতে ফুঁসতে স্যার টেবিলে ফিরে গেলেন। তারপর ধপাস কোরে চেয়ারে বোসে পড়লেন। পকেট হাতড়ে তিনি সিগারেট বের করলেন। জ্বাললেন না। কিছুক্ষণ চুপচাপ বোসে থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। তারপরই গর্জে ওঠলেন- 'সাগর, বাবুল, খোকন, যোকিম!'

ওরা চারজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'কাল রাতে কারা নারকেল চুরি করেছে, তোমরা জানো না?'

ওরা মাথা ঝাঁকায়।

'স্যার তড়াক কোরে উঠে দাঁড়ালেন। 'জানো না, না? ধিক তোমাদের। ছি!' শিমুলকে তর্জনী আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ওকে দ্যাখো, ভালো কোরে দ্যাখো। বন্ধুর জন্যে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের মতো কুলাঙ্গার বন্ধুর জন্যে কি ধরনের লজ্জা পেলো, অপমানিত হলো, মার খেলো; তবুও মুখ খোলেনি। তোমাদের নাম বলেনি।'

'সে সাহসী; তোমরা ভীতু, কুলাঙ্গার। চার বন্ধু একসাথে এক বন্ধুর পাশে দাঁড়াতে পারলে না? আর শিমুল, সততা সব সময়ের জন্যে ভালো নয়। তোমার এহেন একগুয়েমী সততার জন্যে ভবিষ্যতে তোমাকে অনেক বেশি ভুগতে হবে। নিজের বোকামিটুকু বুঝতে চেষ্টা করো। বুঝে নাও, যাদেরকে তুমি বন্ধু ভাবছো, ওদের সবাই তোমার ভালো বন্ধু নয়।'

এতোক্ষণ পরে শিমুলের চোখ ভেঙ্গে ফোটায় ফোটায় লোনা জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

'তুমি অবশ্যই কাল হোস্টেল ছাড়বে। আমি তোমাকে বাধ্য করবো। এই ছেলেরা, তোমরা সবাই শুনলে তো?'

'আমি হোস্টের ছেড়ে যাবো না। স্যার, আপনি নারকেল চোর ধরার জন্য আমাদের ডেকেছিলেন।'

'তারা কে কে?'

'আমি দেখিনি, আর-দেখলেও আপনার কাছে বলতাম না।'

'তুমি সবই জানো। তোমাকে বলতেই হবে এবং তা' আমার কাছেই।' স্যার রবিনের দিকে তাকালেন।

'রবিন, আমার রুম খোলা আছে। বেত নিয়ে আসো।'

রবিন তাৎক্ষণিভাবে মনস্থির না করতে পেরে দাঁড়িয়ে থাকে। স্যার ধমকে ওঠেন- 'দাঁড়িয়ে রইলে কেনো?'

রবিন সামান্য চমকে লাফিয়ে ওঠে। তারপরই দরোজার দিকে মাথা নিচু কোরে হাঁটতে শুরু করে এবং অস্বাভাবিকভাবে দরোজার কপাটে ওর মাথা ঠুকে যায়। কপালে হাত দিয়েই তবু সে দরজা পেরিয়ে গেলো। স্যার আগের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। চোখমুখ রাগে থমথম করছে। তাকালেন শিমুলের দিকে 'আমি তোমাকে কলাগাছ উল্টো কোরে লাগাতে বললে তুমি তাই লাগাবে, লাগাতে বাধ্য।'

'আমি হোস্টেলের কোনো আইন ভাঙ্গিনি স্যার। ইচ্ছে করলে আপনি হেড স্যারকে ডাকতে পারেন। নালিশ করতে পারেন।'

'নালিশ করছি, দাঁড়াও।'

'আমি পাগোল নই স্যার। কলাগাছ উল্টা কোরে কেউ লাগায় না, মারা যাবে। আমি কখনোই উল্টা কোরে লাগাবো না।'

'তুমি একশোবার লাগাবে। আমি বলছি, তুমি লাগাবে, লাগাতে বাধ্য।'

সোহান স্যার এক পা, দু'পা কোরে শিমুলের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁর বাঁ হাতে চশমা। চশমাটা কাঁপছে। শিমুল চশমার কাঁপণ দেখছে।

'বলো, লাগাবে?'

'না।'

ঠাস কোরে শিমুলের গালে চড় পড়ে। সে টুল উল্টিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। মনিটর এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে। মনিটরের হাত সরিয়ে শিমুল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

'বলো, কলাগাছ উল্টো কোরে লাগাবে?'

'না।'

আবার চড় পড়ে। কিন্তু শিমুল এবার পড়ে গেলো না।

'আপনি অন্যায়ভাবে আমাকে মারছেন।'

'বলো লাগাবে?'

'না।'

আবারো চড় পড়লো।

শিমুল সরাসরি সোহান স্যারের দিকে তাকায়। স্টাডি রুমে কবরের স্তব্ধতা। দম নিতেও যেনো সবাই ভুলে গেছে। শিমুল 'থু' কোরে দেয়ালে থুতু ফেললো। থুতুতে রক্ত। বাঁ হাতের কব্জি দিয়ে ঠোঁট মুছে বললো- 'মিথ্যে শাস্তি দিয়ে আপনি একটা মিথ্যেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন স্যার। আমি কাল হেড স্যারের কাছে নালিশ কোরে টি.সি চাবো।

'স্টুপিড!'

ফুঁসতে ফুঁসতে স্যার টেবিলে ফিরে গেলেন। তারপর ধপাস কোরে চেয়ারে বোসে পড়লেন। পকেট হাতড়ে তিনি সিগারেট বের করলেন। জ্বাললেন না। কিছুক্ষণ চুপচাপ বোসে থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। তারপরই গর্জে ওঠলেন- 'সাগর, বাবুল, খোকন, যোকিম!'

ওরা চারজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'কাল রাতে কারা নারকেল চুরি করেছে, তোমরা জানো না?'

ওরা মাথা ঝাঁকায়।

'স্যার তড়াক কোরে উঠে দাঁড়ালেন। 'জানো না, না? ধিক তোমাদের। ছি!' শিমুলকে তর্জনী আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ওকে দ্যাখো, ভালো কোরে দ্যাখো। বন্ধুর জন্যে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের মতো কুলাঙ্গার বন্ধুর জন্যে কি ধরনের লজ্জা পেলো, অপমানিত হলো, মার খেলো; তবুও মুখ খোলেনি। তোমাদের নাম বলেনি।'

'সে সাহসী; তোমরা ভীতু, কুলাঙ্গার। চার বন্ধু একসাথে এক বন্ধুর পাশে দাঁড়াতে পারলে না? আর শিমুল, সততা সব সময়ের জন্যে ভালো নয়। তোমার এহেন একগুয়েমী সততার জন্যে ভবিষ্যতে তোমাকে অনেক বেশি ভুগতে হবে। নিজের বোকামিটুকু বুঝতে চেষ্টা করো। বুঝে নাও, যাদেরকে তুমি বন্ধু ভাবছো, ওদের সবাই তোমার ভালো বন্ধু নয়।'

এতোক্ষণ পরে শিমুলের চোখ ভেঙ্গে ফোটায় ফোটায় লোনা জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

বকুল গাছটার তলায় আসতেই শিমুলের মন আরো বেশি খারাপ হয়ে গেলো। রিয়ার দেয়া বকুল ফুলের মালাটা সে বাড়িতে রেখে এসেছে। কথা ছিলো, ছুটির মাঝখানে সে রিয়াদের বাড়ি একবার যাবে। অথচ যাওয়া আর হচ্ছে না। ওর একটুও ইচ্ছে ছিলো না বড়'পার এখানে আসতে। মায়ের পীড়াপীড়ির জন্যেই শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়েছিল। এখন বড়'পা বলছে, সে বাড়ি যাবে না। পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে। শিমুল মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ইদানিং খুব অল্পতেই ওর বিরক্ত লাগে, রাগ হয়। এতো পড়ে, তবুও মনে থাকে না। কাল একটা কবিতা লিখেছিল। অসম্পূর্ণ। শেষ লাইনটাসহ মাঝখানের আরো দু'টো লাইন মিল করতে পারছে না। যেভাবে শেষ পর্যন্ত মিল দিয়েছিল, তাতে ওর নিজেরই ভালো লাগেনি। পরিবর্তন করতে হবে। অথচ সুন্দর আর অর্থবহ কোন মিলযুক্ত শব্দ ওর মনে আসছে না।

শিমুল গাছতলা থেকে কয়েকটা ফুল কুড়িয়ে ডান হাতের তালুতে নিয়ে নাচায় আর রিয়ার কথা ভাবে। গাছের গুড়ির চারপাশটা বৃত্তাকারে পাকা করা। সে যখন এই স্কুলে পড়তো, তখন পাকা ছিলো না। গাছটাও ইতোমধ্যে বেশ বেড়ে উঠেছে। শিমুল হাতের সবগুলো ফুল বাঁধানো বৃত্তের উপরে ছড়িয়ে এক পাশে বসলো।

ভর-দুপুর। সূর্যটা সামান্য একটু হেলে পড়েছে। একটা সোয়া একটা হবে। আকাশে থোকায় থোকায় সাদা-কালোয় মিশানো মেঘ। দক্ষিণ দিকে থেকে হালকা তালে উত্তরে সরে যাচ্ছে। ফসলের মাঠ শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা একটা বাতাস বইছে। শিমুল সামান্য সরে গিয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে পড়া রোদে গিয়ে বসলো।

ছেলেটার আর্ত-চিৎকারে শিমুল চোখ তুলে তাকায়। শিশির। রাসেল ওকে দাবড়াচ্ছে। ধরি ধরি ভাব। শিশির হঠাৎ কোরে থেমে যায়। রাসেল ওর গায়ের উপর গিয়ে পড়ে। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে রাসেল শিশিরকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। সাথে সাথে পেটে-পাছায় পটাপট কয়েকটা লাথি। শিশির দুই হাতে মাথা চেপে চেঁচাচ্ছে। শিমুল দৌড়ে ওদের দিকে ছুটে যায়। রাসেল ততোক্ষণে শিশিরের সোয়েটার চেপে ধোরে টেনে-হিঁচড়ে দাঁড়

করিয়েছে। পকেট থেকে মাছের আকারের সোনালী রঙয়ের একটা ছুরি বের করলো সে। খ্যাটখ্যাট শব্দ কোরে সে ছুরিটা খুললো। শিমুল তখনো কিছুটা দূরে। সে চেঁচিয়ে উঠলো- 'রাসেল।'

রাসেল তাকায়। দুইদিন হয়ে গেলো শিমুল এসেছে, অথচ রাসেলের সাথে ওর এই প্রথম দেখা। খুঁজেও রাসেলকে সে বের করতে পারেনি। শিশিরই কাল ঠোঁট উল্টে রাসেলের ব্যাপারে যে সব কথা বলেছিল, শিমুল তা' বিশ্বাস করতে পারেনি। এখন হঠাৎ কোরেই ওর মনে হলো, শিশির হয়তো খুব একটা মিথ্যে বলেনি।

সেই কতোদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা! শিমুল উত্তেজনায় কাঁপছে। অথচ রাসেল একবার মাত্র শিমুলকে দেখেই চোখ সরিয়ে নিয়েছে। কোনো আগ্রহই যেনো নেই। যেনো শিমুলকে সে চেনে না। শিমুলের মনটা খারাপ হয়ে গেলো সাথে সাথে। ওর মনটা আরো খারাপ হয়ে গেলো যখন ওর নিষেধ না মেনে রাসেল ঠাস কোরে শিশিরকে থাপ্পড় মারলো। শিমুল রাসেলের পাশে এসে হাঁপাতে থাকে। রাসেলের হাতের ছুরিটা একবার দেখে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে- 'এ তুই কি করছিস? কি হয়েছে?'

রাসেল শিমুলের দিকে তাকায় না। হাতের ছুরিটা সে আরো শক্ত কোরে ধরে। ভরাট এবং থমথমে ঠাণ্ডা গলায় শিশিরকে বলে- 'জামা খোল।'

শিশির শিমুলের দিকে সমর্থনের আশায় তাকায়।

রাসেল কাউন্ট শুরু করে– 'এক-দুই-তিন-চার-'

শিশির অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতিকষ্টে গায়ের জামা খুলে ফেলে।
'প্যান্ট খোল। ওয়ান, টু'

শিশিরের ফর্সা মুখ থেকে সবটুকু রক্ত মুহূর্তে মুছে যায়। একদম ফ্যাকাসে সাদা একটা অবয়ব। প্রচণ্ড ব্যাকুল হয়ে কাতর চোখে সে শিমুলের দিকে তাকায়।
'খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে রাসেল।'

রাসেল এবারও শিমুলের দিকে তাকালো না। অদ্ভুদ আত্মপ্রত্যয়ী আর ডোন্টকেয়ার ধাচের অবহেলার একটা ভাব ওর চেহারায়, আচরণে। এক দলা থুতু ফেললো রাসেল। বাঁম হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছে আগের মতোই অনুত্তেজিত কিন্তু ভয়ঙ্কর কঠোর গলায় সে ধমকে ওঠে– 'প্যান্ট খোল, নইলে থুতুটুকু চাট।' শিমুল ওর হাত ধোরে টানে। 'এই- তুই কি পাগোল হয়ে গেছিস?' এতোক্ষণে রাসেল শিমুলের সাথে কথা বললো– 'ওর যতোটা পাওনা, ততোটাই দিচ্ছি। নিতে ওকে হবেই। ওয়ান-টু-'

রাসেল শিশিরের পাঁজরে হাতের খোলা ছুরি চেপে ধরে। লাফিয়ে ওঠে শিশির। সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। একটুও কাঁদতে পারছেনা। কিছু একটা সে বলতে চাইছে। তার ঠোঁট কাঁপছে কিন্তু কথা বের হচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি প্যান্টের হুক-এ হাত দেয় কিন্ত প্যান্ট খুলে ফেলে না।

রাসেল ঠাস কোরে থাপ্পর মেরে আবার চিৎকার কোরে উঠলো– 'খোল!'

এতোক্ষণে শিশিরের কান্না পেলো। সে কাঁদতে কাঁদতে বললো - 'আমি মাফ চাইছি। তোমাকে আর কোনোদিন কিছু বলবো না।'

'বলবিনে কেনো? যতো খুশি বলিস। শেষবারের মতো বলছি, প্যান্ট খোল। সাতের বেশি আমি যাবোনা- ওয়ান,টু, থ্রী, ফোর...'

শিশির ছুরিটার দিকে তাকায়। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললো এবার। কাঁদতে কাঁদতেই প্যান্টের হুক খুলে চেইন-এ টান দেয়। শিমুল রাগে- অপমানে বকুল গাছটার দিকে হাঁটতে শুরু করে। ওর ইচ্ছে হচ্ছে রাসেলের পাছায় কষে একটা লাথি মারার। কিন্তু সে যে রাসেলের তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল।

'জাহান্নামে যা।' রাসেল শেষ বারের মতো শিশিরের গালে থাপ্পর মারে। অনিচ্ছা সত্বেও শিমুল সেদিকে তাকায়। শিশিরের পরনে শুধুমাত্র ছোট্ট একটা আন্ডারওয়ার। সে স্কুলের বারান্দায় উঠে একটা পীলার ধোরে ফ্যালফেলিয়ে শেষ আশা নিয়ে রাসেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। দূর থেকেই ওর কান্না বোঝা যাচ্ছে। রাসেল কেমন যান্ত্রিক ঢংয়ে ঘাসের উপরে পড়ে থাকা শিশিরের কাপড়গুলো তুলে নেয়। শিশিরের দিকে একবারও তাকায় না। সে লুঙ্গির গাঁট খুলে সিগারেট বের করে। পূর্বাণী সিগারেট। সাথে ম্যাচ। পরম নিশ্চিন্তে সে সিগারেট জ্বালে। হাতে জ্বলন্ত কাঠি। কাঠিটা শিশিরের দলা পাকানো কাপড়ের নিচে ধরে। প্রথমবারেই কাজ হয় না। কাঠিটা ফেলে দিয়ে রাসেল ম্যাচ থেকে নতুন কাঠি বের করে। আয়েশ কোরে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে এতোক্ষণে হঠাৎ যেনো শিমুলকে দেখতে পেয়েছে, এমন একটা ভঙ্গিমায় তাকায়। মুখে কিছু বলে না। তার হাতের কাঠি আবার জ্বলে ওঠে।

রাগে শিমুলের শরীর কাঁপছে। বগলে ঘাম জমতে শুরু করেছে। কি এসব? শিশিরটা একটু পাজি আছে, সবই তা জানেও। কিন্ত রাসেলের এমন কি পাকা ধান আছে শিশির যাতে মঈ দিতে পারে? ফাজিল আসলে রাসেলই। এবং আশ্চর্য, এই রাগের সময়েই হঠাৎ কোরে কবিতার শেষ লাইনটার চমৎকার একটা অন্তমিল শিমুল পেয়ে যায়- সে লাইন দু'টো নিয়ে মনে মনে খেলা করে কতোক্ষণ।

কি তীব্র আর উৎকট গন্ধ! নীলাভ রং ধরেছে আগুনে। রাসেল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নীরবতা ভাঙ্গে– 'দারুন, নারে? যাকে বলে ফ্যান্টাস্টিক!'

কবিতার স্পর্শটুকু হঠাৎ কোরেই আড়াল হয়ে যায় রাসেলের কথায় এবং সাথে সাথে শিমুলের মন ক্ষোভ আর দুঃখে ভরে ওঠে। সে যতোটা পারে নিজেকে সংবরণ কোরে রাসেলের দিকে তাকায়। বলে– 'বকুল স্যার যখন তোর চামড়া তুলে ফ্যান্টাসির আসল মানে বুঝিয়ে দেবে, তখন বুঝবি ঠেলাটা।'

'পরীক্ষা কেমন দিয়েছিস?' রাসেল শিমুলের কথার উত্তর না দিয়ে নির্বিকার ভাবে প্রসঙ্গ পাল্টে শিমুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে। ওর মুখে হাসি।

রাসেলের মুখে মিটি মিটি হাসি দেখে শিমুল অবাক বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে থাকে। ভীষণ অচেনা মনে হয় রাসেলকে। হতবিহ্বল ভাবটা কেটে যেতেই একটা ঘৃণামিশ্রিত রাগ ওর ভেতরে নিশপিশিয়ে ওঠে– 'লজ্জা-শরম, দয়া-মায়া বলতে তোর কি কিছু নেই?'

'দুই-তিন বছর পরে আমাদের দেখা হলো, নারে? তুই না একদম তালগাছ হয়ে গেছিস।' রাসেল বিতর্ক থেকে সরে আসতে চায়। কিন্তু শিমুল ওকে টেনে নেয় সেখানে। শিমুল এবার ক্ষেপে গিয়ে বলে– 'শিশির আসলে ঠিক কথাই বলেছিল। তুই একাটা চন্ডাল হয়ে গেছিস।'

রাসেল আয়েস কোরে ধোঁয়া ছেড়ে বলে– 'আচ্ছা শিমুল, ছাত্তার ভাইয়ের কথা তোর মনে আছে? জানিস, ছাত্তার ভাই প্রেমে পড়ে দল-পার্টি সব ছেড়ে-ছুড়ে বাসা বাঁধলো। গতবছরই বিয়ে করেছিল। বউটা যা ভালো না রে! মজার কথা কি জানিস, যখন সে পার্টিতে ছিলো, তখন তার কোনো ক্ষতি হয়নি। ব্যবসা- বাণিজ্য নিয়ে ভালোই চলছিল। কিন্তু, মাস ছয় আগে কারা যেনো হুট কোরে তাকে গুলি কোরে মেরে ফেললো। এই শিমুল, তুই প্রেম ট্রেম করছিস নাকি রে?'
'তোর ভ্যানতারামি প্যাচাল থামাবি? সব কিছুরই একটা সীমা আছে।'

রাসেল সাথে সাথে জবাব দিলো না। সিগারেটের ধোঁয়ায় পরপর চার-পাঁচটা রিং বানিয়ে ওইদিকে তাকিয়ে থেকেই অনেকটা আনমনা ঢংয়ে বললো- 'রাইট, সব কিছুরই একটা সীমা আছে।' সিগারেটা টিপে নিভিয়ে জামার হাতায় মুখ মুছলো সে। তারপর শিমুলের দিকে তাকালো।

'আচ্ছা শিমুল, তুই যাকে বাবা বোলে জানিস: ধর, সে তোর বাবা নয়। তুই আসলে তোর বাবাকে কখনো দেখিসনি। মানে– তোর কোনো বাবা সেই। তোর তখন কেমন লাগবে রে?'

শিমুল সোজা হয়ে বসে। 'মানে?'

'মানে খুবই সোজা। বুঝলিনে? ধর, হঠাৎ কোরে তুই জানতে পারলি, তুই একটা জারজ সন্তান, তখন?'

'রাসেল, সহ্যের একটা সীমা আছে। ধরাকে সরা মনে করিসনে।'

রাসেলের মুখে এখন কোনো হাসি নেই। থমথমে মুখটায় একবার নিজেরই বাম হাত বুলিয়ে শিমুলের দিকে তাকিয়েই সে আবার চোখ নামিয়ে নেয়। খুব ধরা গলায় স্পষ্ট কিন্তু ধীরে ধীরে সে আবার বলে– 'ধর, তুই যাকে মা ডাকিস, হঠাৎ একদিন জানলি সে তোর মা নয়। তখন তুই কি করবি শিমুল?'

রাগে শিমুল উঠে দাঁড়ালো। ওর শরীর কাঁপছে।

রাসেল এবার খুব করুণভাবে হাসলো। শিমুলের দিকে তাকিয়ে বললো– 'তুই আসলে এখনো খুব ভালো ছেলে হয়ে আছিস, তাই এতো সহজে শুধু রাগ দেখাতে পারছিস, আসল বিষয়টা বুঝছিস না।'

'দাঁড়া, রহিমা খালাকে আমি যদি সব না বলছি!'

শিমুলের গোয়ার্তুমির রাগ দেখে রাসেল এবার রাগতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সে শব্দ কোরে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই বললো– 'গবেট।'

‘গবেট আমি, না তুই?’ শিমুল চেঁচিয়ে ওঠে।

‘তোর রহিমা খালা আমার কে হয় রে যে তাকে আমি ভয় পাবো?’

‘এতোটা পঁচেছিস? মাকেও তুই ভয় পাসনে?’

‘তোর রহিমা খালা আমার মা নয়। আমি আমার মাকে চিনি না। বাবাকেও না।’

‘রাসেল!’ অবাক বিস্ময়ে শিমুল হতভম্ব!

‘শিশিরটা ফাজিল, তবে সত্যি কথাই বলে। আজ কি যে হলো আমার! রাগের ভূতটা এমন কোরে আমাকে জাপ্টে ধরলো, ঠিক থাকতে পারলাম না।’

‘শিশির তোকে কি বলেছিল?’

‘আমার বাবার নাম জানতে চেয়েছিল। রহিমা নামের যে মহিলাকে আমি মা বোলে ডাকি, সে আমার কেমন মা- ‘এই সব! ও প্রায়ই এসব করে। আমি তেমন একটা রাগি না। আজ কি যে হলো!’ কিছুক্ষণ ঘাড় গুঁজে থাকে রাসেল। হঠাৎ কোরেই ওর চোখ দু’টোয় লাল রঙ এসে জমাট বেঁধেছে। সে মাথার চুল ব্যাক ব্রাশ করতে করতে বললো- ‘ওর কিন্তু এসব কথা বলা ঠিক হয়নি।’

‘রহিমা খালা এসব জানে? শিমুলের গলায় বিষন্নতার ঘন আবেশ।’

‘আমি আমার সত্যিকারের মাকে খুন করবো।’

‘তাকে তুই চিনিস?’

‘তার আগে আরো একজনকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করবো।’ কেমন নির্লিপ্ত শোনায় রাসেলের গলা।

শিমুল চোখ তুলে বলে- ‘কাকে?’

‘যার নাম জানিনে বোলে সবাই আমাকে ঠাট্টা করে, থুতু দেয়। আচ্ছা শিমুল,প্রায় লোকই বলে, আমার চেহারার সাথে নাকি জলিদের মামার চেহারা ভীষণ মিল। কেনো রে?’

‘তুই ফাদার প্রিন্স-এর কথা বলছিস?’

রাসেল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কোনো জবাব না দিয়ে। হঠাৎ কোরে শিমুলের মনে ডলির কথা মনে পড়ে। সে প্রচন্ড ব্যাগ্রতার সাথে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে– ‘রাসেল, তাহলে ডলি? ডলি তোর বোন না?’

রাসেল নতুন কোরে সিগারেট বের কোরে তাতে আগুন ধরায়। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে-

‘আমাদের মা, মানে- তোর রহিমা খালা, বিয়েই করেনি।’

‘ডলি?’

‘ওই পাজিটার জন্যই আমার যতো জ্বালা, কোথাও যেতে পারছিনে।’

‘সে কি এসব কথা জানে?’

‘ও তো এখনো পিচ্ছি। যখন জানতে পারবে....... ’ অস্থিরতায় রাসেল মাথার চুল টানে, মুখে অস্থিরতার এক ধরনের শব্দ তোলে। ওর চোখের কোনায় ঘাম না লোনা জল, শিমুল বুঝে উঠতে পারলো না। ওর খুব কষ্ট হতে শুরু করেছে। বোবা কান্না!

‘তুই এতো সব কোত্থেকে জানলি?’

'তোর সাথে এটাই হয়তো আমার শেষ দেখা। একদিন চলে যাবো কোথাও। আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না রে।' শার্টের হাতায় রাসেল চোখ মোছে।

'কোথায় যাবি?'

'জানিনে, তবে যাবো।'

'আগামী বছর না তোর ফাইন্যাল পরীক্ষা?'

'শিশির তোকে এতো কিছু বলেছে, আর এ কথাটা বলেনি?

'সে আমাকে এ ধরনের কোনো কথা বলেনি।'

'আমি তো গত বছর থেকেই স্কুলে যাইনে!'

'স্কুলে যাসনে?'

'আমার দম বন্ধ হয়ে আসতো। কথাটা কি কোরে যে রাতারাতি ছড়িয়ে পড়লো! সবাই আমার দিকে কেমন কোরে তাকাতো, হাসতো। স্যাররাও, আপারাও। আমার তখন কেবলই মরে যেতে ইচ্ছে হতো। তুই তো জানিস, ক্লাশে আমি কোনো দিন ফার্ষ্ট ছাড়া সেকেন্ড হইনি। আমার রেজাল্ট দেখেও সবাই কেমন ফিসফাস করে। আমার যে মা, তার পেটের কোনো ছেলে নাকি এতোটা ভালো রেজাল্ট করার মতো মেধাবি হতে পারে না।'

'এসব তুই কি বলছিস, রাসেল?'

'দুই-একজন আবার উপদেশও দেয়। বলে-যীশুরও তো বাপ নেই।'

'কথাটা কিন্তু ঠিক।'

'ঠিক না কচু! আমি যে জারজ, যীশুর উদাহরণ দিয়ে ওরা আসলে সে কথাটাই আমাকে বুঝিয়ে দেয়।'

'তুই ঈশা নবীর কথা বলছিস তো?'

'দুই বছর আগেও যদি কেউ যীশুকে জারজ সন্তান বলতো, আমি হয় তো তাকে খুনই কোরে ফেলতাম। এখন কিন্তু আমার আর তেমন হয় না। যীশু আসলেই জারজ সন্তান, নারে? তোর কি মনে হয়?'

'আমি তোর মতো এতোশত বুঝিও না, ভাবিও না।'

'অবশ্য যীশু জারজ হোলেও যা, না হোলেও তা। সেতো জারজ হয়েও কোনো অজ্ঞাত ধার্মিক বাপের ধর্মের নামে এখন মহা-মানব। আমি আর ডলি জারজ, জারজই থেকে যাবো।'

রাসেল উঠে দাঁড়ালো। কোচড় থেকে ছুরিটা বের কোরে মাজার পেছনে গুঁজে টেনেটুনে সে শার্ট ঠিক করলো। শিমুলও উঠে দাঁড়ালো। রাসেল আর কোনো কথা না বোলে পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করে। শিমুলও পা বাড়ায়। রাসেল না দাঁড়িয়েই বলে- 'তুই বাড়ি যা, আমার সাথে দেখলে নানা জন নানা কথা বলবে। তাছাড়া, আমি এখন কোথায় যাচ্ছি, আমি নিজেও জানিনে।'

শিমুল সত্যিই থেমে পড়ে। কথাটা ঠিক। রাসেল কিছুটা দূরে চলে যায়। শিমুল দাঁড়িয়ে থেকে ওর হাঁটা দেখছে। হঠাৎ কোরে সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো- 'এই রাসেল, আবার কখন দেখা হবে?'

রাসেল পেছনে না ফিরেই বললো- 'আজই হতে পারে, আবার- কখনো না।'

শিমুলের মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। কেমন একটা 'ভাল্লাগে না, ভাল্লাগে না ভাব।' সে স্কুলের বারান্দায় কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। বেশ খানিকটা সময় সে একা একা রাস্তায় হাঁটলো। কতো চেনাজানা পথ, অথচ কেমন অচেনা অচেনা নতুন একটা ভাব সবদিকে ছড়িয়ে আছে। ঘন্টাখানেক এদিক ওদিক ঘুরে অশান্ত মন নিয়েই সে বাড়ি ফিরে এলো। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো- কালই সে নিজেদের বাড়ি চলে যাবে। বড়'পা তো বলেছেই, যেতে পারবে না।

বাড়িটা কেমন খাঁ খাঁ। বুবলিরা কেউ নেই। কাল শিমুলকে দেখেই সবাই পাকাপাকি সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললো এবং সবাই মিলে আজ সকালে মামাবাড়ি বেড়াতে গেছে। শিমুল বারান্দার চৌকিতে বসলো। শীত শীত ভাব। লীনা ঘরের মধ্যে সত্যিই পরীক্ষার খাতা দেখছে। শিমুল চাদর টেনে শুয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে যায়।

হঠাৎ কোরেই শিমুলের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ওর মনে হলো, বড়'পা ওকে নাম ধোরে ডেকেছে এবং তারজন্যেই ওর ঘুমটা ভেঙ্গে গেছে। সে হয়তো চাদর সরিয়ে লীনার ডাকে ঠিকই সাড়া দিতো, কিন্তু দিলো না। বকুল স্যারের গলা চিনতে ওর কোনো ভুল হলো না- 'এই তোমার এক দোষ, পুরোটা না শুনেই রেগে যাও।'

'আর কি শুনবো? ও গেলো কেনো রাসেলের সাথে?'

'আমি কিন্তু এধরনের কথা তোমার কাছে একবারও বলিনি। শিমুল আগেই ওখানে ছিলো। একা। সে বরং শিশিরের হয়ে রাসেলের সাথে কথা কাটাকাটি করেছে। আচ্ছা লীনা, তোমার হয়েছেটা কি, বলো তো? ইদানিং তোমার ধৈর্যশক্তি বেশ কমে গেছে, কেমন খিটিমিটি করো সব সময়! খবরদার, শিমুলকে এসব নিয়ে আবার ধমক ধামক দিও না যেনো। ঘুরিয়ে দেখলে রাসেলকে কিন্তু খুব একটা দোষও দেয়া যায় না।'

'একটু বসো তুমি। ম্যাগাজিনটা দ্যাখো।'

'তুমি?'

'খুব চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'তোমার স্বভাবটা আর পাল্টালে না। বললেই হয়, তোমাকে একটু চা কোরে দিই! তা-না, খুব চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে!' বকুল স্যার ম্যাগাজিন টেনে নেন

লীনার হাসিতে সামান্য ঢেউ ওঠে।

শিমুল পাশ ফিরলো।

'এই শিমুল, ঘুম ভাংলো তোর? হঠাৎ কোরেই বকুল স্যার শিমুলকে ডাক দিলেন।

শিমুল বকুল স্যারের মতলবটা হঠাৎ কোরে যেনো বুঝে ফেলে। তাই সে উত্তর না দিয়ে ঘুমের ভান কোরে চুপচাপ শুয়েই থাকে।

কাপ-পিরিচের টুং টাং শব্দে শিমুলের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটুকুও শেষ পর্যন্ত কেটে গেলো। সিগারেটের মিষ্টি একটা গন্ধ। লীনার গলা- 'চিনি হয়েছে কি-না, দ্যাখো।'

'হয়েছে। তুমি একটু বসো তো! আচ্ছা লীনা, ধরো এই যে তুমি আমার জন্যে চা বানিয়ে আনলে, আমি তা খেলাম না। কেমন লাগবে তোমার?'

'কেমন লাগবে মানে? দারুন হবে- একসাথে দুই কাপ চা-ই আমি একটু একটু কোরে তারিয়ে তারিয়ে খাবো আর তৃপ্তির সাথে ভাববো- তুমি কি বোকা!'

'আমার মন যদি খারাপ হয়ে উঠতো, তোমার ভালো লাগতো, না? সেই সুযোগ আর পাচ্ছো না।'

বকুল স্যারের কণ্ঠস্বর যেনো হঠাৎ কোরে আকুলতার মহাপ্লাবণে ডুবে যায়। তিনি প্রচন্ড 'মিনতী কোরে বলেন– 'লীনা, মাকে আর কতোদিন ঠেকিয়ে রাখবো, বলো?'

'বেরিকেটটা ভেঙ্গে ফেললেই হয়।'

'সত্যি বলছো?'

লীনা শব্দ কোরে হেসে ফেলে।

'বেরিকেটটা আমার দিকের না সাহেব, মায়ের দিকের।'

'লীনা, কাল সারাটা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। অনেক ভেবেছি। আমি একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চাই।

'যেমন........'

'প্রথমে, তুমি তোমার বদলীর আবেদনপত্র প্রত্যাহার কোরে নেবে।'

শব্দ কোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে লীনা। কপালে কয়েকটা চুল ঝুলছে। সে চুলগুলো বাম হাত দিয়ে সরিয়ে নিতে নিতে উত্তর দেয়– 'যা হয় না, তা তুমি বলো না বকুল, প্লিজ!'

'হয়, হবে না কেনো? আমরা বিয়ে কোরে ফেললেই সব ধরনের রটনাশেষ হয়ে যাবে।'

'তা যাবে, কিন্তু আমাদের বিয়েটাই যে হবার নয় বকুল।'

'হবার নয় কেনো? আমি কি এতোই অনুপযুক্ত? আমাদের এতোদিনকার সম্পর্কটা কি শুধুই একটা স্বপ্ন?' বকুল স্যারের গলায় বোবা কান্নার দংশন-জ্বালা তীব্র এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্বভাব সুলভ ভঙ্গিমায় লীনা শব্দ না কোরে হাসে, পরিবেশ ও সময়কে হালকা কোরে নিতে চায়। সে বাম হাতের চুড়িগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বলে– 'স্বপ্ন নয়, বলো ঘোর। আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি। কিন্তু জীবনের কাছে আমাদের ভিন্ন ধরনের দায়বদ্ধতার জন্যে বাধ্য হয়ে আমরা দু'জন দুই দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছি। জীবনে কখনো-কখনো ঘোর থাকা দরকার। পথ চলায় হতাশাকে ঠেলে দূরে রাখা যায়।'

'ফিলোসোফি থাক লীনা। আজ সারাটা রাত পাচ্ছো। ঠাণ্ডা মাথায় প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত টোটাল সময়টাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারপর মনস্থির করো।'

'আরেক কাপ চা দেবো?'

'দাও।'

লীনা চা ঢেলে দেয়। নিজের কাপেও খানিকটা ঢেলে নেয় সে।

'বকুল, একই কথা তোমাকে আমি কতো আর বলবো, বলো?'

'আর একবারও না। কারণ- তোমার দেখানো সমস্যাগুলো সবই সমাধানযোগ্য। তুমি অযথা একগুয়েমী ভাবে জটিল কোরে তুলছো। ওসব আমার হাতে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দাও।'

'তুমি আসলে আমাকে বুঝতেই পারোনি।' হঠাৎ কোরেই লীনার চোখেমুখে গোধূলীর ম্লান ধূসরতা নেমে আসে।

'আমি শুধু বুঝেছি- জীবনের প্রয়োজনেই জীবনকে ভাঙ্গতে হয়, ভেঙ্গে গড়তে হয়।'

বকুল নিজের অবস্থানকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন ক্লান্তিহীন আকাঙ্খায়।

বকুলের কথার দৃঢ়তায় এবং যুক্তিতে লীনা মাঝে মাঝে চমকে ওঠে। ওর ভেতরে এক ধরনের কাঁপন জাগে। অস্থিরতার কাঁপন, অনাস্থার কাঁপন। অনাস্থা নিজের উপর। নিজের উপর ওর খুব রাগও হয়। মাঝে মাঝেই মনে হয়, এই বুঝি সে হেরে গেলো। কখনো আবার ভাবে– এভাবে জীবন যাপনের কোনো মানে হয় না। মাকেও তখন খুব স্বার্থপর মনে হয়। মনে তখন সব ভেঙ্গে ছিঁড়ে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে হয় ওর। রাগ ওর বকুলের উপরও কম নয়। সে কেনো এভাবে ওর কথা শুনবে? ও কেনো রাগ করে না, জোর খাটায় না অধিকারের? মনে মনে সে প্রার্থণাও করে– 'শুনো না বকুল, আমার কথা, আমার বাধা তুমি গুড়িয়ে দাও তোমার ভালোবাসার জোড় খাটিয়ে!' কিন্তু শেষ পর্যন্ত লীনা কিছুই বলতে পারে না, করতে পারে না, শুধু এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে নিজের ভেতরে গুমড়ে গুমড়ে মরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসবের কিছুই হয়ে ওঠে না। লীনা তার মনের গহীন বনে জেগে ওঠা সপ্নের হাতছানির গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসে। সেখানে আবার কর্তব্য বড়, সমষ্টি বড়, সামাজিক মর্যাদা বড়; আমিত্বের একক কোনো অস্তিত্ব সেখানে ভীষণ রকমের বেমানান। তপোবনে এমন এক আর্তিকে চাপা রেখে সে হাসতে চেষ্টা কোরে বকুলের দিকে তাকিয়ে বলে– 'সবার ভাঙ্গা-গড়ার ধরনটাতো একরকম না-ও হতে পারে, পারে না?'

'তা পারে। পার্থক্যটা পথ বা পদ্ধতির, লক্ষ্যের নয়।'

'আমার পথটাই যে অসম্ভব রকমের জটিল আর এ্যাবড়ো থেবড়ো, আমি কি করবো বকুল! 'আচ্ছা, লীনা, আমার জন্যেও কি তুমি একটু নরম হতে পারো না? আমার কষ্টটুকু একটুও দেখবে না? এতো নিষ্ঠুর কেনো তুমি, লীনা?'

'বকুল! প্লিজ বকুল, ওভাবে বলো না।'

বকুল স্যার নতুন কোরে সিগারেট ধরালেন। শিমুলের খুব ইচ্ছে হচ্ছে বকুল স্যার আর বড় আপাকে একটু দেখার জন্যে। কিন্তু চাদরের নিচেই সে চোখ পিটপিট করলো ঘুমিয়ে থাকার ভান কোরে। কথাগুলো শুনতে ওর ভালো লাগছে এবং মাঝেমাঝে পড়'পার উপর একটু রাগও হচ্ছে। বড়'পাটা যে কি?

বারান্দা থেকেই দক্ষিণের আকাশ দেখা যায়। বিকেলের ধানী-রোদ ঝিলমিল করছে গাছের পাতায় পাতায়। তারই উপর দিকে বকুল স্যার উদাস চোখে কিছুক্ষণ চুপচাপ আকাশের গহীন নীল রঙয়ের দিকে চেয়ে রইলেন।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। শব্দ কোরে। আলতো কোরে সিগারেটে টান দিলেন। চিকন কোরে নীলচে' ধোঁয়া ছেড়ে লীনার দিকে তাকালেন। লীনা মাথাটা সামান্য ঝুকে বোসে আছে চুপচাপ।

'গতকাল আমার বাড়ি যাওয়ার কথা ছিলো।' বকুল স্যার নীরবতার লক্ষ-কোটি মন পাথরটা ভেঙ্গে দিলেন আলতো কোরে। 'কি জানি, কাল পরশু পর্যন্ত না গেলে শেষে হয়তো মা নিজেই এসে পড়বে।'

'তা কেনো? তুমি কালই বাড়ি যাও।'

'মা আমার উপর খুব রেগে আছে। একটা মেয়েও নাকি ইতোমধ্যে দেখে রেখেছে।'

'সত্যি? ভারী আশ্চর্য তো! এতো মজাদার খবরটা তুমি এতো পরে দিলে?'

'থামো!'

হঠাৎ কোরে বকুল স্যার লীনাকে ধমকে ওঠলেন এবং আশ্চর্য, তাতে তার মধ্যে কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বা অনুতাপ হলো না। তারপর তিনি মাটির দিকে চোখ রেখে বললেন- 'জীবন নিয়ে ঠাট্টা করা আমার ভালো লাগে না।'

'আমি ঠাট্টা করছি না বকুল। তুমি বিয়ে করলে আমার খুবই ভালো লাগবে। খুশিই হবো।' লীনার ভেতরে কান্নার উথাল-পাথাল ঢেউ। বকুলের সামনে থেকে ওর পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে।

'এতো অহংকার কিসে তোমার, লীনা? মা তার পছন্দের মেয়ের ছবি পাঠিয়েছে। দেখবে? তোমার চেয়ে অসুন্দরী নয় বোধহয়।'

'যাক বাবা, আমি তা হোলে সুন্দরী, কি বলো?'

লীনার ঠোঁটে হাসি। কিন্তু ভেতরে তার বেদনার ক্ষরণ বইছে। ক্ষরণের সেই যন্ত্রণা ভয়ঙ্কর। বকুল স্যার ভুল করলেন। বাইরের আচরণে প্রলুব্ধ হলেন, ক্ষুব্ধ হলেন। ভেতরের তল পেলেন না। তিনি আবারো লীনাকে আঘাত করলেন- 'তুমি অনেকের চেয়ে বেশি জানো, তুমি সুন্দরী। এ কারণেই তোমার অহংকারটা ধীর-স্থির, কিন্তু মজবুত।'

লীনা শব্দ কোরে হাসলো। হাসতে হাসতেই বললো– 'অহংকারই যদি না থাকলো, সুন্দরী হওয়া কেনো?'

'থামো!'

'বাহ্, বেশ তো মজার লোক তুমি! আমাকে অপমানও করছো, আবার থামতেও বলছো।'

হাসতে হাসতে লীনা মুখ চাপার ছল কোরে মুখ ঢাকলো, চোখ ঢাকলো; চোখের অবাধ্য জলটুকু ঢাকলো এবং মুছে ফেললো। এতো কিছু ঘটলো বকুল স্যারের সামনে। বকুল স্যার কিছুই বুঝলেন না।

'আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে, জানো?'

বকুল স্যারের গলা থমথমে, ভারী।

লীনা খুব ধীরে সুস্থে চোখ তুলে তাকালো।

'কি?'

'ইচ্ছে হচ্ছে- না, থাক।'

'আরে বলোই না, থাকবে কেনো? ঘরে নতুন বউ এলে তখন তো আর এভাবে তোমাকে পাবো না, ঝগড়াও হবে না। কা-তব-কান্তা। এই বকুল, বলো না তোমার ইচ্ছেটা কি?'

বকুল স্যার ঘনঘন সিগারেট টেনে সিগারেটটা উঠানে ফেলে দিলেন। সবটুকু ধোঁয়া ছাড়লেন একটু একটু কোরে। তাঁর চোখে-মুখে রাগ-ক্ষোভ-লজ্জার সংমিশ্রণ।

'ইচ্ছে হচ্ছে– প্রচণ্ড জোরে তোমাকে একটা থাপ্পর মারি, তোমার সবটুকু ঘোর কাটিয়ে দিই। জীবনের মুখোমুখি তোমাকে দাঁড় করিয়ে বলি- আমি তোমাকে........'

বকুল স্যার এবারও বক্তব্য শেষ না কোরেই থেমে গেলেন।

'বারে, শেষ করো!'

'তুমি হাসছো?'

'তুমি কিন্তু কথাটা শেষ করোনি। আমি সাহায্য করি? তোমার অসম্পূর্ণ ইচ্ছেটা- "লীনা, আমি তোমাকে ঘৃণা করি"।'

বকুল স্যার হতাশ হলেন। তিনি আবারো দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। আর কোনো কথা না বোলে বারান্দা থেকে উঠানে নেমে দাঁড়ালেন। শিমুল চাদরটা সামান্য সরিয়ে তাকালো। বকুল স্যারের চুল হাওয়ায় উড়ছে। থমথমে মুখ। যেনো ঝড় আসি আসি ভাব। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। শূন্যে চোখ রেখেই বললেন- 'না লীনা, তুমি যা বুঝতে চাইছো না, আমি তোমাকে তা-ই বলতে চেয়েছি। আমি তোমাকে বড়বেশি ভালোবাসি, লীনা। চলি। পার তো বদলীর দরখাস্তটা উইথড্র কোরো। আমি চাকুরিটা আর করবো না। তো, ভালো থেকো।'

বকুল স্যার সত্যিই পা বাড়ালেন। লীনা তাড়াতাড়ি বললো- 'আরে, চলি বোলেই সত্যি সত্যি চললে? আর একটু বসো। পাঁচ মিনিট। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে শেষ বারের মতো এক কাপ চা কোরে খাওয়াতে। খাবে বকুল?'

'সময় নেই।'

'এটা তোমার রাগের কথা।'

'আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

'সে তো কাল।'

'না, কাল নয়। আমি আজই বাড়ি যাবো। ভালো থেকো।'

লীনা বারান্দা থেকে নামলো না। বকুল স্যার ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে চলে গেলেন। লীনা থ' মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। টেবিলের কাপ-পিরিচ না তুলেই সে প্রায় টলতে টলতে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

শিমুলের সন্দেহ হলো। কেমন যেনো ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। সে উঠে বসলো। সন্তর্পণে চৌকি থেকে নেমে ধীরে ধীরে দরোজার কাছে গেলো। লীনা কাঁদছে। টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্নার ধাক্কায় তার পিঠ কাঁপছে, চুল কাঁপছে। ভীষণ কষ্ট হলো শিমুলের। ওর চোখ ছলবলিয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে চৌকাঠ পেরিয়ে সে লীনার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। ডাকলো- 'বড়'পা..........।'

কিন্তু শিমুলের সেই ডাক শব্দ হয়ে বেরোলো না। যন্ত্রণার একটা দলা হয়ে হৃদয়ের সবটুকু বোধ ওর গলার কাছে আটকে গেলো।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে সাত-আটবারের বেশি ঘড়ি দেখেছে শিমুল। সময়ের কাটাগুলো যেনো পাথর, নড়তেই চাইছে না। ভেতরে ভেতরে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। মোটে পৌনে আটটা। রিয়ার বেরোনোর কথা সাড়ে সাতটায়। তেরো মিনিট! যেনো কতো লম্বা এক সময়। শিমুল প্রেমতলার কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে অস্থিরভাবে হাঁটতে থাকে।

চারদিন আগে টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়েছে। খোকনরা চারজনই ইতোমধ্যে যার যার বাড়ী চলে গেছে। ক্লাশ স্থগিত। পনেরোদিন পরে কোচিং ক্লাশ শুরু হবে, বাধ্যতামূলক। পনেরো দিনের তিনদিনই পেরিয়ে গেলো শুধুমাত্র আজকের এই দিনটার জন্যে। আজ রোববার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। রিয়ার সাথে কথা হয়েছে, সে বাড়ী যাওয়ার ছুটি নেবে এবং ঠিক সকাল আটটায় হোস্টেল থেকে বেরিয়ে আসবে। কথা আছে। অনেক কথা। রাস্তায় যেতে যেতে কথা হবে।

ফার্স্টবয় হিসেবে শিমুল যে খাতা ও কাগজ-কলম পুরস্কার পেয়েছিল, রিয়া যেগুলোর দিকে তাকিয়ে ঠাট্টায় ঠোঁট বেঁকিয়েছিল, শিমুল সেই খাতায় হাতের স্পর্শ রাখলো ইনকরা শার্টের তলায়। সেই কলম আর কালি দিয়ে, সেই খাতায় শিমুল গত দুই বছর ধোরে নিজের প্রিয় কিছু কবিতা লিখেছে। সাথে কয়েকটা গান। এর মধ্যে স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপা হওয়া চারটে কবিতাও রয়েছে। প্রথম পাতায় চমৎকার একটা লাল গোলাপের কাটিং আঁঠা দিয়ে লাগানো। লেবু আর পেঁয়াজের রস মিশিয়ে 'গোপন কালি' বানানোর কৌশলটা বাবুলের কাছ থেকে শিমুল শিখেছিল। সেটা এবার যায়গা-মতো কাজে লাগিয়েছে। গোলাপ-ছবির নিচে বড় এবং

সুন্দর কোরে গোপন কালিতে লিখেছে– শিমুল+রিয়া। শেষ দিকের কয়েকটা পাতা খালিই রয়ে গেছে। ওর ইচ্ছে ছিলো আরো কয়েকটা কবিতা লিখে দেওয়ার। তা' আর হলো না।

আজ সকালে দ্বিতীয় পাতায় আর্ট কোরে লিখেছে 'উপহার'। তখন থেকেই ওর মনটা খুঁতখুতে হয়ে ওঠে। এতো যত্ন কোরে লেখার পর এখন ওর কেবলই মনে হচ্ছে– হাতের লেখাটা মোটেই সুন্দর হয়নি। আরো সুন্দর কোরে লেখা উচিত ছিল।

কৃষ্ণচূড়া গাছ পেরিয়ে শিমুল ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে বাঁক নেয়। রয় স্যার। বেশ দূরে হোলেও শিমুলের পক্ষে এখন আর পালানোর পথ নেই। চোখে চোখ পড়ে গেছে। তিনিই স্কুলের হেড স্যার। শিমুলদের ইংলিশ পড়ান। ইংরেজদের সাথে ইংরেজীতে টক্কর দিয়ে গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন। কথাটা আজো মুখে মুখে ঘোরে। শিমুল তা' বিশ্বাসও করে। তিনি যেনো শ্বাস-প্রশ্বাসও ইংরেজীতে চালান। তিনি শিমুলকে মাঝে মাঝে আদর কোরে 'পাগলা' ডাকেন। বড়বেশি আদর করেন। তা অবশ্য শিমুল অপেক্ষাকৃত ভালো ইংরেজী জানে বোলেই। ইতোমধ্যেই তিনি পাঁচটি ইংলিশ বই শিমুলকে দিয়েছেন। একটা উপন্যাস, তিনটি গল্পের, একটা গ্রামার। সব কয়টা বইই অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির।

সেই স্যারের উপরই শিমুল ক্ষুব্ধ। ক্ষোভটা অভিমানের। এইতো দিন কুঁড়ি-পঁচিশ আগেকার ঘটনা। স্যার উত্তর লিখতে বলেছিলেন। প্রশ্নটা খুবই কমন এবং সহজ। বেশ কয়েকবার পরীক্ষায়ও এসেছে। প্রতিবারই শিমুল তার নির্ভুল উত্তর দিয়েছে। অথচ সেদিন হলো উল্টো। থার্ড বয় বাবুল। শিমুলের চেয়েও দুটি বানান ভুল কোরে বসলো। অথচ মাত্র একটা ভুল বানানের কারণে স্যার শিমুলের খাতাটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এতো ঠান্ডা মাথার স্যার কেনো যে সেদিন ওভাবে রেগে গিয়েছিলেন! স্যারের রাগ ওতেও মেটেনি। তিনি গ্রামার ধরলেন। আর্টিক্যালের প্রপার ইউজ। সবাইকেই প্রশ্ন ধরছিলেন। শিমুলের পালা আসে। উঠে দাঁড়ায় সে। ইংরেজীতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন- 'ইউজ দ্য প্রপার আর্টিক্যাল ইন দ্য ব্লাঙ্ক– ইউ আর --- ইডিয়ট।'

ক্লাশের সবাই, স্যারও জানেন, ওটা পূরণ করা শিমুলের কাছে জলভাত। কিন্তু শিমুল নিরুত্তর। গোয়ার্তুমির ভুতটা হঠাৎ কোরে ওর মাথায় এসে গেড়ে বসে।

স্যার বিরক্ত হন।

'বলছিসনে কেনো? ইউ আর --- ইডিয়ট।'

শিমুল ঘাড় গুজে দাঁড়িয়েই থাকে।

'শুনছিস নে?

শিমুল সামান্য নড়লো মাত্র, জবাব দিলো না।

স্যারের হাতে বই ছিল। 'রিসার্জেন্ট'। 'ইউ আর এ্যান ইডিয়ট! সীট ডাউন স্যার, প্লিজ!' 'এ্যান' শব্দের উপর জোর দিয়ে স্যার হাতের বই দিয়ে শিমুলের মাথায় বাড়ি মেরেছিলেন।

ক্লাশের সবাই সেদিন ঠোঁট টিপে হেসেছিল। সেকেন্ড বয় বক্কার। সে তো খুশিতে নেচেই উঠেছিল। খুশিতে তার পোয়া বারো। কি লজ্জা! শিমুল সেই থেকে ক্লাশে মাথা উঁচু করতে পারছেনা। রাগ তার হবে না কেনো?

দেশাই স্যার বাংলা পড়ান। তিনিও একদিন হুট কোরে বোলে বসলেন- 'শিমুল, এ পর্যন্ত সব পরীক্ষায় বাংলাতে তুমি হায়েস্ট নাম্বার পেয়ে আসছো, তাইনা? আমি কিন্তু এবার বাজি ধরে বলতে পারি, সামনের পরীক্ষায় তুমি হায়েস্ট নাম্বার পাচ্ছো না। জানো কেনো? তোমার ম্যানিয়া হয়েছে।'

খোকনটা বরাবরই একটু ফিচকে কিসিমের। হুট কোরে সে জিজ্ঞেস কোরে বসলো- 'স্যার, ম্যানিয়া কি?'

'যারা সময় অসময় বোঝে না, অসময়ে প্রেম করে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করো। না পারলে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে পারো। শিমুল, তোমার কাছে স্কুলের অনেক আশা ছিল। তুমি তা পারতে। কিন্তু তা আর হলো কই! স্কুলের যদিও আহামরি ক্ষতি হবে না, তোমার কিন্তু অনেক ভোগান্তি আছে। শিমুল, এখনো সময় আছে, পড়াশোনায় মন দাও।'

শিমুল হোস্টেলে ফিরেই ডিকশনারী ঘেঁটে 'ম্যানিয়া' শব্দের অর্থ বের করেছিল।

রয় স্যার কাছে আসতেই শিমুল সালাম কোরে মাথা নিচু করে।

'কিরে, বাড়ি যাবি নে?'

চোখ না তুলে শিমুল মাথা ঝাঁকায়।

'বাড়িতে গিয়ে বাঁদড়ামি কোরে শুধু ঘুরিসনে। সামনে ঘোরাঘুরির অনেক সময় পাবি। বাড়ি কবে যাবি?'

'আজই স্যার।'

'সময়মতো ফিরে আসিস। কোচিং ক্লাশ মিস করলে চলবে না। আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো, অহঙ্কার ভালো না। ভালো থাকিস।'

রয় স্যার বাঁক পেরিয়ে চলে যেতেই বিষয়টা ওর খেয়াল হলো। মোটে পাঁচ মিনিট বাঁকি আছে। রিয়া যদি রেরিয়ে আসে? রিয়াকে দেখলেই স্যার সব বুঝে ফেলবেন। ইস, কি লজ্জা! শিমুলের চোখ-মুখ লজ্জায় ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে।

সোয়া আটটায় রিয়ারা এলো। এমনিতেই দেরি করেছে, তার উপরে ওর সাথে আসছে মলী ও রানু। শিমুলের খুব রাগ হলো। এদিকে আবার টিপটিপানি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শিমুল গোমড়ামুখে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে।

সবার আগে মলী দৌড়ে আসে। শিমুলের হাত ধোরে টেনে বলে- 'কানে কানে।'

শিমুল রিয়া বা রানুর দিকে না তাকিয়ে মাথা কাৎ করে। মলী সুযোগটা কাজে লাগায়। সে শিমুলের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়। দু'টো চিঠি। একটা রিয়ার। প্রায় একমাস আগে শিমুলকে

লিখেছিল। চিঠির ভেতরে সত্তরটা টাকা। অন্য চিঠিটা শিমুল লিখেছে। লিখেছে রিয়াকে। কাগজের এক কোনায় তিব্বত সেন্ট মাখানো। মলী এক দৌড়ে দূরে সরে যায়। চিঠিটা নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শোকে। শিমুলের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে– 'ও..মা.., এ যে রিয়া'পার চিঠি। দাঁড়া, তোকে এবার আমাকে মারার মজা দেখাবো।'

শিমুল মলীর দিকে যেতে যেতে বলে– 'লক্ষি আপু আমার!'

'ভিজে যাচ্ছো তো আপু! গাছের তলায় আসো।' শিমুল মলীর মন নরম করতে চেষ্টা করে।

'থাকগে। আমিও ভিজবো, এটাও ভেজাবো।' মলী হাতের চিঠি দেখায়।

'ওগুলো দাও আপু, তুমি আমার লক্ষি আপু না?'

'কচু।' মলী সুর তুলে বলে- 'বাতাস দিলে হবে না।'

'তাহলে কি করলে হবে?'

'আমাদের সাথে যেতে হবে আর, আচার কিনে দিতে হবে।'

রিয়া ধমকে ওঠে– 'মলী! শুধু খাই খাই, না?। বেহায়া কোথাকার!'

'আমি দুলা ভাইয়ের সাথে কথা বলছি, তোর কি?'

রানু রিয়াকে জড়িয়ে ধোরে হেসে ওঠে।

শিমুলের মুখ লজ্জায় লাল।

রিয়া রাগের সাথেই বলে- 'মারবো থাপ্পর!

'মার না এবার! এটা দেখেছিস? দাঁড়া, বাবাকে আমি না বলছি তো!'

'কি বলবি?'

'আমি বুঝিনে,না?'

রিয়া আরো বেশি রেগে ওঠে। মলীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে- 'দে বলছি।'

শিমুল বাঁধা দিয়ে বলে– 'তুমি রাগছো কেনো? ও তো দুষ্টোমি করছে।'

'ঠিক আছে আপু, আমি তোমার কথায় রাজি,রাজি এবং রাজি। এবার হলো তো?'

মলী চিঠি দুটো মাটিতে ছুঁড়ে ধুপধাপ পা ফেলে শিমুলকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

শিমুল চিঠি দু'টো কুড়িয়ে পকেটে রাখতে রাখতে রিয়াকে বলে– 'ওর সাথে রাগ দেখালে কেনো? ও ছোট না?'

'রাগ করবো না মানে? হচ্ছে তো একটা বাঁদর। পড়ার নামে লবডংকা।'

শিমুল রানুর দিকে তাকায়। 'তুই?'

'রিয়াকে পাহারা দিয়ে নিয়া যাইতাছি।'

'যা ভাগ!'

'ওঁ, ভাগ কইলেই হইলো! আমি রিয়ার লগে যামু, নারে রিয়া?' রানু এগিয়ে গিয়ে রিয়ার কাঁধে হাত রেখে ফিকফিকিয়ে হাসে।

'আমি তবে গেলাম।'

'তোরে আসতে কইছে কে?'

'তুই যাবি?'

রানু রিয়ার গলা ধোরে শিমুলের দিকে তাকিয়ে হাসে।

'যাইবার পারি এক শর্তে। আমারে কি দিবি?'

'কি দিবি মানে?'

'কি দিবি মানে– কি কিন্না দিবি!'

'ব্লাক মেইল?'

'মলীকে তুই আচার কিন্যা দিবার পারবি, আর আমি ফাও? ঠিক আছে,আমিও মার কাছে সব কমুনে।'

'বলগে। মা জানে!'

'বড়পা'? বড়পা' জানে? ভোগাস দেওনের আর জায়গা পাসনা!'

'বলগে, যা্। এখন তোর কি ঘুষ চাই, তাই বল!'

'তোর কাছে চাইছে কে? বড়পা'র কাছে আজই আমি চিঠি লেখুম।'

রিয়া রানুর পাশে দাঁড়িয়ে হাসে। শিমুলের চোখে চোখ পড়তেই সে চোখ টিপে দেয়।

'যতো খুশি লিখিস। দেখা যাবে সপ্তায় সপ্তায় তোকে কোন বড়'পা চকলেট- চানাচুর আর ডজন ডজন নিত্য-নতুন চুড়ি কিনে দেয়।'

'আমারে চার গজ মেরুণ রংয়ের ফিতে আর দেড় ডজন ইন্ডিয়ান চুড়ি দিলে চিঠিও লেখতাম না, রিয়ার লগেও যাইতাম না।'

'দেড় ডজন না, তিন ডজন দেবো। যা- ভাগ এখন।'

রানু রিয়ার চুল টেনে বলে- 'তুই ভাবিস না যে, বাকি দেড় ডজন এই ঝগড়াইট্টারে দিমু!' সে এগিয়ে গিয়ে মলীর হাত ধোরে বলে- 'দেড় ডজন আমার, দেড় ডজন এর।'

রোদ উঠেছে, কিন্ত গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিটুকু থামেনি। রিয়া রুমাল বের করলো। ভাঁজ খুলে শিমুলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে– 'মাথায় দাও,। জ্বর টর হতে পারে। সামনে পরীক্ষা না?'

শিমুল রুমাল থেকে গন্ধ টানে। অদ্ভুদ একটা গন্ধ। কৃত্রিম সেন্ট না। গন্ধটা হয়তো রিয়ার।

শিমুলের ভেতর ভিন্ন এক সত্তার হালকা একটা শিহরণের স্পর্শ লাগে। শিমুল শিহরিত হয়।

সে আবেগে বুঁদ হয়ে আবেশ জড়ানো কণ্ঠে বলে, 'তুমি? তুমি ভিজবে না?'

'আমার জ্বর হয় না।' রিয়া মিষ্টি কোরে হাসে।

'কেনো, তোমার শরীর বুঝি লোহার?'

'জ্বি-না, মোমের। কই, মাথায় দাও!'

'তুমি দাও। এইটুকু বৃষ্টিতে আমার কিছু হবেনা।'
'বুঝলে কি কোরে?'
'বাব্বা কি জেরা গো! ঠিক আছে, আমি মাথায় ওড়না দিচ্ছি।'

শিমুল রুমালটা মাথায় দিয়ে রিয়ার পাশে হাঁটতে লাগলো। কাল রাতভরে ভেবে ভেবে সে কতো কথা সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিল। এখন তার কিছুই মনে পড়ছে না। হাত দিয়ে সে খাতাটা স্পর্শ করে। ভীষণ লজ্জা করছে এখন। ঠিক হবে তো?
'রিয়া-'

শিমুলের গলা শুকিয়ে আসে।

রিয়া হেসে ফেলে। 'বাব্বা, এমনিতে তো কি স্মার্ট, এখন যে কাঁপতে শুরু করেছো!'
'না-মানে-'
'বাড়ি পর্যন্ত সত্যিই যাবে তো?'
'আজ থাক।' শিমুল ঢোক গেলে।
'আমি কিন্তু রানুকে বলে রেখেছিলাম।'
'আমি ওকে তোমার সাথে দেখেই বুঝেছি।'
'তুমি রাগ করোনি তো?' রিয়া শিমুলের চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞেস করে।
'তোমার আপা যে এলোনা?' শিমুর প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়।
'এলে বুঝি ভালো হতো?'
'আমি বুঝি তাই বলেছি?'
'তুমি তাহলে আমাদের সাথে যাচ্ছো?'
'আজ না।'
'কবে?'
'আগামী রোববারে আমি আসবো।'
'সত্যি? রিয়ার কণ্ঠে খুশীর প্লাবণ আসে।'

শিমুল দুইচোখ বন্ধ কোরে মাথা নেড়ে হেসে বলে- 'সত্যি।'
'আমি ওইদিন একাই থাকবো।' রিয়া শিমুলের জামাটা টেনে ঠিক কোরে দিতে দিতে বলে।
'রানু থাকলে অসুবিধা নেই।'
'না, আমি একাই থাকবো।'

শিমুল শার্টের হাতা গুটাতে গুটাতে জিজ্ঞেস করে– 'আমি তোমাদের বাড়ি গেলে তোমাদের কাকা কিছু বলে না তো?'
'তোমার খালার উপর দিয়ে?' রিয়া চোখ বড় কোরে আশ্চর্য হয়ে বলে– 'জানো,খালা না বাবার কাছে তোমার আমার সব কথা বোলে দিয়েছে।'

শিমুলের বুক ধ্বক কোরে ওঠে।

'কি বলেছে?'

'বলেছে-' রিয়া মুখে ওড়না চেপে হেসে ফেলে।

শিমুল হাত দিয়ে খাতাটা আবারো স্পর্শ করে। রিয়ার কথাটা শেষ হয়নি বোলে সে যেনো হাপ ছেড়ে বেঁচেছে। রিয়া যেনো তার বক্তব্যে ফিরে আসতে না পারে এবং লজ্জাময় মুহূর্তেই নিজের লাজুক বোধটা ভেঙ্গে ফেলার যথার্থ অনুকুলতা পেয়ে শিমুল রিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে চোখ নামিয়ে বলে– 'তোমাকে একটা জিনিস দেবো, নেবে?'

বুঝতে রিয়ার কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে। সে বেশ অবাক হয়ে শিমুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে– 'কি?'

'না মানে-'

'ধেৎ, তুমি যে কি-না!

'তুমি নাক শিটকাবে নাতো?'

'তুমি কি, বলোতো? তুমি আমাকে গিফট করবে আর আমি তাতে নাক শিটকাবো, কথাটা তুমি ভাবতে পারলে?'

শিমুল ইনকরা শার্ট টেনে বের করতে শুরু করে।

আসলে, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না।' রিয়া ঠোঁট ফুলিয়ে শিমুলের পাশ থেকে একটু দূরে সরে যায়।

'তুমি কিন্ত রেগে যাচ্ছো।'

'রাগবোই তো। কই, দাও।'

শেষ মুহূর্তেও শিমুল দো'টানায় পড়ে। রিয়া খাতাটা শিমুলের হাত থেকে কেড়ে নেয়। পাতা ওল্টায় সে। 'উপহার' শব্দের উপরে ঠোঁট ছুঁয়ে সে শিমুলের দিকে তাকায়। তার সমস্ত চোখেমুখে উপছে পড়া হাসি। শিমুল দাঁড়িয়ে পড়ে। টিপটিপানী বৃষ্টি ততোক্ষণে থেমে গেছে।

'দাঁড়ালে যে?' রিয়া ঘুরে দাঁড়ায়।

'আজ থাক। রানু দাঁড়িয়ে আছে না? যাও।'

'তুমি কিন্তু কথা দিয়েছো।'

'বিশ্বাস হয় না?'

'যদি না আসো, আমি কিন্তু তোমার সাথে একমাস কথা বলবো না।'

'একমাস! শাস্তিটা বেশি দিয়ে ফ্যালছো না?'

'ঠিক আছে, তাহলে দেড়মাস।'

ওরা দু'জন শব্দ কোরে হেসে ওঠে।

কোনো লেখকের নোট বই শিমুল হুবহু মুখস্ত করে না। ওর আলাদা একটা ধরন-ধারন আছে। তিন-চার লেখকের নোট বই এক সাথে নিয়ে এটার থেকে ভালো এক অংশ, ওটার থেকে আরেক অংশ জোড়াতালি দিয়ে সুন্দর একটা আলাদা ধাচের নোট খাড়া করে।

তাতে তুলনামূলক ভাবে উত্তরপত্রে অধিক সংখ্যক পয়েন্ট আসে। নাম্বারও বেশি পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত পেয়েও আসছে সে। ওর এ ধরনের ইংলিশ ও বাংলা নোটখাতা নিয়ে বাড়ি চলে এসেছিল যোকিম। যোকিমদের বাড়িটা মাঝামাঝি যায়গায়। পূবে শিমুলদের বাড়ি, পশ্চিমে হোস্টেল। শিমুল দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে যোকিমদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো নোটখাতাসহ। অনেক পীড়াপীড়ি কোরেও যোকিম বা ওর মা শিমুলকে আটকাতে পানেনি। একমুঠো মুড়ি মুখে দিয়েই শিমুল চলে আসে।

আকাশে খাঁ খাঁ রোদ। রাতে বেশ শীত পড়লেও দিনটা খুব তাড়াতাড়ি তেতে ওঠে। কুরৈল বিলের প্রায় মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা অলসভাবে পড়ে থেকে বিলের দুইপাশকে যেনো হাত বাড়িয়ে ধোরে রেখেছে। প্রায় আধাঘন্টা রোদে পুড়ে শিমুল বিল পাড় হয়। পুবপাড়ে লাউতিয়া। মাঝখানে আরো একটা ছোট বিল। ওটা পেরোলেই– ব্যস, শিমুলদের বাড়ি দেখা যায়। সে গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এদিক-ওদিক তাকায়। এ গ্রামের অনেকেই ওর পরিচিত। একটু পানি খাওয়া দরকার।

পানি খাওয়া শেষ পর্যন্ত হয়না। রাস্তার পাশে সরকারি একটা টিউব-অয়েল ছিলো। এখনো আছে। তবে- অকেজো। হ্যান্ডেল নেই। একটা আধাভাঙ্গা ডাল গলায় আটকে ঝুলে আছে। ওটার উপর বিষনজর ছড়িয়ে শিমুল বড় রাস্তা ছেড়ে পায়েহাঁটা পথে নেমে পড়ে। ফাঁকা ফাঁকা কয়েটা বাড়ি। তারপর- আবার বিল, তবে- তেমন বড় নয়। বড়জোর মিনিট কুড়ি লাগবে পেরোতে। ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর। বড়বেশি খাপছাড়া। আর সব বাড়িগুলো বেশ ফাঁকে এবং কেমন যেনো অপরিকল্পিত হোলেও সাজানো। পাশাপাশি। কুঁড়ে ঘরের উত্তর দিকে রাস্তার ঠিক পাশ-ঘেঁষা একটা পেয়ারা গাছ। একটা বাচ্চা ছেলে এ্যাঁ এ্যাঁ কোরে কাঁদছে না গান

করছে, দূর থেকে বোঝা না গেলেও দুরত্ব কমার সাথে সাথে স্পষ্ট হয়। কাঁদছে। বয়স বড়োজোর সাত কি আট। ছেলেটার দুটি পা ডাল থেকে ঝুলানো। কান্নার ভেতরেই সে দু' একটা পাতা ছিঁড়ছে, ক্ষোভে, রাগে নাগালে পাওয়া ছোট-খাটো ডাল হেঁচকা টানে ভেংগে ফেলছে, মুচড়ে দিচ্ছে। ছেলেটা উদোম। পরনে শুধুমাত্র রঙ বেরঙয়ের জোড়াতালি দেওয়া একটা হাফপ্যান্ট। চোখ দু'টো বড়বেশি সাদা, বড় এবং ভাসা ভাসা। বুকের হাড়গুলো দাঁত খিঁচিয়ে ভেংচি কাটছে সমাজকে। কুচকুচে কালো শরীরটায় মাংশ নেই। শুধু পেটটাই সম্বল। বেঢ়প হয়ে ফুলে আছে।

'ও আল্লারে, ও কুত্তি মাগীরে, আমার বুঝি ক্ষিধে লাগে না- এ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ!'

শিমুল থমকে দাঁড়ালো। ক্ষুধার তীব্র অনুভূতির সাথে ওর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে অনেকবার, অনেকভাবে। এইতো মাস ছয় আগেকার ঘটনা। তখন প্রিটেষ্ট পরীক্ষা শুরু হয়- হয় অবস্থা। হোস্টেলের খাবারের নিম্নমান নিয়ে প্রথম কথোপকথন। সোহান স্যারের একগুয়েমীর জন্যে তর্কে তর্কে খাবারের টাকা চুরি করার কথা উঠলো, স্যারের সাথে পরী নামের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রের ঘনিষ্ট সম্পর্ক নিয়ে বাজে ধরনের হৈ উল্লাস আর ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ হলো। হাতে লেখা পোস্টার পড়লো দেয়ালে। সোহান স্যার রাগে খোকন আর সাগরকে খুব মেরেছিলেন। তাঁর ধারনা- কাজটা ওই দুইজনের, সাথে শিমুল কিংবা বাবুল-যোকিম থাকলে থাকতেও পারে।

আর যায় কোথায়! শিমুল কোমর বেঁধে এগিয়ে আসে প্রতিবাদে। কথায় নয়, কাজে। জুনিয়রদের বুঝাতে আর কতোটুকুই বা বেগ পেতে হয়। স্যারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ভাষার জায়গা নিলো অনশন। সেই প্রথম অভিজ্ঞতা। দুই দুইটি দিন। ক্ষুধার সে কি তান্ডব দাপাদাপি! কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু মুড়ে আসে, গায়ে-গতরে জোর নেই, মাথা নোটিশ ছাড়া ঝিমঝিমিয়ে ওঠে, এলোচুলে হলদে বুদবুদ নেচে ওঠে চোখের তারায়, শুয়ে থাকতেও ভালো লাগে না। সব সময় কেমনতরো বমি বমি একটা ভাব,অথচ পেট একদম বনবেড়ালের মতো লোভী এবং হিংস্র। পানি খেলে বমি বমি ভাবটা আরো বেশি তেড়ে আসে। অবশ্য দ্বিতীয় দিনের সাত সকালে সাগর কোত্থেকে যেনো রুটি জোগাড় করেছিল। টাটকা আটার রুটি। চাদর মুড়ি দিয়ে খেয়ে নেওয়ার জন্যে শিমুলকে ফন্দিটাও বাতলে দিয়েছিল। নিস্পৃহ চোখে শিমুল শুধু সাগরের দিকে চেয়েই ছিল, কিছু বলেনি। লোভের পরিবর্তে ওর চোখে হতাশার বিবর্ণ ধোয়াশাও ঘুরপাক খেয়েছিল সেদিন। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদেরকে অনশনে রাখা হয়নি। অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আটত্রিশ জন ছাত্র। এর মধ্যে সতেরো জন বিভিন্ন মেয়াদ শেষে অনশন ভেঙ্গে ফেলে। সহ্য করতে পারেনি। শিমুল তাতে সত্যিই কারো উপরে কোনো রাগ করেনি। ঘৃণাও না। কিন্তু সাগরের উপর হয়েছিল। সত্যিকারের ঘৃণা। শিমুল সেদিন বিকেলে হঠাৎ বুঝতে পেরেছিল, না খেয়ে থাকাতে ওর শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে উঠেছে, অথচ ঠিক বিপরীতভাবে মনের জোর যেনো তাতে একটুও কমেনি, বরং অনেকটা বেড়ে গেছে। আর মিথ্যে বলতে ওর একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না। সন্ধ্যার পর থেকে কেবলই রিয়াকে মনে পড়ছিল এবং তৃতীয় দিন সকালে, অনশন ভাংগার ঘন্টা দেড়-দুই আগে হঠাৎ কোরে ওর

আত্মহত্যার উদ্ভট একটা বোধ ওকে টেনে হিঁচড়ে ছাদের দিকে টেনে নিয়েছিল। ওর জানা ছিলো না, ছাদে যাওয়ার দরোজাটা ইদানিং সব সময় বন্ধ থাকে।

কথাটা শিমুল অনেকদিন চাপা রেখেছিল। অনেক ভেবেও ওইদিনের হঠাৎ কোরে লতিয়ে ওঠা আত্মহত্যার ইচ্ছের কোনো হদিস খুঁজে পায়না সে। কথাটা অনেক পরে রিয়াকে শিমুল জিজ্ঞেস করেছিল। রিয়ার কোলে তখন সেতু আর সাথী। রিয়া থমথমে চোখে-মুখে সাথীকে আরো একটু কাছে টেনে নিয়েছিল মাত্র, কোনো উত্তর দেয়নি। আরো একজনকে শিমুল বলেছিল, যার কাছে শিমুল একতিল কথাও কোনোদিন মিথ্যে বলেনি, গোপনও রাখেনি কোনো ঘটনা। সে তিথি।

'ভাত দে....এ....এ..., রুটি দে-...এ্যাঁ, ও আল্লারে-..., ও কুত্তিরে-...এ...,'

শিমুল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। মনের অগোচরেই ডানহাত পকেটে চলে যায়। বেশ কিছু টাকা আছে। প্রায় তিনশো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে মত পাল্টে ফেলে। ছেলেটার দিকে আরো একবার তাকিয়ে সে সামনের দিকে পা বাড়ায়।

'ছিনাল মাগীরে, খাইতে দেরে এ্যাঁ.., ও আল্লারে তরে লাথি মারি রে-এ্যাঁ, অ মা রে, ক্ষিধে লাগছে রে...এ্যাঁ.... ।'

শিমুলের পেছনে ভীষণ করুণ আর যন্ত্রণার একটা একঘেয়ে এ্যাঁ এ্যাঁ কান্নার ঝুল সেই যে লেগে গেলো, সে যতোই সামনে পা বাড়াতে থাকে, তাতে কোনো হেরফের হয়না।

নতুন ভিটেয় নতুন বাড়ি। কেমন নেংটো লাগে। উত্তোরে ভিটেয় চৌচালা টিনের ঘর, টিনের বেড়া, দক্ষিণে রান্নাঘর। টালীর। উঠোনে উঠতেই দুই পাশে চারটা চারটা কোরে নারকেল চারা, ডেগোগুলো এখনো ডানা মেলে ওঠেনি। রান্না ঘরের দক্ষিণ-পুব কোনায় একটা পেয়ারা গাছ। এ ছাড়া আর কোনো চোখে পড়ার মতো গাছ গাছড়া নেই। উত্তোরে ভিটের বসত ঘরের পেছন-লাগোয়া পায়ে-হাঁটা রাস্তা। রাস্তাটা পারিবারিক হোলেও পশ্চিম পাড়ার কেউ কেউ সময় বাঁচানোর জন্যে রাস্তাটা মাঝেমধ্যে ব্যবহার করে। শিমুল বড় রাস্তা থেকে বাড়িতে আসার এই ছোট্ট রাস্তায় পা দিয়েই করাতি দলকে দেখতে পায়। আপনা থেকেই ওর ভ্রু কুঁচকে ওঠে। সে এদিক-ওদিক তাকায়। তালগাছটি নেই। না থাক। গাছটা ওদের নয়, বিকুদের। তবুও একই সাথে ওর ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা একটা ক্রোধও চোখ মেলে তাকায় সাথে সাথে। চোখ না মেলে ক্রোধটুকুর পথও নেই। আমগাছটা থাকলে বাড়িটা এখন এতো বেখাপ্পা লাগতো না। কেমন এতিম এতিম আর হা-ঘরে হা-ঘরে ভাব। তাছাড়া- কি মিষ্টি ছিলো গাছের আম। নামে যেমন ছিলো সুন্দরী আম, স্বাদেও তেমন। কথা নেই বার্তা নেই, ফেলু মেম্বর গাছটা একদিন কেটে ফেলেছিল। লতাকে একবার জিজ্ঞেসও করেনি। গাছটা জমির সীমানায় থাকলেও বেশির ভাগ শিমুলদের জমিতে ছিলো। আর কি ভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য, শিমুল এর দুইদিন পরেই বাড়ি এসেছিল। মিস্ত্রীরা তখন একটা জামগাছ চিরাচ্ছিল।

সব শুনে ভেতরে ভেতরে প্রচন্ড উত্তেজনায় শিমুল ফুসে উঠেছিল। লতা তা' আঁচ করতেও পারেনি। দুপরে খেয়ে-দেয়ে সে বাইরে বেরোচ্ছিল এবং তখনই করাতিদের ওখানে ফেলু মেম্বরের সাথে ওর দেখা হয়ে যায়।

লোকটা বেশ শিক্ষিত। অথচ কুৎসিত। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও কাছাকাছি গেলে খুব অল্পতেই ভেতরের কদর্য গন্ধকে চেনা যায়, ধরা যায়। শিমুল লোকটাকে সেই ছোটবেলা থেকেই কখন যেনো ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। ঘৃণাটা সারা জীবনই থেকে যায়। স্বভাব দোষে ফেলু মেম্বর টিকিয়ে রাখে।

শিমুলকে দেখেই ফেলু মেম্বর কেমন কুৎকুতে চোখে হেসে উঠেছিল।

'কি গো পন্ডিত সাব, আইছো কোন সময়?'

উত্তর দিতে ওর ইচ্ছে নেই। কিন্তু এমনিতেই ওর কতো দোষ! জবাব না দিলে আর রেহাই নেই, অপপ্রচারের টি টি পড়ে যাবে। শিমুল করাতিদের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়- 'একটু আগে।'

'ভালা কথা। মাঝে মধ্যে মা-জননীরে আইস্যা দেইখা যাওন ভালা। বিদ্যাসাগরও করতো, মার অবাধ্য হইতোনা। তয়, অহন যাও কই?'

'হাসেমদের বাড়ি।'

'সুন্দরী আমগাছটা লইয়া তুমি নাকি আমার নাম লইয়া কি সব উল্টা-পাল্টা- গাইল-মন্দ পারছো?'

'গাছটা আমাদের ছিলো।' শিমুলের গলার স্বর ধীর-স্থির এবং গম্ভীর। ফেলু মেম্বর যেনো আকাশ থেকে পড়ে। চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলে– 'তোমাগো আছিল মানে?' হঠাৎ হিহি শব্দে ফেলু মেম্বর হেসে ফেলে– 'এরেই কয় পরের ধনে পোদ্দারী।' শিমুল লজ্জা আর অপমানে ঠোঁট কামড়ে দৃঢ়তার সাথে বলে– 'গুড়ির গর্তটা এখনো আছে।'

'আছে। তাতে কি হইছে? বাবাজী, আইজ কাইল গাঁজা-টাজা খাও নাকি?'

'বাজে কথা বলবে না।' শিমুলের ভেতরের অজগর একটু একটু কোরে পাক ছাড়তে থাকে।

'বাজে কথা? মানে?'

ছোট্ট কোরে হোলেও ফেলু মেম্বরের বুকে একটা ধাক্কা লাগে– 'এ যে দেখতাছি কুলোপনা চক্কর গো! আমারে ধমকাইলানি?'

'আমগাছটা আমাদের ছিলো। তুমি অন্যায় ভাবে কেটে নিয়েছো।'

'আমারে ন্যায় অন্যায় দেখাও?'

'বলোতো আমি আমিন আনতে পারি। আমগাছটা যদি আমাদের সীমানায় না পড়ে, করাতিরা সাক্ষী, আমি আমার কান মলে তোমার কাছে মাফ চেয়ে নেবো। কিন্তু আমাদের সীমানায় পড়লে তোমাকেও কান মলে মাফ চেয়ে নিতে হবে। রাজি আছো? সব খরচ আমার।'

ফেলু মেম্বরের চোখ এমনিতেই লাল। এবার তা আরো বেশি লাল হয়ে ওঠে।

'কি? আমারে তুমি কান ধরাইয়া মাফ চাওয়াইবা?'

'অন্যায় করলে শাস্তি নিতেই হয়। অতো চেচিও না ফুপা। গলাবাজি শুনে ভয়-পাওয়ার বয়স আমার শেষ হয়ে গেছে। তুমি তো শিক্ষিত মানুষ। ভদ্রভাবে কথা বলতে পারো না?'

'শিমুল! বেশি বাইড়ো না কইলাম। বিষদাঁত তোলনের মন্ত্র আমার জানা আছে। তয়, এতোসব খবর রাখো, কিন্তু তোমার মা জননী গোপনে গাপনে কি সব করে, তার খবর রাখো নি? নতুন একটা বাপ বানাইয়া লইতে পারো না? সব কুলই রক্ষা হইতো!'

শিমুলের মাথায় ঝিম কোরে রক্ত ছলকে ওঠে। একরোখা গোয়ার্তুমীর অজগরটা ভেতরে প্রবল বেগে আড়মোড় ভেঙ্গে জেগে যায়। রক্তে বিষ নিঃশ্বাস ছড়িয়ে দিয়ে জিভ বের করে। দপ কোরে প্রতিশোধের তৃষ্ণা শিমুলের সত্তায় জ্বলে উঠলো। করাতিদের ওখানে কুড়াল। মুখ ঝিকঝিক করছে। যেনো ডাক দিচ্ছে শিমুলকে। সে কুড়ালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর মনে পড়ে গেলো– আরো আগে, সে যখন আরো ছোটো, নতুন বাপের কথা বোলে মাকে নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছিল এই ফেলু মেম্বর। শিমুল তা' ভোলেনি, এক মুহূর্তও না।

শিমুল দুই হাতে শক্ত কোরে কুড়ালের আছাড়ি টানাটানি করে। দুইজন করাতি কুড়ালটা ধোরে রেখেছে। একজন শিমুলের হাত ছাড়িয়ে নিতে সচেষ্ট। ফেলু মেম্বর হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এখন আর সেই ভাবটা নেই। সেখানে ঝিরঝির একটা কাঁপুনি জেগে উঠেছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে দৌড়ে পালিয়ে যেতে। অদ্ভুত একটা ভয় তার বুকের ভেতরে ধুক ধুক করছে। কিন্ত একই সাথে রুখে দাঁড়াচ্ছে মর্যাদা। অন্তর্দ্বন্দ্বে সে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে বাতাবিলেবু গাছে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে আর ফোঁসে।

গন্ডগোলের শব্দ শুনে লতা ততোক্ষণে উঠান পেরিয়ে চলে এসেছে। ডান হাতে পান কাটার জাতি। এক নজর তাকিয়েই যা বোঝার সে বুঝে ফেলে। বেশ খানিকটা দূর থেকেই শান্ত কিন্তু কঠিন গলায় সে ডাকে– 'শিমুল!' তাতেই কাজ হলো। শিমুল কুড়াল ছেড়ে দেয়। লতা ফেলু মেম্বরের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট কোরে বলে– 'একটা মেচি বিলাই মারনের লাইগ্যা তোমারে লেখাপড়া শিখাইতাছি না। বাইত আহো।'

শিমুল সামান্য একটু দাঁড়ায়। তাকায় করাতি দলের দিকে। সব কথা ওর মনে পড়ছে। না, এরা সেই দল নয়। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক চিড়ে। সে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে উঠানের দিকে পা বাড়িয়ে ডাক দেয়– 'মা!

উঠানে ওঠার আগেই শিমুল হোঁচট খায় ভেতরে ভেতরে। বড়'পা। আড়বাঁশে কাপড় উল্টে দিতে দিতে শিমুলের দিকে তাকিয়ে হাসছে। বড়'পা শিমুলের দিকে চোখ রেখে ডাক দেয়- 'মা, ভাইয়ে আইছে।'

এক নজরেই শিমুল ছেলেটিকে চিনলো। শিশির। বকুল স্যারের ভাই। সে হেসে জিজ্ঞেস করলো-'কিরে, চিনতে পারছিস তো?' 'তিন-চার বছরেই একজন মানুষকে আরেকজন দিব্বি ভুলে যেতে পারে না।' শিমুল হেসে হেসে জবাব দেয়। 'ভালো আছিসতো?'

শিশির আর শিলু দাবা খেলছিল। শিমুল ওদের আধ-খেলা দাবার অবস্থানটা এক নজর দেখে নেয়। লতা এসে ওর শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করে– 'চাইরদিন দেরি করলা যে? আইবার সময় রানুর লগে দেখা করছো?'

'হ, ও ভালোই আছে। আসার সময় খালাদের বাড়ি যেতে দেখলাম।' শিমুল হিসেব কোরে দেখলো, শিলুর জেতার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু সে বারবার গজে হাত দিচ্ছে। মন্ত্রী না সরালে ওর নৌকা মার যাবে একদম ফাও ফাও। খেলাটা বন্ধ, কিন্তু শিলু ও শিশিরের মাথায় হিসাব চলছে ফাঁকে ফাঁকে। লীনা শিমুলের হাত থেকে গেঞ্জিটা নিয়ে জিজ্ঞেস করে- 'পরীক্ষা কেমন হয়েছে?' শিমুল ঢোক গেলে। সে মিথ্যে বলতে পারেনা, বললে সহজেই অন্যে ধোরে ফেলে। 'মোটামুটি।' লীনা খুশী হয়না। জেরা না কোরে জিজ্ঞেস করে- 'গোসল করবি?'

শিমুল ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে– 'হ্যাঁ।'

ঘুম থেকে উঠে শিমুল ঘড়ির দিকে তাকায়। চারটে পঁচিশ। সে হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে উঠানে নেমে আসলো এবং ওর উপস্থিতির কারনে পৎ পৎ শব্দে ডানা ঝাপ্টে একঝাঁক কবুতর উড়ে গেলো। সে হাত-মুখ ধুয়ে কবুতর ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। শিলু রুমাল সেলাই করছিল। জিজ্ঞেস করলো– 'চা খাবি?'

'মা কোথায় গেছে?'

'খরবাড়িয়া।'

শিলু রুমাল রেখে রান্নাঘরে ঢোকে। শিমুল ঘর থেকে চেয়ার বের কোরে আনে। চেয়ারে উঠে বাসায় থাকা কবুতরগুলো দেখে। চারটে। ডিমে তা' দিচ্ছে। বাসার দক্ষিণ দিকের খোপ ভেংগে গেছে। তাছাড়া- খোপ মোটে বারোটা। সাগরের চব্বিশ খোপওয়ালা বাসা। ওর কবুতরও অনেক। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা। শিমুলের মোটে আঠারোটা। অবশ্য দেড় বছর দেরিতে সে কবুতর পোষা শুরু করে। সাগরের লোটন কবুতর আছে। শিমুল ভাবে, যে কোরেই হোক একজোড়া গিরিবাজ কবুতর জোগাড় করতেই হবে।

নেমে পড়ার সময় অসাবধানতার জন্যে ঘরটায় ঝাকুনি লাগে। তাতে বড়বেশি অস্বাভাবিকভাবে ঘরটা দুলে উঠে। সে বাঁশের চারটা খুঁটিই পরীক্ষা কোরে দেখে। জরুরীভাবে দুটো পাল্টানো দরকার। নইলে, হঠাৎ বাতাস উঠলে ঘর ভেংগে পড়তে পারে।

শিমুল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরে বাঁশঝাড়। পুব-দক্ষিণ কোনায়। ওর চোখ পড়লো বাঁশঝাড়ে। বছর দুই আগেও ঝাড়টার উপর ওদের কর্তৃত্ব ছিলো। এখন নেই। এখন ওটা মেঝো ফুপুর-ফেলু মেম্বরের। ফেলু মেম্বরের কথা মনে পড়তেই জেদটা হঠাৎ কোরে ভেতরে জাঁকিয়ে আসে। সে ঘরের ভেতরে গিয়ে দাঁও বের করে।

শিলু রান্নাঘর থেকে তিন-চারবার শিমুলকে ডাকে। কোনো সারা নেই। বিরক্ত হয়ে সে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং শিমুলকে দেখতে পায়। ফেলু মেম্বরের ঝাঁড় থেকে বাঁশ কাটা

মানেই ঝগড়া বাঁধানো, জানা কথা। আঁতকে ওঠে শিলু। আবার একটু খুশিও হয়। শিমুলের গোয়ার্তুমি ওর জানা। ফেলু মেম্বরকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া যায় না। তবুও শেষ পর্যন্ত ওর গলা থেকে আতংকই বেরিয়ে আসে– 'বাড়ি আইসাই তুই ঝগড়া বাধাইবার চাইতাছোস? মা যদি রাগ না করে তো আমি কি কইছি।'

শিমুল জাবাব না দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে বাঁশটা উঠানে এনে তুললো। উপুড় হয়ে লুঙ্গি দিয়ে মুখ মুছে বললো, 'কই, চা দে।'

বেশ পাকা বাঁশ। আলকাতরা লাগিয়ে নিলে তো কথাই নেই। শিস দিতে দিতে সে চেঁছে বাঁশটি পরিস্কার করতে শুরু করে এবং ঠিক সেই সময়ে লতা বাড়ি ফিরে আসে। মায়ের চোখে চোখ পড়তেই শিমুল কিছুটা ঘাবড়ে যায়। মুখটা কেমন থমথমে, যেনো পাথর আঁটা।

'বাঁশ কোত্থেকে কাটছো?'

শিমুল জবাব না দিয়ে আপন মনে দাঁও চালাতে থাকে।

'কথা কওনা ক্যা? কোত্থেকে কাটছো?' লতার কণ্ঠস্বর ঠান্ডা।

'ঝাড় থেকে।'

'বাঁশ ঝাড়েই জন্মে। কাগো ঝাড় থাইক্কা?'

'ফুপুগো।'

'বাঁশটা পাকছে ভালাই। কয় ট্যাহা নিছে?'

শিমুল নিরুত্তর। সে মাথা নিচু কোরে দাঁও দিয়ে বাঁশের গায়ে আস্তে আস্তে কোপ দেয়। তাতে হালকা শব্দ ওঠে– ঠুক ঠুক, ঠুক।

'ফেলু মেম্বর যদি দেখতো?'

শিমুল এবার ফোঁস কোরে ওঠে, 'এসেই দেখতো! দাঁওয়ের একটা মাত্র কোপ।'

'ঝাড় তাগো, না কইয়া বাঁশ কাটছো তুমি। তুমি করছো অন্যায়, তারে কোপ মারবা ক্যা?

'ঝাড়টা আমাদেরই থাকতো। সে আমাদের ঠকিয়ে নিয়েছে।'

'তোমার কথাটা সত্য না। তোমার দাদী তাগো লেইখ্যা দিয়া গ্যাছে। ফেলু মেম্বর বা তোমার মার্গেটা ফুপু তোমারে ঠকায় নাই, তোমারে তোমার দাদীই ঠকাইছে। কথাটা আর যেন্ কইতে না হয়।'

আর কোনো উচ্চ-বাচ্য না কোরে লতা ঘরে ঢোকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে। হাতে তিনটে দশ টাকার নোট। নোট তিনটে শিমুলের দিকে বাড়িয়ে ধোরে বলে- 'তোমার ফুপুরে বা ফুপারে, যারে পাও, দিয়া আহো। না কইয়া বাঁশ কাইট্যা অন্যায় করছো। তার লাইগা মাফ চাইবা।'

শিমুলের দাঁও থেমে যায়।

'আমি পারবো না।'

'কেডা পারবো?'

'শিলুপ্যারে পাঠাও।'

'শিলু বাঁশ কাটে নাই। অন্যায় তুমি করছো, তোমারেই যাইতে হইবো। ওঠো।' মায়ের কাছে শিমুলের সব গোয়ার্তুমী অচল। সে বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়ায়। কেড়ে নেওয়ার মতো কোরে লতার হাত থেকে টাকা গুলো সে ছিনিয়ে নেয়। তারপর ধুপ ধাপ কোরে উঠান থেকে নেমে আসার সময় হাত বাড়িয়ে আড়বাঁশ থেকে গামছাটা টেনে নেয় সে। থামে না। খুব রাগ হচ্ছে ওর। তবে-মায়ের উপর যতোটা, ফেলু মেম্বরের উপর ততোটা না।

ঘরের ভেতরে মাঝারি আকারের একটি মাত্র চৌকি। চারজন বেশ ভালো কোরেই ঘুমোনো যায়। আরেকটা চৌকি বানাতে হবে। মাঝখানে একটা পার্টিশন দিয়ে শিমুলের জন্য আলাদা একটা কামরা বানানোর পরিকল্পনা লতা নিয়েছে। কাঠও ইতোমধ্যে চেরাই করা সারা। তক্তাগুলো ধন্নার উপর পাটাতনের মতো কোরে বিছিয়ে রাখা হয়েছে।

চৌকিটা পূব দিকে, যেখানে কয়েকদিন পরে শিমুলের জন্য আলাদা কামরা হবে। পশ্চিমের মাটির মেঝেতে ঢালাই বিছানা। চৌকিতে শিমুল একাই শোয়। লতা আর শিলু মাটিতে। রানু এলে সে-ও। এখন শিশিরও শিমুলের সাথে চৌকিতে ভাগ নিয়েছে। শিমুল তাতে আপত্তি তোলেনি। ভিন্ন কোনো উপায় নেই। শোবার একটা মাত্র ঘর।

কনুইয়ে ভর কোরে শিমুল মাথাটা হাতখানেক জাগালো। তন্ময় হয়ে শিশির বইটি পড়ছে। ডিটেকটিভ উপন্যাস– "ড: নো ম্যান।" শিমুল কয়েকটা লাইন পড়লো। অনেকক্ষণ থেকেই মনটা ওর আইটাই করছে। করার কিছু নেই। শিশিরের পড়া না হোলে শিমুল দখল নিতে পারছেনা। ওর একটাই আশংকা, হুট কোরে শিলু আবার দখল নিয়ে না নেয়। সে-ও বইয়ের ভীষণ পোকা।

পশ্চিম দিকে কাৎ হয়ে শিলু শুয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছেনা সে ঘুমিয়ে গেছে, না জেগে আছে। লীনা হাই তুলে লতাকে বললো– 'আমি ঘুমালাম মা!

লতা পান চিবোতে চিবোতে আদর মিশানো ধমক দেয়– 'ঘুমাইবা ক্যা, আমার লগে জাইগা থাহো।' শিমুল তাকিয়ে দেখে, দরোজায় খিল লাগানো হয়নি।

মাস দেড়-দুই আগে কুকুরের বাচ্চাটা জোগাড় হয়েছিল। অন্ধকারের চেয়েও কুচকুচে কুকুরটার গায়ের রঙ। অতুলদাকে চেপে ধরতেই বাচ্চাটা সে জোগাড় কোরে দিয়েছিল। বাচ্চাটা কপাটের একপাশে চটের উপর শুয়েছিল। কান মাটিতে ঠেকানো। হেরিকেন জ্বলছে। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। গভীর মনযোগে কান পাতলে শুধু ঝিঁঝি পোকার মাতাল কোরাসের একটানা শব্দ শোনা যায়।

কুকুরের বাচ্চাটা হঠাৎ কোরে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো। সে কেঁউ কেঁউ কোরে তেড়ে ওঠে। দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বের হবার বয়স ও সাহস ওর হয়নি। বাইরে বয়স্ক কুকুরের ঘড় -ড়, ঘড়-ড় শব্দ। লেজ নেড়ে বাচ্চাটা সামান্য পিছিয়ে এলো, তবে প্রতিবাদ থামায়নি।

'ভাবী, বাড়ি আছো?'

উঠানে পায়ের । এলোমেলো আওয়াজ।

'ক্যাডা?'

'আমি মঙ্গলা, ভাবী। সাথে লোক আছে। একটু ওঠো তো?'

লতা হাই তোলে। মুখে পানের রস। ঢোক গিলে সে উঠে দাঁড়ালো। দরোজার কপাট খুলে হেরিকেনটা দরোজার পাশে এনে রাখলো। বারান্দায় পাঁচ ছয়টা পিঁড়ি। গুছানো ছিলো। লতা পিঁড়িগুলো বিছিয়ে দেয়। নিজে পাটাতনে এসে বসে। হেরিকেনের আলোয় তার গায়ের বিশাল ছায়া হয়েছে। মাথা উঁচিয়ে শিমুল দেখলো, ছায়াটা ফেলু মেম্বরের বুক পেঁচিয়ে উঠানে গিয়ে পড়েছে। তার পাশে সুলতান ফকির, বাবার ঘনিষ্ট বন্ধু। এই রাতেও হেরিকেনের আলোয় তার মাথার টাক চিকমিক করছে। মঙ্গলার কুকুরটার মাথা আলোয়, পেছনটা অন্ধকারে। কুকুরের চোখদুটো হেরিকেনের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। কুকুরটা দুই পা সামনে ছড়িয়ে শিকার ধরার ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে। চোখ ঘরের দিকে। একটা বাদুর শব্দ কোরে উড়ে গেলো। কুকুরটা কান খাড়া কোরে সামান্য ভাবলো। তারপরই আগের অবস্থানে ফিরে গেলো। ভীষণ সতর্ক এবং হিংস্র এই কুকুরটা। ঘটে বুদ্ধিও প্রচুর। কুকুরটা ক্রস। লীনা উঠে বসলো। শিমুলের কান সজাগ। যেখানে ফেলু মেম্বর, সেখানে সুন্দর বলতে কিছু থাকতে পারে না। মঙ্গলা পকেট থেকে সিগাটে বের করে। সোনালী রংয়ের প্যাকেট। আগে ফেলু মেম্বরকে দেয়, পরে নিজে। টট্। গ্যাস লাইটার জ্বলে ওঠে। ধোয়া ছাড়তেই মিষ্টি একটা গন্ধ পেলো শিমুল। লীনা কেশে ফেলে নাক চেপে ধরতে গিয়েও ছেড়ে দেয়। সুলতান ফকির কেশে ওঠে। গা ঝাঁকানো কাশি। একদলা কফ ফেলে তবেই তার কাশি থামে। শিমুলের ভেতরটা ঘুলিয়ে গেলো। মুখে থুতু এসে ভরে উঠলো। শিশিরের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সে জানালার কাছে মুখ নিয়ে যায়। মঙ্গলই প্রথমে মুখ খোলে– 'লীনা ঘুমিয়ে গ্যাছে?'

লতা ভেতরে তাকালো। লীনার সাথে তার চোখাচেখি হয়।

'যা কওনের, আমারে কইলেই হইবো।'

'তারে একটু ডাকো।'

'না।'

শিমুল থতোমতো খেয়ে গেলো। মায়ের 'না' শব্দটা যেনো অনেক ওজনদারী!

'মাইয়াডা তো আইবুড়ো হইবার লাগছে, বিয়া-সাদী দিবা না?'

ফলু মেম্বরের কথার কোনো জবাব দিলো না লতা। শিমুলের দিকে চোখ পড়তেই কেমন ঠান্ডা আর ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো ভারী গলায় বললো, 'তুমি জাইগা রইছো ক্যারে? শুইয়া পড়ো।'

শিমুল এখন ভয় পেলো না। বরং রাগই হলো। মা এখনো ওকে কি ভাবে? সে শুয়ে তো পড়লোইনা, বরং গো ধোরে খাট থেকে পা নামিয়ে দিলো।

আবার ফেলু মেম্বরের গলা– 'বুঝি, বিয়া দিবার চাইলেই বিয়া সাদী হয় না। মায়ের কাজ-কামের যা নামগন্ধ! পোলাডাও হইতাছে একটা ল্যাবান্ডিস মার্কা গুন্ডা। কথা তো কয় না, যেন্ বোমা ফাটায়। মাইয়াডাও কম যাইতাছে কিসে? থাহে তো ভিনদেশে। ছিটে-ফোটা যা শোনবার পাই, বুইঝা নিতে অসুবিধা হয়না। খোদা-ই জানে. কোন্ তলে গিয়া ঠেকছে।

'মেম্বর, তোমারও তিন তিনডে মাইয়া আছে। জিভটারে বেহুদা আলগা করাইও না। জীবনডা ভইরা গন্ধমাদন কম করলা না। অহনও থামনের সময় আছে।'

মায়ের কণ্ঠস্বরে শিমুল চমকে ওঠে। কি শীতল আর ভয়ংকর!

'কথায় তো চটাং চটাং খই ফোটে গো! কই লিয়াকাত আলী, আর কই জুতার কালি।'

'তা যা কইছো, মিতা তো তোমার মাইয়া না!'

'তোমরা শোনলা? আমার পাগলী মাইয়ারে লইয়া কি কইরা কথা চটকাইতাছে? এর পরেও তোমরা আমারে চুপ থাকবার কও?'

'সময় হইলে আরো ভালা জবাব পাইবা মেম্বর, সবুর করো। মেওয়া সবুরেই পাকে।'

মঙ্গলা সিগারেটের শেষাংশ উঠানের অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে। কুকুরটার চোখ আগুনের বিন্দুর সাথে ঘুরে যায়। মঙ্গলা বললো– 'ফেলু, কথার মার-প্যাঁচ থাক। কথায় কথা বাড়ে, ভোজনে পেট ভরে। আসল কথায় আসো। সুলতান ভাই, তুমিই কথাটা পাড়ো।'

সুলতান ফকির কাশতে কাশতে বলে– 'অই একই কথা, তুমিই কইয়া ফালাও।'

মঙ্গলা একটু সময় নিলো। অযথা গ্যাস লাইটারটা জ্বেলে ফুঁ দিয়ে শিখা নিভালো সে।

'ভাবী, ঘরে একটা যুবক ছেলে আছে, তাই না? শিশির না কি যেনো নাম। ঘরতো একটাই। ঘরে তোমার সেয়ানা মেয়েও আছে। এভাবে এক ঘরে থাকাটা কি ঠিক?'

শিমুলের বুক ধক কোরে ওঠে। সে তাড়াতাড়ি শিশিরের দিকে তাকায়। বইটি খোলা, ওর হাতে ধরা। সে চোখ বন্ধ কোরে ফেলেছে। শিমুল ভীষণ লজ্জা পায়। লীনার দিকে তাকালো সে। লীনা হতভম্ব হয়ে বসে আছে। মুখ সামান্য হা করা। শিমুল ভেবেছিল, মা হয়তো চেঁচিয়ে রেগে উঠবে। কিন্ত তা হলো না। আগের মতোই সে ধীর-স্থির গলায় বললো– 'শিশির আমাগো আত্মীয়। খাঁটে শিমুলের লগে শোয়।' ফেলু মেম্বর ব্যাঙ্গো গলায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে– 'শিশি আমাগো আত্মীয়। কোন্ জন্মের আত্মীয়, জিগাও তো মঙ্গলা! নাইল্লা ক্ষেতে বিয়াইছে গাই, সেই সম্বন্ধে খালাতো ভাই। ওইডা কোনো কথা না। বাতি নিভাইয়া দিলে খাট আর মেঝের মইধ্যে ফারাকটা কই থাকে? মানুষ ঘুমাইছে কি মরা। শিমুল কি রাইত জাইগা পাহারা দেয়?'

'মেম্বর, তুমিও মাইয়ার বাপ, হিসাব কইরা কথা কও।'

'চোররে চোর ছাড়া কি কমু?'

'তুমি বুঝছো না কেনো ভাবী, সমাজ বোলে একটা কথা আছে না?'

শিমুল আর স্থির থাকতে পারে না। পা ঝুলানোই ছিলো। সেই পায়ে ভর কোরে সে মেঝেতে নেমে দাঁড়ায়। ওর শরীর কাঁপছে। রাগে আর অপমানের জ্বালায়। মঙ্গলার কথার রেষ ধোরে সে বলে ওঠে– 'আমাদের জায়গা-জমি যখন চক্রান্ত কোরে কেড়ে নেয়া হলো, সমাজ তখন কোথায় ছিলো? শূন্য হাতে যখন ভিটে থেকে নামিয়ে দেয়া হলো, সমাজ তখন খোঁজ নেয়নি কেনো? আমাদের বেশি সমাজ দেখিওনা!'

'তোমারে না ঘুমাইতে কইছি?'

'দ্যাখলা, দ্যাখলা তোমরা? বাব্বা, জিভ তো না, যেন্ কেউটের ফনা। হইতাছো লেখা পড়া জানা আস্তো একটা বান্দর, আদব-কায়দা জানবা কই? তয়, তোমারে দোষই বা দেই কি কইরা; যেমন মা, পুত তো তেমন হইবোই। আইনের কথা।'

শিমুলের ইচ্ছে হলো ফেলু মেম্বরের জিভটা টেনে ছিঁড়ে নিতে। কিন্ত সে কিছুই করলো না। মা রয়েছে যে। অনেক কষ্টে ফেলু মেম্বরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আক্রোশটা সে সামলে নিলো। কিন্ত জায়গা থেকে একচুলও নড়লো না।

'কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না ভাবী। সমাজের কাছে আমরা মুখ দেখাবো কেমন কোরে? ভাই যদি বেঁচে থাকতো, পারতে এসব করতে? সে মেনে নিতো?'

'শরমের পানি দিয়া তোমরা আগে মুখটা ধুইয়া লও, তারপর তোমরা মানুষটার নাম লইও।'

সুলতান ফকির কেশে উঠলো। কেউ কোনো কথা বললো না সাথে সাথে। তার ভেতরে অস্বস্তি ঘুরপাক খায়।

'কাজটা বাড়াবাড়ি গোছের অন্যায়, ভাবী।' নতুন একটা সিগারেট বের কোরে ডলতে ডলতে সিগারেটের দিকে চোখ রেখেই সে কথাগুলো বলে।

'অন্যায়টা দ্যাখলা কই?'

'মঙ্গলা, কুকুর বুইঝা মুগুর আর দেবতা বুইঝা ফুল দেওন লাগে, বুঝলা? এত্তোগুলান পোলা-মাইয়ার মা হইছে, আইজ তারে আমাগো বুঝান লাগবো একঘরে সেয়ানা মাইয়া আর সেয়ানা অনাত্মীয় যুবক- পোলা থাকলে অন্যায়টা ক্যামন কইরা হয়! বেহায়া আর কারে কইছে। সুলতান, তুমি যে কিছু কইলা না?'

সুলতান ফকির এবার মিনমিনে গলায় বলে, 'দোস্তাইনি, কামডা মনে লয় হাচাই ভালা হইতাছে না।'

'ব্যবসা, বুঝলানি, ব্যবসা।'

'মুখ সামলাইয়া কথা কও মেম্বর! বাড়িডে আমার!' এতোক্ষণে লতার গলায় ঝাঁঝ তীব্র হয়ে ঝংকার দিয়ে ওঠে।

'কি, আমাগো অপমান?'

ব্যাঙ্গাত্মক ঢংয়ে লতা উত্তর দেয়– 'উপরমুখী হইয়া থুতু ফালাইলে গায়ে-গতরে পড়বোই। বুনছো পাট, ধান পাইবা কই? আর তোমরাও শুইনা রাখো– আত্মীয়র কথা কইলা না? তোমাগো এই মেনীমুখো মাতবর লীনার বাপের সূত্রে আমাগো আত্মীয়, কি কও? আত্মীয়

হইয়া হেয় আমাগো কোন ভালা কামের বালডা ফেলাইছে, হেরে তোমরা ইট্টু জিগাও তো? আমারে আর আত্মীয়র জ্ঞান দিবার আইও না। কি গো মেম্বর, আমি ব্যবসা শুরু করলে তুমিই তো হইবা এক নম্বরের কাষ্টমার, না? তয়, তুমি বাঘের গু দিয়া দাঁত ধুইতে থাকো।'

ফেলু মেম্বর লাফিয়ে ওঠে– 'মঙ্গলা, সুলতান, লও, ওঠো। এর একটা শক্ত বিহীত আমি না করছি তো আমি ফেলু মেম্বর না, তোমরা আমার নামে কুত্তা পুইষো! মাগীর কট্টুক তেল হইছে,আমি তা দেখতাছি!'

'আহ্ ফেলু, অনেক রাত হয়েছে। মাথাটা তুমি ঠান্ডা রাখতে পারো না? এদের লজ্জা বুঝি তোমারও লজ্জা না? এরা তোমার আত্মীয়; না আমার, সুলতানের?'

ফেলু মেম্বর দাঁড়িয়ে গেছিল। এবার আগের জায়গায় বসতে বসতে সে বললো– 'তোমার যা কথা! কথাডা এরা মানে, না আমারে পোছে?'

'মানবে মানবে। মানবে না কেনো? শান্ত হয়ে বসো তো তুমি।' মঙ্গলা নতুন কোরে সিগারেট ধরায়। 'এক কাজ করো ভাবী, কলংকের ঢোল কোনো অবস্থাতেই বাজাতে নেই। তুমি বরং ছেলেটাকে বের কোরে দাও। রাতটা না হয় সে ফেলুর বাড়িতেই থাকলো! মতিতো একাই এক ঘরে থাকে। কাল ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিও। আর ভবিষ্যতে এদিকটায় একটু খেয়াল রেখো। আজ হোক আর কাল হোক, মেয়েগুলোকে বিয়ে তো দিতে হবে, নাকি?'

'না।'

লতার গলা স্পষ্ট এবং দৃঢ়।

'না? কি না?'

'শিশির আমার মেহমান। ও এখানেই থাকবো, যতোদিন খুশি বেড়াইবো। আমারে এতো ন্যায়-অন্যায় দেখাইতে আইসো না। তোমাগো একটা কথা কই, আমি এই গেরামে বউ হইয়া আইছি পরায় তিরিশ বছর। সব বাড়ির রান্ধনঘর থাইকা শুরু কইরা বসতঘর পর্যন্ত খোঁজ-খবর আমার ভালাই জানা। গু ঘাইটো না, গন্ধ বারাইবো।'

'ভাবী, বাড়াবাড়িটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।'

'ভিটে ছাড়া কইরাও তোমার খায়েশ মিটে নাই না মেম্বর? তয়, এইবার বেশি যুইত হইবো না, কইয়া রাখলাম।'

'কি করবা, শুনি?'

'আমার কিছু করন লাগবো না। যা করার, করনের মালিকই করবো। একটা কথা খালি মনে রাইখো, গন্ধ ছড়াইবার লাইগা তুমি গু লইয়া যতো ঘাটাঘাটি করবা, গু ততোই তোমার গতরে আগে-ভাগে লাগবো।'

'আমরা কিন্তু ভালোর জন্যই এসেছিলাম!' মঙ্গলা লতাকে নরম করার চেষ্টা করে।

'মঙ্গলা, তুমি একজন লেখা-পড়া জানা মানুষ। বিদেশ গ্যাছো। একটা ইতরের পক্ষে দালালি করতে তোমার একটু শরমও লাগে না?'

'কি, আমি ইতর? মঙ্গলা আমার দালাল?'

'অতো চেঁচাইও না। ইতররা তোমার চাইতে বেশি হায়া-শরম রাহে। তুমি একটা গুয়ে মাছি। উপরে লেহা-পড়া আর মেম্বরের রঙ চংয়া ছাপ, ভেতরে পচা গু। থু!'

একদম আঁতে গিয়ে ঘা টা লাগে। রাগে চেঁচিয়ে ওঠে ফেলু মেম্বর। লাফিয়ে ওঠে সে। কুকুরটাও সাথে সাথে ঘেউ ঘেউ কোরে উঠলো। ওর ভরাট গলার ডাকে অন্ধকার থরথরিয়ে কেঁপে গেলো।

লীনা চুপচাপ সব শুনছিল। সে এবার শিমুলের পাশে এসে দাঁড়ায়। তার চোখে জল চিকচিক করছে। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে সে কাঁদতে কাদতে বললো, 'তোমাদের মন এতো নোংড়া, জানতাম না। সুলতান কাকা, তোমার বিবেক বলতে কি কিছুই নেই? তুমি না বাবার দোস্ত! দোস্ত বলতে তুমি না অজ্ঞান ছিলে? ছি, কাকা, ছি! তোমরা শুনে রাখো, দরকার হোলে কাল গ্রামের লোকজন ডেকে শালিস ডেকো। যা বলার, আমরা ওই সময়ই বলবো। তোমরা আমাদের খেতে পড়তে দাও না, আমরাও তোমাদের করুণার তোয়াক্কা করি না। ন্যায়-অন্যায় তোমাদের চেয়ে আমরা কম বুঝি নে। আমি বিয়ে করি বা না করি, তা নিয়ে তোমরা মাথা না ঘামালেই ভালো হবে। মা, চলে আসো।'

লীনা লতাকে হাত ধোরে টেনে তোলে। হেরিকেনটা আরো খানিকটা ভেতরে সরিয়ে রাখে। শব্দ কোরে সবার সামনে সে দরজা বন্ধ কোরে দেয় এবং তারপরই মায়ের গলা জড়িয়ে ধোরে হুহু কোরে কেঁদে ফেলে।

বড়'পা কি শান্ত মানুষ! শিমুল বড়পার এমন স্বভাব আগে কখনো দেখেনি। ওর হঠাৎ কোরে খুব লজ্জা হলো। কাজটা ওর করার কথা, অথচ করলো বড়'পা! দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে ধীরে ধীরে অপরাধীর মতো বিছানায় গিয়ে ওঠে। শিশির ঝিম মেরে চুপচাপ পড়ে আছে। পা দু'টো সামান্য কোঁচকানো। শিমুল নিশ্চিত– শিশির ঘুমোয়নি। শ্বাস-প্রশ্বাসই তার প্রমাণ। ওর ইচ্ছে হলো শিশিরের গায়ে হাত রাখতে, ডাকতে– এই শিশির। কিন্তু লজ্জা ও অপরাধবোধের কারণে সে সে দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না। বাইরে ফেলু মেম্বরের আস্ফাফল, মঙ্গলার ভদ্রলোকী কাই-কুই আর সুলতান ফকিরের বিরামহীন কাশি। এসবের সাথে পাল্লা দিচ্ছে কুকুরটা। সব মিলিয়ে রাতের নি:স্তব্ধতা হঠাৎ কোরে প্রেত-নৃত্যে বুড়ো আংগুল দেখিয়ে খলবলিয়ে দুলে উঠলো। শিমুল মায়ের পাশ দিয়ে শিলুর দিকে তাকালো। দিব্বি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। লতা লীনাকে পিঠ চাপড়ে, মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে। চমকে উঠলো শিমুল। শিশির দির্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরেছে। লজ্জায় শিমুল এতোটুকু হয়ে ওঠে। অসহায়ভাবে সে বাইরে তাকালো। জানালার শিক গলিয়ে মিশমিশে কালো আকাশ দেখা যাচ্ছে। চাঁদ আছে, তবে খুবই নিস্প্রভ। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না। শিমুল একদৃষ্টে অন্ধকারে ঝুলে থাকা আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং আশ্চর্য, এতোদিন পরে খুব বেশি কোরে বাবার কথা মনে পড়ছে ওর। মনে পড়ছে বারবার।

,,

প্রশংসায় শিমুল আটখানা। সবাই ওকে প্রশংসা করছে। সবাই ঠিক নয়। ভিন্ন ধরনের চাহনী আর কূট কথায় কেউ কেউ ওকে দগ্ধ করতে চায়, হতাশ করতে চায়, উদ্দীপনার প্রবল জোয়ারকে আঁটকে দিতে চায়। এরা ফেলু মেম্বরের ঐতিহ্যিক বংশধর। 'গুণ্ডা নাম্বার ওয়ান। নকল-টকল না কইরা ডিভিশন পাইলে না হয় একটা কথা হইত! কোনো ভালা কলেজে ভর্তি হইতে গেলেই চিচিং ফাঁক হইয়া চোর ধরা পড়বো, তোমার জারি-জুরি কই যায়, দেখুম না?' ফেলু মেম্বর শিমুলের রেজাল্ট সহ্য করতে পারছে না।

ফেলু মেম্বরের এসব কথা কানকথায় শুনে শিমুলের খুব একটা ভাবান্তর হয় না। ফলাফল যে এমন হবে, তা যেনো ওর আগেই জানা। তাছাড়া আহামরি গোছের কোনো ভালো রেজাল্টও সে করেনি। অংক ও ক্যামিস্ট্রিতে লেটার আছে। এক নাম্বারের জন্যে ফিজিক্স-এ লেটার পায়নি। মোট নাম্বারের পরিমাণটাও তেমন উঁচু না। বলা যায়- সাধারণভাবে প্রথম বিভাগ। কিন্তু মার্কসীট ও টেস্টিমোনিয়াল আনতে শিমুল স্কুলে যায়নি। লতা কোনোভাবেই ওকে পাঠাতে পারেনি। স্যারদের বিশ্বাস ছিলো, শিমুল মেরিট লিস্ট-এ থাকবে। মনোহর স্যার অবশ্য আগেভাগেই অন্য স্যারদের সেই বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তিনি পরীক্ষার শেষে স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন, শিমুল প্রথম বিভাগই পাবে না।

কথাটা শিমুলও শুনেছিল এবং মনে মনে মনোহর স্যারের উপর ক্ষেপে গিয়েছিল। ওর খুব আপসোস হচ্ছিল। ইস্, যদি আবার সুযোগ পাওয়া যেতো, স্যারকে দেখিয়ে দিতাম। কিন্তু সময় তো পেছনে ফিরে আসে না এবং শিমুলও নতুন কোরে কোনো সুযোগ পায়নি, কিছু দেখাতেও পারেনি। শুধুমাত্র তার মন্তব্যকে স্বাভাবিকভাবে ভুল প্রমাণ করা ছাড়া।

আসলে সব দোষ রিয়ার। সাগরদের সাথে শিমুল সেই যে একবার মেয়েদের হোস্টেলে গিয়েছিল, কি কোরে যেনো কথাটা জানাজানি হয়ে যায়। রিয়াও শুনেছিল। শুনেই রিয়া বেঁকে দাঁড়ায়। তখন পরীক্ষার মাত্র মাসখানেক বাকি। দেখা হোলেও রিয়া শিমুলের সাথে কথা বলে না। চিঠি দিলেও পড়ে না, যদিও তা নেয় কিন্তু কোনো জবাব দেয় না। শিমুল অস্থির হয়ে

ওঠে। খেতে-পড়তে কেবলই এক দুশ্চিন্তা, এক ভাবনা– রিয়া। শিমুল রিয়ার কাছে মাপও চেয়েছিল। তবুও রিয়া টলেনি। আর কি আশ্চর্য, শিমুল যখন ক্ষোভে-রাগে হতাশ হয়ে পড়লো, তখনই রিয়ার চিঠি পেলো। একটা চিঠিই শিমুলকে পাল্টে দিয়েছিল। কিন্তু তখন আর হাতে সময় নেই। পরীক্ষার মাত্র ছয়দিন আগে রিয়া চিঠিটা লিখেছিল। চিঠিতো নয়, যেনো একমুঠো জ্যোস্নার ঘ্রাণ। সেইদিন শিমুল একটা কবিতাও লিখে ফেলেছিল। এবং এসবের ফলে যা হবার তা-ই হয়েছিল, পরীক্ষা ভালো হয়নি। ভালো কোরে একবার রিভাইস দিতে না পারলে ভালো হয়ও না। শিমুল সেই সুযোগ ও সময় শেষ মুহূর্তে পায়নি।

বড় রাস্তা থেকে অতুলদাদের বাড়িতে যাওয়ার রাস্তায় পা বাড়ালো শিমুল। অতুলদাকে দরকার। সকালে একবার খোঁজ নিয়েছিল। পায়নি। এসময়টা অতুল খেতে আসে, বিশ্রাম নেয়। পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই মিতাকে দেখলো। রাস্তা থেকেই দেখা যাচ্ছে। ফেলু মেম্বরদের কলতলায় হেলানো গরুর গাড়ি। মিতা সেখানে শুয়ে গান গাইছে। তাল-বেতাল চেঁচামেচি। মিতাকে দেখলেই কেনো যেনো শিমুলের মন খারাপ হয়ে যায় এবং ফেলু মেম্বরের উপর থেকে তখন সব রাগ ঘৃণা একটু একটু কোরে ফিকে হতে থাকে।

থমকে দাঁড়ালো শিমুল। মিতার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সে ছোট বাঁকটা পেরোলো এবং তখনই মেয়েটাকে দেখলো। মেয়েটা পেয়ারা গাছে হেলান দিয়ে কি যেনো পড়ছে। বাঁ হাতে আধ-খাওয়া পেয়ারা। শিমুলের দিকে পেছনফেরা। এক বোঝা চুল পিঠে খোলা । তবে আগায় রাবার দিয়ে আটকানো। ছোটোগুলো গ্লাডারের ফাঁক ফাঁকি দিয়ে একটু একটু উড়ছে। হলুদ রংয়ের সালোয়ার-কামিজ। ম্যাস করা। মাঝারি গড়ন। শিমুলের বুক ধক কোরে ওঠে। রিয়া! রিয়া নয়তো? চুলের ঢং, পোষাক-আষাকের-ঢং গায়ের রংটাও-এক। শেষবার যখন দেখা হয়, তখন ঠিক এই রংয়েরই সালোয়ার কামিজ পরেছিল রিয়া। বাড়ি থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশগজ পূবে, বাড়িতে যাওয়ার রাস্তায় মাঝামাঝি যায়গায় পাশে একটা সুপারি গাছে বাঁ হাত রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডানহাতে দাঁও। হঠাৎ কোরে সাইকেলের ঘন্টা শুনে চমকে উঠেছিল। তারপরই- শিমুল ভুলবে না, কোনোদিন ভুলতেও পারেনি। এটুকুর জন্যেই যেনো শিমুল প্রবল রোদে সাইকেল চালিয়ে আসে,আসতে বাধ্য হয়। কি প্রচন্ড জ্যোতি সেই আনন্দে। খুশির কি অনাবিল উল্লাস। ভালোবাসার এই বুঝি প্রকৃত প্রকাশ। পাঁচ-ছয় গজ দূর। রিয়া দৌড়ে এসেছিল। একদম সামনে এসে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধোরে হেসে বলেছিল, 'আমার মিষ্টি কোথায়?'

'মিষ্টি?' আশ্চর্য ভাবটুকু শিমুল ধোরে রাখতে পারেনি। হেসে ফেলেছিল। হাসতে হাসতে বলেছিল– 'আমি নিজেই তো চলে এলাম, তাতেও হবে না?'

'ফাজলামোতে চিড়ে ভিজবে না সাহেব। আমি বুঝি খবর রাখিনে, না?'

'আবার কি করলাম আমি?'

'কি ন্যাকারে আমার! ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছো, মিষ্টি খাওয়াবে না?'

'তুমি খুশি হওনি, রিয়া?'

'হু।' শব্দটা উচ্চারণ কোরেই রিয়া হেসে ফেললো এবং চোখ বন্ধ কোরে মাথা ঝাঁকালো।

'খুশি হওনি?'

'আধাআধি। বক্কার ভাই তোমার চেয়ে ভালো রেজাল্ট করেছে।'

'বক্কার তো আর প্রেম করেনি! জানো, সেই যে তুমি আমাকে একটা কাটা দিয়েছিলে, মনে আছে না? ওটা মাঝে মাঝে আমি নেড়েচেড়ে দেখি।'

'তোমার রেজাল্ট খারাপ হওয়ার জন্য পরোক্ষভাবে তুমি কিন্তু আমাকেই দায়ী করছো।'

'তুমি নাতো কে? তুমি, তুমি, তুমি। মনে মনে কথাটা ভাবলেও শিমুল মুখে আনলো না। গম্ভীর হয়ে যাওয়া রিয়ার দিকে তাকালো। হ্যান্ডেল তখনো রিয়ার হাত। হাতের উপর হাত রাখলো শিমুল। হাসলো। শব্দ কোরে।

'কই আমি তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে তোমার কাছে এলাম, আর এসেই ঝগড়া। এই মারলাম এক থাপ্পর। বেয়াদব!' শিমুল নিজের গালে বাঁ হাত দিয়ে থাপ্পর মেরে বললো–'আরে বাবা এবার একটু হাসো না!'

রিয়া তাকালো। কেমন ভেজা ভেজা ভাব।

'নাহ্, তোমার সাথে ঠাট্টাও করা যাবে না। এখান থেকেই তাড়িয়ে দেবে? এই রিয়া!'

রিয়া মুখ কাচুমাচু কোরে বললো, 'কাল বাবা এসেছে।'

রিয়ার বাবা শিমুলকে চেনেন। স্নেহও করেন। কিন্তু মাস ছয়েক আগে লোকটা বিয়ে কোরে বসলেন। সেই থেকে লোকটার উপর শিমুল রেগে আছে। কোনো মানে হয়? আবার রিয়ার নতুন মায়ের নাম লীনা। রাগ না লেগে পারে? শিমুল সত্যিই চুপসে গেলো। মজা পেলো রিয়া। কিন্তু সে বেশিক্ষণ ওভাবে থাকতে পারলো না। হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

'বাব্বা, কি ভীতুরে!'

শিমুলের সন্দেহ হলো। রিয়ার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলো। শেষ পর্যন্ত কিছু বুঝে উঠতে না পেরে সে জিজ্ঞেস করলো, 'এই রিয়া. সত্যিই বাবা এসেছে?'

'বাবা? কার বাবা?'

লজ্জায় শিমুলের মুখ লাল হয়ে গেলো। রিয়ার হাসি আর থামে না।

'তুমি পারো বটে!'

'তুমি কম গেলে কবে? শোনো সাহেব, বাবা না এলেও বাড়িতে পর্শী আর মলী আছে। বরং চলো তোমার খালাদের ওখানে যাই।'

'ধ্যেৎ।'

'আগে শোনোই না! ঘন্টা খানেক আগে তোমার খালু আর খালাকে সাজগোছ কোরে বেরোতে দেখেছি। ইব্রাহিম ভাই এখন বাজারে। বাড়ি একদম ফাঁকা। ভাবি এখন একাই আছে মনে হয়।'

শিমুল সানন্দে রাজি হয়ে গিয়েছিল।

শিমুলের খালাবাড়িটা যেনো মস্ত এক বাগান। চারপাশে অগুণতি আম, কাঁঠাল আর নারকেল-সুপারি গাছের সগর্ব সমারোহ। বাড়ির উত্তর-পশ্চিম দিকে বিশাল সুপারি বাগান। বাগানের মাঝ দিয়ে পায়ে হাঁটার পথ। জায়গাটায় সব সময় নির্জনতা থই থই করে। ভাবি ওদের দু'জনকে সুপারি বাগানের পথ ধোরে হেঁটে আসতে দেখে ছুটে এলো। দূর থেকেই সে পটাপট শিমুলকে চোখ টিপে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে দুইজনকে দুই হাতে ধরলো। বললো– 'বাড়িতে আমি ছাড়া কেউ নেই। চল, তোদের দুজনকে আজ লাভ-এর মন্ত্র শিখিয়ে দেবো।'

'খালা কোথায় গ্যাছে?'

'হাওয়া খেতে। নো চিন্তা, আসতে আসতে বিকেল।'

তিনজন উঠানে উঠে এলো। উত্তর ও দক্ষিণ ভিটেয় বিশাল দুটি টিনের ঘর। পশ্চিমে রান্না ঘর। উপরে টালী। চারপাশে এতো গাছগাছরা, অথচ উঠোন ভরা রোদ। রোদে পৃথিবীটা ঝলমল করছে। মাজদুপুরের ঠিক পূর্বক্ষণ। ভাবি ওদেরকে নিয়ে দক্ষিণের ঘরে ঢুকলো। মাঝখানে পার্টিশন করা। শিমুল চেয়ারে বসলো। চৌকিতে রিয়া। শিমুলের পাশ ঘেঁষে।

'তোরা বস, আমি আসছি। খালি পেটে প্রেমও আলুনী লাগে,বুঝলি? আমার আবার রান্না করতে হবে। দাঁড়া, তোদেরকে মুড়ি মেখে দিই।'

ভাবি টিন থেকে মুড়ি বের করলো। রান্নাঘর থেকে পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ আনলো। সাথে সরিষা তেলের বোতল। পিঁয়াজ-মরিচ কাটতে কাটতে জিজ্ঞেস করলো- 'খালা কেমন আছে রে? তুই মনে হয় বাড়ি গিয়ে আমাদের খবর বলিসনে, না? বলবিই বা কি কোরে? প্রেমের কথা যদি ফাঁস হয়ে যায়?'

'তার মানে, আমি মিথ্যেবাদী, না? ঠিক আছে, চিঠি লিখে দাও বিশ্বাস না হোলে। সেই কবে থেকেই আসবে আসবে করছে। না আসলে আমি কি করবো?'

'তুই নিয়ে আসলেই পারিস!'

'সাইকেলে কোরে?'

ভাবি হেসে উঠলো।

'রানু বাড়ি আছে, না লীনা'বুর কাছে গ্যাছে?'

'বাড়িতেই তো আসার সময় দেখে এলাম।'

ভাবি তেল ঢেলে মুড়ি মাখলো। রিয়া হাসছে। 'নে, শুরু কর। আগে মুখ-ঠোঁট ঝাল কোরে নে। তারপর.........' ভাবি শিমুলের ডান কানটা টেনে দেয়। 'আমি গেলাম। দরোজা টেনে দেবো নাকি রে?'

রিয়া মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, 'অসভ্য!'

'ওমা, এ আবার কি কথা গো? কই আমি চান্স কোরে দিচ্ছি, তার পুরস্কার এই? আলৌ, মুখে ছি কইলেও পেটের জ্বি আমার কাছে গোপন করনের কিছু নাই। তগো এই পাঠ আমাগো কম পড়া নাই, বুঝলি? তো, ঠিক আছে,আমি যখন অসভ্যই তাহলে এই আমি বসলাম।'

সে সত্যি সত্যি বোসে পড়ে।

'তুমি না বললে রান্না করবে? আমাকে খেতে দেবে না?'

'থাকগে, একদিন না হয় রান্না না-ই হলো! বোসে তোদের প্রেম করা দেখি। আর খাওয়ার কথা? চুমো খেয়েই তোরা তোদের পেট ভরে নে।'

'বেহায়া।' রিয়ার মুখ সত্যিই লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

সে উঠে গিয়ে ভাবিকে কিল মারে। ধাক্কা দিয়ে বলে– 'তুমি যাবে?'

'কেনো লো? তর সইছে না বুঝি, না? অবশ্য মাফ করা মহৎ গুণ। ঠিক আছে, দু'জনকেই আমি নিজগুনে মাফ কোরে দিলাম।'

ভাবি চলে যেতেই ওদের সব কথা যেনো ফুরিয়ে গেলো। সারা রাস্তা আসতে আসতে কতো কথার ফুলঝুড়ি যে মনে মনে সাজিয়েছিল শিমুল, এখন তার কিছুই মনে পড়ছে না। একদম উধাও! আর কেনো যেনো লজ্জা লজ্জাও হচ্ছে ভাবির ওসব কথা শোনার পর থেকে।

'খাচ্ছো না যে?' রিয়াই প্রথম নীরবতা ভাঙ্গে।

'একদম ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'ভাবিটা খুব ভালো, না?'

'বড়'পা চিঠি দিয়েছে। কলেজে ভর্তি হবার পরীক্ষা দিতে হবে। আট-দশদিনের মধ্যেই আমাকে তার ওখানে যেতে বলেছে।'

'ওখানে কতোদিন থাকবে?'

'বারে, আমি তো ওখানেই ভর্তি হবো।'

'ও...,'

রিয়া মন খারাপ কোরে ফেলে। শিমুল ওর বাঁ হাতটা ধরলো। আলতো কোরে। সাথে সাথে ওর ভেতরে হালকা একটা কাঁপন তিরতিরিয়ে ওঠে। কাঁপনটা সে চাপা দিতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। রিয়ার হাতের আংগুলগুলো সে মুঠোয় নিয়ে নাড়াচাড়া করে। কি ধবধবে ফর্সা আর মোমের মতো নরম। আংগুলের সবগুলো নখই সামান্য কোরে বড়। নখে টকটকে নেইল পলিশ। ওর খুব পানিতৃষ্ণা পেলো। গলাটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। ঠোঁটও।

বাইরে খুক কোরে কাশির শব্দ হলো। শিমুল সাথে সাথে রিয়ার হাত ছেড়ে দেয় এবং চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কেউ এলো না। আর কোনো শব্দও নেই। শিমুল জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে চেয়ারে বসলো। পানির গ্লাস ওর ঠোঁটে ঠেকেছে। রিয়া দুষ্টোমি কোরে শিমুলকে ধাক্কা দিলো। সাথে সাথে গ্লাসের পানি ছিটকে ওর গায়ে পড়লো। শার্টপ্যান্ট বেশ খানিকটা ভিজে ওঠে। শিমুলের অবস্থা দেখে ঠোঁট টিপে রিয়া হাসছে। গ্লাসে আরো খানিকটা পানি ছিলো। শিমুল হাসতে হাসতে রিয়ার গায়ে ঢেলে দিতে গেলো এবং ঠিক তক্ষুণি দুইহাত দিয়ে রিয়া শিমুলকে জড়িয়ে ধরলো।

তরঙ্গটা মুহূর্তের মধ্যে শিমুলের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। শরীরে থরথর কাঁপুনি। বুকে কে যেনো হাতুড়ি পিটছে। একটা পরিচিত ফুলের ম-ম গন্ধ। ফুলটার নাম মনে করতে পারছে

না শিমুল। ইচ্ছেও হচ্ছে না। সে খুব দ্রুত ওই গন্ধের রাজ্যে ডুবে গেলো। ওর গলা আরো বেশী শুকিয়ে ওঠে। ঠোঁটদুটো যেনো মরুভূমি। সে ঢোক গিললো। বুকের ধুকধুকানি কমছেই না। কিছুটা ভয়। কিছুটা দ্বিধা। কিছুটা লজ্জা। এসব ডিঙ্গিয়ে কোনো এক সময় রিয়ার ঠোঁট দুটোঁ শিমুলের ঠোঁটে ডুবে গেলো। শরীরের কাঁপুনিটা আরো একটু বেড়ে উঠলো তাতে। দু'জনেরই। কাঁপুনিটা শিমুলের ভেতর থেকে আসছে। নি:শ্বাস উত্তাপ। ঘন হয়ে উঠেছে। শিমুল ঠোঁট ছাড়িয়ে মুখ গলার দিকে নামিয়ে আনে। সে হঠাৎ কোরে মাতাল হয়ে ওঠে। এক অনাস্বাদিত শিহরণে কাঁপতে কাঁপতে এক সময় ওর ভেতরে আর কোরো কাঁপনিই থাকে না।

রিয়া দুই হাতে শিমুলের মাথা বুকের মাঝখানটায় চেপে ধরলো এবং হঠাৎ কোরেই সে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললো।

থমকে গেলো শিমুল। হতভম্ব হয়ে সে রিয়ার দিকে চেয়ে রইলো। রিয়ার কান্নায় এখন শব্দ হচ্ছে। গাল বেয়ে লোনা জল ঝরছে। শিমুল ওর মাথায় হাত রাখলো। চুলের ঘ্রান এলো নাকে। সে ফিসফিসিয়ে ডাকলো-'এই রিয়া, রিয়া; ভাবী সব জেনে যাবে না? আমি মাফ চাইছি। ভুল হয়ে গেছে আমার। এই, রিয়া: প্লিজ, চুপ করো। আমি কিন্তু সত্যি সত্যি চলে যাবো।'

রিয়া শিমুলকে ছেড়ে দেয়। ওড়না নিয়ে চোখ-মুখ মোছে। সহজে ওর ফোঁপানি থামতে চায় না। চোখদুটো লালচে হয়ে গেছে। শিমুল চেয়ারে গিয়ে বসলো। রিয়া হঠাৎ কোরেই আবার হেসে ফেললো। কান্নার ধকলে ফোলা আর লালচে চোখ। মুখে হাসি। শিমুল কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। শুধু বললো, 'চোখে পানি দিয়ে এসো, ভালো লাগবে।'

রিয়া তার ধারেও গেল না। শিমুলের পায়ের কাছে এসে সে হাঁটু মুড়ে বসলো। গাল রাখলো শিমুলের হাটুতে। চোখ শিমুলের চোখে।

'মেয়েরা পারে বটে!'

'কি?'

'আমি তো ভয়ই পেয়ে গেছিলাম।'

'রাগ করলে?'

শিমুল রিয়ার হাত নিয়ে আলতো চাপে আঙ্গুল ফুটাতে থাকে।

'কাঁদলে কেনো?'

রিয়ার চোখ আবার ছলবলিয়ে উঠল।

'আমারে তুমি ভুলে যাবে নাতো?

'ভুলে যাবো? কেনো?'

'তুমি তো এখন কলেজে পড়বে। ডাক্তার হবে।'

'তাতে কি?'

'আমি তো ভাল ছাত্রী না। পড়াশুনা করতে পারবো কি-না, তারও ঠিক নেই।'

'সব বুঝলাম। কিন্তু এসবের সাথে তোমাকে ভুলে যাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।'

'আছে, তুমি জানো না।'

'তুমি যা-ও জানো, তা ভুল।'

শিমুলের হাটুতে চোখ মুছল রিয়া।

'চিঠি লিখবে কিন্তু! মাসে কম কোরে দু'টো।'

'জ্বি -না! তুমি যতোটা লিখবে, আমি তার ডাবল লিখবো। হলো তো?'

'রানু এখানেই পড়বে তো?'

'আপাতত: তাই। রিয়া, একটা কথা বলি?'

'বলো।'

'তোমার কোন ধরনের সমস্যা হোলে আমাকে জানাবে তো?'

'কিসের সমস্যা?'

'যে কোনো ধরনের। রিয়া, আমি না সরকারি স্টাইফেন পাবো। দরকার হোলে টিউশনী করবো। তুমি শুধু আমাকে জানিও। মনে থাকবে তো?'

রিয়া শিমুলের হাটুতে মুখ গুঁজে চুপচাপ বসে থাকে।

শিমুল ওকে হাত ধোরে দাঁড় করায়। রিয়ার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে সে আলতো কোরে চুমো খায়। 'আমি তোমার সাথে কোনদিন বেঈমানী করবো না। বিশ্বাস করো,কোনোদিনও না।'

রিয়া শিমুলের শার্টের বোতাম খুলে আবার তা লাগাতে থাকে। 'আমি যদি তোমাকে ছেড়ে অন্য কোনো স্বপ্ন দেখি, আমি যেনো অন্ধ হয়ে যাই। এই চোখ ছুঁয়ে বলছি।'

রিয়া এবার হাসলো না। কিন্তু স্পষ্টভাবে সে দুই হাতের আঙ্গুল দিয়ে চোখ স্পর্শ কোরে ঢেকে দিলো।

শিমুলের স্বপ্নময়ী ঘোর ভেঙ্গে গেল। কল্পনার ধোঁয়াশা ফুৎকারে মিলিয়ে গেলো কুকুরটার জন্যে। কুকুরটা মেয়েটির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটার সামনে এসে থেমে গেছিল সামান্য। তারপরই লেজ দাবিয়ে, শরীর বেঁকিয়ে কিঁউ কিঁউ কোরে পার হয়েই ভো দৌড়। তাতেই মেয়েটি ফিরে তাকালো। ওর বাঁ চোখ ট্যারা। মোটেই রিয়ার মতো নয়। শিমুল আগে কোনোদিন একে দেখেনি। হয়তো বেড়াতে এসেছে। মেয়েটির দিকে একবারও আর না তাকিয়ে সে উঠানে উঠে গেলো। সেখান থেকে সোজা অতুলের ঘরে। অতুল এখনো রাজনীতি করে। গোপনে নয়, প্রকাশ্যে। মাঝে মধ্যেই এদিক-ওদিক যায়। প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা করার জন্যে। পুলিশ কিছু বলে না, উল্টো যেনো কিছুটা তোয়াজই করে। অবশ্য প্রকাশ্যে আসার সময়ে একটা কাটা রাইফেল জমা দিয়েছিল সে। তাতেই চার চারটে মার্ডার কেসসহ মোট সাতটা কেস থেকে সে রেহাই পেয়েছিল। অস্ত্র এখনো আছে। খুব গোপনে। শিমুল নেড়ে-চেড়েও দেখেছে। অতুলের বর্তমান চলাফেরা আর কথাবার্তা কেমন যেনো খুববেশি গুছালো কিন্তু স্ববিরোধী। শিমুলের সন্দেহ হয়। অতুল এখন ব্যবসা করে। কিন্তু যে ব্যবসা, তাতে কোনোভাবেই এতোবেশি আয় হতে পারে না। অথচ প্রতিদিন তার খরচ হয় তিন-

চারশো টাকা। ধন্ধ লাগে শিমুলের মনে। তবুও মুখ থেকে তার সমাজতন্ত্রের বুলি সরে না। শেষে কয়েকদিন আগে শিমুল প্রশ্নই কোরে বসেছিল– 'আচ্ছা অতুলদা, তোমরা, মানে তুমি, এখনো সমাজতন্ত্র চাও, নাকি চাও না?'

শিমুলের মনে হয়েছিল, আচম্বিত প্রশ্ন শুনে সাবধানতারও সুযোগ পায়নি অতুল। সে প্রচন্ডভাবে চমকে উঠেছিল। অবশ্য নিশ্চিত নয় শিমুল। ভুলও হতে পারে। তবে অতুল যে উত্তর দিতে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সময় নিয়েছিল, তা ঠিক। শেষে সে হেসেই বলেছিল-চাবো না কেনো? এখনো আমরা সমাজতন্ত্র চাই। কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না। বল, ঠিক কি-না?'

স্লোগানটার অর্থ শিমুল তখন গভীরভাবে বোঝেনি। পর বুঝেছিল, আরো বেশ কয় বছর পরে। রুটি খেলেও খাওয়া, আবার পোলাও-বিরিয়ানী– তা-ও খাওয়া। খাদ্য দ্রব্যের গুনগত রকম-ফেরই তো বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বাহ্যিক প্রকাশ। গুনগত সমতা না আনতে পারলে পরস্পরের মধ্যে কোনো মৌলিক পরিবর্তন হবে না। তাছাড়া, খাওয়া ছাড়াও মানুষের আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় যেসব জিনিসের ব্যবহারিক দিকই তাকে সভ্য বানায়, শ্রেষ্ঠ বানায়। শ্লোগানটায় তা নেই। আসলে স্লোগানটাতে একটা চমৎকার চটকদারী সম্মোহনী মোহ আছে, যুব সম্প্রদায়কে সহজেই বিভ্রান্ত করা যায়। অতুলের কথায় শিমুল সেদিন পাল্টা প্রশ্ন করেছিল– তোমরা আগেও সমাজতন্ত্র চাইতে, এখনো চাও। কিন্তু আগে তোমরা কাজ করতে গোপনে, এখন প্রকাশ্যে। আগে পুলিশ তোমাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজতো। এখন উল্টোভাবে তোমাদের কাউকে কাউকে পুলিশ তেল মালিশ করে। কেনো? সরকার তো আর সমাজতন্ত্র চায় না। বলো, চায়? তাহলে?'

অতুল সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে বললো– 'সে অনেক কথা। শোন, অস্ত্র ছাড়াও, সশস্ত্র যুদ্ধ করা ছাড়াও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। তুই যদি মধু দিয়ে তোর প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারিস, তাহলে বিষ দিতে যাবি কেনো? চীনের মাও সেতুঙ স্বয়ং বলেছেন–বন্দুকের বুলেটের চেয়ে চিনির বুলেটের কার্যকারিতা অনেক অনেক বেশি। বিষে শুধু ঝামেলাই বাড়ে, কাজের কাজ হয় না। আমরা জনগণের ঘরে ঘরে যাবো, তাদেরকে বুঝাবো, সংগঠিত করবো। তারপর-নির্বাচন। আমরা যখন সংগঠিত হয়ে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবো, তখন সমাজতান্ত্রিক আইন বানাবো, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবো, বুঝলি?'

শিমুল একটু ভাবে। তারপর আবারো প্রশ্ন কোরে বসে– 'আচ্ছা অতুলদা, ধরো আমাদের গ্রামে একশো জন লোক আছে। ষাট জন যদি ফেলু ফুপাকে বলে, তুমি শিমুলদেরকে ঠকিয়েছো। ওদের জায়গা-জমি ওদের ফিরিয়ে দাও; তা হোলে? ফেলু ফুপা আমাদেরকে জমি ফিরিয়ে দেবে বোলে তুমি মনে করো?'

'কোন কথায় তুই কোন কথা টেনে আনলি?'

বিষয়টা মূলত: একই। ফেলু মেম্বর যদি সরকার হয়, আর গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ ষাট শতাংশ তোমরা, তখন? সরকার তোমাদেরকে মেনে নেবে?'

'দূর বোকা, তখন তো আমরাই সরকার।'

'ধরো তাই হলো। সমাজতন্ত্র তো গরীবদের রাজত্ব, না? রাষ্ট্রের বড় বড় অফিসার, পুলিশের ও,সি, এস.পিরা, আর্মীর মেজর-কর্ণেলরা- ওরা তা' মেনে নেবে? ওদের হাতে কিন্তু অস্ত্র আছে। পুলিশের হাতে অস্ত্র আছে বোলেই তুমি-আমি সরকারের আইন-আদালত মেনে চলি, মেনে চলতে বাধ্য হই।'

অতুল বিস্মিত হয়ে শিমুলকে দেখে।

'এসব তুই কবে শিখলি?'

'ওটা কোনো কথা না। তুমি বুঝিয়ে বলো।'

'তুই আসলে কিছু ব্যাক ডেটেড বই পড়েছিস বোলে মনে হচ্ছে। আমার কাছে কিছু ভালো বই আছে, নিয়ে পড়িস। যা কথা হচ্ছিল– ওসব ও.সি, এস.পি'রা বা মেজর কর্ণেলরা চুড়ান্তভাবে কার কমান্ড শোনে? সরকারের। সংসদের। ওরা যদি তারপরেও গোয়ার্তুমি করে, হয়তো করবেও কেউ কেউ, আমরা তখন জনগণ নিয়ে অভ্যুত্থান ঘটাবো। জনগণই আমাদের আসল শক্তি, লোহার অস্ত্র নয়।'

হাবভাবেই বোঝা যায়, অতুলের জবাবে শিমুল খুশি নয়। সে কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে হঠাৎ সরাসরি আক্রমণ কোরে বসলো- 'অস্ত্র যদি তোমাদের দরকার না হয়, তাহলে তুমি কেনো অস্ত্র রেখেছো?'

অতুল তাড়াতাড়ি বললো– 'হিস্, আস্তে। নাহ্, শেষ পর্যন্ত তুইই হয়তো বা আমাকে ডুবাবি। এসব কথা জোরে বলে? অস্ত্র কেনো রেখেছি, শুনবি? যখন আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম, তখন কতো কিছু করতে হয়েছে, তাই না? তখনকার শত্রুরা এখন আমাকে বাগে পেলে ছেড়ে দেবে? দেবে না। বুঝেছিস এবার?'

'লোকে কিন্তু নানা কথা বলে।'

'দশ লোকের দশ মুখ। সব শুনতে হয় না, এড়িয়ে যেতে হয়।'

'এসব এড়ানোর মতো কথা না। তোমরা নাকি ডাকাতিও করো। ডাকাতি করতে অস্ত্র লাগে। ইউনুস তোমার সবচাইতে কাছের বন্ধু, ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়লো। তার কাছে একটা পিস্তল পায়নি?'

'আমাদের শত্রুরা– বুঝলি, যারা সমাজতন্ত্র চায় না, ওরাই আমাদের বিরুদ্ধে এসব মিথ্যে কথা রটায়। ইউনুসের কথা বলছিস তো? ওকে তো সেই কবেই পার্টি থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।'

'লোকজন কিন্তু তা জানেনা, তোমরাও জানাওনি। এসব হলো শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। আচ্ছা অতুলদা, তোমাদের যেসব বন্ধুরা মারা গ্যাছে, ওদের কি হবে?'

'ওরা তো মারাই গ্যাছে, আবার কি হবে?'

'আমি তা বলছি না। তাদের জীবনদানটা কি হবে?'

'শোন্, রাজনীতিতে আবেগ থাকতে নেই।'

'অতুলদা, মানুষ মানেই আবেগের সঞ্চার, রোবটের আবেগ নেই।'

'তুই কি আজকাল তলে তলে পূর্ব বাংলাদের দলটল করিস?'

শিমূল কিছুটা অবাক আর কিছুটা বিরক্ত হয়ে অতুলের দিকে তাকালো।
'তার মানে?'
'এতো কথা তুই জানলি কোত্থেকে?'
'তার জন্যে পূর্ব বাংলা করতে হয়? সাত্তার ভাই,আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ ছিলেন। সেও তোমার মতো পার্টি করতেন। কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তার ভবিষ্যত মূল্যায়নটা কি হবে?'
'একটা সঠিক অবস্থান বের করতে হোলে অনেক ত্যাগের দরকার হয়। সুভাষ বসুর সেই কথাটা শুনিসনি-'গিভ মি ব্লাড, আই উইল গিভ ফ্রিডম'! তুই এক কাজ কর, মাঝে মাঝে আমাদের অফিসে আয়। তোর বয়েসী অনেকেই আসে। ওখানে যাতায়াত করলে আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবি।'
'তুমি বুঝতে পারো?'
'মানে?'

শিমুল হেসে ফেলেছিল।
'বাদ দাও। তেমাদের অফিসে আমার যাওয়া টাওয়া হবে না। মাঝে মাঝে বইটই পড়ি আর কি। ওতেও অনেক ফাঁকি আছে। ভালো বুঝিও না আমি।'

সেদিন আলোচনা আর এগোয়নি। দিলীপ এসে অতুলের কানে কানে কি যেনো বলেছিল। তাতেই অতুল তড়িঘড়ি কোরে চলে গিয়েছিল। পেছনে পেছনে সে রাস্তা পর্যন্ত চুপচাপ এসেছিল। অতুল দীলিপকে নিয়ে রিক্সায় কোরে যখন থানার দিকে রওনা দিয়েছিল, শিমুল অনেকক্ষণ সেই দিকে চেয়েছিল। ওর এতোদিনকার আদর্শের মহা নায়ক যেনো প্রতিদিন কুয়াশা থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। একটু একটু কোরে, কিন্তু পরিবর্তনটা স্পষ্ট। কথা আর কাজে, কাজ আর যুক্তিতে আগের মতো শিমুল তেমন যেনো বিশ্বাসী কোনো ভিত খুঁজে পায় না।

দিলীপকে দেখেই শিমুলের রাগ হলো। কেনো যেনো ছেলেটাকে সহ্য হয় না। বারো-তেরো বছর বয়স, অথচ কথা বলে পাকা পাকা। অতুল প্রশ্রয় দিয়ে হাসে। তাতে রাগ আরো বেড়ে যায়। কখনো অতুলের উপরে, কখনোবা দীলিপের।

শিমুলকে দেখেই দীলিপ হাসি থামিয়ে ফেলে। সে অতুলের দিকে প্রশ্রয় আশায় তাকায়। অতুল বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়েছিল। শিমুলকে দেখেই সে এবার সোজা হয়ে বসতে বসতে হাসে।
'কিরে, থাকিস কোথায়? বোস।'

খাটে দীলিপ বসা। শিমুল বসলো না। সে খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।
'তো, যাচ্ছিস কবে?'
'রোববার।'

‘কোন কলেজে এ্যাডমিশন নিবি?’

‘বড়’পা এম, এম, কলেজের কথা লিখেছিল।’

‘ভালোই। বেশ নামী কলেজ। এম, এম, মানে জানিস তো? মাইকেল মধুসূদন। তুই তো আবার কবিতা টবিতা লিখিস। বলা যায় না, একদিন হয়তো তুইও মাইকেল মধুসূদনের মতো বিশাল কবি হয়ে যেতে পারিস। তো, শুধু আবার কালি কবিতা নিয়ে পড়ে থাকিসনে যেনো। কবিতায় আর যা-ই হোক, ভাত দিতে পারে না। মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষ পরিণতিটা জানিস?’

‘জবাব না নিয়ে শিমুল মুখ না খুলে হাসলো।’

অতুল দীলিপের দিকে তাকায়।

‘যা তো বাপ, একটা সিগারেট জ্বালিয়ে আন।’

দীলিপ শিমুলের দিকে তাকায়।

‘আগুন নিয়ে আসি?’

‘আগুন নিয়ে টানাটানি ভালো না। জ্বালিয়েই আন।’

দীলিপ ট্রিপল ফাইভ সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করলো। শিমুলের দিকে না তাকিয়ে সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শিমুলের মেজাজটা খিচিয়ে গেলো এবার।

‘এসব কি, অতুল দা’?’

‘কি রে?’

‘দীলিপকে তুমি সিগারেট জ্বালাতে পাঠালে কেনো?

‘তাতে কি হয়েছে?’

‘ও সিগারেট খায়?’

‘বারে, আমি বুঝি জন্মের পর থেকেই সিগারেট খেতাম?’

‘ভাবছো, এসব কাজে লায় দিলে দু’দিন পরে সে তোমাকে সম্মান দেবে? সবার সামনে সিগারেট খাবে, না থাকলে তোমার কাছেও চাবে। তখন?’

‘ওর সম্মান চায় কে?’ অতুলের ঠোঁটে অদ্ভুত এক টুকরো হাসি ঝিলিক মেরে যায়। ‘আমি চাই ও সিগারেট খাওয়া শিখুক। চাই কি-মদও।’

শিমুল আঁৎকে ওঠে।

‘কেনো?’

‘প্যাচাল থামাতো।’

‘থামাবো কেনো? আমি শুনেছি তুমি নাকি ওকে টাকাপয়সা দিয়ে মাঝেমধ্যে সিনেমা দেখতেও পাঠাও। এটা ঠিক না অতুল দা’।’

‘তাতে তোর কি?’

‘আমার কিছু না, তবে ওর লেখাপড়ার বারোটা বাজাবাজি চলছে।’

'সবার জন্যে লেখা পড়া না। সবাই লেখা পড়া করলে রিক্সা চালাবে কে? কে মিলে কল-কারখানায় কাজ কাম করবে?'

'এ তুমি কি বলছো অতুল দা?'

সিগারেট নিয়ে দীলিপ ফিরে এলো। জ্বালানো। ওর মুখ থেকে একটু একটু ধোঁয়া বেরোতে দেখলো শিমুল। যেনো আগুনটা জ্বালিয়ে রাখার জন্যেই টান দেয়া, এমন ভাব কোরে শেষবার টান দিয়ে দীলিপ সিগারেটটা অতুলের হাতে দেয়। শিমুল এতোটা ভাবেনি। দীলিপ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। টান দেয়া আর ধোঁয়া গেলার ধরন ধারনই তার প্রমাণ। দীলিপ বসতে যাচ্ছিল। শিমুল রাগে খিঁচিয়ে ওঠে– 'যা,ভাগ! ফের তোকে সিগারেট টানতে দেখলে দাঁত ফেলে দেবো।'

দীলিপ ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো। সে আবার অতুলের দিয়ে তাকায়। অতুল তখন চোখ বন্ধ কোরে সিগারেটে টান বসিয়েছে। মুখে হাসির টান। সুস্পষ্ট সারা না পেয়ে মিনমিনে গলায় দীলিপ বললো -'অতুলদা বললো যে?'

'আবার কথা বলছিস? অতুলদা ঘরে আগুন দিতে বললে তুই তাই দিবি? ভাগ!'

তবুও অতুল চোখ খুলে তাকালো না । উপায় না দেখে দীলিপ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। শিমুলের ছোটো কিন্তু শিমুলকে মানে না, এমন ছেলে এ তল্লাটে খুব কমই আছে।

এতোক্ষণে অতুল চোখ খুললো। মুখে তার সেই হাসিটা ঝুলে আছে।

'তুমি হাসছো?'

'তুই নিজেই সাক্ষী, আমি ওর হয়ে একটা কথাও বলিনি। বলেছি, বল? তবুও একটু পরেই ও আবার আসবে, আসতে ওকে হবেই?'

'তুমি প্রশ্রয় না দিলেই পারো?'

শিমুল তখনো বুঝতে পারেনি অতুলের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনাটুকু । তবে বুঝেছিল এবং তার জন্যে ওর আরো কিছুটা সময় লেগেছিল! পরিস্থিতি তখন হাতছাড়া । দীলিপ সিগারেট থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা কোরে মদ ধরেছিল। সাথে জুয়া । তাসের। ফিস! ফিসকে কিং ফিসার এমন ভাবেই ছোবল মেরেছিল যে, দশ হাজার টাকা দরের জমি গড়ে ছয় হাজার টাকায় দীলিপের মা অতুলের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল এবং মহিলা বুদ্ধি মত্তার পরিচয় দিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়ে। ততোদিনে অতুল সফল।

অতুল শিমুলের উৎকণ্ঠা দেখে নিঃশব্দ হাসিকে সশব্দে টেনে তোলে। 'শিমুল, তোর মতো গুডবয় মার্কা বুদ্ধি দিয়ে বাহবা কুড়ানো যায়, জীবন চলে না। বুঝলি না তো? তোর বোঝার কথাও নয়।'

'মানে?' বেশ অবাক চোখে শিমুল অতুলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'সে অনেক কথা। তুই বুঝবিনে, বুঝে কাজও নেই। আই হেভ বীন প্লেইং এ ক্রাইং গেম ফর মী। ওঁহো, এখানে ক্রাইং মানে কান্না নয়, ভিন্ন কিছু।'

'দীলিপের মা তোমাকে কিছু বলে না?'

'আমি বুঝি সব জায়গায় তোর অতুলদা?'

'তোমাকে ভয়ে কিছু বলে না?'

'বাদদে তো এসব প্যাচাল। তা হোলে আগামি রোববারেই যাচ্ছিস?'

চালাকিটা মাথা না ঘামিয়েই শিমুল বুঝলো। অতুল প্রসঙ্গ পাল্টে দিয়েছে। নোংড়ামির কদর্য গন্ধটাকে ধামাচাপা দিয়ে এড়িয়ে গেলো। শিমুল অবাক বিস্ময়ে একদম 'থ'। এ কোন অতুলদা'? একে তো শিমুল চিনতো না! সে খাট থেকে নেমে একটুখানি দাঁড়ালো। মাক্সিম গোর্কীর আত্মজীবনী তিনখন্ডই অতুলের কাছে আছে। 'পৃথিবীর পথে' খন্ডটি শিমুল পড়েনি। বইটা নেয়ার জন্যেই সে এসেছিল । কিন্তু বইটা নিতে ওর এখন একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না। ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে সে শুধু বললো- 'গেলাম।'

উত্তরের কোনো আশা না কোরেই শিমুল ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ওর বুকটা কষ্টের কালো নুড়িতে গিজগিজিয়ে উঠলো। এ কোন অতুল? শিমূল একে চেনা না, একদম চেনে না।

তবে চিনেছিল। আরো পরে অনেক কজন অতুলকে শিমুল চিনেছিল। ওদের মধ্যে দুইজনকে মৃত্যুদন্ডও দেয়া হয়েছিল । শিমুল খুব সহজেই গণ-আদালতের কাছে সেই রায় আদায় কোরে নিতে পেরেছিল।

মিছিলটা আসাদ হল পার হলো। বাঁয়ে গোল পাতার লম্বা লম্বা ঘর। একেকটাতে তিনটে কোরে কামরা। গোলপাতার ছাউনি, চটার বেড়া। সাইন বোর্ডে লেখা-'রূপসী বাংলা ছাত্রাবাস।' এই ছাত্রাবাসকে পেছনে ফেলে মিছিল সাইন্স ল্যাবোরেটরীর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেলো। শহীদ মিনার চক্কর দিয়ে ক্যান্টিনের সামনে গিয়ে থামলো। ঔদ্ধত্যের তরঙ্গায়িত ঢেউ যেনো হঠাৎ থামার কারণে ছড়িয়ে গেলো এদিক ওদিক। ঘামে সবাই নেয়ে গেছে। শিমুলও। ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি ফকরুল হাসান। পাশাপাশি দুটো চেয়ার দিয়ে বানানো তাৎক্ষণিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা করতে শুরু করেছেন। বক্তব্যটা চুম্বকের মতো শিমুলকে আকর্ষণ করলো। বলার ধরনটাও চমৎকার। একমাথা ঝাঁকড়া চুল হাওয়ায় দুলছে। গোছাখানেক চুল কপালে ঘামে লেপ্টে গেছে। তিনি ঘন ঘন কপালে হাত দিচ্ছেন। শিমুল বক্তৃতা শুনতে শুনতে পকেট

থেকে রুমাল বের করলো। আশে-পাশে তাকালো। নাহ্, বাবুলটা নেই। শার্টের ফাঁক দিয়ে যতোটা পারা যায়, হাত ঢুকিয়ে শিমুল ঘাম মুছতে চেষ্টা করে। চোখ ফকরুল হাসানের মুখে।

মনযোগ দিয়ে শুনেও বক্তব্যটুকু পরিস্কারভাবে শিমুল বুঝতে পারলো না। আজ রুশ অক্টোবর দিবস। এই দিনেই মহামতি লেনিন রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। আজকের মিছিল এবং এই বক্তৃতাসভা সেই মহান 'রুশ অক্টোবর'কে স্মরণ কোরে। লেনিন! নামটার সাথে শিমুলের প্রাথমিক পরিচয় আছে। ছবিও দেখেছে বিভিন্ন বইয়ে। একজন খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামী ছিলানো পেশীর মতো তার চোখের চাহনী। গড়নটাও লোহা পেটানো কামারের মতো। হুট কোরে চোখ সরানো যায়না। তাঁর লেখা সম্পর্কে শিমুল একটু আধটু শুনেছে, তবে পড়েছে তারও কম। অবশ্য সাত্তার ভাই আর অতুলদা'র কাছ থেকে যেসব বই নিয়ে সে পড়তো, তাতে এর কথা এখানে সেখানে থাকতো। কিছুদিন আগে বাবুল একটা বই দিয়েছিল। লেনিনের লেখা। নারোদবাদী অর্থনীতি।' খুব কঠিন লাগে, শিমুল তেমন একটা বুঝতেও পারে না। আজ হঠাৎ কোরেই সে এখন বইটা শেষ করার তাগিদ অনুভব করলো।

মিছিল হয়না, কলেজে এমন দিন মেলে না বললেই চলে। তবে, শিমুল ওসবের তেমন কোনো ধার ধারে না। আজকের মিছিলেও ওর আসার কোনো কথা ছিল না। বাবুলের পীড়াপীড়ির কারণেই শেষ পর্যন্ত সে রাজি না হয়ে পারেনি। খুব লজ্জা হচ্ছিল ওর। মাত্র দিন পনেরো কি সতেরো আগে এমনই এক ফাঁপরে পড়ে শিমুল খোকনের সাথে আরো একবার মিছিলে গিয়েছিল। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-এর মিছিল। আর কি আশ্চর্য, এতো বছর পরে, একদম আচম্বিতে স্মৃতির জীর্ন-শীর্ণ ঝালর ঠেলে ধীরেণ স্যার উঠে এসেছিলেন– 'জয় বাংল',' জয় বঙ্গবন্ধু'; 'আমরা সবাই মুজিব হবো, মুজিব হত্যার বদলা নেবো'- ওই 'বদলা নেবো' বলার সাথে সাথেই ধীরেণ স্যারের বেদনার্ত গোংড়ানী আর রক্ষী বাহিনীর পৈশাচিক বুট আর রাইফেলের বাট ধেয়ে এসেছিল শিমুলের চেতনার পরতে পরতে। ধীরেণ স্যারের গোংড়ানী বিশাল একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে ওর মনের চোখের পুরো পৃথিবীকে ঢেকে ফেলেছিল। মিছিলের পুরো সময়টায়ই শিমুল ছিলো কিন্তু খোকনের সাথে সে আর আর গলা মেলাতে পারেনি। কেমনতরো একটা স্ববিরোধী ধিক্কার ধাক্কা দিচ্ছিল ওকে। ধাক্কাটা ভেতরের। মিছিল শেষে জেলা কমিটির সভাপতি দিপু সুলতানের সাথে খোকন শিমুলকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। খোকন ততোদিনেই সংগঠনের একজন সংগঠক ধাচের গুরুত্বপূর্ণ কর্মী। দিপু সুলতানকে শিমুলে বেশ ভালোই লেগেছিল। অমায়িক ব্যবহার। এতো বড় লিডার, অথচ শিমুলের সাথে হ্যান্ডসেক করেছে, হেসে কথা বলছে। অবশ্য 'তুমি' কোরে বলাটা শিমুল মন থেকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি।

খোকনের সাথে আর কোনোদিন শিমুল মিছিলে যায়নি। যায়নি মিছিল টিছিল খুব একটা ওকে টানে না বোলেই। ভালো লাগে না। অবশ্য মাঝখানে সে খোকনের সাথে আরো একবার ওদের মিটিংয়ে গিয়েছিল। এইতো সেদিন দিপু সুলতান শিমুলকে দেখেই মোটর সাইকেল থামিয়ে ফেলেছিল। অনুযোগের সুরে জিজ্ঞেস করেছিল– 'গতকাল এতোবড় প্রোগ্রাম ছিলো, কই, তোমাকে যে দেখিনি? এসেছিলে? সে যাকগে, শোনো, আগামী মঙ্গলবার আমাদের

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। প্রোগ্রাম আছে। অবশ্যই অসবে, ভুলে যেওনা কিন্তু!' সেই মুহূর্তে কেনো যেনো শিমুলের মনে হয়েছিল-'স হয়তো সুলতান ভাইদের মিছিলে মিটিংয়ে না গিয়ে ভুলই করেছে। অবশ্য ভাবনাটা ছিলো সাময়িক। সে লজ্জা মাখানো হাসি হেসে মাথা নেড়েছিল। মাথা নাড়ানোর অর্থটা যে কি ছিলো, শিমুল নিজেই তা জানতো না।

ফকরুল হাসানের বক্তৃতা শেষ হ'তেই মঞ্চে আরো একজন উঠে এলো। বদরুল আলম। শিমুলের ক্লাশমেট। শিমুল রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ক্যান্টিনে গিয়ে ঢুকলো। ক্যান্টিনেও বাবুল নেই। সে আয়েশ কোরে চা খেলো। পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করলো। ঘামে সিগারেটটার এখানে সেখানে ভিজে গেছে। আশে পাশে তাকালো। আগুন নেই। উঠে দাড়ালো। ক্যান্টিন লাগোয়া পান-সিগারেটের দোকান। নারকেল ছোবার পাকানো দড়িতে আগুন ঝুলছে। শিমুল সিগারেট জ্বেলে বুক ভরে ধোয়া টানে। তৃপ্তির সাথে সাইকেল স্ট্যান্ডে এগিয়ে যায়। মেয়েলী কণ্ঠ। শিমুলঘাড় ঘুড়িয়ে তাকায়। তেমন কাউকে সে দেখতে পেলো না। ওকে দেখে কেয়ার-টেকার শহীদ মিনারের ওদিক তেকে দৌড়ে এলো। শিমুল টোকেন বের কোরে কেয়ার টেকারের হাতে দেয়। সে সাইকেলটা ঠেলে শহীদ মিনারের দিকে এগিয়ে চলে। এবং শহীদ মিনারের হাত পনেরো উত্তর-পশ্চিম কোনায় কৃষ্ণচূড়া গাছের তলে দাঁড়িয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। অন্য একটা মিছিল। ব্যানারে লেনিন ও স্টালিনের বিশালাকৃতির দুটি পোস্টার। নিচে লেখা-'জাতীয় ছাত্রদল।' শিমুলকে পাশ কাটিয়ে মিছিলটি কলেজ চত্বরে ঢোকে।

গেট পেরিয়ে এলো শিমুল। ঘড়ির দিকে তাকালো। আরো দেরি করার কোনো মানে হয় না। রাগও হচ্ছে তলে তলে। সে সাইকেলে উঠলো এবং তখনই বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এলো বাবুল। দৌড়ে আসার ঢংয়ে এগিয়ে এসে সাইকেলটা সে সামনে থেকে ধোরে ফেললো। হাত বাড়িয়ে শিমুলের হাত থেকে প্রায় ফুরিয়ে যাওয়া সিগারেটটা নিয়ে জোরসে দম দিলো সিগারেটে। তারপর সে সূর্যের দিকে একবার তাকালো। আলোয় ওর চোখ কুঁচকে ওঠে।

'চল।' বাবুল সামনে পা বাড়াতে বাড়াতে বললো।

'সর, আমি বাসায় যাবো।'

'জরুরী কাজ আছে নাকি?'

'তোর সাথেও আমার কোনো জরুরী কাজ নেই। আছে?'

'বাব্বা, চটে আছিস যে?'

'তবে কি ভেবেছিলি, মধু সুইটস-এর দই নিয়ে তোর জন্যে বোসে আছি? ফ্রিজড্ কার্ড!'

'চটার হেতু?' বাবুলের মুখে ওর স্বভাবসুলভ হাসি লেগেই থাকে।

'পারিস বটে তুই। এ জিনিয়াস শেইমলেস বাট পসিবল্ড লিডার। আমার এইসব মিছিল-টিছিলে খুব একটা ভালো লাগছে না। তুই তা ভালোই জানিস। তবুও আজ এলাম কেনো? তোর তেলানিতে, জ্বী স্যার, শুধুমাত্র তোর তেলানিতে। অথচ মিছিল শেষে একবার খোঁজও নিলিনে! কাজ ফুরালে পাজি, তাই না?

'আরে না।'

'জ্বি হ্যাঁ, তাই।'

'আরে বাবা, আমার কথাটা একটু শোনই।'

'থাক থাক, তোকে আর গাঁজাখোরি ভ্যানতারা করতে হবে না।'

শিমুলের সাইকেল বাবুলের হাতে হাতছাড়া হয়ে যায়। বাবুল সাইকেল ঠেলছে, শিমুল পেছনে। গেট পেরিয়ে আবার ওরা কলেজ চত্বরে ফিরে এলো। শিমুল বিরক্ত। চোখে-মুখে তাকালেই বোঝা যায়। বেশ খানিকটা ভেতরে এসে বাবুল বললো- 'জাতীয় ছাত্র দলের মিছিল গেলো। নিশ্চয় খেয়াল করেছিস? ওরা কোনো ঝামেলা-ফ্যাসাদ বাঁধাবে কি-না, সেই খোঁজ নিতেই এক জায়গায় গেছিলাম। গল্প নয়, হানড্রেড পারসেন্ট সত্যি।'

শিমুলের ভেতরে প্রশ্নটা তিল তিল হয়ে জমছিল, এবার ফাঁক পেতেই তা' বের কোরে বসলো- 'একটা জিনিস আমায় বুঝিয়ে বলতো বাবুল?'

বাবুল প্রশ্নবোধক চোখে তাকায়। চোখ দু'টোয় কৌতুহল নেচে ওঠে।

'কেমন যেনো দুর্বোধ্য আর নুইসেন্সী মনে হয় আমার, মাথামুণ্ড বুঝিনে। তোরাও অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী পালন করছিস, আবার জাতীয় ছাত্র দলও তাই করছে। তোদের তাত্বিক গুরু যারা, ওদের বেলায়ও তারা। তোরা নয়া গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র শেষে সাম্যবাদ চাস, ওরাও হুবহু একই জিনিস আশা করে। তাহলে তোরা এক না হয়ে আলাদা কেনো? একতো নোসই বরং সম্পর্কটা যেনো দা-কুমড়ো, নোটিশ ছাড়া সংঘর্ষে নেমে পড়িস। কেনো?

'এ বিষয়টা বুঝিসনে? এটা আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের পুরানা হোলেও খুবই কার্যকরী একটা খেলা, রাজনৈতিক কৌশল। ধর, আমরা বিশজন ছাত্র আছি। সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, শুধুমাত্র এই মৌলিক পার্থক্যকে ভিত কোরে যদি দল হতো, তাহলে থাকতো মোটে দু'টো দল। অর্থাৎ বিশজন ছাত্র দুইভাগে বিভক্ত হতো মাত্র। তাতে কোনোদিক থেকে সাম্রাজ্যবাদ পেরে উঠতে পারতো না। শ্রেণীগতভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা বরাবরই সংখ্যা লঘিষ্ঠ। তাহোলে? এখানেই হলো কুট-কৌশল, ডিভাইড এন্ড রোল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি যেনো এক হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে না পারে, তার জন্যে ওরা কৌশলে দেশপ্রেমিক, সমাজতন্ত্রের ছদ্মবেশে সংগঠন দাঁড় করায়, নিজেদের বিরোধী শক্তিতে ফাটল ধরায়। টাকার তো আর অভাব নেই ওদের । অনেক ঝানু ঝানু মাথাকে চড়াদামে কিনে নেয়। লেনিন চমৎকারভাবে বিষয়টাকে একটা বাক্যে প্রকাশ করেছিলেন-" A red flag oppose a red flag! বুঝেছিস?' "

'শুধু এই?'

'এটা অন্যতম একটা কারণ। আরো আছে। ধর, তোর-আমার লক্ষ্য ঝিনেদা যাওয়া। যাওয়ার ইচ্ছো ধরা যাক আন্তরিকই। কিন্তু আমরা পথ খুঁজছি আলাদা আলাদাভাবে, যে যার মতো! অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা থেকেই আমাদের এইসব ধারার জন্ম। নেতৃত্বের লোভেও এমন হয়। আরো কথা থাকে– আমরা ঝিনেদার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। কিন্তু যাবো কি কোরে? এই পথটুকু চলার সময় আমাদের বিভিন্ন বাঁক পেরোতে হবেই। ওসব বাঁকে আমাদের রণকৌশলই বা কেমন হবে? কেবলমাত্র আন্তরিকতা দিয়েই সমাজ পাল্টানো যায় না, দরকার সঠিক দিক নির্দেশনা।'

'সেটা নিশ্চয় মার্কসবাদ?'

'অবশ্যই। তোর কি কোনো ভিন্নমত আছে?'

'মার্কসবাদ আমি তেমন একটা বুঝিনে। ভিন্নমত হবে কি হবে না, কি কোরে বলি?'

'এটা ঠিক না শিমুল। স্বীকার করছিস বুঝিস না, এটা ভালো। কিন্তু সত্যিকারের ভালোটা হলো– বুঝে নেয়া।'

'চেষ্টা করছি একটু আধটু। খুব কঠিন লাগে।'

'যেখানে যেখানে কঠিন লাগে, দাগিয়ে রাখিস। আসলে কি জানিস, আমিও ভালো একটা বুঝি না, তবে বুঝি। পড়তে হবে, বুঝলি? দেখবি, একসময় সব ঠিকঠাক বুঝে ফেলছিস। তখন খুব ভালো লাগবে আর যেসব প্রশ্নগুলো আমায় করেছিস তারও ঠিকঠিক উত্তর পেয়ে যাবি।'

'আরেকটা কথা বাবুল; তুই বললি, সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের স্বার্থে স্বাচ্ছা রেড ফ্যাগকে অপোজ করার জন্যে মেকি রেড ফ্যাগের ছদ্মবেশ নেয়। তোরা বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী আর জাতীয় ছাত্র দল– নিজেরা একে অন্যকে মেকি বোলে, সংশোধনবাদী বোলে গালি দিস। আমার কথাই ধর, আমি না মৈত্রী, না ছাত্রদল। তোরা কে যে আসল, আর কে নকল, আমি বুঝবো কি কোরে?

'প্রশ্নটা খুবই মৌলিক এবং জটিল। একমাত্র মার্কসবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান ছাড়া প্রশ্নটার সঠিক উত্তর দেওয়া যাবে না। তাছাড়া, বাস্তব জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত না হোলেও উত্তরটা দেওয়া যেমন কঠিন হয়, বোঝাটাও তেমন কঠিন। আমি যে খুব একটা ভালো বুঝি, তা নয়; তবে বোঝার চেষ্টা করি। তোকে শুধু এটুকু বলতে পারি, সূত্রের সাথে প্রয়োগের সম্পর্ক যতো বেশি অভিন্ন হবে, সঠিকতাও ততোটুকু।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা ছাত্রাবাসের সামনে এসে পড়ে। বাঁ পাশে, হাত বিশেক উত্তর-পশ্চিমে আসাদ হল। ডাইনে সরাসরি হাত দশেক পূবে 'রূপসী বাংলা' ছাত্রাবাস। 'রূপসী বাংলা' ছাত্রাবাসের অধিকাংশ ছাত্রই প্রথম বর্ষের। অন্য যায়গা থেকে যারা কলেজে এসে ভর্তি হয় অথচ আসেপাশে থাকার কোনো স্বজন নেই ওরাই প্রথম ধাক্কাটা 'রূপসী বাংলা'য় আশ্রয় নিয়ে কাটিয়ে ওঠে। প্রথমবর্ষেই আসাদ হলে চান্স পাওয়াটা রীতিমতো সাধনার বিষয়। হয় স্যারদের পা ধরো, নয়তো দল করো। তা-ও যেই সেই দল করলে চলবে কেনো? সংসদে যার দাপট আছে, তার দাপট সর্বত্র। হলটাতো আর কলেজের বাইরে নয়! বাবুলের আবাস 'রূপসী বাংলা' ছাত্রাবাস। সংগঠনের নির্দেশে। ওর সাথে শিমুল কামরায় ঢুকলো। বাবুলের রুমমেট শাওন। বিছানায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ কোরে আছে। হাতে সিগারেট, কোছড়ে বই। সামনে, টেবিলের কোনায় ফুলদানী। একগোছা টাটকা রজনীগন্ধা। খুব সুন্দর হয়ে সেজেগুজে ফুলগুলো ফুটে আছে। বুক সেলফ-এর ফুটখানেক উপরে স্মিতা পাতিলের হাস্যোজ্জ্বল পোস্টার। পোস্টারের সাথে নিচে আর্ট পেপারে হাতে লেখা পঙ্ক্তিকা গেঁথে দেয়া।

শাওন। এরই মাঝে কবি হিসেবে কিছুটা পরিচিতি পেয়েছে। এক বছরের সিনিয়র হয়েও বাবুল আর শিমুলের বন্ধু। বাবুলের বন্ধু, কারণ– শাওন ছাত্র মৈত্রী করে। শিমুলের বন্ধু, কারণ

শিমুলও কবিতা লেখে এবং দুইজনই 'চেতনা' সাহিত্য বাসর'এর সদস্য। লোকটার অনেক ভালো গুণের সাথে কিছু বদদোষ লেপ্টে আছে। ভরাট গলায় গণসংগীত ধরলে পাথর-প্রাণ ব্যস্ত মানুষও থমকে থেমে দাঁড়ায়, ক্ষণিকের জন্যে হোলেও মুগ্ধ চোখে তাকায়। অথচ গাঁজা না খেলে ওর গলা খোলে না, কলম চলে না। কাপড়-চোপড় দামী, অথচ প্রায়ই অপরিস্কার আর দুমড়ানো থাকে। সে এখন বাবুলের বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে। শিমুলদের দেখে সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' বইটি হাতে তুলে নিয়ে হাসলো। ওর মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া এবং এলোমেলো। মাথার কিছুটা উপরে কার্ল মার্কস-এর বিশাল একটা পোস্টার। হাতে আঁকা। সেলফ-এর উপরে আরো দু'টো পোস্টার। সাঁটানো। একজন লেনিন, অন্যজন মাও সেতুঙ।

শাওন হয়তো এতোক্ষণ মনে মনে কবিতাই পড়ছিল। ভীষণ রকমের ভালো আবৃতি করে। সে আধশোয়া থেকে এবার পুরোপুরি শুয়ে পড়ে ভীষণ রকমের একটা হাই তুললো।

বাবুল গা থেকে ঘামে ভেজা শার্ট খুললো। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের কোরে চেন টানলো। শিমুল দেখলো, অনেকগুলো পাঁচশো টাকার নোট। আটদশটা হবে। ভীষণ ফুলে আছে।

শিমুল শাওনের মাথার কাছে চেয়ার টেনে বসলো। দরোজার পাশে রবীন্দ্রনাথ আর সুকান্ত, ছবিতে পাশাপাশি। নিচে ফিউজ বাল্ব থেকে ছোট একটা মানিপ্লান্ট লতিয়ে উঠেছে। কেমন যেনো ভয় ভয় একটা ভাব লতাটার সারা গায়ে। ছবি দুটোকে ছুঁই ছুঁই কোরেও না ছুঁয়ে থমকে আছে। শাওনের টেবিলে গোল্ড ফ্ল্যাক সিগারেটের প্যাকেট। শিমুল প্যাকেট খুললো।এখনো সাতটা আছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে শাওনকে বললো– 'একটা কবিতা শোনা, দোস্ত!'

এক ধাক্কায় নিজেকে উঠিয়ে বসালো শাওন। হঠাৎ কোরেই। যেনো এইমাত্র মনে পড়েছে, চোখে মুখে এমন একটা ভাব। 'দোস্ত, লাস্ট নাইট-এ যা একটা তোফা স্বপ্ন দেখেছি না! তাজ্জব ব্যাপার। কবিতা থাক, এখন না হয় স্বপ্নটাই বলি, শোন।'

বাবুল ফোড়ন কাটে– 'শ্রীচরণের ধূলো দাও বাবা, তবুও থামাও তোমার গাঁজায় বোনা নেশার স্বপ্ন। গুরু,শোয়ার আগে কয় কল্‌কে হয়েছিল?'

শিমুল বাবুলের কথায় তাল দেয়– 'স্বপ্ন ইজ স্বপ্ন! তুই দোস্ত কবিতাই শোনা। সুকান্ত।'

শাওনের উৎসাহে একফোটাও ভাবান্তর হলো না। হাসিটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখেই বললো– 'কয় কলকে নয়, কাল রাদে মোটেই টানিনি। টানলে কি আর এমন তোফা স্বপ্নটা মিলতো! স্বপ্ন ইজ স্বপ্ন, না? ওকে, বাজি ধরা যাক।' বাবুর ও শিমুল কৌতুহলে ওর দিকে তাকায়।

'স্বপ্নটা তোদের ভালো লাগবে। ভালো না লাগলে আমি সবাইকে নাস্তা খাওয়াবো। কিন্তু ভালো লাগলে কি হবে? ওঁহো, ভালো লাগলে ঠিকই আমি বুঝতে পারবো, ফাঁকি দেয়া যাবে না।'

শিমুল শাওনের মনের আকুলি বিকুলিটুকু ধোরে ফেলে। শাওনের প্রস্তাবে সে সাথে সাথে বললো– 'ভালো লাগলেও তুই-ই খাওয়াবি। কারণ– আমাদের ভালো লাগলে তুই খুশি হবি. অহংবোধে নিজের ভেতরে একচোট গড়াগড়ি যেতে পারবি।' জবাবে সিগারেট জ্বাললো শাওন।

'বুঝলি, ঘুম আসছিল না। রয়ে-সয়ে দু' দুটো সিগারেট সাবাড় করলাম। হেগে মুতে এসে হাত বাড়ালাম কলমের জন্যে, কিন্তু উঠে এলো গুরুর 'সোনার তরী।' কি আর করা, গুরুর 'সোনার তরী' পড়তে পড়তেই আমি কখন যেনো ঘুমিয়ে পড়ি এবং স্বপ্নটা দেখে ফেলি।

নদীটা মাঝারী। বেশ স্রোত আছে। দুই পাশেই ফসলী মাঠ। মাঠে সোনালী ধানের খিলখিল হাসি। আমি টগবগে একটা ঘোড়া নিয়ে ছুটছি। ধবধবে সাদা ঘোড়াটার গলায় হলুদ রংয়ের মালা। মালাটা আবার কাপড়ের। ঘোড়াটা আমি জীবনানন্দের কাছ থেকে কোনো এক ফাঁকে ধার নিয়েছি। আচম্বিতে আমার ঘোড়া থেমে গেলো। সাথে সাথে থেমে গেলো সোনার ধানের হাসি। আমি হতভম্ব। চেয়ে দেখলাম, হাজার হাজার মানুষের ঢল আর ঢল। ওদের হাতে কাস্তে। কিন্তু একমুঠো ধানও কেউ কাটতে পারছে না। সবাই হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। গলা গড়গড় করছে রাগে। অযুত নিযুত গলার সম্মিলিত গড় গড় শব্দ! ওহ্, যদি শুনতি! ভয় পেয়ে আমার ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠলো। তারপরই নদীর পাড় ঘেঁষে দে দৌড়। কতোক্ষণ যে ঘোড়াটা ওভাবে ছুটছিল, সঠিক বলতে পারবো না। আমিও হয়তো ভয় পেয়েছিলাম। একসময় আপনা থেকেই ঘোড়াটা থেমে গেলো। যা তা কথা নাকি, স্বয়ং জীবনানন্দ বাবুর আদুরে ঘোড়া! আমি চোখ মেলে তাকালাম। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে একশো-শোয়াশো হাত দূর হবে, একটা তরী বাঁধা। তরীটা বিশাল। মাঝি-মল্লারা ততোক্ষণে পাল খাটিয়ে তৈরি। আমি তো 'থ'। স্বয়ং কবিগুরু! তিনি ছড়ি ঘুরাতে ঘুরাতে তরীতে উঠে বসলেন। সাথে ডজন খানেক চাকর-বাকর। আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। টুক কোরে নেমে পড়লাম ঘোড়া থেকে। খুব সাবধানে চাকরগুলোর দলে ভিড়ে গেলাম। তরী পাড় ছাড়লো। বাতাস লেগেছে পালে। সাঁ সাঁ কোরে তরী ছুটছে। বড় তরীটার গা ঘেঁষে আরো একটা তরী। অপোক্ষাকৃত ছোট। আত্মগোপন করার জন্যে আমি টুপ কোরে ওই তরীটায় গিয়ে ঘুপটি মারলাম। আর তাতেই আমি আসল বর পেলাম। কবিগুরু উদাস চোখে শুন্য নীলিমায় তাকিয়ে।'

কালু। বয়স শিমুলদের মতোই হোটেল বয়। কুটকুচে কালো শরীর। শাওন কালি বোলে ডাকে। সে চা-সিঙ্গারা নিয়ে এলো। গল্প থেমে গেলো। শাওনের চোখে এখন সত্যি সত্যি মায়াবী স্বপ্নময়তা খেলা করছিল। স্বপ্নময়তা ভেঙ্গে যাওয়ায় ও কষ্ট পেলো। তবে চা-সিঙ্গারা খেতে পিছ পড়লো না। কা-কা ডাক তুলে তিনটে কাঁক উড়ে এসে বারান্দায় বসলো, গলা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখলো। শেষে পড়ে থাকা ভাঙ্গা একটা চিরুণী ঠোঁটে নিয়ে একটা কাক উড়ে যেতেই বাকি দুটো ডাক ছেড়ে উড়াল দিলো। শিমুল হাতের কব্জি ঘুরালো। বারোটা বেজে তিন।

শাওন পকেট থেকে সিগারেট বের করলো। বেনসন। এই ওর একটা বদভ্যাস। বেশ দামি সিগারেট খায় কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট একটা ব্যান্ড নেই। একেক সময় একেক ব্যান্ড। সিগারেট

নিয়ে প্যাকেটটা টেবিলে ছুঁড়ে দিলো। শিমুল সিগারেট নিলো। আগুন জ্বেলে তৃপ্তির একটা টান দিয়ে আয়েস কোরে চেয়ারে হেলান দিলো। তারপর শাওনকে বললো- 'নে. গাঁজার নৌকাটা আবার বাইতে শুরু কর দোস্ত।'

আয়েশ কোরে সিগারেট টানছে শাওন। চোখ বন্ধ ছিলো। এবার তাকালো।

'হঠাৎ আমার হৃদপিন্ড লাফিয়ে উঠলো। কবিগুরু তাঁর আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে কেউ নেই। তিনি একদম একা। হেঁটে এলেন। কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব। শেষ পর্যন্ত তিনি বড় তরীটি থেকে ছোট তরীতে উঠে এলেন আমি যেটায় লুকিয়ে ছিলাম। সাথে সাথে ছোট্ট তরীতে অদ্ভুত একটা আলোড়ন উঠলো। ভ্রমরের ডাকের মতো মৃদু একটা গুঞ্জন। প্রচণ্ড গতিতে তরীটা এগিয়ে গেলো এবং একসময় শূন্যে ভেসে উঠলো। মুহূর্তে গতি বেড়ে গেলো লক্ষগুণ। তরীটা শূন্যতা ভেদ কোরে মহাকাশে ছুটে চলেছে। আমি থরথরিয়ে কাঁপছি। মাইরী দোস্ত, হঠাৎ আমার ঝুমুর কতা মনে পড়ে গেছিলো। ওকে বুঝি হারালাম। কষ্টে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছিল। আর তখনই তরীটা থেমে গেলো। কবিগুরু অচঞ্চলচিত্তে তরী থেকে নেমে গেলেন। আমি উঁকি মারলাম। আর- আমার চোখতো একদম ছানাবড়া! পাশাপাশি দুটো সাইনবোর্ড। দুই এ্যাঙ্গেলে। সাইনবোর্ড দুটো ইংরেজীতে লেখা। বাঁ দিকেরটায় লেখা– ইডেন গর্ডেন; সামনেরটায়– হেভেন। কবিগুরু হেভেনের পথ ধোরে পা বাড়িয়েছেন। আমি তরী থেকে নেমে এলাম। কোথাও কেউ নেই।

রূপালী জ্যোস্নার মতো স্বর্গীয় নৈ:শব্দে আমার মন জুড়িয়ে গেলো। নীল সবুজের মাঝামাঝি রঙয়ের নরম আলো ঝরছে রোদের জায়গায়। আমার মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক ফিনিক্স পাখি উড়ে গেলো। পাখির ডানায় ডানায় অনেকটুকু আলো ঢাকা পড়াতে কেমন স্বপ্নচ্ছন্ন এক ঘোরে আমি ক্ষণিকের জন্যে ডুবে গেলাম। যখন ঘোর কাটলো, আমি তখন শ্বেত শুভ্র বিশাল এক প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে। প্রাসাদটার ফটকে বিদ্যাসাগরীয় হরফে লেখা– 'স্বর্গ'। আমি উন্মুক্ত ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

ছবিতে লর্ড হেস্টিংসকে ভাগ্যিস দেখা ছিল। ওই ধরনেরই এক ব্যক্তি সিংহাসন জাতীয় একটা চেয়ারে বোসে কয়েকজন সখা সখিকে নিয়ে কি যেনো পান করছেন। তাঁর ডান পাশে যীশু, মোহাম্মদ, গৌতম বুদ্ধ ; ওদের সাথে রয়েছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডস ওয়র্থ, বোদলেয়ার। আমার চোখ তো কপালে। বাইরে হঠাৎ কোরে হৃদয় কাড়া সুমধুর বাঁশির শব্দে আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আমার চোখ তো ছানাবড়া! দেখি, জীবনানন্দ দাস মাথায় গামছা বেঁধে একা একা ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছেন। হাতে তাঁর নকশীকাঁথার মতো কিছু একটা ঝুলছে। তার কাঁধ গলিয়ে আমি তাকিয়ে দেখি– কৃষ্ণ। হাতে তার বাঁশের বাঁশি। তিনি গভীর মনযোগ দিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন এবং স্বয়ং রোমের সম্রাট নীরো তাঁর কাঁধে হাত রেখে হাঁটছেন। ভেতরে হাসির শব্দ হওয়াতে আমি আবার ভেতরে তাকালাম। যিনি সিংহাসনে বোসে আছেন, তিনি হাই তুলে বাঁ দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে চোখ পড়াতে চেঙ্গিস খাঁ

হাসলেন। ওনার সাথে কি নিয়ে যেনো শলা-পরামর্শ করছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, আলেকজান্ডার আর হিটলার। সবাই টকটকে লাল রঙয়ের দামি সোফায় বোসে আছেন। রাণী এলিজাবেথ সবুজ রঙয়ের দামি পানীয় নিয়ে এলেন। দেখলাম, রাণীকে দেখামাত্রই সিংহাসনে বসা ব্যক্তির মুখের বিষন্নতা মুহূর্তে উবে গেলো। তিনি নড়ে বসলেন এবং মধুরভাবে হাসলেন।

আমি চাপা গুঞ্জন শুনছিলাম, কিন্তু আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কৌতুহল হলো। উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখি, সামনের একটু নিচুমতো ফ্লোরে অনেক লোক। মেঝেতে বসা। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে। বেঞ্জামিন মালয়েসী আর মাক্সিম গোর্কী যাদের সাথে কথা বলছিলেন। প্রথম ধাক্কায় আমি চিনে উঠতে পারিনি। একজনের কাঁচা দাড়িগুলোও পেকে গেছে, একজনের টাক আরো খানিক বেড়ে গেছে, আরেকজনের মাথার চুল যা-ও ছিলো, তাতে পাক ধরেছে। কার্ল মার্কস, লেনিন ও মাও সেতুঙ। সবার চোখে উদ্বেগ। ওরা বোসে থাকা বিশাল জনতার দিকে তাকালেন। ঠিক স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে ওঠলেন শবমেহের আর নুরজাহান। তখনো ওদের গায়ে রক্তের দাগ। সম্মিলিত গলার একটা কম্পন বের হলো বিশাল জলপ্রপাতের মতো– 'বিচার চাই।'

ক্ষোভের সাথেই আমি আবার সিংহাসনের দিকে তাকালাম। এতোক্ষণে সাইনবোর্ডটা চোখে পড়লো। তাতে লেখা– 'এখানে সবাই সত এবং সমান।' আরো বেশি আশ্চর্য হবার কথা থাকলেও আমি আর তা' হইনি। স্বয়ং আমাদের মুজিবর রহমান নাদুস নুদুস মোনায়েম খান-এর সাথে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। ইয়াহিয়া খান তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বিগলিত চিত্তে দুজনের সাথে করমর্দন করলেন। কি নিয়ে যেনো সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ওরা বিশ্রীভাবে হেসে ওঠলেন। আর সহ্য হয়নি আমার। এখানে সবাই সৎ এবং সমান। সাইনবোর্ডটা বারবার চোখে পড়ছে। কি করি আমি, আমি তখন কি করি? পায়ের স্যান্ডেলই হাতের কাছে পেলাম। এক ঝটকায় ডান পায়েরটা খুলে নিলাম। মনের সবটুকু ঘৃনা আমার চোখে জ্বলজ্বল করছে। হাতে স্যান্ডেল। আমি রাগে থুতু ফেললাম। ছুঁড়ে মারার জন্যে হাতটা ঝটকা মেরে তুলতে গেলাম। আর তখনই আমার চূড়ান্ত বিস্ময়। বুকের বাম পাশে বেহেস্তের মনোগ্রাম। নিচে সাদা বর্ণে লেখা– 'গার্ড'। ডান পাশে একটা ব্যাজ। ব্যাজের নিচে নেমপ্লেট। ইবলিশ! আমি কঁকিয়ে ওঠলাম। ভয়ে নয়, ব্যথায়। ইবলিশ এখানকার অতন্দ্র প্রহরী! সে আমার উদ্ধত হাত জোরে মুচড়ে দিলো। আমার নির্জিব হাত থেকে স্যান্ডের পড়ে যায়। তাকালাম মার্কস-এর দিকে। সবটুকু জোর জড়ো কোরে প্রবল জোরে হেঁচকা টান দিলাম এবং দু:খের সাথে তোদেরকে জানাচ্ছি– ঠিক তখনই আমার ঘুম ভেংগে যায়। বাইরে তখন আজানের ধ্বনি।

শাওন তন্ময়াচ্ছন্ন। ওভাবেই হাত বাড়ালো। ওর বাড়ানো হাতে সিগারেটের প্যাকেটের বদলে সিংগারার এক টুকরো আলু গুঁজে দিয়ে হেসে উঠলো। কিন্তু হাসিটা বিকশিত হলো না। তিন-চার জন ছেলে বারান্দা দিয়ে দৌড়ে গেলো। বাবুল রুম থেকে বেরিয়ে পড়ে। শিমুলও। সবাই রাস্তা পেরিয়ে আসাদ হলে গিয়ে ঢুকছে। বাবুল ততোক্ষণে রাস্তায় চলে গেছে। শিমুল না দৌড়ে একটু দ্রুত হাঁটতে লাগলো। হলে হৈ চৈ।

ছেলেটার ফর্সা রং চোখ টানে। কেমন সোনালী শুভ্র! সে দুই হাটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে বোসে আছে। ডাইনিং হল। মেঝেতে ফোটায় ফোটায় রক্ত। ছেলেটার নাকের পাশে রক্ত জমে গেছে। মাথায় জামের মতো কুচকুচে চুল। লম্বা এবং এলোমেলো। ফ্যানের বাতাসে উড়ছে। ব্রহ্মতালুর ঠিক উপরে একগোছা চুল নেই, খাবলা মেরে কাটা। শার্টের ডান পাশের কলার ছিঁড়ে ঝুলে আছে। ডান পায়ে একটামাত্র চামড়ার স্যান্ডেল, বাঁ পা খালি। বিশ পঁচিশজন ছেলে ইতোমধ্যে জড়ো হয়ে গেছে। শিমুল বাবুলকে একবার খুঁজলো, তবে পেলো না।

হল সংসদের সভাপতি মনিরুল আলম। তিনি ছাত্র মৈত্রীর কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক। শিমুলের হাত তিনের ডান দিয়ে, অনেকটা ঠেলেঠুলে জায়গা বানিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। পাশে বাবুল। প্রচন্ড হৈ হুল্লোড় হুট কোরে অনেকটা কমে এলো, পুরোপুরি থামলো না। সবার ভেতরে উত্তেজনা টগবগিয়ে ফুটছে। মনিরুল আলম অনেকটা বক্তৃতার ঢংয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে বসতে বললেন।

চারপাশে ডাইনিং টেবিল সাজানো। ছেলেরা পেছনের চেয়ার উচিঁয়ে সামনে আনলো। প্রতিটি চেয়ারে শেয়ার কোরে অনেকে বসে গেলো। কেউ কেউ দাঁড়িয়েই থাকলো। আহত ছাত্রটির চারপাশে চতুর্ভূজ আকারের একটা বেষ্ঠনী। ছেলেটি আগের মতোই চুপচাপ বোসে আছে। শিমুল সামান্য ডানে সরে জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

বেষ্ঠনীর ভেতরে মনিরুল আলমও। চেয়ারে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ ঘুরিয়ে বেষ্ঠনীর সব ছাত্রকে মনযোগ দিয়ে দেখলেন। এক ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি করা। এতোক্ষণ পরে ফ্যানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনি হঠাৎ কোরে স্পষ্ট আদেশের সুরে বললেন- 'জাহিদ, মোহাম্মদ আলী, রফিক, আযম– তোমরা মাঝখানে আসো।'

চেয়ার ছেড়ে চারজন ছেলে উঠে দাঁড়ালো। ওদের চোখে মুখে রাগের ফসফসানি স্পষ্ট হয়ে লেগেই আছে। কোনো অনুতাপ নেই। ধীরে ধীরে তবে দৃঢ়ভাবে, বলা ভালো– জেদের তাড়নায় মনিরুল আলমের বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। একজন চোখ উঁচিয়ে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে ঘাড়ের লম্বাচুলে হাত দিয়ে ব্রাশ করলো।

'জাহিদ, কি থেকে কি হয়েছে, সত্য সত্য বলো তো?'

চেহারায় গোবেচারা ধাঁচ থাকলে কি হবে, গলার সুরে রুক্ষতার দাপাদাপি। 'হবে আর কি, জানোয়ারের মাংশ রান্না করেছে। আমি নিষেধ করেছিলাম। কথা তো শুনলোই না, উল্টো আমার উপর ফোঁস কোরে উঠলো!'

শিমুল জানে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্যে এই হোস্টেলে গরুর মাংস, শুয়োর বা কচ্ছপের মাংস রান্না করা নিষেধ। এমনকি বাইরে থেকে এনেও খাওয়া যাবে না। আইনটা ভঙ্গ করা মানেই হোস্টেল থেকে বিদায় নেওয়া। কোনো মার্সী নেই, সবার জন্যেই প্রযোজ্য। এইতো মাস দুই আগের ঘটনা– গফুর, হল সংসদের কার্যকরী সদস্য, ছাত্র মৈত্রীর কলেজ শাখার প্রচার সম্পাদক, গরুর মাংস এনে খেয়েছিল। কথাটা ছাত্রদলের কানে চলে যায়। হৈচৈ শুরু

হয়ে গেছিল ভালোই। কিন্তু মনিরুল আলম বিচক্ষণ একজন সংগঠক। প্রথম ধাক্কায়ই তিনি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না কোরে গফুরের হোস্টেলের সিট ক্যানসেল কোরে দিয়েছিলেন। গফুর এখন খড়কি পাড়ায় মৈত্রী মেসে থাকে। ব্যবস্থাটা অবশ্য মনিরুল আলমই কোরে দিয়েছিলেন।

মনিরুল আলম সেদিন বেশি ভাবেননি, ভাবতে হয়নি। আজ ভাবতে হচ্ছে। অমলেশকে তাড়ানো মানে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের বেশকিছু ভোট হারানো। তাহলে সামনের ভরাডুবি ঠেকানো যাবে না। গত সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগের জি,এস, প্রার্থী দিপু সুলতান মৈত্রীর কাছে মোটে দুইশ' সতেরো ভোটে হেরে গেছে।

ঘাড়ের লম্বা চুল বাঁ হাতের আংগুল দিয়ে যে ছেলেটা চুল ব্রাশ করছিল, সে জাহিদের কথা শেষ হতে না হতেই বললো– 'আমাদের গরুর মাংস খেতে ইচ্ছে করেনা? না আমাদের পয়সা নেই? জিভকে কন্ট্রোল করতে না পারলে হোস্টেল ছেড়ে গ্যালেই হয়!'

ছেলে দু'টি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের। মনিরুল আলম কৌশলী হতে চান। কিন্তু হাতড়ে কোনো কিছু পাচ্ছেন না। ছেলেটার কথায় একটু খিঁচিয়ে ওঠলেন তিনি–'এতো কথা বলো কেনো? সে নিজের জিভকে কন্ট্রোল করতে না পেরে অপরাধ করেছে সত্য, কিন্তু তোমরাও তাৎক্ষণিক মৌলবাদী সেন্টিমেন্টকে কন্ট্রোল করতে পারোনি। নিজেদের বন্ধুকে মেরে তোমরা একই ধাচের ভুল করেছো।'

'সে যদি জানোয়ারের মাংস রান্না না করতো, তা হোলেতো আমরা আর তাকে মারতাম না।

'আমার নিষেধ শুনলেও ওকে এভাবে মার খেতে হতো না।'

'তোমরা আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারতে। সেটাইতো নিয়ম, নাকি? সে যাকগে, ও যে সত্যি সত্যি জানোয়ারের মাংস রান্না করেছে, তোমরা কি কোরে বুঝলে?'

'আমাদের চোখ নেই? চিনি না আমরা? ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন?'

'খবরটা তোমাদের কানে কে লাগিয়েছে? সত্য কথা বলো।'

'কথাটা কে লাগিয়েছে, সেটা কোনো কথা না।'

'আমরা নিজেরাই দেখে বুঝেছি।'

মাংসটা জানোয়ারের কি না, ওটাই আসল কথা। কে বললো না বললো, ওসব টেনে আনার কোনো দরকার হয়না।'

মনিরুল আলমের মন খারাপ হয়ে গেলো। ইচ্ছে হলো ছেলেগুলোকে চড়াতে। এটা ওর ভেতরের কথা। রাজনীতি নয়। এমনিতেই হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে মৈত্রীর খুব একটা ভালো ভিত নেই। অমলেশ মৈত্রীর সক্রিয় কর্মী। হিসাব মেলাতে পারছেনা মনিরুল আলম।

অনেকটা দমে গেছেন তিনি। রাগে ছেলে ক'জনার দিকে তাকালেন। সবাই চুপচাপ সব দেখছে, শুনছে। তিনি এতোক্ষণে অমলেশকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি অমলেশ, ওরা যা বলছে, তা কি সত্য?'

অমলেশ কোনো জবাব দিলো না। ওর মাথার চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। আগের মতোই সে মুখ গুঁজে চুপচাপ বোসে থাকলো। একটুও নড়লো না।

যেনো এক টুকরো দমকা বাতাসের ঝাপটা। দীপু সুলতান। হন্তদন্ত হয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। সবাইকে পেছনে ঠেলে তিনি সোজা অমলেশের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। অমলেশের মাথায় হাত দিয়ে তিনি প্রশ্রয়ের ঝাঁকুনি দিলেন। 'তোর কি হয়েছে রে অমলেশ?' এতোক্ষণে তিনি মনিরুল আলমের বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলোর দিকে তাকালেন।

'তোরা ওকে মেরেছিস?'

'ও শুয়োরের মাংস রান্না করেছে।'

'তোদের কে বললো? দশটার দিকে আমি জাহাঙ্গীরের হাতে বাজার থেকে খাশীর মাংস কিনে পাঠালাম যে? অমলেশের রুমে হিটার আছে। রাধেও ভালো। তাছাড়া, জাহাঙ্গীর ওর বন্ধু, পাশাপাশি বাড়ি। জাহাঙ্গীরই তো ওকে মাংসগুলো রান্না করতে বলে গ্যাছে! আমার দু'জন বন্ধু আসবে খুলনা থেকে, ওদের নিয়ে দুপুরে খাবো। আর তোরা কানকথা শুনে মিছেমিছি ওকে মারলি? আচ্ছা বলতো, তোদের ধৈর্যশক্তি এতো কম কেনো? খোঁজ নেই, খবর নেই, হুট কোরে মেরে বসা। ও তোদের বন্ধু না? তোদের একটু কষ্টও হলো না?' গোটা বেষ্টনীটা দুলে উঠলো। ফিসফাস শব্দ।

'আপনি ঠিক বলছেন না।'

'মোহাম্মদ আলী, আমি যখন বাজার থেকে মাংস কিনি, তুমি কিন্তু সাথে ছিলে না। বলো, ছিলে? তাছাড়া তুমি কি মনে করো আমি বাজার থেকে শুয়োরের মাংস কিনেছিলাম?'

'অমলেশ শুয়োরের মাংসই রান্না করেছে।' মোহাম্মদ আলী একটুও নরম না হয়ে দীপু সুলতানের চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বললো।

'অমলেশ শুয়োরের মাংসই রান্না করেছে।' জাহিদ মাথার চুলগুলো হাতের আংগুলে ব্যাকব্রাশ করতে করতে হিংস্রচোখে অমলেমের দিকে তাকিয়ে বললো। ওর চোখ বলছে পারলে সে অমলেশকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতো।

'তোমরা এতো নিশ্চিত হোলে কি কোরে? কে তোমাদের বলেছে?'

'আমরা জানি।'

'তোমরা ভুল জানো।'

'আমরা শিওর।'

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'ঠিক আছে, আপনি তাহলে খেয়ে দেখান।'

ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলেন দীপু সুলতান। বিশ্বাসের বিবর্ণ ধ্বস মুহূর্তে তার সারা মুখাবয়বে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু সাথে সাথেই তিনি হেসে ওঠলেন। ধাক্কাটুকু হাসির আড়ালে ঢেকে দিলেন সবাইকে ফাঁকি দিয়ে। হাসতে হাসতেই তিনি বললেন–'তাই বলো। তোমরা তা হোলে আমার কথা বিশ্বাস করছো না, এই তো?'

'পাগোলও নিজের চোখকে অবিশ্বাস করে না।'

'আমি যদি খাই, বিশ্বাস হবে তো?'

'হবে। আমাদের সামনে খান।'

দীপু সুলতান হাজী মো: আকবর তালুকদারের ছেলে। সহজে নামাজ কামাই দেন না। তিনি নিজেও জানেন, ধর্মীয় বিধান কখনো-সখনো কথার ভরাডুবিতে ভাংলেও মনের দিক থেকে তিনি পারতপক্ষে ভাংগের না। কথাটা কমবেশি সবাই জানে।

দীপু সুলতান মনিরুল আলমের ডান দিকে তাকালেন। অমলেশের রুমমেট প্রাণেশ চুপচাপ বোসে আছে। তিনি ডাকলেন- 'প্রাণেশ!'

প্রাণেশ উঠে দাঁড়ালো।

'যা তো, মাংসগুলো নিয়ে আয়। হাড়িশুদ্ধ আনবি।'

প্রাণেশ হতভম্ব, বিমূঢ়। সে জানে, হাড়ির মাংসগুলো দীপু সুলতান পাঠাননি। কি করবে, বুঝে উঠতে না পেরে সে দীপু সুলতানের দিকে ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে।

'তাড়াতাড়ি কর, আমার কাজ আছে না?' মনিরুল আলমকে তাড়া দেন দীপু সুলতান। এসব ক্ষেত্রে যতো দেরি হয়, ততোই জট জটিল হয়, তিনি তা ভালোই জানেন।

প্রাণেশ একটা ঘোরের আচ্ছন্নে আটকেছিল। দীপু সুলতানের কথায় তার সেই ঘোর কেটে গেলো। ডাইনিং হলে একটু আগেও ফিসফাস হচ্ছিল। এখন কবরের নিস্তব্ধতায় সবাই ডুবে আছে। প্রচণ্ড উত্তেজনা। ফ্যানের বাতাসে সবার চুল উড়ছে, শার্ট উড়ছে। তবুও অনেকে ভেতরে ভেতরে ঘেমে গেলো। এবং এই প্রথম অমলেশও একটু নড়ে বসলো। তবে মাথাটা উঁচু করতে পারলো না। সে মাথাটা নিচু কোরে নিচের দিকে তাকিয়ে আগের মতোই চুপচাপ বোসে থাকে।

'এক গ্লাস পানি আনতো জাহিদ।'

প্রাণেশ ছোট্ট একটা হাড়ি নিয়ে এলো। মনিরুল আলমের চেয়ারটা টেনে নিলেন দীপু সুলতান। হাড়িটা ওখানে রাখতে বললেন। তিনি ভেতরে ভেতরে খুব বেশি ঘামছেন। কাঁপছেনও একটু একটু। ভেতর থেকে কি যেনো একটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তিনি হাড়িটাকে একটা বোল বানিয়ে ফেললেন। কল্পনায় ধোরে নিলেন মাংসগুলো কোরবানী ঈদে কোরবানী দেওয়া নাদুস নুদুস একটা গরুর।

জাহিদের হাত থেকে তিনি পানির গ্লাস নিলেন। হাত ধুয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করলেন। অমলেশের দিকে তাকালেন একটু। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, এতোক্ষণ পরে অমলেশ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দীপু সুলতান সত্যিই এবার মনে অনেক বেশি জোড় পেলেন। অমলেশের চোখের পানিই বোলে দিচ্ছে তিনি জিতে যাচ্ছেন গোপন পরিকল্পনায়। তিনি কোনো হাড়াহুড়ো করলেন না। হাড়ি থেকে দুইবার দুই টুকরো মাংস তুলে মুখে দিলেন। গ্লাস থেকে পানি খেলেন, হাত ধুয়ে হাত বাড়ালেন। চারজন ছেলে দৌড়ে এগিয়ে এলো সাথে সাথে। তিনি নাগালে পাওয়া প্রথম রুমাল নিয়ে হাত মুছে রুমালটি ধীরে-সুস্থ্যে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি

এগিয়ে গিয়ে অমলেশকে হাত ধোরে টেনে তোললেন। সোহাগ মিশিয়ে ধমক দিলেন- 'মেয়ে মানুষের মতো কাঁদছিস কেনো? রুমে যা। প্রাণেশ, নিয়ে যা একে। হাড়িটা নে।' তারপর ছেলে চারজনের দিকে তাকালেন। খুব শান্ত গলায় স্পষ্টভাবে বললেন- 'রোবটের সেন্টিমেন্ট নেই। মানুষ রোবট নয়, তার সেন্টিমেন্ট আছে; কিন্তু নিজের সেন্টিমেন্ট নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। না পারলে, ভুগতে হয়।'

তিনি অমলেশকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

দুই আঙ্গুল জিভের উপরে কায়দা কোরে বসিয়ে একজন জোরে শিস বাজালো। সাথে সাথে অজস্র শিস বেজে উঠলো ডাইনিং রুমে। শিমুল বেরিয়ে এসে সোজা বাবুলের রুমে গিয়ে ঢুকলো।

বাবুল এলো আরো খানিকটা পরে। থমথমে মুখ। শিমুল মাঝে মাঝে ধন্ধে পড়ে যায়। বাবুলকে কেমন অচেনা লাগে। স্কুল জীবনের সেই বাবুল থেকে এই বাবুল যেনো যোজন যোজন দূরের এক প্রতিচ্ছবি মাত্র। পোংটামির ছিটেফোটাও নেই আর। অশ্লীলতা যেনো ভুলেই গেছে। অথচ মোটে বছর খানেকের মধ্যবর্তী ফারাক। কারণটা শিমুল বুঝে উঠতে পারে না। কি কোরে এমনটা হলো? রাজনীতি? নাকি প্রেম? বাবুল ইদানিং প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ওদেরই সংগঠন করে মেয়েটা। লুবনা। একই বর্ষের। শিমুল এক্ষেত্রেও হিসাব মেলাতে পারে না, কেমন খাপছাড়া মনে হয়।

বাবুল ধপাস কোরে চেয়ারে বোসে পড়ে। উপরের দিকে চোখ, চোখ দুটি পাতায় ঢাকা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ওর বুক থেকে।

'ফ্যান্টাসটিক বাট পারফেক্ট, আনবিলিভেবল বাট ট্রুথ!'

শিমুল ভ্রু কুঁচকে তাকায়।

বাবুল চোখ খুলে সামনে ঝুঁকে টেবিলে থাপ্পর মারে।

'শালার একেই বলে পলিটিশিয়ান!'

'কি সব আবোল-তাবোল বকছিস?'

'বিপ্লব, বুঝলি, বিপ্লব! ব্যাটা মোহরের হাঁস এখনো আমাদের অস্থিমজ্জা থেকে বহুত বহুত যোজন দূরের পথ, বুঝলি? হাতে-নাতে আজ প্রমাণ কোরে দিলো, কি চাতুর্যে, কি বাস্তবতার বাস্তব বিশ্লেষণ কোরে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে আমরা, মানে নামধারী কম্যুনিস্টরা এখনো বুর্জোয়াদের অনেক পেছনে পড়ে আছি।'

'তত্ত্বের কচকচানি থামিয়ে একটু বাংলাভাষায় বলবি কি হয়েছে?'

'দীপু ভাই খুব বমি করেছেন।'

'বমি করেছেন?'

'খেলো শুয়োরের মাংস। আগেতো কোনোদিন খায়নি। বমি হবে না?'

'ধ্যাৎ!'

'ধ্যাৎ নয়, হানড্রেড পারসেন্ট সত্যি! তুরুপের টেক্কা এখন দীপু সুলতানের হাতের চুটকিতে।'

'জেনে শুনে উনি খেতে পারলেন?'

'লেগে থাক না কিছুদিন, এরচে' মারাত্মক কতো খেল্ দেখতে পাবি! আমি এরই মধ্যে একটু একটু দেখেছি। ওদের ভেতরে কি যে নোংরামি, বমি আসে।'

'আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'এতো সহজেই যদি বিশ্বাস হয়, তবে আর ওদের খেলা জমতো নাকি? ক্ষমতার জন্যে ওরা পারে না, এমন কাজ নেই, বুঝলি? আগামী ইলেকশনে দীপু সুলতানের বিপক্ষে খোদ মার্কস এসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জিতবেন না। ধোরে রাখ, মনিরুল আলম আজই নক-আউট হলো।'

'শুধু এই কারনে লোকটা শুয়োরের মাংস খেয়েছেন?'

'শিমুল, তুই না একটু বুদ্ধু ধরনের আছিস। ভেবেছিস অমলেশের জন্যে ওদের খুব দরদ, না? ঠনঠন। ভোটটাই আসল কথা।'

'আমি বলছিলাম কি, উনি যদি খেতেই পারলেন, তাহলে বমি করছেন কেনো?'

'বমি করছেন, কারণ- মাংসটা উনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে খেয়েছেন। ভণ্ডামীর খেল্ খেলতে গিয়ে তিনি এতোটা এগিয়ে গেছিলেন যেখান থেকে ফিরে আসা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। টোটাল ব্যাপারটাকে বলা যায় চমৎকার এক ধোকাবাজি খেলা। স্বপক্ষে মোহাবিষ্ট করা। ভবিষ্যতের হাতছানি আর পরিস্থিতির সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ জেতার দৃঢ়তা তখন তার সংস্কারকে সাময়িকভাবে হোলেও ঢেকে দিতে পেরেছিল। তিনি জেনে শুনেই সবার সামনে শুয়োরের মাংস খেয়ে বসলেন। কিন্তু যখন নিজের রুমে গেলেন, একা হলেন, তখনতো আর কোনো চ্যালেঞ্জ নেই। ভন্ডামীর ছদ্মবেশটুকু আপনা থেকেই তখন খসে গেলো। ব্যাস, তিনি কেবলই একজন মানুষ হয়ে ওঠলেন, যিনি ছাত্রলীগের জেলা কমিটির সভাপতি নন, আজন্মের বিশ্বাস ও সংস্কারে লালিত এক মুসলিম যুবক, রুচির শৃঙ্খলিত অভ্যস্ত নিগড়ে বাঁধা দীপু সুলতান। সাথে সাথে কয়েক মিনিট আগেকার দীপু সুলতান আর সংস্কারাচ্ছন্ন নিরিবিলির এই দীপু সুলতানের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলো। তিনি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। গলগলিয়ে বমি বেরিয়ে এলো তার খোলশ ভেঙ্গে, ক্লিয়ার?'

শিমুল বাবুলের কথা শুনে 'থ' মেরে তাকিয়ে থাকে। সে আরো পরে কতো যে নিষিদ্ধ খাবার খেয়েছিল; একটুও খারাপ লাগেনি, বমি করা তো দূরের কথা। আসলে সত্য-অসত্য, পাপ-পূণ্য-,সবই দ্বন্দ্বমুখর, পরিবর্তনশীল। কোনটা সুসংস্কার আর কোনটা কুসংস্কার তা' ভাবলেই জন্মসূত্রে নিয়ে আসা পচা আমিত্বের গন্ডিটা ভাংগা যায়। ভণ্ডামীটুকুই হলো যতো অনিষ্টের মূল! দীপু সুলতানের ঘটনা মনে পড়লে ভেতরে ভেতরে ওর খুব হাসি পেতো। হাসতো ঘৃণায়। সে আরো চার পাঁচ বছর পরের কথা।

বাসায় ফিরতে কিছুটা দেরি হয়ে গেলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শিমুল চমকে ওঠে। আধঘন্টা পরেই বড়'পা স্কুল থেকে ফিরবে। সে তাড়াহুড়ো কোরে কাপড় পাল্টে নেয়। পরিমিত চাল লীনা হাড়িতে রেখেই যায়। শিমুল বালতি থেকে পানি নিয়ে চালগুলো ধুয়ে নিলো। হীটারে চড়িয়ে স্যুইচ অন কোরে একটু অপেক্ষা করলো। কয়েল লাল হয়ে ওঠাতে শিমুল মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে। দিন দশেক পুরানা হলেই কয়েল যখন তখন পুট-পাট কেটে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নামে।

শিমুল পারতপক্ষে বাসায় সিগারেট খায় না। এখন খুব ইচ্ছে হলো। সিগারেট জ্বেলে জানালার পাশে গিয়ে বসলো। এখন অপেক্ষার পালা। এই সময়টুকু ওর একটুও ভালো লাগে না। কেমন ক্লান্তিকর বোসে থাকা। প্রতিদিনই বসতে হয় ওকে। লীনা বাসায় ফেরে পৌনে দুইটার মধ্যে। তখন এসে রান্না-বান্না কোরে খাওয়া চলে না। অনেক দেরি হয়ে যায়। শিমুল তাই কলেজ থেকে ফিরে ভাত চড়িয়ে দেয়। সেই ভাতের মাড় কোনোদিন লীনা এসে গালতো, কোনোদিন শিমুল নিজেই। এখন আর মাড় গালার বালাই নেই। যেকোনো পরিমাণের চাল হোক না কেনো, কতোটা পানি দিলে ভাতও ঠিকঠাক ফুটবে অথচ মাড়ও থাকবে না, শিমুল তা শিখে ফেলেছে। লীনা সকালের তরকারি গরম কোরে শিমুলকে নিয়ে যখন খেতে বসে, তখন আড়ইটা বেজে যায়।

সূর্যের প্রতিফলিত তির্যক আলোটা এদিক-ওদিক লাফালাফি কোরে শিমুলের ডানগাল ছুঁয়ে চোখে এসে পড়লো। এমনটা মাঝে মধ্যেই হয়। কোনো কোনোদিন সে রেগে উঠে যায়, খুব একটা গরম না থাকলে জানালা বন্ধ কোরে দেয়। আজ উঠলো না। একটা জেদ একটু একটু কোরে ভেতরে লতিয়ে উঠছে। ঝিরঝিরে বাতাসে ওর ঘামে ভেজা শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে, জানালা বন্ধ করার কোনো মানে হয় না। কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে সে একমনে সিগারেট টানতে থাকে। আলোটা পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে বোলে সে চোখ বন্ধ কোরে রাখলো।

চোখ বন্ধ রেখেই শিমুল বুঝলো, প্রতিফলিত আলোটা হাওয়া হয়ে গেছে। নিশ্চয় কেউ এসে পড়েছে। সে-ও ভালো। কোনো মানে হয় না। মনে মনে রিয়ার কথা ভাবলো সে। মুখটা মনের চোখে দেখার চেষ্টা করলো। এবং কৌতুহলের তাড়নায় হঠাৎ কোরেই জানালা দিয়ে সে পেছনে তাকালো।

শিমুলের হৃদপিণ্ড ধক কোরে লাফিয়ে উঠলো। হাতুড়ি-পেটা শব্দ হচ্ছে ভেতরে। হাত দেড়েকে দূরে মেয়েটা দাঁড়িয়ে। দুই হাত জানালার শিকে। মুখে মিটিমিটি হাসি। হাত বাড়ালেই মেয়েটাকে ছোঁয়া যায়। গায়ের রংটা অদ্ভুত রকমের সুন্দর- মোমের সাথে হলুদ মিশিয়ে যেনো তৈরি করা হয়েছে। চুলগুলো খোলা। কোমর ছাড়িয়ে কিছুটা নিচে ঝুলে পড়েছে। ঝিলমিল করছে। ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে জাগে। শিমুলের হঠাৎ কোরে খুব জেদ হলো। চোখ ফেরালো না সে। সরাসরি মেয়েটার চোখে চোখ রাখলো। খুব কষ্ট হচ্ছে, কষ্টটা অস্বস্তি আর লজ্জার সংমিশ্রিত প্রকাশ। সে দেখলো, মেয়েটার চোখ দু'টো কি কালো আর গভীর! মেয়েটি খিলখিলিয়ে শরীর দুলিয়ে হেসে ফেললো। শিমুল তাতেই হেরে যায়। সে চোখ নামিয়ে নিলো কিন্তু সরে গেলো না।

শিমুল ঢোক গেলে। এই ওর এক সমস্যা। অপরিচিত মেয়েদের সাথে কথা বলতে গেলে ওর গলা শুকিয়ে আসে, রিয়ার কথা মনে পড়ে। আজ সে হঠাৎ কোরে রিয়ার সাথে এই মেয়েটাকে তুলনা করতে শুরু করলো।

'কি বিচ্ছিরি গন্ধরে বাবা! আপা আসুক আজ। তার বোবা ভাইটার এই গোপনীয় সু অভ্যাসের কথা ঠিক ঠিক বোলে দেবো।'

শিমুল মনের অগোচরে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজায়। যে দস্যি মেয়ে, অসম্ভব কিছু না।

মেয়েটা আবার মুখে হাত দিয়ে হেসে ওঠে।

'এতো ভয়? আসে-পাশে ভূত-টুত আছে নাকি? না বাঘ-ভল্লুক?'

'এ কিন্তু ভালো না।'

শিমুলের গলা থমথমে, ভারি আর খটখটে। মেয়েটা থমকে গেলো। কিন্তু খুবই অল্প সময়ের জন্য। সে চোখ বড় বড় কোরে বললো– 'যাক, বোবা না তাহলে। জানা থাকলো। তো, কি ভালো না?'

'এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না।'

'কেনো? জায়গাটা আমাদের।'

শিমুলের হুট কোরে রাগ হলো। রাগটাকে বশ মানাতে খানিকটা সময় নিলো ওর।

'জায়গাটা কার, ওটা কোনো কথা না। সামাজিকতা বলতেও একটা কথা আছে। আগে ওটা। কেউ না কেউ আমাদেরকে দেখছে।'

'আমি ভয় পাই না।' মেয়েটা অদ্ভুতভাবে ঠোঁট ফুলায়।

'আমার ভয় আছে। আপনি যান।'

'জ্বি না, আমি ছোটো,তাই আপনি বললে চলবে না, তুমি।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

মেয়েটা ঠোঁট টিপে নতুন কোরে হেসে ওঠে।

'আমার একটা নাম আছে, আছে না?'

শিমুল কোনো জবাব দিলো না। ওর মনে হলো, চেহারার সাথে নামটা দারুণ মানিয়েছে। শিউলী, শিউলী ব্যানার্জী।

'আমাকে দেখলে জানালা বন্ধ কোরে দেয়া চলবে না। প্রমিজ!'

'আলো নিয়ে ওভাবে খেলা করা ভালো না। বড়'পা কয়েকদিন দেখে ফেলেছে।'

'আমার সাথে কথা বললে বিষয়টা ভেবে দেখবো।'

'আমার কোনো কথা নেই।' শিমুল আড়চোখে মেয়েটার দিকে একবার তাকায়।

'কথা নেই মানে? এরই মাঝে 'নো এডমিশন' সাইবোর্ড ঝুলানো হয়ে গ্যাছে?'

শিমুল বোকার মতো শিউলীর দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর ফিক কোরে হেসে ফেলে নিচের দিকে তাকিয়ে বলে–'বুঝেছি।'

'কি?' শিউলী আরো কিছুটা কাছে এগিয়ে আসে।

'দিনটা চমৎকার, না?'

'তুমি এখন যাও, প্লিজ!'

'কি রান্না হচ্ছে?'

'ভাত। তুমি জানো।'

'সত্যি?'

শিউলীর চোখে-মুখে কৌতুহল।

'তুমি যাবে?' শিমুল এবার সত্যি সত্যি রাগ করে।

'কষ্ট হয় না?'

'কষ্টের কথা ভাবলে ভাত খেতে তিনটে সাড়ে-তিনটে বেজে যাবে। তাছাড়া রান্না করতে আমার যতোটা কষ্ট হয়, অন্য কেউ রান্না করলে সেই কষ্টটা তারও হবে।'

'রান্না-বান্না মেয়েদের কাজ।'

'কি জানি! তাছাড়া- আমার সত্যি সত্যিই তেমন একটা কষ্ট হয় না।'

শিমুল জানালা থেকে সরে আসে। সে এগিয়ে গিয়ে হাড়ির ঢাকনি খুলে চামচ দিয়ে ভাত নেড়ে দেয়। ভাত হতে এখনো বেশ দেরি আছে। সে নিজের ইচ্ছেশক্তির কাছে হেরে গিয়ে জানালার দিকে তাকায়। ওর দিকে তাকিয়ে শিউলী হাসছে।

'এতোটা ভালো না।'

'ভালো কতোটা?'

'বড়পা'র আসার সময় হয়ে গেছে। তুমি না গেলে আমি জানালা বন্ধ কোরে দেবো।'

'কি আমার বাহাদুররে!'

ঠোঁট বেঁকিয়ে শিউলী চলে গেলো। আশ্চর্য, শিমুলের এবার সামান্য কোরে হোলেও খারাপ লাগতে শুরু করেছে। সে জানালা দিয়ে তাকিয়ে উদগ্র মনে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু মেয়েটি পেছন ফিরে একবারও তাকালো না।

বেশ কিছুদিন থেকে শিমুলের ভেতরে ভাঙ্চুর হচ্ছে। দ্বন্দ্বও হচ্ছে। শিউলী ওকে একটুও স্বস্তি দিচ্ছে না। পাগলাটে ধরনের গো ধোরে পিছু নিয়েছে। ফাঁক পেলেই নিজেকে জানান দেয়। বাড়িওয়ালার মেয়ে এবং হিন্দু। সমস্যা ওখানে নয়। ধর্ম-অধর্ম নিয়ে এই একটা বেলায় আগেও বাছ বিচার হয়নি, আজও হয় না। শিমুলেরও হচ্ছে না। ওর সমস্যা রিয়া।

শিমুলের চেতনায় ঘাপটি মেরে বোসে থাকা রিয়া চিমটি কাটে অভিমানে, রাগে চোখ পাকায়। সে তাতে চুপসে যায়। ইদানিং রিয়াও মাঝে মাঝে কেনো যেনো ক্ষণিকের জন্যে হোলেও আবছা হয়ে যায়, আড়াল হয়ে পড়ে। মেয়েটার সাথে চোখাচোখি হোলে, একটু হাসলে ওর বেশ ভালোই লাগে। কখনো সখনো সেই টানে জানালা খুলে আড়চোখে সে শিউলীকে খোঁজেও। কিন্তু আবার কোনো একান্ত মুহূর্তে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে রিয়া জেগে ওঠে। নিজেকে তখন ভীষণ

ছোটো মনে হয়। আপনা থেকেই মুখ কালো হয়ে যায়। মনে মনে বিড়বিড় করে– 'তোমায় আমি ভালোবাসি রিয়া, ভীষণ-ভীষণ ভালোবাসি।'

শিমুল আড়চোখে তাকালো। মেয়েটা আবার আসছে। হাতে কাগজের একটা প্যাকেট। শিমুল চামচ দিয়ে ভাত নাড়তে শুরু করে।

'এভাবে নাড়লে ভাত কিন্তু ক্ষীর হয়ে যাবে।' প্রথম আষাঢ়ের ঢল নামা জলের মতো মেয়েটা শব্দ তুলে হাসতে হাসতে বললো।

শিমুল তাকালো না। মেয়েটার কথা শুনে সে আরো বেশি কোরে চামচ নাড়তে লাগলো।

'রাগ কোরে বেশি বেশি নেড়ে ভাতকে ক্ষীর বানালে কৈফিয়ত কিন্তু আমাকে দিতে হবে না। এখন রাগ রেখে একটু আসতে হয় যে!'

'শিউলী, বেশি হয়ে যাচ্ছে। বড়'পা এক্ষুণি এসে পড়বে। তোমাকে এসে এভাবে দেখলে সে কি মনে করবে?'

'এখানে কেউ না এলে যাই কি কোরে?'

শিমুল রাগের সাথে তাকায়। এবার শিউলীও রাগ করে। সে সামান্য একটু ভাবলো কি যেনো। তারপর আছড়ে রাখার মতো জানালার শিক গলিয়ে হাতের প্যাকেটটা শিউলী চেয়ারে রাখে। সে আর ভেতরের দিকে তাকালো না। ঘুরে দাঁড়ালো।

'যেনো আর কারো রাগ থাকতে পারে না।'

শিমুল থমকে গেলো।

শিউলী একবারও পেছন ফিরে তাকালো না। সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বাড়িটা একদম ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই। শিমুল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্যাকেটটা তুলে নিলো। উপায় নেই। বড়'পার ফেরার সময় হয়ে গেছে।

প্যাকেটটা সে ড্রয়ারে রাখতে গিয়েও রাখলো না। ভেতরে কৌতুহল ছলবল করছে। এক ছুটে বাইরের গেট লাগিয়ে সে ফিরে এলো। ভেতর থেকেই সে একটু একটু কাঁপছে। প্যাকেটটা সাথে সাথেই খুললো না। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে সে কিছুক্ষণ বোসে থাকলো। নাকের কাছে নিয়ে সে ঘ্রাণ নিতে চেষ্টা করলো।

চারটা ছানার সন্দেশ। একটা চিরকূট। 'প্রথম কথা বলার উপহার– শিউলী'। লেখাটা গোটাগোটা, ঝরঝরে। আরো একটা খাম। মুখ খোলা। শিমুল ভেতর থেকে ছবিটা বের কোরে আনলো। আবার ধ্বক কোরে ওঠে ওর বুক। সেপেছন ঘুরে তাকায়। না, শিউলী নেই। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছবিটা দেখতে থাকে। পোস্টকার্ড সাইজের রঙিন ছবি। যেনো প্রতিমা একটা। চোখে মুখে হাসি। হঠাৎ কোরে ওর মনে হলো, ওকে দেওয়ার জন্যেই শিউলী ছবিটা তুলেছে। সে উল্টো পিঠ দেখলো। সিগনেচার কলমের সবুজ কালিতে লেখা– 'রাতে ফুটে রাতে ঝরে গেলেও যার ঘ্রান থেকে যায় হৃদয়ের অর্ঘে।'

ছবিসহ খামটা শিমুল ক্যামিস্ট্রি বইয়ে রাখলো। সন্দেশগুলোর দিকে তাকালো সে। একদম সময় নেই। সে সন্দেশগুলো তাড়াতাড়ি ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ফেলে। যদি বড়পা' ড্রয়ার খোলে? শেষ পর্যন্ত ওর মনপুত হলো না। প্যাকেটটা সে ড্রয়ার থেকে বের কোরে এবার বইয়ের পেছনে চালান দেয়। তারপর সে দ্রুত হাতে বইগুলো টেনে টুনে ঠিকঠাক করে। হঠাৎ কোরে ওর নাকে ভাত-পোড়া গন্ধ লাগে। সে একলাফে ভাতের কাছে এগিয়ে যায়। টান দিয়ে প্লাগ খুলে ফেলে। হাড়ি নামিয়ে ঢাকনা খুলে দিয়ে একদৌড়ে বাইরে ছুটে যায়। তারপর সে দরোজা খুলে সামনের দিকে তাকায়। না, বড়'পা এখনো আসেনি। এতোক্ষণে সে হাতের জ্বলুনি টের পায়। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হাতে ছেকা লেগেছে। কিন্তু এখন আর ওর মাঝে কোনো ধরনের ভীতি নেই। সে বেশ ধীরে সুস্থ্যে ঘরে ফিরে আসে। জানালা দিয়ে তাকাতেই শিউলীর চোখে ওর চোখ পড়ে। মেয়েটার জন্যে শিমুলের হঠাৎ কোরে খুব মায়া হলো। সে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে এবার প্রশ্রয়ের হাসি হাসে। মেয়েটা চোখ নামিয়ে ওড়না দিয়ে চোখ মুছছে। শিমুলের দিকে সে না তাকিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ে। বাইরে পায়ের শব্দ। শিমুল দ্রুত জানালা থেকে সরে যায়।

তাড়াহুড়ো কোরেও শিমুল সময়মতো উপস্থিত হতে পারলো না। টিউশনী দু'টো পাশাপাশি। অন্যদিন সন্ধ্যার পরে পড়ায়। শুক্রবারে ওই সময়টায় সে 'দিশারী সাহিত্য বাসর'-এ কাটায়। এ কারণে বিকালে পড়াতে হয়। পড়াতে ওর খুব একটা খারাপ লাগে না। শুধু শুক্রবার এলেই মনে হয়, টিউশনী দু'টো না থাকলে মন্দ হতো না। বড়'পা চায়ও না। শিমুল তবুও পড়ায়। গোটা টাকাগুলো সে যখন বড়'পার হাতে তুলে দেয়, নিজেকে তখন খুব হালকা মনে হয়। ভিন্ন ধরনের এক সুখপাখি বাকুম বাকুম কোরে একটু আধটু ডাক ছাড়ে ওর নিরিবিলি তপোবনে।

রোজী আফরোজা কবিতা পড়ছেন। কামার ফরিদ নি:শব্দে হেসে শিমুলকে ইশারা করলেন। নিজের লেখা গল্প সভাপতির কাছে জমা দিলো শিমুল। তারপর সে নি:শব্দে কামার ফরিদের পাশে গিয়ে বসলো। অন্য কোনো শব্দ নেই। ধূপকাঠি গন্ধ ছড়াচ্ছে। সেই গন্ধকে টেক্কা দিয়ে কার যেনো শরীর থেকে মিষ্টি একটা সেন্টের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। ম-ম করছে সময়টা। অভিনয়ের ঢংয়ে হাত নেড়ে, চোখ ছোট-বড় কোরে শিল্পের মাধুরী মিশিয়ে দিচ্ছেন রোজী আফরোজা। তার বাচনিক ঢংয়ে কবিতার শব্দগুলো কখনো ডানা ঝাপ্টিয়ে উড়ে যাচ্ছে অনন্ত নীলিমায়, মধ্যাকর্ষণ ফাঁদের ঘোরে; কখনো বা সাতরঙা রামধনুর সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে যাচ্ছে স্বপ্নীল জগতে, কখনো বা মাটির সোঁদা গন্ধে হো হো কোরে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু-অসীম এক বেদনাবোধ যেনো সব কিছুকে হালকা একটা পর্দা দিয়ে সার্বক্ষণিক ঘিরে রেখেছে।

এটা শিমুলের লেখা তৃতীয় গল্প। কামার ফরিদ চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরে গল্পটার সাথে যেনো মীরজাফরী করলেন। শিমুলের মন ছোট হয়ে গেলো। কিন্তু এই ছোটো হয়ে যাওয়া মনের পুরো গায়ে আদর আর আশ্বাসের ছোঁয়া লাগিয়ে দিলেন সভাপতি। সবার মুখে হালকা আমেজের

গন্ধ। কামার ফরিদ গুনগুন করতে করতে মিনিট খাতায় সই করলেন। খাতাটি শিমুলের দিকে ঠেলে দিয়ে তিনি সিগারেট জ্বাললেন।

'যাবেন নাকি?' মুখে মিষ্টি এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে কামার ফরিদ শিমুলকে জিজ্ঞেস করলেন

'আপনি?' কিছুটা লাজ মিশিয়ে শিমুল উল্টো জিজ্ঞেস করে।

'আমার খুব তাড়া নেই। তো, এখানে আর ভালো লাগছে না। চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

শিমুল কামার ফরিদের সাথে বাইরে বেরিয়ে আসে। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। প্রথম সন্ধ্যার থমথমে একটা গুমোট ভাব। ওদের বাঁ দিকে গুরু-গম্ভীর সুরে কোথাও শঙ্খ বেজে উঠলো। ওরা বড় রাস্তা ছেড়ে ছোটো রাস্তায় নেমে আসে।

'আপনার কাজ নেই তো?'

'না। টিউশনী কোরেই এসেছি।'

'টিউশনী না করলে হয় না? ছেড়ে দিন।'

'ছাড়লে হয় না, তা না। তবুও ছাড়াটা ঠিক হবে না।'

'তা হোলে ছেড়ে কাজ নেই। তবে, ফাঁকি দেবেন না।'

'আমি টিউশনীটা করি কেনো, জানেন? আত্মদংশনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে।'

'এটা ভালো। নিন।'

কামার ফরিদ শিমুলের দিকে সিগারেট এগিয়ে দিলেন।

এই প্রথম। শিমুল হত-বিহ্বল। সে কামার ফরিদের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসলো এবং সিগারেট নিলো। কামার ফরিদ ম্যাচ বাড়িয়ে দিলেন।

'তো কমরেড, গল্পের নাম 'মীর জাফর' দিলেন ক্যানো?'

তিনি মাঝে মাঝে শিমুলকে কমরেড ডাকেন। শব্দটায় কি যেনো এক মোহ আছে। কানে যেতেই রক্ত কণিকায় একটা তরঙ্গ বয়ে যায়। একটু লজ্জা লজ্জাও লাগে। কিন্তু সেই লজ্জায় মিশে থাকে একধরনের অহম।

গল্পের পাতাগুলো কল্পনায় নাড়তে নাড়তে শিমুল কথাগুলো গুছিয়ে নিলো।

'নেতৃত্ব গ্রুপ সংকটময় সময়ে জনগণকে ফেলে রেখে যেভাবে পালিয়ে বাঁচলো, 'মীরজাফর' নামই তার সবচে' সুন্দর এবং কুৎসিত প্রকাশ, অন্তত: আমার কাছে।'

কামার ফরিদ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একটু হাসলেন।

'ঠিকই আছে। তবে কি, নামটা আরো একটু আধুনিক হোলে ভালো হতো। অবশ্য এই ভালো হওয়া না হওয়াটা কিন্তু চূড়ান্তভাবে লেখকেরই।'

'আপনার মন্তব্যটা একটু ব্যাখ্যা করুন না?'

'বারে, তা' আমি কি আর ব্যাখ্যা করবো? শোনেন কমরেড, সৃষ্টিটা আপনার, আপনাকেই খুঁজে দেখতে হবে। আচ্ছা, মীরজাফর সম্পর্কে আপনার ধারণাটা কি?'

শিমুল গতানুগতিক ইতিহাসের কথা বললো– 'পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে মীরজাফর মীরজাফরী না করলে ভারতের ইতিহাস আজ ভিন্ন কিছু হতে পারতো।'

'মীর জাফরকে খুব ঘৃণা করেন, না?'

'সবাই করে, করা উচিতও।'

'কিন্তু কেনো ভায়া? বিভীষণ কি রাবণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। করেছিল বোলেই না লংকার পতন হয়েছিল! কই, বিশ্বাসঘাতকতার ঘৃণা প্রকাশের জন্যে কেউ তো বিভীষণের নাম নেয় না? নাম নেয় মীরজাফরের।'

রাস্তাটা দুই দিকে ভাগ হয়ে গেছে। ওরা বাঁ দিকে মোড় নিলো।

'আসলে অর্থনীতির জটিল আবর্তে মীর জাফরের তুলনায় বিভীষণ একদম নিস্প্রভ! বোঝলেন কমরেড, অর্থনীতিটাই আসল কথা, আর সব ভুং ভাং।'

শিমুল চোখ কুঁচকে তাকালো। কিন্তু অন্ধকার এতোটা ঘন যে, কেউ কারো চোখ-মুখ স্পষ্ট কোরে দেখতে পাচ্ছে না।

'সিরাজের সাথে মীরজাফররা কেনো যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা কি ভালো ভাবে ভেবে দেখেছেন? ক্ষমতা, বোঝলেন, স্রেফ ক্ষমতা। কিন্তু ওই ক্ষমতাটা কি? ওটা নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী জীয়ণকাঠি ছাড়া আর কিছুই না। বর্তমান সময়ের টোটাল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আর ভাবাদর্শের দিকে তাকান একবার, চেতনায় ঘেরা অস্পষ্ট পর্দাটা কেটে যাবে। গতানুগতিক সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতিনিধি সিরাজ, তাকে ঘিরে রয়েছে তার দাদু, মা, স্ত্রী; মীর মদন আর মোহন লাল। অন্যদিকে মীর জাফর; নব্য পুঁজিবাদের ধারক-বাহক, ইংরেজ বেনিয়াদের সংস্পর্শে মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় সংগ্রামরত নব্য বুর্জোয়াদের এদেশীয় প্রতিনিধি। তাকে ঘিরে রয়েছে উমিচাঁদ, রায়বল্লভ, জগৎশেঠ আর ঘোষেটি বেগমরা। শ্রেণীগতভাবেই এরা পরস্পর-বিরোধী আপোষহীন পক্ষ। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সাথে অগ্রসরমান পুঁজিবাদের যে আপোষহীন বৈর দ্বন্দ্ব, তারই স্বাভাবিক বহি:প্রকাশ পলাশীর যুদ্ধ। একটা কথা কখনো ভুলবেন না- কেউই তার নিজ শ্রেণীর সাথে সহজে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। সিরাজ বা মীরজাফরও তা পারেনি, পারার কথাও ছিলো না। এই ধরুন আমাদের কথা,- আমরা বিপ্লবী সাহিত্য নিয়ে, তত্ত্বের কচকচানিতে বিভিন্ন ধরনের আসর আর বাসর মাতিয়ে রাখছি। দৌড় কিন্তু আমাদের ওই পর্যন্তই। আর্থ-সামাজিক টানাপোড়েন, ভাবাদর্শের দীনতা- এসব আমরা বুঝিনা? বেশ ভালোই বুঝি। আমরা এ-ও বুঝি, আমাদের চমৎকার শব্দের গলাবাজিতে সত্যিকারের শত্রুকে এখন ধরাশায়ী করা যাবে না। তার জন্যে আরো কিছু করা দরকার, ভিন্ন ধরনের কিছু। মন থেকেই আমরা তা' চাইও। ওই পর্যন্তই; করণীয় কাজটুকুই কিন্তু আমরা কেউই করছিনে। কেনো? কারণটা যেভাবেই আপনি আমি তত্ত্বের মারপ্যাচে লিগেলাইজড করতে চাই না কোনো, আসলে পেটিবুর্জোয়া ভাবাদর্শের যে মোহ, যে পিছুটান, হারানোর ভয়- তাই আমাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। কেউ কেউ যে স্পর্ধা দেখিয়ে এই বেড়াটা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে না, তা নয়। তবে, সংখ্যায় এরা এতোই কম যে, ডোমিনেটিং ফোর্স হয়ে এরা আবার স্বাভাবিক সময়ে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব

দিতে পারে না। ফলে হতাশা আসে, স্পর্ধা দেখিয়ে যারা দৃপ্ত পদভারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো, দু'দিন পরে নতজানু হয়ে তারাই আবার নিজ শ্রেণীতে ফিরে আসে।'

কামার ফরিদ সিগারেট বের কোরে ধরালেন। শিমুল বিস্ময়ে হতভম্ব। এতো সহজ সত্য বিষয়টা, অথচ কখনো ওর কল্পনার ধারেও ঘেঁষেনি! ওর চোখের সামনে থেকে হঠাৎ যেনো ভারী একটা পর্দা সরে গেলো। একটা ব্যাখ্যায় অনেক জটিলতা ওর কাছে সহজ হয়ে উঠছে। সে এবার প্রশ্ন করলো, 'তাহলে কি আমরা মীরজাফরকে বিশ্বাসঘাতক বলবো না?'

ধোঁয়া ছেড়ে কামার ফরিদ হাসলেন। 'উত্তরটা দুই দিকের সমন্বয়ে হবে।'

'মানে?'

'তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কারা ছিলো? সামন্তশ্রেণী। ওই শ্রেণীর কাছে মীরজাফর অবশ্যই বিশ্বাসঘাতক। মীরজাফর যেহেতু ছিলো নব্য পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি, সেই হিসেবে নিজ শ্রেণীর স্বার্থে সে অবশ্যই বিশ্বাসঘাতক নয়। কমরেড, আমরা সেই কখন থেকে সামন্ত আর পুঁজিপতিদের নিয়েই আলাপ করছি। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর মাঝখানেই আবার রয়েছে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত মানুষ, যারা ইতিহাসে নেই; রাখা হয়নি সচেতনভাবেই। এদেরকে ভুলে গেলে আসল কথাই ভুলে যাওয়া হবে। যা বলছিলাম- ধরুন, ক্ষমতায় সিরাজই রইলো। কৃষকরা কলুর বলদের মতো সামন্ত প্রভুদের জোয়ালে দাসখত দিয়ে বাধা থাকতে বাধ্য। ওটাই ওই ব্যবস্থার স্বত:সিদ্ধ সত্য ধর্ম। আপনার আমার, ওইসব ভূখানাঙ্গা মানুষগুলোর কি লাভ হতো তাতে? কিচ্ছু না। তাছাড়া, সামন্ততন্ত্রকে পুঁজিবাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবেই; দ্বন্দ্বও হবে। হয়তো তখন সিরাজের জায়গায় সিংহাসনে থাকতো করিম আর মীরজাফরের জায়গায় ছলিম। এবার মীরজাফর বা ছলিমকে ধরুন, ওরা ক্ষমতায় এলে কি লাভ? ক্ষমতা শুধু এক শোষক গোষ্ঠীর হাত থেকে অন্য এক শোষক গোষ্ঠীর হাতে বদল হলো মাত্র। মূল কথা হলো- এই যে সামাজিকভাবে উৎপাদন হচ্ছে আর ভোগ হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানায়, এটাই সমস্যার নাটের গুরু। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসাই হলো সারকথা- সামাজিকভাবে উৎপাদন হচ্ছে, ভোগও হতে হবে সামাজিকভাবে। বিক্রেতা-ক্রেতা লুকোচুরি খেলা থামাতে হবে। যতোটা মূল্যমানের শ্রম আপনি দিচ্ছেন, আপনাকে ফেরতও পেতে হবে ততোটুকু, কমও নয়, বেশিও নয়।'

'আপনি কেবলই শ্রেণী শ্রেণী করছেন, শ্রেণীর সাথে শ্রেণীর দ্বন্দ্ব উস্‌কে দিতে চাইছেন। তাতে কিন্তু কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই হবে ঢেড় বেশি। যুদ্ধ কোনোদিন শান্তি দিতে পারে?'

'অবশ্যই পারে। তবে সেটা অবশ্যই সাময়িক। চূড়ান্তভাবে যুদ্ধ শান্তি দিতে পারে না। শতকরা আশিজনের কষ্ট আপনার কাছে বড়ো, না কুড়িজনের আয়েশী জীবনযাত্রাটা, আগে এটা নির্ধারণ করতে হবে। সমস্যা হলো, এই দুই পক্ষের মাঝে কোনো ভাবেই শান্তি স্থাপন করা যাবে না। তাহলে? এসে যায় দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ! যুদ্ধটা কখনো বৈর, কখনো আবার অবৈর; কখনো রাজনৈতিক, কখনো সামরিক। যুদ্ধ কোরে এই কুড়িজন শোষককে পরাজিত কোরে যদি আশিজনের শ্রমের ন্যায্য পাওনা পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, আপনি তাকে শান্তি বলবেন না? আসলে কি জানেন, শ্রেণী সংগ্রামটাকে সাম্রাজ্যবাদ তার অত্যাধুনিক প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার

সাহায্যে জুজুবুড়ি বানিয়ে তুলেছে, আপনি আমি ভয় পাবো না কেনো? শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদকে বাড়িয়ে বা জিইয়ে দেয়া হয় না. ওটা আগে থেকেই রয়ে গ্যাছে. বরং এই জিইয়ে থাকা বিভেদকে দূর কোরে স্থায়ী শান্তি আনার একমাত্র এবং অদ্বিতীয় পথই হলো শ্রেণী সংগ্রাম, যার কোনো বিকল্প নেই, থাকতে পারে না।'

'শ্রেণী সংগ্রামই পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের মৌলিক সত্তার বলিষ্ঠ এবং সত্য উচ্চারণ। শ্রেণী সংগ্রামই সাম্রাজ্যবাদী ঘুম পাড়ানিয়া গানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলে- ওহে, তুমিতো ওই রকম ছিলে কিন্তু হয়ে পড়লে এই রকমের, তোমাকে তোমার সত্তার আসল জায়গা থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে এই নর্দমায় নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াও, ফিরে যাও সেই শ্বাশত আপন স্থানে। মোট কথা, হারানো অস্তিত্বের সাথে পুনর্মিলনের যে উদগ্র তাগিত, তা হলো শ্রেণী সচেতনতা, সংগ্রাম তার বাস্তব রূপায়ণের আঁকাবাঁকা সময় এবং পথ। এখন আপনাকেই আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত টানতে হবে আপনি কোনটি চান, পূর্বাবস্থার স্বাভাবিক অগ্রসরতার নিশ্চয়তা, না কৃত্রিম পঙ্কিল কাদায় আটকে থাকার আয়েশী প্রাপ্তীলিপসার প্রয়াসী পাশবিকতা!'

শিমুল ভাবনার গভীর অরণ্যে ডুবে যায়। এ কেমনতরো ব্যাখ্যা? শ্রেণী সংগ্রামের এমন তাজা ব্যাখ্যা শুনে ওর ভেতরটা ভীষণভাবে নড়ে উঠলো।

পরিদর্শন যেনো কলেজে হবে, এমন একটা ভাব। সাজ সাজ রব পড়ে গেছে গোটা শহরে। কলেজও বাদ পড়েনি। ঝকঝকা, তরতাজা রাস্তা-ঘাট। অসমাপ্ত শহীদ মিনারে অনেকদিন পর আবার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এলো। নির্মাণ কাজ চলছে তাড়াহুড়ো কোরে। শিমুলের হাসি পায়। নিচের ক্লাশে পড়া হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীদের কথা মনে পড়ে যায়। সাথে যোগ হয় কল্পিত এক মন্ত্রী পরিষদ। নতুন চুনকাম করা দেয়াল জ্বলজ্বল করছে। চারদিন আগেও তাকানো যেতো না। যেনো অজস্র স্লোগানের জগাখিচুড়ি পাকানো একটা অসভ্য পোস্টার। এখনো স্লোগান লেখা আছে। সম্ভবত কাল রাতের লেখা। মোটে তিনটে। তাতে যেনো বিশাল সুভ্র দেওয়াল আরো বেশি হেসে উঠেছে। একপাশে চমৎকার একটা রূপক স্লোগান- 'পুরাতন দেয়াল ভেঙ্গে ফেলো, নতুন দেয়াল গড়ে তোলো'।

স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আসছেন। আসছেন আজই। তিনি স্বেচ্ছাশ্রমের বিনিময়ে খালকাটা উদ্বোধন করবেন। এম.এম. কলেজ কর্তৃপক্ষ খালকাটা কর্মসূচিতে একাত্মতা জানিয়েছেন। কলেজ থেকে স্বয়ং প্রিন্সিপাল-এর নেতৃত্বে একদল ছাত্রব্রিগেড যাচ্ছে খালকাটার জন্যে।

আসবো বোলে শেষ সময়ে বাবুল এলো না। হাওয়া হয়ে গেছে। শিমুলের বেশ একলা একলা লাগছে। বাস আর যাবে না। পথ নেই। সবাই হুড়মুড় কোরে নেমে পড়ছে। কলেজ থেকে এসেছে দুটি বাস। মেয়েও আছে কয়েকজন। শিমুল একদম শেষে নেমে এলো। আটটার সূর্য এরই মাঝে তেতে উঠেছে। রাস্তায় ধূলো আর ধূলো। অনেকদিন ধরে বৃষ্টি নেই। কেমন একটা খাঁ খাঁ ভাব। রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে। সবাই তালতলীর দিকে ছুটে চলেছে। প্রেসিডেন্টকে এক নজর দেখাও কম ভাগ্যি নাকি?

গ্রাম-ঘেঁষা রাস্তা। এ্যাবড়ো-থ্যাবড়ো। গরুর গাড়ি চলাতে রাস্তার দুই পাশ দেবে গেছে। মাঝখানে একজন চলার মতো রাস্তা। সাইকেল চলে। এখানে সেখানে কলাগাছ। বাঁ পাশে গ্রাম। আমগাছে আম ঝুলছে। বতি হয়নি। কাঁঠালগাছে মুছি। গাছ-গাছালির ফাঁক-ফোকড়ে ঘর-দোর। অধিকাংশই কুঁড়ে ঘর। মাঝে মাঝে দু'একটা টিনের ঘর। টিনের চালে রোদ ঝিলমিল করছে। যেনো গ্রামের ধনী কৃষকের অহংকারী দন্তের উদ্ভাসিত ঝিলিক।

ডানপাশে মাঠ। এখানে ওখানে গম ক্ষেত। কোনোটায় সতেজতায় গম হেলেদুলে নাচছে, কোনোটা আবার শীর্ণকায় ব্যথা বুকে কুঁকড়ে আছে। মাঝেমধ্যে পাকা মশুরী আর সরিষা ক্ষেত। দু'একটা একদম ন্যাড়া। অনেকগুলো কবুতর- প্রায় দেড় দুইশ, ঝাঁক বেঁধে মাঠের উপর দিয়ে ঘুরছে। শিমুলের কয়েক গজ সামনে দিয়ে একটা কুটুম পাখি উড়ে গেলো। দু'টো ফিঙগে ওকে তাড়া করছে। তেতুলগাছের আড়ালে না পড়া পর্যন্ত শিমুল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো।

সকালের উদ্বেলিত মন এখন বিতৃষ্ণ, কোনো ভাবাবেগই যেনো ছিলো না কোনোদিন। কেমন অর্থহীন এবং নিরস মনে হচ্ছে দিনটাকে। ওর সঙ্গীরা সবাই অনেকটা সামনে এগিয়ে গেছে। সে আগের মতোই যন্ত্রের মতো পা ফেলতে থাকে স্বাভাবিক ছন্দে। কোনো তাগিদ নেই ভেতর থেকে। বাবুলের উপর হঠাৎ কোরে এখন ওর রাগটা বেড়ে গেছে।

শব্দটা হেলিকপ্টারের। এখন বেশ দূরে, তবুও স্পষ্ট বোঝা যায়। শব্দটা একটু একটু কোরে বড় হয়ে বিকট রূপ নিচ্ছে। সে পেছন ফিরে তাকালো। বেশ নিচু দিয়ে উড়ছে। ওকে ডানে রেখে হেলিকপ্টারটি পার হয়ে গেলো।

আট দশজন ছেলেমেয়ে। ওরা দৌড়াচ্ছে। পড়ি-মরি কোরে দৌড় লাগিয়েছে হেলিকপ্টারটা ছুঁয়ে দেয়ার জন্যে, এমন একটা ভাব। এখন আর ওরা হেলিকপ্টার দেখতে পাচ্ছে না। শব্দই ওদের সম্বল। শব্দের আকর্ষণে ওরা ছুটছে। ছেলেটার বয়স বড় জোর চার কি পাঁচ, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। উঠতে চেষ্টা করলো সাথে সাথে। পারলো না। আবার টাল হারিয়ে ফেললো। একটা নয়দশ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে পড়লো পেছনে তাকিয়ে। কিন্তু পিছিয়ে এলো

না। ওখানে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে কি যেনো বললো। তারপরই ছুট। আর তখনই পড়ে যাওয়া ছেলেটি হাত পা আছড়িয়ে কেঁদে উঠলো। শিমুল টের পেলো, ওর খুব পানি তেষ্টা পেয়েছে।

চতুর্থ কাঠিটিও নিভে যাওয়াতে বিরক্তে রেগে ওঠে শিমুল। কাঠিটা দূরে ছুঁড়ে মেরে সে দাঁড়ালো। হাতের আবডাল বানিয়ে নতুন কাঠি জ্বালিয়ে সে সিগারেট ধরালো। ওর পাশ দিয়ে দলটা পার হয়ে গেলো। হেলিকপ্টার ততোক্ষণে ল্যান্ড করেছে। এখন আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। শিমুল দলটার পাশাপাশি চলতে শুরু করে।

সবচে' বয়স্ক ব্যক্তি বললেন- 'আরে বাপু আস্তে হাঁটো না!

'তোমার যা কথা! এমনিতেই দেরি হইয়া গ্যাছে। চেয়ারম্যান না জানি কি কয়!'

'দিবো তো মোটে দুইসের গম। নিজে কতো কামাইবো, কে জানে?'

'তোমার যে কবে আক্কেল হইবো চাচা? এখনও সময় আছে, জিভটারে বাগ মানাও।'

'বোঝলা না, পেরসিডেন্ট আসতাছে। হের লগে আরো কত্তো গন্নী-মান্নী লোকজন আসবো। রেডিওতে খবর কইবো, টেলিভিশনে দেখাইবো। আমাগো চেয়ারম্যানের লাল নিশানাটা টেলিভিশনে আনতে হইবো না? সামনে চেয়ারম্যান আর তার চামচার দল,পেছনে আমরা কুত্তা-ছাগলের দল। দল যতো ভারী হইবো, চেয়ারম্যানের ততো লাভ। চাই কি, আমাগো ধলা খালটা কাটনের কামও পাইয়া যাইবার পারে। একদানে কেল্যা ফতে! মাটি কাটবো তিন কোপ, বিল হইবো তিন হাজার মন গমের। এক হাজার মন এ্যারে-তারে বখরা আর ভ্যাট দেওনের পরেও থাকবো দুই হাজার মন। সামনের এম.পি. ইলেকশনে খাড়াইলে তারে ঠেকায় কে?

'কওতো ভাই, খাল কাটলে তোমার আমার লাভটা কি?'

'ক্যান্, সেচ দিয়া বেশি বেশি ধান ফলাইবা, গম ফলাইবা; জলার মাছ ধইরা ভাতমাছ খাইবা। সরকার আমাগো মাছেভাতে বাঙালী না বানাইয়া ছাড়বো না।'

'আমাগো নাই জমি, পানি দিয়া কি হইবো?'

'তোমার যা কথা! ভাবছো পেরসিডেন্ট আমাগো সুখের লাইগা খাল কাটতাছে? তবেই হইছে! কথায় কয় না, তেলা মাথায় তেল দেওয়ন। ধনীরা খালের পানি দিয়া আরো বেশি ধান-পাট ফলাইবো, আরো বেশি ধনী হইবো। তাগো ফসল ফলানোর লাইগা মুনি লাগবো না? আমরা হইলাম মুনি। আমাগো জমি থাকলে মুনি হইবো কেডা? আগেও আমাগো ভাঙ্গা ঘর আছিল, এখনও ভাঙ্গা ঘরই আছে, কাইলও থাকবো। অহন পেরসিডেন্ট রামই হোক আর রমিজই হোক।'

'সেই আশার গুড়ে বালি, বাজান! খাল যা কাটে, দেখি না? মুইত্তা দিলে ধরনের জায়গা থাকে না। ভরাট খাট ভরাটই থাকে। উপর দিয়া দুই কোপ মাটি কাইট্যা বিল করো, ব্যস, ল্যাটা শেষ। গৌরী সেনের টাকা, পেরসিডেন্ট নাকি নিজেই কইছে। আধাআধি ভাগ দিয়া উপর দিয়া উপর-অলাগো মুখ বন্ধ কইরা দিতে কোনো অসুবিধা নাই। ধনী মাইনষের খালের পানিরও দরকার হয় না। হেগো লাইগা ডিপ মেশিন আছে না?'

'আরো কথা আছে চাচা। গেলো বছর বামন্দি থাইক্কা গোয়ালমারী পর্যন্ত যে রাস্তা বানানো হইলো, সেই রাস্তায় কত্তোগুলান বাঁক, খেয়াল কইরা দেখছো নি? কারণটা জানো? যাগো জমি বেশি, তারা ধনী বেশি; ক্ষমতাও তাগো হাতে। তারা নিজে গো ক্ষেতের উপর দিয়া রাস্তা দিলো না। রাস্তা গেলো জমির শেখ, পরাণ ফকির আর মাধব দাসগো ক্ষেতের উপর দিয়া। এমনিতেই পোড়া কপাল, নুন আনতে তাগো পান্তা ফুরায়; রাস্তাটা তাগো নুনও এইবার কাইড়া নিলো, পান্তাও কাইড়া নিলো। গরীব মারনের নিত্য নতুন কতো যে ফন্দী ফিকির বাইর হইতাছে চাচা!'

'হ চাচা। পাকিস্তানই ভালা আছিল। আমাগো দরকার বিটিশের মতন শক্ত রাজা।'

'না চাচা, ঠিক কইলা না। পাকিস্তানও ভালো না, বৃটিশও না। আসলে আমাগো দরকার জমি, দরকার ফসলের উপর অধিকার।'

'তয়, আমার কি মনে হয়, জানো? মনে হয় বঙ্গবন্ধু থাকলে আইজ এমন হইতো না।'

'রাখ তোর বঙ্গবন্ধু। আরে, মুজিবঘোটা কারে কয়, চিনোস? চোরের মার বড় গলা- আমার কম্বলটা কই?'

'যুদ্ধে দেশটা ধ্বংস হইয়া পড়ছিল না? সাত তাড়াতাড়ি সব সমস্যার সমাধান দেওন সম্ভব? উনি কি যাদু-মন্ত্র জানতেন?'

'তা জানতেন না। জানলে তার চেলা-চামুণ্ডারা লুটপাট কইরা রাতারাতি আঙ্গুল ফুইল্যা কলাগাছ হইতে পারতো না, লোকটার কপালেও ইমুন পরিণতি হইতো না। দুধের বাচ্চাটারেও রেহাই দিলো না। এমন কাম মাইনষে করে?'

'তয় চিন্তা কইরা দেখো!'

'চিন্তা করা আমার অনেক আগেই সারা। যত্তোসব রাজাকারগো মাফ কইরা দিলো দয়ার সাগর। আর তার পরপরই রক্ষী বাহিনী লেলাইয়া দিয়া হাজার হাজার যুবকের প্রাণ কাইড়া লইলো। এই সব জানে না কেডা?'

'এরজন্যে তো তোরাই দায়ী! তুইও তো জাসদ করতি। মফিজ মাস্টার করতো সিরাজ সিকদারের পার্টি। দুইদিনও হইলো না, দেশটা স্বাধীন হইছে। আর তোরা সব সমাজতন্ত্রের নামে কি তোলপাড় কাণ্ডটাই না শুরু করছিলি? শেষ পর্যন্ত পাইলি কি? নিজে জেল খাটলি, মারা পরলো মফিজ মাস্টার, আর সব দোষ পড়লো গিয়া রক্ষী বাহিনীর উপর।'

'অস্ত্র আমি আবার ধরুম, বুঝলি? আগে এতো সব বুঝতাম না।'

'এখন বুঝি খুব বুঝিস?'

'খুব না, তবে বুঝি। তগো সমাজতন্ত্র আর গণতন্ত্র, গণতন্ত্র আর ধর্ম নিরপেক্ষতা, তার লগে জাতীয়তাবাদ-এর ভণ্ডামিটা বুঝি। সমাজতন্ত্র মানে খালি মিল কল-কারখানা জাতীয়করন না, বুঝলি? মিল কল-কারখায় যা তৈরি হয়, তার উপর শ্রমিক শ্রেণীর পুরোপুরি অধিকার অর্জনই হইলো আসল কথা।'

'ঐ, তোরা প্যাচাল থামাবি? এতো বকবক করিস না। কাম কর, কাম। যার যার পথে আগাইয়া যা। তয়, কমতো দেখলাম না! হক সাব, সিরাজ সিকদার, সিরাজুল আলম খান- আরো কতো নেতা-পাতি নেতা! কেউ খালি গলা চুলকানো কথার খই ফুটাইয়া গেলো, কেউ

গলা কাটলো। শেষের হিসাবে- সব ফক্কা। ওইদিন কাশেম কইতেছিল, সিরাজুল আলম খান নাকি কইছে জাসদের প্রয়োজন শেষ। ভাবছোস নি কথাটা? প্রয়োজন শেষ মানে? তারা তো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র চাইতো! সমাজতন্ত্রের কথা থাকলেও তলে তলে অন্য কিছু চাইতো। জানোস তোরা, সেই অন্য সরাসরি ভাগটা একটু বেশি কইরা চাইছিল তারা মুজিবরের কাছে। পায় নাই। হের লাইগাই তাগো এত্তো গোস্সা, এত্তো আন্দোলন। এখন তো আর মুজিবুর রহমান নাই, দেন দরবার করবো কার লগে? তাছাড়া বর্তমান সরকারের কাছ থাইকাও মনে লয় ভালাই একটা দাঁও মারছে। যার লাইগা জাসদেরও আর প্রয়োজন নাই।'

'ঠিকই কইছো চাচা। তয়, আরো একটা কারণ আছে। '৭১ এর যুদ্ধে খালি আওয়ামী লীগ অংশ নেয় নাই, অংশ নিছে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক– সবাই। তারা সত্যিকারের স্বাধীনতাই চাইতো।'

'তুমি? তুমিও তো যুদ্ধ করছিলা। তুমি কি চাইছিলা, ভাই?'

'আমি সিরাজ সিকদারের গেরিলা বাহিনীর সদস্য আছিলাম। আমাগো লক্ষ্য আছিলো সত্যিকারের স্বাধীনতা। কৃষক জমি পাইবো, শ্রমিক পাইবো মিলের উপর অধিকার। যা কইতেছিলাম, কিন্তু আসল স্বাধীনতা আমরা শেষ পর্যন্ত পাই নাই। আমার মতো অনেক মুক্তিযোদ্ধার রক্তে তখন নেশা, সত্যিকারের স্বাধীনতার নেশা। সিরাজ সিকদার সেই নেশায় ছন্দ দিলেন, নেতৃত্ব দিয়া দল করলেন। মুজিব সরকার চিন্তায় পইড়া গেলো। শেষে লাল পতাকা ঠেকাইবার লাইগা নিজে গো অনুগত লোক লেলাইয়া দিয়া গঠন করলো জাসদ। হাতে দিলো ভন্ডামির লাল পতাকা– বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র! আসল লক্ষ্য, বিপ্লবীমনা যুবকদেরকে সাচ্চা বিপ্লবী পার্টির ধারে কাছে ঘেঁষতে না দেওয়া। সিরাজ সিকদার মারা গেলেন, দল লন্ডভন্ড হইয়া গেলো, বিপ্লবী যোদ্ধারা সিরাজ সিকদারের পার্টিতে থাইকা, জাসদে থাইকা দেদারসে মারা পড়লো, জেলে ঢুকলো, হতাশ হইলো। আপাতত: বিপ্লবী শক্তির একটা শক্ত পতন ঘটলো। এর লাইগাই সিরাজুল আলম খান কইতে পারছে– জাসদের প্রয়োজন শেষ। কথাটা মিছে না, অন্তত এই কথাটা সত্য কইরা কইছে।'

'আসল কথা কি জানো? মুজিবই কও আর জিয়াই কও, তারা আমাগো ভালা চায় না, চাইতে পারে না। রসের কথা কইয়া আমাগো দমাইয়া রাখে, ভুলাইয়া রাখে, শরীলে রক্ত টানার সিরিঞ্জ ঢুকাইয়া মাথায় হাত বুলায়। তারা শোষক, আমাগো রক্ত চুইষা বাইচ্চা থাকে।'

'হ হ, হক কথা কইছো কাকা। ভোট আইলেই মোলায়েম গলায় তাগো কি প্যানর প্যানর– দেশ ও দশের খেদমতের সুযোগ দিন। আসলে আমরা ভোট দিয়া আমাগো পাছায় বাঁশ দেওনের ক্ষমতা তাগো হাতে তুইলা দিই।'

'যা কইছো চাচা। কি দরদী কথা– ভোট আপনার গনতান্ত্রিক অধিকার! ক্যান্, রক্ত পানি কইরা আমি যেই ফসল ফলাই, তার উপর আমার গনতান্ত্রিক অধিকার নাই ক্যারে? শ্রমিক ক্যারে তার শ্রমে তৈয়ারি জিনিসের ন্যায্য দাম পায় না? পায় না ন্যায্য পারিশ্রমিক?'

'নানা, এই যে হেলিকপ্টার দিয়া প্রেসিডেন্ট ঘন ঘন আসা-যাওয়া করে, তার খরচ কতো, জানো? লাখ লাখ টাকা। প্রেসিডেন্টের লগে আরো কতো হোমরা চোমরা লোকজন আসে। তাগো পেছনেও খরচ আছে। সব খরচ কিন্তু আমাদের ট্যাকস থাইকাই আসে। আমাদের টাকায় ফুটানি, বুঝলা? এতো ঘন ঘন ওড়াউড়ি না কইরা টাকাগুলান দিয়া দে না একটা

কাপড়ের মিল? তা দেবে না। তাতে তো আর বাবুগিড়ি চলে না।'

'আরো কারণ আছে, বুঝলি? আমাদের এই সরকার হইলো দালাল সরকার, সাম্রাজ্যবাদীর পা চাটা দালাল। ভাবছিস, সেই প্রভুরা মিল করার অনুমতি দেবে? আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করি, তবে তাদের জিনিস কই বিক্রি হবে? আমাদের দেশ তো তাদের অবাধ বাজার, হরিলুটের দাদন তারা বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতা দেওয়ার নামে পাকা-পোক্ত কোরে নেয়। দেখিস না, ওরা টাকা দেয় রাস্তা বানাতে, মসজিদ-মন্দির-গির্জা বানাতে, এয়ারপোর্ট-রেডিও সেন্টারের জন্যে, কিন্তু ভুল কোরেও ইন্ডাস্ট্রিজ করার জন্যে না।'

শিমুল যেনো গভীর এক ঘোরে ডুবে গেছিল। কান পেতে শুনছিল কথাগুলো। খুব খারাপ হয়ে গেলো ওর মন। একটুও পানি নেই। খালের উপর দিয়ে নতুন বাঁশের সাঁকো। লোকগুলো সাঁকোর সামনে এসে আলাপ থামিয়ে দিলো। অমনযোগী হয়ে অন্তত: বাঁশের সাঁকো পার হওয়া যায় না। আর সাঁকোর উপরেই একদল পুলিশ। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা শুরু হয়ে গেছে। সে নি:শব্দে ওদের পেছনে থেকে সাঁকোতে পা রাখলো।

শিমুল তিন তিনটে পত্রিকাই খুঁটিয়ে পড়লো। খবর একই। সে হতবাক হয়ে পড়ে। হঠাৎ কোরেই যেনো ওর কাছে ফাঁকটা ধরা পড়ে গেলো। উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে একই খবর কি কোরে গুণগতভাবেও পাল্টে যেতে পারে, ইত্তেফাক আর সংবাদ-এর রিপোর্টিংই তার প্রমাণ। কোন্‌টায় কতোটা সঠিক আর কতোটা বেঠিক, সে বুঝে উঠতে পারে না। সংবাদ পত্রের উপর থেকে ওর বিশ্বাসের ধ্বস নেমে আসে। হেডিং-এও কতো পার্থক্য! পার্থক্যটুকু কেবল শব্দগত নয়, অর্থগতও। গোলটা এখানেই। ইত্তেফাকে লিখেছে– 'দুস্কৃতকারীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বন্দুকযুদ্ধে ৭ জন খুন।' সংবাদের হেডিং– 'সর্বহারার সাথে জাসদের সংঘর্ষ, পুলিশসহ চারজন নিহত, আহত এগারো।' দুটো খবরই স্টাফ রিপোর্টারের।

ইদানিং পত্রিকা খুললে প্রায়ই সর্বহারাদের (স.বি.প.) সাথে জাসদের সংঘর্ষের খবর চোখে পড়ে। মুখোমুখি বন্দুকযুদ্ধ। এক মাদারীপুরেই প্রায় তিনহাজার আর্মড পুলিশ নামানো হয়েছে। ওই পর্যন্তই, কাজের কাজ তেমন কিছু হচ্ছে না। দি ইউনিভার্স-এর নিউজ– 'সর্বহারাদের

উৎখাতের জন্যে পুলিশ অস্ত্রসস্ত্র দিয়ে জাসদকে সহযোগিতা করছে, একই সাথে যৌথভাবে অপারেশনে নামছে।' কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। হিসাবটা শিমুল কিছুতেই মেলাতে পারে না। জাসদ এখন ওপেন দল। অস্ত্রের রাজনীতি ভুল বোলে তা ত্যাগ কোরে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে। নেতারাও যেখানে সেখানে প্রকাশ্যে মিটিং সভা কোরে বেড়াচ্ছে। পত্রিকার রিপোর্টও তাই। অথচ ওদের হাতে অস্ত্র? কেনো? কোন স্বার্থে ওরা সর্বহারা পার্টির সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নেমেছে? কই, সরকারতো ওদের নেতা কর্মীদের গ্রেফতারও করছে না? করলে নিশ্চয় পত্রিকার খবর হতো। অন্যদিকে সরকারকে গৌণ বানিয়ে সর্বহারা পার্টিই বা কোন প্রয়োজনে জাসদের সাথে লড়াইয়ে নেমেছে? এটাকে বিপ্লব বলে? কেনো মানে হয় না। পত্রিকায় সর্বহারা পার্টির খবর হচ্ছে। কিন্তু কেনো ওরা জান দিচ্ছে, অত্যাচার সহ্য করছে, এক অস্বাভাবিক জীবনের স্রোতে সাঁতরে চলছে, কই, সেইসব ব্যাখ্যা দিয়ে কোনো খবরতো হচ্ছে না? শিমুলের রাগ শুধু বেড়েই চলে। ভণ্ডামি বা ফাঁকিটুকু ওর চেতনার ফাঁদে ধরা পড়ে যায়।

সর্বহারা পার্টি সম্পর্কে শিমুল তেমন একটা জানে না। তাও আবার দুই গ্রুপ সর্বহারা স.বি.প ও সর্বহারা অ.প.ক। স.বি.প ও অ.প.ক এর পুরো শব্দগত অর্থ কি, দুই গ্রুপ কি কোরে হলো, ওদের মাঝে আদর্শগত মিল কতোটা, ফারাকই বা কতোটা, সে এসবের কিছু জানে না। কিন্তু জানার জন্যে ওর ভেতরে গোপনে একটা কৌতুহল প্রতিনিয়ত বেড়ে উঠছে। গত স্বাধীনতা বিশেষ সংখ্যা বিচিত্রায় সিরাজ সিকদারকে নিয়ে একটা লেখা ছিলো। লেখাটা শিমুল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছিল। জানার আগ্রহটা সেই থেকেই ওকে মাঝে মাঝে খোঁচায়। বাবুল ইদানিং মৈত্রী আর কম্যুনিস্ট লীগ ছাড়া আর কিছু বোঝে না এবং ওর বিশ্বাস কেবলমাত্র এ দু'টোকে জড়িয়ে রেখেছে বিপ্লবের লাল রঙ। শিমুল সর্বহারা পার্টি সম্পর্কে ওকে জিজ্ঞেস করেছিল। বাবুল সাথে সাথে কিছু বলেনি। কিছুক্ষণ শীতল চোখে সে শিমুলের দিকে চেয়েছিল। শেষে বেশ গম্ভীর হয়েই পরামর্শ দিয়েছিল– 'নামটা যেখানে সেখানে মুখে আনিসনে, পুলিশ ঝামেলা বাঁধাবে।'

শিমুল খবরের কাগজের পাতা উল্টায়। বড় বেশি কমার্শিয়াল হয়ে পড়েছে ইত্তেফাক পত্রিকাটি। তিন পৃষ্ঠা শুধু বিজ্ঞাপনে ঠাসা। 'উৎপাদন মূল্য না পেয়ে পাটে অগ্নিসংযোগ- কৃষকের অভিনব বিদ্রোহ।' সংবাদটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অথচ চোখে লাগার মতো ছোটো আর সংক্ষেপ কোরে লেখা হয়েছে। শিমুল উঠে দাঁড়ালো। 'এক্ষুণি অভিষেক অনুষ্ঠান শুরু হবে।' মাইকের স্পষ্ট আওয়াজ। কমচে কম বিশ-পঁচিশবার এই একটি কথা আওড়ানো হয়েছে অথচ অনুষ্ঠান এখনো শুরু হয়নি। এতোক্ষণ পরে হঠাৎ কোরে ওর খুব চা খেতে ইচ্ছে হলো এবং ইচ্ছে হতেই সে আবার চেয়ারে বোসে পড়লো। ঘড়ি দেখলো। ৩টা ৪২ মিনিট। এরই মধ্যে ১২ মিনিট দেরি হয়ে গেছে। চায়ের অর্ডার দিয়ে সে চোখ বন্ধ কোরে চেয়ারে হেলান দিলো।

কলেজ সাংসদদের বরণ অনুষ্ঠান। পাঁচদিন আগে কলেজ সংসদের নির্বাচন হয়ে গেছে। শিমুলও ভোট দিয়েছিল। সে সক্রিয়ভাবে কোনো সংগঠনে জড়িত হয়নি। স্কুল জীবনের বন্ধু বাবুল মৈত্রী করে। ওর সাথে সে কখনো সখনো মৈত্রীর মিটিংয়ে যায়। খোকন প্রথম সময়ের ভালো বন্ধু ছিলো। কিন্তু দুইদিন বাবুলের সাথে দেখে শেষে শিমুলকে এড়িয়ে চলতে শুরু

করেছে। তবুও ভোটের আগে সে ভোট চেয়েছিল। শিমুল সুস্পষ্ঠভাবে কিছু বলেনি, হেসে করমর্দন করেছিল। প্রায় সব ক'জন ছাত্র নেতাকেই ওর দুর্বোধ্য লেগেছিল। নির্বাচনের আগে কেউ খোঁজও নিতে আসেনি। অথচ নির্বাচন আসতেই সে কি তোড়-জোড়, ধুমধাম: প্রচারণা: দারুণ উত্তেজনা! মিছিলে মিছিলে কলেজ কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। ক্লাশ প্রায় পনেরোদিন হয়ইনি বলা যায়।

ভোট দেওয়ার একঘন্টা আগেও শিমুল ভেবে ভেবে ঠিক করতে পারেনি, সে কাকে ভোট দেবে। ক্লাশ রিপ্রেজেন্টেটিভ বদরুল ওর বন্ধু। কলেজে কবিতার গোপন একটা আড্ডা বসে। সেই আসরের বন্ধু বদরুল। দারুণ সব রোমান্টিক কবিতা লেখে। পিন্টুও বন্ধু। একই পাড়ায় বাস। দারুণ সভ্য এবং ব্রিলিয়ান্ট। কি কোরে যে জাতীয় ছাত্র দলের সাথে যুক্ত হয়ে গেলো! বাবুলও দাঁড়িয়েছিল। বাবুলটা আবার ব্যাক্তি জীবনে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। ইদানিং রীতিমত গাঁজা টানে।

নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো ছাত্রমৈত্রী। কিন্তু জি.এস.পদটা চলে যায় ছাত্রলীগের মুঠোয়, আর এ.জিএস. জাতীয়তাবাদীদের দখলে। ফলাফল নিয়েও সে কি টগবগে উত্তেজনা। বাবুলের হাতে ওইদিন শিমুল এস.এম.জি দেখেছিল। অবশ্য উত্তাপটা শেষ পর্যন্ত মিছিলে মিছিলে গলে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

শিমুল তাড়াহুড়ো করলো না। অধ্যক্ষর বক্তব্য শুনলো ক্যান্টিনে বোসেই। সে আয়েশ কোরে সিগারেট শেষ করলো। পরে ধীরে-সুস্থে মঞ্চের পূবপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভিড়ের সাথে গিয়ে দাঁড়ালো।

কামার ফরিদ কয়েকবার তাগাদা দিয়েও শিমুলের নাগাল পায়নি। ওর মন খুব খারাপ ছিলো। শিমুলের সাহিত্য নিয়ে এতো ঘেঁষাঘেষিটা লীনা পছন্দ করে না। আভাসে ইঙ্গিতে কথাটা সে শিমুলকে কয়েকবার জানিয়ে দিয়েছে। শিমুল থামেনি। থামা যায় না। এমনও কোনো কোনো মুহূর্ত আসে, যা' বর্ণমালার আঁচড়ে প্রকাশ করতে না পারলে ওর ভেতরে সঞ্চারিত ছটফটানীটুকু মোটেই শান্ত হয় না। সে অস্থিরতায় ছটফট করে। বড়'পা কেনো যে তা' বোঝে না! শিমুল ক্ষোভের সাথে বড়'পার সাথে কখনো সখনো কথা বলাই বন্ধ কোরে দেয়। প্রায় প্রতিবার লীনাই আপোস করতে এগিয়ে আসে, আপোষ হতেও খুব একটা দেরি হয় না। কিন্তু এইবারের আঘাতটা আশ্চর্য রকমের নিষ্ঠুর এবং নৃশংস। চারটে ছোট গল্প আর দশটা কবিতা লেখা খাতাটা উধাও। উধাও তো উধাওই– যেনো হাওয়ায় মিশে গেছে। লীনাকে কাঁদো কাঁদো গলায় শিমুল জিজ্ঞেস করেছিল– 'আমার কবিতা খাতাটা কই, বড়'পা? কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না!'

'কোনো বন্ধুর বাসায় ফেলে এসেছিস কি না, মনে কোরে দেখ।' কেমন নির্লিপ্ত গলায় বড়'পা জবাব দিয়েছিল! তাতেই বড়'পার উপর শিমুলের সন্দেহ পাকা হয়।

শিমুলের কান্না পেলো রাগে আর দু:খে। ওর স্পষ্টই মনে আছে, গতরাতে নিজের লেখা একটা কবিতা ফ্রেশ কোরে খাতাটা সে বুক সেল্‌ফ-এ রেখেছিল। পরে আর হাত দেয়নি খাতায়। ঠোঁট কামড়ে সে বললো- 'খাতাটা সেল্‌ফ্-এই ছিলো।'

'তা হোলে খুঁজে দেখ, আছে নিশ্চয়।'

শিমুল আশ্চর্য হলো। কেমন নিরাসক্ত আর বেখেয়ালী বড়'পার গলা। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে সে এবার কেঁদেই ফেললো-'বললাম তো নেই!'

'নেই তো যাবে কোথায়? আবার খুঁজে দেখ।'

'তুই নিসনি?'

'আমি নিতে যাবো কেনো? না থাকলে খাতা আরেকটা কিনে নে। ব্যাগে টাকা আছে, নিয়ে যা।'

শিমুল আর সামাল দিতে পারেনি। ভেতরের রাগ-ক্ষোভ-দু:খ লোনাজল হয়ে ওর দু'চোখ ঝাপসা কোরে দিয়েছিল। লীনা নি:শব্দে সবই দেখেছিল কিন্তু কিছু বলেনি। এমনিতেই শিমুলের মনটা খুব খারাপ হয়েছিল। রিয়ার চিঠিপত্র নেই, নেই কোনো খবরাখবর। প্রথমদিকে বেশ কয়েকটা চিঠি ঠিকই পেয়েছিল। তারপরই মাস তিনেক কোনো চিঠি নেই। শিমুলের সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহটা সঠিকই ছিলো। ভিন্ন একটা ঠিকানা দিয়েছিল রিয়াকে। সেই ঠিকানায় রিয়া জানিয়েছিল সে গত তিন মাসে পাঁচটা চিঠিই পেয়েছে, প্রতিবার জবাবও দিয়েছে যা শিমুল পায়নি। সেই থেকেই বড়'পার উপর ওর প্রচণ্ড রাগ। রাগটা কমে এসেছিল। কিন্তু হঠাৎ কোরে আবার মাস খানেক হচ্ছে, বর্তমান ঠিকানায়ও শিমুল রিয়ার কোনো চিঠি পাচ্ছে না। শিমুল কারণটা খুঁজে পায় না। এমন এক বেদনাময় মুহূর্তে 'তোমার জন্যে কবিতা' নাম দিয়ে পরপর সাতটা কবিতা লিখেছিল রিয়াকে নিয়ে। সবই ওই খাতায়। শিমুল মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল- খাতাটা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত সে বাসায় খাবে না। ওর ধারণা, খাতা বড়'পাই সরিয়েছে।

চার চারটে দিন শিমুল সত্যি সত্যিই বাসায় খায়নি। একগ্লাস পানিও না। তবুও খাতাটা সে ফেরত পায়নি। মা ওইসময় না এলে শেষ পর্যন্ত কি যে হতো, বলা যায় না। চারদিনের মাথায় নোটিশ ছাড়াই লতা এসে হাজির। মাকে নিয়ে শিমুল ইদানিং খুব একটা ভাবে না। তবে মাঝে মাঝে মায়ের জন্যে ওর কষ্ট হয়, সত্যিকারের কষ্ট। সে মাকে নিয়েও একটা কবিতা লিখেছে, 'তোমায় ভালোবাসি বোলে'।

শিমুলের ওই কান্না-বিক্ষুব্ধ সময়েই কামার ফরিদ ওকে খুঁজেছিলেন। অভিষেক অনুষ্ঠানে একটা গীতিনাট্য করা হচ্ছে। তিনিই লিখেছেন। ওতে অংশ নেওয়ানোর জন্যেই শিমুলের খোঁজ। এতোসব কথা শিমুল যখন জেনেছিল, তখন গীতিনাট্যের চূড়ান্ত রিহার্সেল শুরু হয়ে গিয়েছিল।

পরপর দু'টো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন রোজী আফরোজ। শ্রোতা মণ্ডলীর উপর যেনো অদৃশ্য কিন্তু তীব্র এক আফিমের নেশাকর ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো সুরে সুরে, কথায় কথায়। এ ধরনের চুপসে যাওয়া নি:স্তব্ধতা শিমুলের অপছন্দ। সে নড়ে চড়ে বসলো।

কথা নেই, বার্তা নেই, শিমুলের কলার ধোরে টান। শিমুল পেছন ফিরে তাকালো। বাবুল। ওর চোখ দুটো লালচে। হাসলো একটু। কলার ছেড়ে শিমুলের হাত ধরলো। সে প্রায় টেনে তিঁচড়ে শিমুলকে মঞ্চের পেছনে শিল্পীদের জন্যে আলাদা নিজস্ব রুমে নিয়ে এলো।

মঞ্চে উঠেছে তিনজন মেয়ে ও একজন ছেলে। নৃত্য। এরপরই শাওনের পালা। গান গাবে। সাথে কমিক। ওকে তবলায় সহযোগিতা কোরে আসছিল রফিক। স্টেজ করতে গিয়ে ওর ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলটা মচকে গেছে। কোনোভাবেই তবলা বাজানো সম্ভব নয়। এ কারণেই শিমুলের তলব। একটু আগে রোজী আফরোজের সাথে যে তবলা বাজালো, শিমুল বোঝে, সে নিজে কোনোভাবেই ওর সমকক্ষ নয়। তবুও শিমুলকেই শাওনের পছন্দ। বিভিন্ন আড্ডায় সে শাওনের গানে কখনো সখনো তবলা বাজিয়েছে, পক্ষপাতিত্ব বা নির্ভরতার কারণ এটাই।

শাওনের গান শেষ হলো। নজরুল গীতি– 'আকাশের আরশীতে ভাই।' ওর গলার কাজ বরাবরই ভালো। আজ যেনো আরো ভালো হয়েছে। 'ওয়ান মোর, ওয়ান মোর' হৈ চৈ উপেক্ষা কোরে সে কামার ফরিদের কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে। পরে আরো একটা কবিতা- মাক্সিম গোর্কীর 'ঝড়ের পাখী'। তারপরই কৌতুক। দর্শক শ্রোতাদের পেটে হাসির উত্তাল ঝড় পুরে দিয়ে শাওন বড় বেশি থমথমে। কি যেনো গভীরভাবে ভাবছে। চোখ দু'টো কি স্থির আর গভীর!

'আমার শেষ অভিনয়। তারপর- বি-দা-য়। তো, আগে ভাগেই আপনাদের কাছে আমার সব ধরনের ভুল ত্রুটির জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এবার অভিনয়! আমার এক বন্ধু, হ্যাঁ, বন্ধুই, যার ডান গালে একটা তিল ছিলো, কালো তিল, সে প্রেমে পড়েছিল। ধরুন, মেয়েটির নাম বন্যা। আমার বন্ধুর চোখে তখন ধবল জ্যোস্নার বন্যা, মুখে স্বপ্নচারী নরম বাকুম বাকুম শব্দের বন্যা, ঘুমে রঙধনুর সাতরঙা বন্যা; শুধু বন্যা আর বন্যা।'

দর্শকদের দুইচারজন শাওনের কথা বলার ঢংয়ে হেসে ফেললো। শিমুলের চোখেমুখেও তার ছোঁয়া। ওর চোখ তখন শাওনের ডান গালে লেপ্টে থাকা কালো তিলটার গায়ে।

'আপনারা হাসছেন? শাওনের কণ্ঠ বিস্ময়াহত। তা হাসুন। আমি ধোরে নিচ্ছি, যারা হাসছেন, তারা কখনো প্রেমে পড়েননি।'

আবার উত্তাল হাসির ঢেউ উঠলো দর্শক শ্রোতাদের ভেতরে। শিস বাজালো দুই তিনজন।

'যথেষ্ট হয়েছে। যা বলছিলাম, ঘটনাচক্রে আমার ওই বন্ধু ওর আরেক বন্ধুর সাথে, ধরুন, ওর নাম তপন, বন্যাকে পরিচয় করিয়ে দিলো। ওতেই কাল হলো। ধনে-মানে আর চেহারা-সুরতে আমার বন্ধুর চেয়ে তপন গজখানেক এগিয়ে। বন্যা দিনে দিনে পাল্টে গেলো, কিন্তু আমার বন্ধুটি নিজেকে আর পাল্টাতে পারলো না। আহাম্মক কি না, তাই। প্লেটোনিক প্রেমে বুঁদে থাকা বাবা-মার একমাত্র আদুরে ছেলের যা হয়। একটা আস্তো কাওয়ার্ড।

শিমুলের মনে খট কোরে বাজলো। শাওন বাবা-মার একমাত্র ছেলে। ডান গালে তিল। ওর প্রেমিকাকে শিমুল ভালো কোরে চেনে না। তবে নাম শুনেছে। ঝর্ণা। শাওনের একবন্ধু– রবি।

সিটি কলেজে পড়ে। ছাত্র হিসেবে গবেট হোলেও স্ট্যাটাসে ফুরফুরে, তরতাজা; অনেক এগিয়ে থাকা ওর স্বভাব।

'কয়েক মাসের মধ্যেই বন্যা তপনের প্রেমে ডুবে গেলো। জ্বি, এই তপন আমার সেই বন্ধুর বন্ধু। বন্যা তপনের হাত ধোরে স্বপ্নের সিঁড়ি ভেঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পায়ে শিশির মাখে, চোখে মাখে আগামীর কল্পিত রূপ-রস-গন্ধ। আমার সেই বন্ধু তপন বন্যার হাতে এনে দেয় কখনো মেহেদী, কখনো তরতাজা ঘাসফুল। সেই মেহেদী আর ঘাসফুলে মাখানো থাকে আভিজাত্যের পারফিউম ঘ্রাণ! আর আমার গবেট বন্ধু? অনেক চেষ্টা কোরেও বন্যাকে ফেরাতে পারেনি। তবে, সেও থামেনি। সেও মাতাল উল্লাসে শূন্যতার পথ ভেঙ্গে এগিয়ে যায় তেপান্তরের মাঠের খোঁজে। বড়বেশি একাকী সেই পথ চলা, বুকে তার বয়ে চলে হু হু কান্নার ঝড়। শেষে, আমার বন্ধু কোনো এক ধূসর সময়ে সিদ্ধান্ত নিলো, হ্যাঁ, সেই সিদ্ধান্তের বাস্তব চিত্ররূপই আমি অভিনয় কোরে আপনাদের দেখাবো। Life is a critical drama and all of us are to play a very special role.

'কোনো একদিন, ঠিক এমন এক দিনে, আমার বন্ধু আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্লিজ, চম্‌কে যাবেন না, হাসবেনও না। এ বড় কষ্টের কথা। আত্মহত্যার আগে বন্ধু আমার তার প্রিয় একটা কবিতা আবৃতি করেছিল এভাবে.........

যেখানে তুমি নেই
সেখানে আমিও নেই,
জীবনের শ্বেত কপোত পাখা মেলে নির্মম
মৃত্যুআকাশে!

তুমি ছাড়া-
আমার হৃদপিণ্ডে চলে উত্তপ্ত বালুর প্রবাহ
হৃদয়ের কোমলতায় ফনিমনসারা তোলে ফণা
ফোটা কুঁড়ি ঝোরে ঝোরে
অবিরাম ছাড়ায় দুর্গন্ধ!

তবুও ভালো আছি আমি!

তুমিও কেমন আছো জানার ইচ্ছেগুলো
আমার নীরবতায় করে বিদ্রোহ;
হয়তো তুমি বেশ ভালো আছো!

হৃদয়ের কোমলতায় তোমার সোনার কারুকাজ
সাগরের মোহনায় জেগে ওঠা এক

সবুজ দ্বীপের ছবি– তোমার সুখ!

তবুও আমার ইচ্ছে করে জানতে,
আমার এ চোখ দেখে
তোমার চোখে কি কভু একটুও ভাসে না
যন্ত্রণার হিমালয়,
তুমিও কি হারোনি জীবনের খেলায়
আমার হারাতে?

কোথাও এক টুকরো শব্দ নেই। বেশ দূরে রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে একটা মোটর সাইকেল চলে যাওয়ার শব্দ এই নি:স্তব্ধ চুপচাপকে আরো বেশি শান্ত আর বাকরহিত কোরে রাখলো। কবিতার শরীর চুঁইয়ে যেনো বেদনার লাবণ্য ঝরছে। আর দর্শক শ্রোতারা সেই লাবণ্যের গন্ধে বিমোহিত! 'বেয়াদব ভাববেন না। আমি এখন আমি নই, আমি এখন কেবলই আমার বন্ধু, বন্ধুর প্রতিকৃতি।'

শাওন পকেট থেকে বেনসন বের কোরে জ্বাললো। সত্যিকারের তৃপ্তি নিয়ে সে সিগারেটে টান দিলো। আমার সেই বন্ধু শেষবারের মতো আয়নার সামনে গিয়ে খানিকটা সময় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। জানিনে সে কি ভেবেছিল। তার জায়গায় এখন আমি। আমার সামনে আয়না নেই, আছেন আপনারা। আমার মনে হচ্ছে, সোনালী সময় থেকে সৃষ্টি হওয়া একঝাঁক ধবল কবুতর আপনাদের চারপাশে উড়ছে। বাক-বাকুম বাক-বাকুম শব্দের মাতোয়ারা উচ্ছ্বাসে আপনারা বিমোহিত। কিন্তু আমার ভালো লাগছে না কিছু, কিচ্ছু না।

শাওন মঞ্চের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। ওর মুখটা কেমন থমথমে, বিবর্ণ। যেনো ধূসর লাবণ্য মাখা এক স্তব্ধ তারুণ্য। সে সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বললো–' আমার সেই বন্ধুর মুখে একদম শেষ সময়ে যে কথাটি শব্দ হয়ে ঝরেছিল, আপনারা তা শোনবেন না? বলেছিল– **ঋধৎবষষ, ঃযব ধসব রং ড়াবৎ.**' তারপর শাওন পকেট থেকে ছোট্ট একটা শিশি বের করলো। ওর চোখ দু'টো বড়বেশি উদাস, উদভ্রান্ত; যেনো এক অচেনা ঘোরে সে ডুবে আছে। ওভাবেই সে দর্শক শ্রোতাদের দিকে সেকেন্ড বিশেক তাকিয়ে থাকে। একজায়গায় ওর চোখ গিয়ে স্থির, নিশ্চল! শিমুলের মনে হলো, শাওন হয়তো এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। সে বুকভাঙ্গা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। হাতের শিশির দিকে ফ্যালফেলিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে শিশির মুখ খুললো। কণ্ঠ তার কাঁপছে– 'আমার সেই হতভাগা বন্ধু, হ্যাঁ, হতভাগাই, ঠিক এভাবে শিশির সবটুকু বিষ এভাবেই তার গলায় ঢেলেছিল।'

মঞ্চের উপর ঢলে পড়ে শাওন। শেষ সময়ে সে হয়তো একটু হাসতে চাইলো, ব্যাঙ্গ হাসি। অথচ কষ্টের তীব্র যন্ত্রণায় ওর চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে চাইছে, মুখ বেঁকে গেছে। ঠোঁটের কোণ চুইয়ে গোলাপী রঙয়ের পটাশিয়াম সায়ানাইড গড়িয়ে পড়ছে একটু একটু। এতোসব হলো কয়েক মুহূর্তের ভেতরে। যেনো প্রচণ্ড ক্লাইমেক্সঘেরা ছায়াছবির কোনো যবনিকা

দৃশ্য। দর্শকদের মাঝে হৈ চৈ। শিমুল স্তব্ধ হয়ে গেলো ঘটনার আকস্মিকতায়। বিশ্বাসই হচ্ছে না। তাও কয়েক মুহূর্ত! তারপরই সে দ্রুত জাপ্টে ধরে শাওনকে। শাওন তখন একদম শান্ত।

ছেলেটাকে শিমুল চিনতে পারলো না। বয়সে কিছুটা বেশি। ওর সাথে শাওনকে ধোরে রিক্সায় নিয়ে এলো। অনুষ্ঠান অচল। রিক্সার তিন পাশে ছাত্র ছাত্রীর ঢল। রিক্সা শহীদ মিনার ছাড়িয়ে মেইন গেটে গিয়ে পড়লো এবং তখনই তিনটে মোটর সাইকেল এসে রিক্সার পাশে হঠাৎ কোরে থেমে গেলো। দুই মোটর সাইকেল থেকে দুই জন ডাক্তার নেমে এলেন। শাওনের বোঁজা চোখের পাতা টেনে দেখলেন। বিশেষ কোরে ডান চোখটা। হাতের পার্লস দেখলেন। ডাক্তার কি বুকভাঙ্গা একটা দীর্ঘশ্বাসকে হঠাৎ সচেতন ভাবে গিলে ফেললেন? শিমুলের তাই মনে হলো। তিনি হালকা ভাবে মাথা ঝাঁকালেন। সেই হালকা ঝাঁকুনিটুকু শিমুলকে প্রবলভাবে দুলিয়ে দিলো। ওর মাথা ঘুরছে, যন্ত্রণায় বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, ভেতর থেকে দলা দলা কষ্ট এসে গলায় আটকে যাচ্ছে। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওর, খুব খু-উ-ব কষ্ট। সে কষ্টের হলুদ ঘ্রাণে ডুবে থেকে অপলক চোখে শাওনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মিনিট দেড়েকের মধ্যে একটা মোটর সাইকেলে আগুন জ্বলে উঠলো। শহীদ মিনারের পূবপাশে যে কৃষ্ণচূড়া গাছটি, তার তলায় আগুন আর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। শিমুলদের সামনে দিয়ে ট্রাক যাচ্ছিল। একদল ছেলে দৌড়ে গেলো। মুহূর্তে ট্রাকে দাউ দাউ কোরে আগুন জ্বলে উঠলো। স্বতস্ফূর্ত একটা উত্তাল মিছিল। হুট কোরে একটা প্রাইভেট কার ওদেরকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত চলে গেলো। কয়েকজন ছেলে দৌড়ে গেলো। অন্য সময় হোলে শিমুলের রাগ হতো, ক্ষেপে যেতো। এসবের কোনো মানে হয়? আজ কিন্তু ওই ধরনের কোনো প্রতিক্রিয়া ওর হলো না। মনে হলো, ছেলেগুলোর পায়ে জোর নেই। সে নিজে হোলে গাড়িটাকে ঠিকই বাগে পেয়ে যেতো। হঠাৎ কোরে ওর শাওনকে নাম ধোরে ডাকতে ইচ্ছে হলো। একটু আগেও গান গাইলো, আর এখন কথা বলবে না? ইয়ার্কি? শিমুল সত্যি সত্যি কষ্টের সীমানায় ঘুরপাক খেতে খেতে ডাক দেয়– 'শাওন, এই শাওন।' কিন্তু ওর গলায় সুস্পষ্ট কোনো সুর ফোটে না, শুধু চোখ বেয়ে ফোটায় ফোটায় লোনাজল গড়াতে থাকে। সেই লোনাজল হাতের চেটোয় মুছতে মুছতে সে বিড়বিড় করে– 'দোস্ত, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে রে, চোখ ম্যাল শাওন, দোস্ত, একবার চোখ ম্যাল!' শিমুল আলতো কোরে শাওনকে ধাক্কা দেয়। ইস, কাঁদতে পারাও কি এতো অসম্ভব রকমের সহজ?

শিমুল এলোমেলো ভাবে রাস্তায় অনেকক্ষণ হাঁটলো। পা দু'টো ব্যথা হয়ে এসেছে, তবুও সে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে সে একটা অদৃশ্য ঘোরের ফাঁদে আটকা পড়ে। শাওনের নিথর হয়ে যাওয়া বেদনাসিক্ত নীলাভ মুখ ওর মনের পর্দায় সার্বক্ষণিক ঝুলে থাকে। কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না সেই মুখ। তিনজন মেয়ের মাঝ থেকে সে কল্পনায় বন্যাকে টেনে বের করতে চেষ্টা করলো বারবার। তাও শেষ পর্যন্ত পারলো না। কোন মেয়েটা ঝর্ণা? শিমুল নামই শুনেছিল, কোনোদিন দেখেনি। আজ দেখেও চেনেনি। পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার কয়েক সেকেন্ড

আগে শাওন তিনজন মেয়ের দিকে তাকিয়েছিল। চোখে অদ্ভুদ একটা আলোর নাচন তখন জেগে উঠেই ডুবে গিয়েছিল শাওনের নিভৃত্য তপোবন থেকে। শিমুল তখন তেমন একটা পাত্তা দেয়নি। অথচ এখন নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পারছে না নিজেকে ফেরাতে। আর মাঝে মাঝে রিয়ার মুখ ভেসে ভেসে উঠছে। রিয়াও কি বন্যার মতো করবে? এরই মধ্যে শুরু করেনি তো? আজ সকালেও সে যা ভাবেনি, ভাবনা আসেনি, এখন তাই আসছে। চিঠি না দেয়ার আর কি কারণ থাকতে পারে? বড়'পার জানার কথা নয় অন্য ঠিকানাটা। তা হোলে? ভেতরটা ওর বড় বেশি উতালা হয়ে ওঠে। শাওনের শেষ কথাটা বারবার হিয়ার দোলনায় দোল খেয়ে উঠছে- Frailty, thy name is woman.

আচ্ছা, রিয়া যদি বন্যার মতো করে, শিমুল তাহলে কি করবে? শাওনের মতো মরে যাবে? মরে গেলেই তো সব জ্বালা, সব বেদনা, গ্লানিমা, ক্লান্তি শেষ। কি লাভ একবুক ব্যথা নিয়ে ধুকে ধুকে বেঁচে থাকা? মরে গেলেই শেষ। কে কাঁদছে না কাঁদছে, তা তো আর দেখতে হচ্ছে না! ধ্যেৎ, মরাটা অতো সস্তা না! আগে রিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ইয়ার্কি নাকি? শাওন অবশ্য বন্যার সামনে ওভাবে বিষ খেয়ে একহাত নিয়েছে। শিমুল এতো সহজে মরতে যাবে না। মরতেই যদি হয়, শেষ পর্যন্ত দেখেই মরবে। দরকার হোলে দৌড়াতে-দৌড়াতে, নিদেন পক্ষে হাঁটতে হাঁটতে মরবে, দাঁড়িয়ে থেকে নয়। প্রয়োজনে রিয়াকে তুলে আনতে হবে। অসম্ভব কোনো ঘটনা নয়। আলমকে বললেই হবে। রিয়ার গালে একটা চিহ্ন বানিয়ে দিতে হবে। পার্বতীর কথা ওর মনে পড়লো। দেবদাসের পার্বতী। শিমুল অবশ্য দেবদাসকে একটুও পছন্দ করে না। পার্বতীর হাত ধোরে বেরিয়ে পড়লেই হতো। তা না, বেশ্যার প্রেমে পড়া, বউ বোলে ডাকা আর মদ খেয়ে ওভাবে মাতলামি করা– কোনো মানে হয় না। ওতে যেনো পার্বতীকে এবং নিজের প্রেমকেই অপমান করা হয়েছে। দেবদাসের উপর ক্ষেপে ওঠে শিমুল–'কাওয়ার্ড'।

এবং তখনই শিমুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে– আগামী কালই সে বাড়ি যাবে। হ্যাঁ, আগামীকালই। পরীক্ষা হতে হতে এখনো মাসখানেক দেরি আছে। বড়'পা রাজি হবে না, জানা কথা। না হোক, তবুও সে যাবে। রিয়াকে কতোদিন একটু চোখের দেখাও দেখতে পায়নি! 'রিয়া, তুমি ভালো আছো তো? ক্যানো আমাকে এতো কষ্ট দিচ্ছো? তুমি কি জানো না তোমার চিঠি না পেয়ে আমি কি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি?'

সিদ্ধান্ত নিতে পেরেই শিমুল ক্লান্তির কাদায় পা দিলো। হঠাৎ কোরেই ওর খেয়াল হলো– পা দু'টো ভারী হয়ে গ্যাছে। সে পকেটে হাত ঢুকালো। না, প্যাকেট নেই। মনে করতে পারলো না খেতে খেতেই প্যাকেট ফুরিয়েছে, না কি কোথাও পড়ে গ্যাছে। সে দোকানের সামনে এগিয়ে গেলো। পাশে চা স্টল। চা খেতে খুব ইচ্ছে হলো। বুকটা যেনো শুকিয়ে মরু হয়ে আছে। পাঁচ টাকা দিয়ে এক প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট কিনে শিমুল চা স্টলে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু চা না খেয়েই সে আবার স্টল থেকে বেরিয়ে এলো। কেমন ঘিনঘিনে সব টেবিল চেয়ার। চাপা আর ভারী একটা অস্বস্তিকর গন্ধ। সে গেট পেরিয়ে এক্সিবিশন মাঠে গিয়ে ঢুকলো।

মন এখনো থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠছে। কোনো এক বেখেয়ালী ভাবালুতায় শিমুল সার্কাসের টিকিট কেটে ফেলে। গ্যালারীতে ঢুকি ঢুকি কোরেও টিকেটটা মুঠির পেষণে সে দুমড়ে ছুঁড়ে ফেলে। মনের ভেতরে অচেনা একটা জাহাজ তলাতে তলাতে এখন থির হয়ে আছে। ডুবছে না আর। তবে ঢেউয়ের ধাক্কায় ধাক্কায় জাহাজটা একটু একটু দুলছে। চর্কি খেলার ভিড় এড়িয়ে শিমুল ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো। সিগারেট বের কোরে আকাশে তাকালো। আশ্চর্য হলো সে। ওর চারপাশে শত শত নিয়ন আলোর মাতাল করা চকমকি নাচন। চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে তাকালেই। এইসব জৌলুস এড়িয়ে আকাশ দেখার সাধ বড়ই অকল্পনীয়, অথচ একবার তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়। ঝলমল করছে আকাশ তারায় তারায়। একফোটা মেঘ নেই। মাথার অনেকটা পূবে চাঁদ হাসছে। আর সেই জ্যোস্নার নরম চাদর থেকে মুঠো মুঠো শান্তির আর স্বস্তির ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। শিমুল সেই নরম জ্যোস্নায় ভিজতে শুরু করে। হঠাৎ কোরে হাজার মানুষের অরন্যে সে একা হয়ে যায়, যে একাকীত্ব ওর বড় বেশি আপন, কাঙ্খিত।

কতোক্ষণ ওভাবে সে দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল নেই। প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ওর সবটুকু একাকীত্ব খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। 'শিমুল, তুই ফিরে আয়- ফিরে আয় বাপ আমার। শি-মু-ল!' নারীকণ্ঠের আকূল আর্তনাদে ধড়ফড়িয়ে জেগে ওঠে শিমুল। এদিক ওদিক তাকায়। বুকের ধক ধক শব্দ ওকে সুস্পষ্টভাবে স্পর্শ দিয়ে যায়। মা! মা কোথায়? আলো-ছায়া ঘেরা মায়াবী অন্ধকারে সে মায়ের মুখ খুঁজতে শুরু করে। একটু একটু কোরে মায়ের মুখের আদলটুকু ভাসছে, আবার ভেঙ্গে যাচ্ছে জনস্রোতের ধাক্কায়, কোলাহলে। শিমুল ছটফট করে। মা, মাগো!

টেলিভিশনে নাটক হচ্ছে। একটু মাথা ঘামাতেই ব্যাপারটা বুঝলো সে এবং তখনই ওর মন আবার ভারী হয়ে গেলো। সে নি:শব্দে, সিগারেট না জ্বালিয়ে, কোনোদিকে না তাকিয়ে এক্সিভিশন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

শিমুলের রিক্সা চিত্রা হলের ট্রাফিক মোড় থেকে গজ পঞ্চাশেক পূবে থেমে পড়ে। ওখান থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালে হলের পোস্টার চোখে পড়ে। শিমুল বিরক্ত হয়ে সামনে তাকায়। আজ দিনটাই ওর জন্যে কেমন অস্বাভাবিক। সেই সকাল থেকেই। কেবলই উল্টো স্রোত। এখন ওর সামনে আগুন। মশালের আগুন। মশাল মিছিলটি দড়াটানার দিক থেকেই আসছিল। কারা এবং কেনো এই মিছিলের আয়োজন করেছে, শিমুল তা' জানে না। এখনো ওইসব তথ্য জানার কোনো কৌতুহল ওর হলো না। অথচ ওর মাত্র হাত পঁচাত্তর কি শ'খানেক সামনে দুমদাম কোরে বোমা ফাটছে। দুইটি পুলিশ ভ্যান ট্রাফিক সিগন্যাল-ল্যান্ড ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। একজন পুলিশও নামলো না। এতো হুলস্থুল হয়ে যাচ্ছে, তবুও ওরা নির্বিকার; কোনো তাড়া নেই।

ঠিক ট্রাফিক সিগন্যালের গায়ে, পুলিশ ভ্যানের গা ঘেঁষে তিন সেকেন্ডে দুটো বোমা ফাটলো। ট্রাফিক পুলিশ বুদ্ধিমান। আগেভাগেই সে কেটে পড়েছে। বোমার বিস্ফোরণে শিমুলের রিক্সা ঝনঝনিয়ে উঠলো। সে দুটো এক টাকার নোট রিক্সা ওয়ালার হাতে গুঁজে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে।

আট দশজন যুবক। বেশিও হতে পারে। তখন ওদের হাতে দাউ দাউ মশাল। শিমুলের পাশ দিয়ে দৌড়ে গেলো দক্ষিণ দিকে। পেছনে ধেয়ে আসা খাকি পোষাকের উপরে ওর চোখ পড়লো। সাথে সাথে অবচেতন মনের জড়তা ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেলো। সে দৌড় দেয়। প্রথমে পেছন দিকে। হঠাৎ ওর খেয়াল হলো, ওদিকেই যুবকদল গ্যাছে। মত পাল্টে সে বাঁ পাশে যেতে চাইলো। অনেকগুলো রিক্সা গায়ে গায়ে ঠেকে দাঁড়িয়ে আছে। ঢোক গিললো শিমুল। হাতে মোটেই সময় নেই। সে হলের দিকে দৌড়ে গেলো। ওর নাকের ডগায় কলাপসিবল গেট বন্ধ হয়ে গেলো। মোটে পাঁচসাত সেকেন্ডের ব্যাপার। সে ঘুরে দাঁড়ালো। এবং তখনই ওর হাত পাঁচসাত পেছনে একটা বোমা ফাটলো। মনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন তাড়ণায় শিমুল পা ধোরে সিঁড়িতেই বোসে পড়লো। কেটে গেছে বা ফেটে গেছে। গোড়ালীর সামান্য উপরে প্যান্ট ভিজে উঠছে। দরদরিয়ে রক্ত ঝরছে, এটুকু সে বুঝতে পারে। সে চোখ বন্ধ কোরে ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলো। হাত ক্ষতের উপর চেপে বসা।

ঘোরের ভেতরে কতোক্ষণ শিমুল ওভাবে বসেছিল, সে খেয়াল ওর নেই। হয়তো চারপাঁচ মিনিট। কিংবা চারপাঁচ বছর অথবা চারপাঁচ সেকেন্ড! পিঠে আচম্বিতে লাঠির বাড়ি পড়লো। প্রচণ্ড জোরে। শিমুল পিঠ বেঁকিয়ে মুখ ঘুরায়। ব্যথাটা এতো তীব্র আর আকস্মিক যে, তার মুখ দিয়ে বিকটাকারে কোনো শব্দও বেরোলো না। পুলিশ!

নবাবপুত্তুর! আবার মেজাজ দেখানো হচ্ছে, না?

অন্য একজন খাকি এগিয়ে এলো। চুলের মুঠি ধোরে শিমুলকে টেনে তুললো। সেই ফাঁকে কে যেনো পায়ের সবটুকু শক্তি জড়ো কোরে ওকে লাথি মারলো।

শিমুল হুমড়ি খেয়ে একজন পুলিশের বুটের সামনে পড়ে যায়। পুলিশটির পায়ের ভারী বুট ওর বিছিয়ে থাকা শৈল্পিক আঙ্গুল অবলীলায় চেপে ধরে।

'ব্যা-স্টা-র্ড!'

দেড় দুই ঘন্টা কেটে গ্যাছে। থানা গারদ। পাশে হাত তিনেক, লম্বায় ছয়সাত হাত। ছোট্ট খুপড়ি। কোনো জানালা বা ভেন্টিলেটর নেই। ভেতরে ঢোকার একটা মাত্র লোহার দরোজা। এইটুকু জায়গায় বারো চৌদ্দজনের জায়গা কোনোভাবেই হয় না। এখন হয়েছে। হচ্ছে। এর ভেতরেই প্রশ্রাবের ব্যবস্থা। দক্ষিণ পাশে ছোট্ট একটা ফুটো। সবটা প্রশ্রাব সেই ফুটো দিয়ে বাইরে বেরোয় না। ঘরময় ভারী আর উৎকট একটা ভুরভুর গন্ধ। ধা কোরে নাকে লাগে। দম আটকে আসে। সেই ভয়ংকর গন্ধটুকুও শিমুলের স্নায়ুতে এখন পোষ মেনে গ্যাছে, একটুও পীড়া দিচ্ছে না। চোখ বন্ধ রেখেই সে চটাৎ কোরে কপালে থাপ্পর মারলো। রক্ত খাওয়া টইটুম্বর মশাটা গলে গ্যাছে। হাতে রক্তের সুস্পষ্ট স্পর্শ। সে আর নড়লো না। একইভাবে দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বোসে থাকলো।

ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। লোহার দরোজার ফাঁকে গলিয়ে হাত বের করলে বারান্দার আলো খানিকটা ছোঁয়া যায়। কি হবে সেই আলোয়? ভেতরে কয়েকটা বিড়ি জ্বলছে। বিড়ির লকলকে

আগুন জীবনের অস্তিত্বতে আপ্রাণ প্রয়াসে ধোরে রেখেছে। শিমুল এখন আর ভাবছে না। কিচ্ছু না। কোনো ভাবাবেগ ওর ভেতরে এখন কাজ করছে না। শুধু অপেক্ষা। যা হয় হোক. এমন একটা উদাসীনতা ওকে গিলে ফেলেছে।

কে যেনো ডুকরে কেঁদে উঠলো। শিমুল নড়ে বসে সেই কান্নার ধাক্কায়। খেঁকিয়ে উঠলো একজন রাগে– কি আমার মেনীমুখো মজনুগো! কানকা তাতে চাপা ফোঁপানীতে নেমে আসে। রাত এখন কতো? শিমুলের হাতে হাত ঘড়িটা এখনো রয়ে গ্যাছে। ইচ্ছে করলে হাত বাড়িয়ে আলো পাওয়া যায়; সেই আলোয় সময়ও দেখা যায়। কিন্তু সে হাতটা একটুও নড়ালো না। সময় দিয়ে কি হবে? এখন রাত, এটাই সত্য। সে এখন থানা গারদে, এটাই বাস্তব। খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। পকেটে সিগারেট আছেও। তাও সে শেষ পর্যন্ত খেলো না। সব কিছুতেই এক ধরনের নিস্পৃহবোধ। ঢং ঢং কোরে থানার ঘন্টা বেজে উঠলো। দরোজার ফাঁক গলিয়ে ওর চোখ গিয়ে পড়লো বারান্দার দেয়ালে। একটা টিকটিকি। লেজ বেঁকিয়ে কিছুটা সামনে এগিয়ে যায়। তারপরই ঘাপটি মেরে থাকে। একটা ছায়া টিকটিকির ইঞ্চি তিনের সামনে নাচছে। পোকাটা দেখতে পেলো না শিমুল। সে দরোজার লোহার পাতে হাত রেখে চোখ বন্ধ কোরে সময় থেকে হারিয়ে থাকার চেষ্টা করে।

শিমুল ঝিমিয়ে পড়েছিল। লোকটি বুটের ডগা দিয়ে ওর ডান হাতের বেরিয়ে থাকা আঙ্গুল চেপে ধরতেই সে ধড়ফড়িয়ে ওঠে। রাগে ওর শরীরটা কেঁপে ওঠে মুহূর্তের জন্যে। তিনটে আঙ্গুল যেনো খসে পড়েছে। কেমন অসাড় অসাড় লাগছে। সে ডান হাতের আঙ্গুল তিনটির উপর বাঁ হাতের আঙ্গুল বুলিয়ে দিতে দিতে স্পষ্ট কোরে গালি দেয়– ব্লাডি সোয়াইন।

লোকটি লক খুলে শিমুলকে শার্টের কলার চেপে টেনে হিঁচড়ে বের কোরে আনে। ওকে ঘাড় চেপে বসায়। বুটপরা বাঁ পা দিয়ে বুক চেপে ধরে। লক বন্ধ কোরে লক টেনে পরীক্ষা কোরে পেট থেকে পা নামায়। এবার শার্টের কলার ছেড়ে লোকটি খাবলা দিয়ে শিমুলের মাথার চুল চেপে ওকে টেনে তোলে।

শিমুলের চোখ এইসব মুখগুলো আর দেখতে চাইছে না। সে সরাসরি চোখে চোখ রেখে তাকানো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। ওর চোখ গিয়ে পড়ে নেমপ্লেটে– খলিলুর রহমান, এস.আই।

এস.আই তাৎক্ষণিকভাবে ফিরেও তাকালো না। সেন্ট্রির স্যালুটেও কোনো সাড়া দেয় না। হাতে একটা স্লিপ। সামনে কিছুটা ঝুঁকে রয়েছে এস.আই. খলিলুর রহমান।

'নাম?'

শিমুল তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে উঠতে পারলো না এস.আই. কার নাম জানতে চাইছে। লোকটির চোখ তখনো স্লিপের গায়ে। সেন্ট্রি শিমুলের ঘাড়ে চাপ দিয়ে ঝাঁকুনি দিলো। এস.আই. এবার চোখ তোলে।

'নাম কি তোর?'

শিমুল প্রশ্নের জবাব দিলো না। ভেতরের ঘুমিয়ে থাকা অজগরটা একটু একটু কোরে আড়মোড় ভাংছে। সে এতোক্ষণে সরাসরি এস.আই.-এর চোখে চোখ রাখলো।

'আমাকে টর্চারিং করছেন কেনো? আমার বিরুদ্ধে আপনাদের কিসের ইল্লিগেশন?'

এস. আই'র কুতুকুতু চোখের মনি দুটো যেনো নেচে উঠলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিমুলকে দেখলো সে। না চেঁচিয়েও মানুষ যে কি ঘৃন্যভাবে খেঁকিয়ে উঠতে পারে, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এস,আই।

'কৈফিয়ত চাওয়া হচ্ছে, হুঁ? নাম কি? '

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।'

'ব্যাস্টার্ড!'

'গালি দেবেন না। ওটা আমার জন্যে সঠিক নয়।'

এস.আই. চেঁচালো না। এখন তার চোখের মনিদুটো স্থির। চেয়ার ঠেলে সে উঠে দাঁড়ালো। শিমুলের দিকে চোখ রেখেই সিগারেট জ্বাললো। বেতটার এক অংশ চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা। ভালো কোরে ধরার জন্যে। টেবিলেই ছিলো। ওটা হাতে নিয়ে এস.আই শিমুলের কাছে এসে দাঁড়ালো। শিমুল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটুও ভয় হচ্ছে না ওর। শুধু শরীরে তিরতির হালকা একটা কাঁপন। রাগের বাহ্যিক প্রকাশ।

'বল, নাম কি তোর?'

'আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমাকে মারছেন কেনো?'

এস.আই. যেনো এমন একটা অজুহাত খুঁজছিল। সে শিমুলের চুল ধোরে হাতের বেত দিয়ে পেটাতে শুরু করে। বাছবিচার ছাড়াই সেই লাঠি চলতে থাকে। শিমুল এক সময় ঢলে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটুও চেঁচালো না সে। চোখ দিয়ে তার একফোটা জলও বের হলো না। এস.আই. যেনো একটু তাড়াতাড়িই ক্লান্ত হয়ে ওঠে। নি:শ্বাসের তালে তালে কুৎসিত লোকটার বেঢপ ফোলা ভূড়ি দ্রুত ওঠা-নামা করতে থাকে। চেয়ারে ফিরে যাবার সময় সে শিমুলের বুকে পা দিয়ে থেতলে দিতে দিতে বললো– ব্যাস্টার্ড!

সেন্ট্রি ওকে হাত মুছড়ে টেনে তোলে।

এস.আই. নতুন কোরে সিগারেট জ্বালে। এই মুহূর্তে শিমুলের হঠাৎ কোরে মনে হলো, পৃথিবীতে সে জন্মের পর থেকেই একা। কিন্তু সে তবুও খুব কষ্টে এস,আইকে আবারো চ্যালেঞ্জের গলায় জিজ্ঞেস করে– আমাকে মারলেন ক্যানো?

'শার্টআপ ব্লাডি, নাম বল।'

'আমি কিছু করিনি। আমার বিরুদ্ধে আপনাদের চার্জ কি? আমাকে এভাবে মারছেন কেনো?'

এস.আই. যেনো এবার একটু কুঁচকে গেলো। এ আবার কি চীজ? চাকুরির দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন গোঁয়ার আর পায়নি সে। আস্তো একটা ননসেন্স, আহাম্মক!

'কি করিস?'

শিমুল কোনো জবাব দেয় না।

'ঠিকানা বল।'

শিমুল একদৃষ্টে এস.আই.র চোখে চেয়ে থাকে।

'পিটিয়ে বাপের না ভুলিয়ে দেবো। বাঁদরামী না? জবাব দে কুত্তা!'
'বাপ থাকলে কেউ বাস্টার্ড হয় না।'
'কথায় তো চ্যাটাং চ্যাটাং, নাম-ঠিকানা আছে নাকি যে বলবি?'

লাইটের চারপাশে কয়েকটা পাক খেয়ে তেলাপোকাটা দেয়ালে গিয়ে বসেছে। টিকটিকিটি অনেকটা পথ দৌড়ে এসে সতর্ক হলো। শিমুল কোনো জবাব না দিয়ে তেলাপোকা আর টিকটিকি দেখতে থাকে। তেলাপোকাটা একটু একটু কোরে টিকটিকির দিকে এগুচ্ছে।

বাঁ চোখ বেশ ফুলে গেছে। ভেতরে কালচে লাল, বাইরে কালো। ডান হাতের অনামিকা আঙ্গুলের মাথা ফেটে গেছে। রক্ত শুকিয়ে প্যান্ট চিটচিটে। গোড়ালির ইঞ্চি দুই উপরে কিছু একটা ছুটে এসে লেগেছিল। আধা ইঞ্চির মতো জায়গা থেতলে গেছে। ফুলে গেছে ক্ষতের চারপাশ। টিপলে আঙ্গুল বোসে যাচ্ছে। সারা শরীরে হাড়ভাঙ্গা ব্যথা। শার্টের বুকের দু'টো বোতাম নেই, কলাটা বিশ্রিভাবে ডানদিকে ঝুলে আছে। অনেকক্ষণ ধোরে ওর তলপেট চিনচিন করছে ব্যথায়। তবুও একইভাবে পড়ে রয়েছে। নড়াচড়া করলেই ব্যথা। শেষ পর্যন্ত পারে না শিমুল। ওর মুখ তেতো, বিস্বাদ। জ্বরটর এসেছিল হয়তোবা। খুব কষ্টে, দেয়ালে হাত রেখে সে একটু একটু কোরে উঠে দাঁড়ালো। আর সবাই জায়গা কোরে দিলো। একটা ছেলে এসে ওর হাত ধরতেই বিরক্তিতে হাতটা সরিয়ে দিলো শিমুল। ঠোঁট কামড়ে, নিজেকে ধমকে সে একটু একটু কোরে প্রশ্রাব করার জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো। হাঁফিয়ে উঠেছে তাতেই। কতো ক্লান্তি! ধীরে ধীরে সে বসতে গেলো। পারলো না। ভারসাম্য হারিয়ে বাঁ দিকে ঢলে পড়লো। ঠুক কোরে মাথ্য ঠুকে গেলো দেয়ালে। আবার একজন এগিয়ে এসে ওকে ধরার চেষ্ট করলো। শিমুল সেই হাতটাও সরিয়ে দিলো। দেয়ালে হেলান দিয়ে কতোক্ষণ চোখ বন্ধ কোরে রইলো। চোখ বন্ধ করলেই আরাম। থানার ঘন্টিতে ঢং ঢং কোরে ঘন্টি পড়লো। সকাল সাতটা। শিমুল অতিকষ্টে সোজা হয়ে বসে। আহ্, কি আরাম! সে প্রস্রাব কোরে পাশেই বোসে থাকে। ঝাঁঝালো গন্ধ ওর স্নায়ুতে একদম মরে গেছে।
'শিমুল কার নাম?'

শিমুল ফিরেও তাকালো না। যতো ইচ্ছে ডাকুক। চোখ বন্ধ কোরে থাকার চেয়ে বড় আরাম আর কি। হঠাৎ কোরে ভীষণ বমি পায় ওর। সেন্ট্রি আবার জিজ্ঞেস করে, 'শিমুল কে?'

শিমুল থুতু ফেললো চোখ না খুলেই।
'আপনার নাম কি ভাই?'

আলতো কোরে চোখের পাতা খুলে শিমুল পাশের সঙ্গীকে দেখলো, জবাব দিলো না। দেখছেন না, ব্যাটা হারামখোরের গলাটা কতো দরদী! আপনার নামই বুঝি শিমুল? লোকজন কেউ এসেছে মনে হয়। ফোন টোনও হতে পারে।

'এই, ওকে একটু ধোরে দাঁড় করাতো। আস্তে ধর একটু। দেখিস, ব্যথা ট্যথা যেনো না পায়।'

শিমুল একাই দরোজার কাছে এগিয়ে এলো।
'আপনার নামই তো শিমুল, না?

সেন্ট্রির গলার সুরে আর বলার ধরনে কেমন যেনো বিনয়ী ছোঁয়া। শিমুল চোখ তুলে সেন্ট্রিকে দেখলো একবার, জবাব দিলো না।
'রাতে বলেননি কেনো আপনি আতিয়ার সাহেবের লোক?'

শিমুলের মাথা কাজ করলো না। আতিয়ার সাহেব কে? কে? কই, তেমন কাউকে সে চেনে বোলে তো কিছু মনে পড়ছে না? তুমি নিজে কে? চমকে ওঠে শিমুল। আজগুবি একটা ধন্ধ লাগছে ওর। সে নিজে শিমুল তো?
'আপনি এম.এম. কলেজে পড়েন না? কোন ইয়ারে?'
'ইন্টারমিডিয়েট, দ্বিতীয় বর্ষ।'

অফিসে ঢুকতেই, এতোক্ষণ পরে, সারা রাতের পর শিমুল ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে। বড়'পা বসা। একাই। শিমুল কথা বলতে পারলো না। চোখ নামিয়ে নিলো। ওর মনে হলো, কোথাও না কোথাও ওর কোনো একটা অপরাধ হয়েছিল। কিন্তু সে ভেবে পায়না, বড়পা' কোত্থেকে খবরটা পেলো? শিমুল থানায় একবারও ঠিকানা বলেনি, এমন কি নিজের নামও।

শিমুল হাত বাড়িয়ে বিকুর কাছ থেকে সিগারেট নেয়। অনেকদিন পরে দেখা। নাইন পাশ কোরেই লেখাপড়ার পাঠ শিকেয় তুলেছিল বিকু। পড়াশুনা নাকি ওর ভালো লাগে না, তাই। ওর চোখ তখন কুয়েত ফেরত মিন্টু বিশ্বাসের উপর। হা কোরে বিকু বিদেশর গল্প শুনতো। মিন্টু বিশ্বাসের হাতের ওরিয়েন্ট ঘড়িটা, হাতের সোনার আংটি আর গায়ের ঝকমকে পোষাক দেখতো আর ভাবতো, পড়াশুনা কোরে কি হবে? মিন্টু বিশ্বাস বকলম, কথাটা সবাই জানে।

বিকু পালায়নি। বাবার হাতে প্যাঁদানি খেয়ে রাগ কোরে সে বাড়ি ছেড়েছিল। সোজা ঢাকায়।

সেখানে কি কোরে না কোরে সে ড্রাইভিং শেখে। সে এখন ড্রাইভার। রয়েল নেদারল্যান্ডেস-এর আর্লী এমপ্লয়মেন্ট প্রোজেক্টের এক ডাচ সাহেবের গাড়ি চালায়। বেতন বাইশ শো টাকা হোলে হবে কি, উপ্‌রি নাকি নিদেন পক্ষে হাজার চারেক হয়। শিমুলের বিশ্বাস হয়নি। ছয় হাজারের উপরে উপার্জন করে এই বিকু? সে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস কোরে বোসেছিল— 'উপরিটা কিসের রে?'

বিজ্ঞের মতো নৈ:শাব্দিক হেসে বিকু গোল্ডলীফ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল— 'এক গ্যালন তেলের দাম কতো, জানিস? ধর, প্রতিদিন কম কোরে চার গ্যালন তেলের দাম তোর পকেটে এসে ঢুকলো। কতো হয়? তাছাড়া, ওয়ার্কশপে একবার গাড়ি যাওয়া মানেই কমসে কম হাজার পাঁচেকের একটা দাঁও মারা।'

শিমুল ছোটবেলা থেকেই বিকুকে চেনে। একটু গল্পবাজ। কথাগুলো সহজে বিশ্বাস হয়নি পরশু দিন যখন এতোসব কথা হয়। সে আবার জিজ্ঞেস করেছিল— 'তোর সেইসব সাহেবরা তোর এই চুরির কথা জানে না? টের পায় না?'

বিকু এবার শব্দ কোরে হেসে উঠেছিল।
'টের আবার পায় না? পায়। তবুও সচরাচর কেউ কিছু বলে না।'
' কিছু বলে না মানে?' এমন আজগুবি কথা শিমুল কখনো শোনেনি। কেউ চুরি করছে যেনেও মালিক কিছু বললো না, এও কি হয়!

বিকু সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং বানাতে বানাতে ঠোঁটের কোনায় অদ্ভূত একটা মৃদু হাসি ঝুলিয়ে রেখে বলে– 'বলে না মানে, বলে না। শোন, ওরা করে লাখ লাখ টাকা চুরি। সেই তুলনায় আমাদের চুরিটা ওদের হিসেবেই পড়ে না। তাছাড়া, আমাদের চুরিটা ওরা মেনে নেয় বোলেই তলে তলে আমরা ওদের উপর বেশি অনুগত হয়ে পড়ি, দুর্বল হয়ে যাই। ওদের দরকারও এমন মানুষ, শক্তি ও দক্ষতায় চমৎকার কিন্তু চেতনায় ছুঁচোর মতো দুর্গন্ধ বয়ে বেড়ানো অনুগত দাস। কথাটা ওরা ভালোই বোঝে।'

শিমুল চমকে উঠেছিল। বিকুর তাও দৃষ্টি এড়ায়নি।
'গরম কথা, নারে? অতুলদা আমার এক সময়কার গুরু ছিলো কি না, মাঝে মাঝে জিভ স্লিপ করে।'

বিকু ওর ম্যাগনেটিং লাইটে 'টর্ট' কোরে শব্দ তুললো। নীলচে গ্যাস শিখা। নিজের সিগারেটটা জ্বেলে শিমুলের দিকে এগিয়ে ধোরে বললো— 'নে।'

সিগারেট নিয়েও নি:শ্চুপ নিশ্চল হয়ে পড়েছিল শিমুল। এবার বাঁ হাতে ভর কোরে সে মাথা জাগালো। সিগারেট জ্বেলে আবার বালিশে মাথা রাখলো। গন্ধটা দারুন। গোল্ডলীফ।
'ওঠতো! চল বাজার থেকে ঘুরে আসি।'
'ভালো লাগছে না, তুই যা। তাছাড়া, আমার একটু কাজও আছে।'

'কাজতো তোর থাকবেই। আমি কিছু বললেই তোর কাজ বেড়ে যায়। 'তো শোন, দুপুরে আমার সাথে খাবি কিন্তু।'

শিমুল জবাব না দিয়ে স্থির হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। বিকু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

শরীরে কেমন ম্যাজমেজে ভাব। ভালো ঘুমও হয়নি রাতে। লেভ তলস্তয়ের 'পুনরুজ্জীবন' বইটি এর জন্যে দায়ী। শেষ হয়নি। হাত বাড়িয়ে বইটি টেবিল থেকে টেনে নিলো সে। দুই লাইনের মতো পড়েই বন্ধ কোরে পাশে রেখে সে উঠে বসলো। আর তখনই ঘরে ঢুকলো রানু। কেমন পুতুল পুতুল চেহারা। স্কুলের ড্রেস পড়লেই শিমুলের চোখে কেনো যেনো রানু ইদানিং পুতুল পুতুল হয়ে ওঠে। কথাটা রানুকে বলি বলি কোরেও বলেনি আজও। বললেই মজা শেষ। এরচে' মিটমিটিয়ে হাসতে পারাই বেশি মজার। রানু দুইটি দশ টাকার নোট 'পুনরুজ্জীবন' বইয়ের ভেতর অর্ধেকটা ঢুকিয়ে রাখলো। বাকিটুকু বাইরে তাকালেই চোখে পড়ে।

'আজ যদি সূতা না আনোস, তোর একটা কাজও আমি কইরা দিতাম না। তিন সত্যি কইরা কইলাম— সত্যি, সত্যি, সত্যি।'

শিমুলের ইচ্ছে হলো রানুর বিণুনী দু'টো জোর কোরে খুলে দিতে। দারুন রেগে যাবে। কিন্তু শিমুলের জবাবের অপেক্ষা না কোরেই রানু বেরিয়ে যায়।

গায়ে ফুলহাতা শার্ট। হাতদুটো কনুই পর্যন্ত গুটানো। পরনে লুঙ্গি। কোমরে ভাঁজ করা গামছা বাঁধা। মাউথঅর্গান বাজাতে বাজাতে শিমুল হাসেমদের বাড়ি গেলো।

হাসেমের বন্ধু সাঈদ, আর সাঈদের বন্ধু হলো সজল। সজল দারুন কবিতা লেখে। শিমুলের একটু আধটু ঈর্ষাও হয়। কিন্তু আবৃতির বেলায় ফক্কা। অথচ শেষ পর্যন্ত খুব অল্প দিনের মধ্যেই সাঈদকে টেক্কা দিয়ে সজলের সাথে শিমুলের বন্ধুত্বটা বেশি পাকাপাকি হয়ে গ্যাছে। শিমুল রোবট উপাধি দিয়ে সাঈদকে অলংকৃত করেছে। রসকষহীন কথাবার্তা সাঈদের। তবে ওর কথার ওজন আলাদা, শিমুল তা বোঝে। কিন্তু কোনা দামি কথাই সব সময়ে একই আবেদন রাখতে পারে না, পারার কথাও নয়, এটুকু সাঈদ বুঝতে চায় না। ওর আরো একটা অদ্ভূদ ব্যাপার হলো– সে কখনোই কোনো মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। প্রথমদিকে শিমুল বিশ্বাস করেনি। গোপনে পরীক্ষা চালিয়েছিল। শিমুল সেদিন হাসি চেপে রাখতে পারেনি। একবারের জন্যেও সাঈদ রানুর দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। তবুও থেকে থেকে সাঈদের ফর্সা গালে লজ্জার লাল ছোপ ফুটে উঠছিল। এই অস্বাভাবিকতার জন্যে ভবিষ্যতে ওকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। মাথার বিকৃতি নিয়ে অনেকদিন ওকে এক নি:সঙ্গ জীবনের পিচ্ছিল অলিগলি পার হোতে হয়েছিল। সেটা অবশ্য আরো পরের কথা। লোকটা এতো কাঠখোট্টা উপরে উপরে, অথচ ভেতরে তার বয়ে চলেছে বয়সের তুলনায় বেশি-পরিণত জ্ঞানের একটা ছন্দময় প্রবাহ। ওর নিজস্ব লাইব্রেরী দেখে শিমুল চমকে উঠেছিল। প্রত্যন্ত গ্রামে একজন প্রাইমারী স্কুল মাস্টারের ছেলে সাঈদ। সেই সাঈদের করতলে এতো বই! না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। বইগুলো দুর্লভ আর দামি। কথা বার্তায় ভালোই

বোঝা যায়, ওসব শখ কোরে সংগ্রহ করা হয়নি, গভীরভাবে ওর পড়াও হয়েছে। তবুও কথাবার্তায় সে বড়বেশি যান্ত্রিক। শুধু মাঝে মাঝে অদ্ভুত সুন্দরভাবে চোখের তারায় ঢেউ জাগিয়ে খুব দামি দামি কবিতা আবৃতি কোরে শিমুলকে চমকে দেয়। কবিতা বোঝেও বেশ। তবে লেখে না। শিমুলের কবিতার উপর ওর কেমন একটা নাক শিটকানো ভাব। মাঝে মাঝে শিমুল আন্তরিকভাবেই কষ্ট পায়। কলেজে ছাত্র মৈত্রী করে সাঈদ ও সজল। শিমুলও একটু আধটু করতো বা করে। শিমুলের দৌড় ওই পর্যন্তই। এদের দৌড় আরো গভীরে। ওরা গোপনে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি করে। শিমুল হাবভাবে বুঝে নিয়েছে। হাসেম কথাটা খুব সাবধানে আর হেসে একবার বলে ফেলেছিল। এদের নাটের গুরু সাঈদ। ওরা তিনজন সম্ভবত শলা পরামর্শ কোরে শিমুলের পিছু নিয়েছে। দলে টানতে চাইছে। পরোক্ষভাবে। কিন্তু— পারছে না।

মার্কসবাদের উপর শিমুলও কমবেশি জ্ঞান রাখে। 'অনুশীলন' ক্লাশে সে পারত পক্ষে ফাঁকি দিতো না। কামার ফরিদও বুঝাতেন ফাঁক না রেখে। এতোসব খবর হাসেমও রাখে না, সাঈদের জানার প্রশ্নই ওঠে না। চালে ওরা ভুল করছে। আরম্ভ করেছে একটু বেশি মাত্রায় এলোমেলো ভাবে। সাঈদ আংশিকভাবে নিজের জ্বালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে। লোকটার ধৈর্য আছে। একটুও বিরক্ত না হয়ে জট খুলে প্রতিনিয়ত নতুন ভাবে নতুন পথ ধোরে শিমুলের সাথে আলোচনা চালায়। শিমুল বুঝতে পারে এবং নি:শব্দে ও গোপনে ঠোঁট টিপে হাসে। ইচ্ছে কোরে জটে গিঁট দেয়।

চৌকাঠ ধোরে শিমুল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ওর চোখে মুখে একটু আগেও কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই যেটুকু বিষণ্নতা জেঁকে বসেছিল, তা কেটে যাচ্ছে। অথচ ওর চেতনায় ঘুরপাক খাচ্ছে একটা কষ্টের কবিতার কয়েটা লাইন–

'এবং ফুলের উন্মিলন থামানোর নগ্নতায়
অচেনা কে যেনো অহর্নিশি গুলি দাগে
মননের গহীন অরন্যে'

ইদানিং এ হলো শিমুলের আরেক সমস্যা, সাঈদ যাকে বলে ঘোড়ারোগ। হঠাৎ হঠাৎ কোরে ওর ভেতর কবিতা জেগে ওঠে। তখন ওর মানসিকতা হুট কোরে পাল্টে যেতে থাকে। কখনো বিষন্নতার ঘের ফাঁদে সে আচম্বিতে ঝুলে পড়ে, কখনো বা জ্যোছনার নরম আলোয় স্নাত হয়ে স্বপ্নের পায়রা হয়ে শূন্যে উড়াল দেয়। বাড়ির উঠোনে মাঝারি একটা কৃষ্ণচূড়া। গাছটা ফুলে ফুলে লাল হয়ে উঠেছে। সবুজ পাতার হালকা ফাঁক গলিয়ে সেই আগুনজ্বালা ফুলের দিকে চোখ রেখে শিমুল একমিনিট রিয়ার কথা ভাবে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ঘরে ঢুকে হাসেমের পাশে বসতে বসতে ডাক ছাড়ে– 'কইগো আমার মাই ডিয়ার সিস্টার শান্তা?'

এক মিনিটের মাথায় শিরিন ঘরে ঢুকলো। চোখে মুখে হাসি। নাকের ডগায় ফোটা ফোটা ঘাম। বেণী পাকানো চুলের মাথায় টকটকে লাল ফিতে বাঁধা। কোমরে বাঁ হাত রেখে চোখ পাঁকিয়ে বলে— 'আবার?'

'কি?' শিমুল যেনো আকাশ থেকে পড়ে। না বোঝার এমন একটা ভান।

‘আমাকে শান্তা নামে ডেকেছো কেনো? এইই কিন্তু শেষ, এই নামে ডাকলে আমি তোমার গোপন হাড়ি হাটে ভেঙ্গে দেবো আর তোমারও কোনো কথা সত্যি সত্যি শুনবো না।’

‘কেনো, কেনো?’

‘বারে, শান্তা নামে এই বাড়িতে কেউ কোনোদিন ছিলো, না আছে যে তোমার ডাকে সাড়া দেবে? ছিলোও না, নেইও। আর তোমার গোপন হাড়িটা হলো গে... ,’হেসে ফেলে শিরিন। ‘কি, বললো?’

‘থাক আপু থাক। এই কান মলছি। কিন্তু আপু ,আমি শিরিন বোলে ডাকলে তুমি কি মা হাওয়ার সাথে হাওয়া হয়ে যাবে?’

‘আমি শান্তা নই, শিরিন-শিরিন-শিরিন!

‘তা’ বুঝি আমি জানি নে? জানি বোলেই তো তুমি মোর শান্তা আপু, মাই ডিয়ার সিস্টার! শিরিন মানে শান্ত, আমি একটা আকার যোগ কোরে আমার আপুকে বানিয়ে নিলাম, ব্যস!’

‘ব্যস নয়।’

‘সামান্য এই ভাষান্তরেও গোস্বা?’

সাঈদ মাঝখানে ফোঁড়ন কাটে। ওর হাতে কলম, সামনে খাতা। খাতায় হিজিবিজি দাগ কাটতে কাটতে বললো— ‘ওইটুকুর দামই বা কম কিসে? শান্তা— কেমন নরম আর শান্ত শব্দটা, মাটির সোঁদা গন্ধ সারা গায়ে। কিন্তু প্রচলিত সামাজিকতার নিয়মে আরও সাতজন মৌলবাদীর মতো শিরিনও বোধহয় শান্তা নামের পরতে হেঁদুয়ালী গন্ধ পায়।’

শিমুল তাকিয়ে দেখলো, চোখ নামানো সাঈদ এইটুকুন কথা বলতে গিয়েও কেমন রাঙা হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সেদিকে মন দিলো না শিমুল। প্রতিবাদের সুরে বলতে বলতে শিরিনের দিকে তাকালো, □‘ নো, নো, অবজেকশন ইয়োর অনার, এখানে মৌলবাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ! নামের ধাঁধাটুকুও শুধুই আমার আর আমার শান্তা আপুর জন্যে, তাই না সিস্টার?’

শিরিণ ফিক কোরে হেসে ফেললো সাঈদের দিকে তাকিয়ে।

‘একটু চা গিলিয়ে তোমার এই অধম ভাইটাকে কৃতার্থ করার আজ্ঞা হোক, সিস্টার।’

ক্ষণিকের জন্যে শিরিনের হাসি থেমে যায়। লজ্জার আনাগোনা। সাথে সাথে সে আবার হেসে ফেললো হাসেমের দিকে তাকিয়ে।

‘এনি প্রবলেম?’

‘আমি তোমার মতো ইংরেজী বুঝি না। চা পাতা নেই।’

‘তাই বলো। তো, নো চিন্তা! তুমি পানি গরম করতে লেগে যাও। ভাইয়া হেলথ মিনিস্টার!’

শিরিন বেরিয়ে গেলো। একটু পরেই সাইফুল এসে হাজির। ওর দুই হাতে মাটি মাখা। শিমুল পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের কোরে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বললো— ‘ভোঁ কোরে আচ্ছা মতো একটা দৌড় লাগাও তো ভাই মোর। যাবে আর আসবে। সামনের

স্পোর্টস-এ তোমাকে কিন্তু দৌড় প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হওয়া চাই। কিন্তু তার আগে এখন তোমাকে আনতে হচ্ছে মোটে চার টাকার চা পাতি আর চার টা লজেন্স! দুটা তোমার , দু'টো তোমার আপুর। রেডি, ওয়ান-টু-'

সাইফুল ঘুরে দৌড় দিয়ে দরজা পেরিয়ে উঠোনে নেমেই লোকটির গায়ে ধাক্কা খায়। হাল্কা পাতলা গড়ন। লম্বায় ওদের চেয়েও অনেকটা বেশি। মুখভর্তি কুচকুচে কালো দাঁড়ি। পরনে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী। মাথায় টুপি নেই। কাঁধে লাল রঙের গামছা। চোখে মুখে সহজাত হাসির ছোপ। দ্রুত স্মৃতির ঝালর ঠেলে শিমুল পাতা উল্টায়। নাহ্, আগে কখনো দেখেছে বোলে ওর মনে পড়ছে না।

পিঠ পেঁচিয়ে সাইফুলকে জড়িয়ে ধোরে হেসে হেসে লোকটি জিজ্ঞেস করে— 'দৌড়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে মিস্টার হেল্‌থ মিনিস্টার?'

সাইফুল শিমুলের দিকে তাকায়।

'চা পাতা আনতে।'

'চা পাতা? কোনো দরকার নেই, আসো। আমার কাছে আছে।'

লোকটি ঘরে ঢোকলেন। আর আশ্চর্য, লোকটি প্রথমেই শিমুলের দিকে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ঠোঁটে ঝুলে আছে মোহনীয় হাসি।

'আপনিই নিশ্চয় শিমুল?' তিনি হাসেমের পাশ থেকে চেয়ারটা টেনে শিমুলের কাছাকাছি এনে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন। 'আমি স্বপন, আপনার বন্ধুরা স্বপনদা বোলে ডাকে। আপনার বন্ধুদের মুখে আপনার অনেক কথা শুনেছি।' হঠাৎ যেনো মনে পড়লো, এমন একটা ভাব কোরে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। আপনার সাথে জমবে ভালো। পাঁচ মিনিট, আমি আগে চা বানিয়ে আনি, কি বলেন? তারপর গল্প করা যাবে।

স্বপনদা তাঁর কাপড়ের ব্যাগ থেকে চা পাতা বের কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শিমুল তাকালো হাসেম ও সাঈদের দিকে।

'কে?'

'শুনলিনে, স্বপনদা!'

'তা শুনেছি। স্বপনদাটা কে, তাই বল। আগে কোনোদিন দেখেছি বোলে তো মনে পড়ছে না।'

'তোর সাথে দেখা দেননি, তুই দেখবি কি কোরে?'

'দাঁড়া দাঁড়া, দেখা দে ন নি, মানে?'

'যা জানার, তাঁর কাছ থেকেই জেনে নিস।'

'হেঁয়ালি রাখ। লোকটা হুট কোরে আমার নাম বোলে দিলো, অথচ আমি তাকে চিনিনে, ভারি অদ্ভুত তো! বয়সও আমাদের চেয়ে বেশি। নিশ্চয় বন্ধু গোছের কেউ নন। তাহলে উনি কে?'

'বললাম তো, যা জানার ওনার কাছ থেকেই জেনে নিস।'

হাসেম ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলো। সাঈদ শিরিনের একটা বই খুলে গভীর মনযোগ দিয়ে পড়ছে। এবং একটু বেশি তাড়াতাড়িই স্বপনদা চায়ের হাড়ি নিয়ে ঘরে ঢোকলেন। সাইফুলের হাতে তরতাজা কাগুজে লেবু।

লোকটার সামনে সিগারেট জ্বালানো ঠিক হবে কি হবে না, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মিনিট খানেক সময় নষ্ট কোরে শেষ পর্যন্ত শিমুল সিগারেট জ্বাললো না। এমন দ্বন্দ্বে সে মাঝে মাঝেই পড়ে এবং তখন মায়ের কথা বারবার মনে পড়ে। শিমুল তখন আপনা থেকেই লজ্জা পায়।

ঘটনাটি ঘটেছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার পরপরই। চা রানুই বানিয়েছিল। চা খেলেই সিগারেট খাবার নেশাটা জাঁকিয়ে বসে। সে আর হাসেম রাস্তায় চলে এসেছিল। এতো সাতসকালে তেমন কেউ আসার কথা ছিলো না। ওরা সিগারেট জ্বালিয়ে গল্প করছিল। ওদের বসা জায়গার দশ পনেরো হাত বাঁয়ে বাঁক। বাঁকের মাঝ কোণে একটা দেবদারু গাছ। দেবদারু গাছকে আঁকড়ে ধোরে মটকিলা আর ভাঁট গাছের ঝোপঝাড়। একটা দুর্ভেদ্য আড়াল।

ঝাঁক ঘুরে এসেছিল লতা। শিমুলদের থেকে হাত দশ বারো বাঁয়ে। শিমুল ও হাসেমের হাতে আধপোড়া সিগারেট, মুখভর্তি ধোঁয়া। মাকে প্রথমে শিমুলই দেখেছিল। সে তখন স্তম্ভিত! কোনো উপায় নেই। দম বন্ধ কোরে সাত তাড়াতাড়ি হাতের সিগারেট লুঙ্গির নিচে ওরা দুইজনই লুকিয়ে আহাম্মকের মতো হাসলো। চোখে মুখে যেনো রক্ত নেই, স্পষ্ট একটা ধূসর ছায়ায় ওদের চোখ মুখ লেপ্টে গ্যাছে। তবুও হাসার চেষ্টা।

লতা ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। সরাসরি তাকালো না প্রথমে। একটু কোরে হাসলো। শেষে— যেনো শিমুল নেই, এমন একটা ভান কোরে হাসেমের দিকে তাকিয়ে বলেছিল— 'বাবা হাসেম, তোমরা যে খুব একটা বড় হইছো, তা না; আবার এক্কেবারে ছোটও না। বিড়ি সিগারেট খাওনের বয়স তোমাগো হয় নাই। শরীল আগে মজবুত কইরা বানাও। এই তো সময়। পরে আপসোস করলেও কোনো লাভ হইবো না। কইছিলাম কি, পারো তো এইসব ছাই পাশ টানা ছাইড়া দেও, ভালা হইবো। চেষ্টা কইরা দ্যাখো। মনের উপর কোনো রাজা নাই বাবারা, তারে যা বুঝাইবা, তাই বুইঝা নিবো। তয়, যদি কোনো প্রকারেই না ছাড়বার পারো, কাপড় চোপড় পোড়নের কাম নাই। সামনে কেউ বিড়ি-সিগারেট খাইলে আমারে অপমান করা হয়, আমি তা মনে করি না।'

লতা আর কিছু বলেনি। আগেও না, পাছেও না।

শিরিন দুটি কাচের গ্লাস ও দুটি স্টিলের গ্লাস নিয়ে এলো। হাতে ছুরি। সাইফুলের হাত থেকে লেবুটা নিয়ে নাকের কাছে ধরলো। অবচেতন মনেই টেনে গন্ধ নিলো। তারপরই যেনো হঠাৎ কোরে খেয়াল হলো এমন একটা ভাব কোরে লেবুটা সে তিন টুকরোয় কাটলো। স্বপনদা নিজের হাতে লেবুর টাটকা রস চিপে চা বানিয়ে সবাইকে দিলেন। নিজের গ্লাসটা নিয়ে শিমুলের পাশে বোসে চুমুক দিলেন তৃপ্তির সাথে।

'পরীক্ষা কেমন দিলেন?'

প্রশ্নটার মুখোমুখি শিমুলকে অনেকবারই হতে হয়েছে। এখনও হচ্ছে। রেজাল্ট না বেরোনো পর্যন্ত চলতেই থাকবে। বিরক্তি লাগে ওর। উত্তরও দিতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু তখন বড়'পার কথা ওর মনে পড়ে ঠিকই। ওর গাফিলতি দেখে লীনা বেশ হতাশই হয়েছিল। ওর সামনে বাবুলের আওড়ে যাওয়া বড় বড় প্রশ্নোত্তর আপা কমবেশি শুনেছে। শিমুল কোনো দিনই গড়গড়িয়ে কোনো উত্তরই বলতে পারেনি। অন্তত: লীনা তা শোনেনি। হতাশ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া— পরীক্ষার রাতেও এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত শিমুল আড্ডা মেরেছে। পরীক্ষার উপর নেতিবাচক ছাপ পড়াটাই স্বাভাবিক। লীনা তবুও শিমুলকে রাগ কোরে কিছু বলেনি। রিয়ার কয়েকটা চিঠি লীনা গায়েব কোরে ফেলেছে, কথাটা সত্য এবং শিমুল তা জেনে যায়। জেনেছে জলির কাছ থেকে। আট নয় বছরের ছোট্ট মেয়ে। প্রতিদিন দুই কলসী টিউব অয়েলের পানি এনে দেয়, থালা বাটি ধোয় আর বিকেলে ঘরটা মুছে দেয় জলী। দিন দশেক এটা ওটা কিনে দিয়ে নরম কোরে জিজ্ঞেস করাতেই জলি বলে দিয়েছিল, লীনা নাকি কয়েকটা চিঠি খাম না খুলেই পুড়িয়েছে। বাকিটুকু শিমুলের কল্পনা। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে কথা প্রসঙ্গে শিমুল বড়'পাকে জিজ্ঞেসও করেছিল। লীনা তেমন কোনো জবাব না দিয়ে এড়িয়ে গেছিল। সেই থেকে দুইজনের মাঝে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। তা ছাড়াও লীনা আগে পরে মোটামুটি বুঝে ফেলেছিল, জেদ খাটিয়ে শিমুলকে দিয়ে কোনো কাজ আদায় করিয়ে নেয়া যাবে না। বড়বেশি গোঁয়ার, একরোখা। সব মিলিয়ে লীনা শিমুলের দিকে কেমন অসহায় আর মমতা মাখানো চোখে চেয়ে থেকে শুধু দীর্ঘশ্বাসই ফেলতো, জোর কোরে কিছু বলতো না। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে একদিন বাবুলকে দ:খ কোরে বলেছিল, 'শিমুল তো আর ফার্স্ট ডিভিশন পাচ্ছে না। ফেলও করবে না ঠিকই, তবে ফার্ট ডিভিশনও ওর কপালে নেই। বড়জোর টেনেটুনে সেকেন্ড ডিভিশন পেলে পেতেও পারে। অথচ মাথাটা ওর আমাদের মধ্যে সবচে' ভালো, ইচ্ছে করলে দারুন রেজাল্ট করতে পারতো। তো, কিছু বলে তোমাকে, এর পরে ও কি করবে না করবে? আগেতো ডাক্তারি পড়ার কথা বলতো। সেটা আর হচ্ছে কই! ফার্স্ট ডিভিশন ওর কপালেও নাই, ডাক্তারিতে চান্সও নাই।'

ইদানিং শিমুলও যেনো লীনার কথাগুলো অবিশ্বাস করতে পারে না। পরীক্ষাতো শেষ। গোঁয়র্তুমী না কোরে আরেকটু মনযোগী হোলেই হতো। লস তো হচ্ছে নিজেরই। তবে ফার্স্ট ডিভিশন যে পাচ্ছে, তাতে ওর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। সে মার্কস হিসাব কোরে দেখেছে, সাতশো পঁয়ত্রিশ হয়। পঁয়ত্রিশ বাদ দিলেও সাতশো। আজ পর্যন্ত নিজের হিসেবে কোনো পরীক্ষায়ই দশের বেশি হের-ফের হয়নি।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বড়'পার মুখটা একবার দেখতে পায় শিমুল। হাসতে গিয়ে হুট কোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললো— 'মোটামুটি।'

স্বপনদা আলতো শব্দে হেসে ওঠলেন।

'সব ভালো ছাত্ররাই বলে- মোটামুটি। অহংকারী বিনয়। শেষে রেজাল্টে দেখা যায়, প্রথম বিভাগ পেয়ে বোসে আছে। তো- তারপর?'

শিমুল প্রশ্নবোধক চোখে তাকায়।

'রেজাল্ট বের হতে আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন। এরপর কি করবেন?'

'রেজাল্ট বেরোক আগে।'

'ওটা বেরোবেই, আজ না হয় কাল। একটা লক্ষ্য আছে না?'

দীর্ঘশ্বাস চাপলো শিমুল। 'ইচ্ছে ছিল ডাক্তারি পড়ার।'

'বলছেন, ইচ্ছে ছিল। কেনো, ইচ্ছেটা এখন আর নেই? নাকি ইচ্ছেটার বাস্তবায়নের বাস্তবতায় টানা পোড়েন? এমন কোনো ছাত্র হয়তো খুজে পাওয়া যাবে না, যে কি-না কোনো না কোনো ক্লাশে পরীক্ষায় 'এইম ইন লাইফ'-এসেটা লিখেনি। মাই এইম ইন লাইফ ইজ টু বি এ ডকটর, অথবা টু বি এ্যান ইঞ্জিনিয়র ইত্যাদি সব। মজার ব্যাপার কি জানেন, ওদেরই অনেকের বাড়িতে হয়তো দুই বেলা ভাতই জোটে না। অধিকাংশেরা উচ্চ মাধ্যমিক পার হতে পারে না, উপার্জনের জোয়াল কাঁধে নিয়ে ঘাম ঝরাতে বাধ্য হয়, রেজাল্ট যেমনই হোক না কেনো। সে যাকগে, এসব নিয়ে আবার মন খারাপ করবেন না যেনো। তবে— মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা ভালো।'

স্বপনদা বিড়ি জ্বাললেন। শিমুলের দিকে তাকিয়ে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন— 'চলে?'

শিমুল সত্যিই কিছুটা লজ্জা পেলো। অথচ হাসেমের হাতে জ্বলন্ত বিড়ি। সাঈদ বিড়ি সিগারেট ছোঁয় না। স্বপনদা' শিমুলের মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন।

'লজ্জার কিছু নেই, নিন। অবশ্য ধুমপান মানেই খারাপ, নিজেকে একটু একটু কোরে ক্ষয়ে ফেলানো। কি আর করা বলুন, খারাপ জেনেও অনেক কিছুই আমরা মেনে নিচ্ছি, মানিয়ে নিচ্ছি, চালিয়ে যাচ্ছি। ধরুন— এটাও ও ধরনের কিছু একটা। বিড়ি কি চলে?'

শিমুল শব্দহীন হাসিতে জবাব দিলো। স্বপনদার প্যাকেট থেকে সে বিড়ি নিয়ে জ্বাললো। তিতো তিতো লাগছে। বিড়িতে অভ্যাস নেই বোলে। তবুও খুব একটা খারাপ লাগছে না।'

জোরে শব্দহীন টান দিলেন স্বপনদা। ফুসফুস ভরিয়ে তোললেন ধোঁয়ায়। তারপর সবটুকু ধোঁয়া বের কোরে দিয়ে গ্লাসের সবটুকু চা চুমুক দিয়ে শেষ করলেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে তাকালেন শিমুলের দিকে। ঠোঁটের দুইপাশে হাসি ঝুলেই আছে।

'আগে আমার কথাটা বোলে নেই। আমি পূর্ব বাংলার সর্বহারা পাটির লোক। স.বি.প— সর্বোচ্চ বিপ্লবী পরিষদ। অ.প.ক. নামে আরো একটা ভাগ আছে, লাইনগতভাবে আমাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য। ওসব পরে বিস্তারিত আলাপ করা যাবে। আমি আপাতত: আপনাদের এই এলাকার দায়িত্বে আছি। স্বপন নামেই পরিচিত। আপনাকে এতো খোলামেলা বলছি, কারণ— আপনার তিন বন্ধু আপনার সম্পর্কে যেভাবে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাতে আপনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়। আপনিতো বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী করেন, না?'

শিমুল বিড়ির আগুন চৌকিতে আলতো কোরে ঘঁষতে ঘঁষতে বলে— 'মৈত্রীর সাথে কিছুটা ভাব আছে, ঠিক- করি বললে ভুল হবে।'

'ভুল হবে কেনো?'

আমি আসলে ভালো একটা বুঝিনে। আমার মনে হয়, মৈত্রীর প্যারেন্ট পার্টি, মানে আর.সি.এল. কে দিয়ে সমাজ পরিবর্তন হবে না।

স্বপনদা হেলান ছেড়ে সামনে ঝুঁকে বসলেন।

'শুধু এইটুকু?'

'আপনি যাকে শুধু এইটুকু বলছেন, আমার মনে হয় ওটাই আসল কথা। তত্ত্বগত ভাবে ভাসা ভাসা হোলেও আমি বোধহয় বুঝি, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীলদের তাড়ানো যায় না। কিন্তু কি জানেন, প্রচলিত ধারার সশস্ত্র পথটাও আমার ভালো লাগে না।

স্বপনদার ঠোঁটের হাসিটুকু অমায়িকভাবে বিস্তৃতি হলো।

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে— হয় আপনি তত্ত্বগত দিকটা এখনো ভালো কোরে বোঝেননি, অথবা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে আপনি ভয় পান।'

শিমুল হুট কোরে হাসেম ও সাঈদের দিকে এক নজর তাকালো। হাসেমের চোখ বন্ধ। সাঈদ কি একটা বই পড়ছে। কিন্তু শিমুল নিশ্চিত, ওরা সবই শুনছে। একটু আমতা আমতা কোরে সে বললো— 'না, ঠিক তাও নয়।'

স্বপনদা এবার ভিন্ন পথে এগোলেন।

'আপনি কখনো মিছিল করেছেন?'

'করেছি।'

'পিকেটিং?'

'দু' তিনবার হবে।'

'পিকেটিং বা মিছিলের সময় অন্তত: ইট পাটকেল মারে না, এমন কোনো পার্টি বা সংগঠন আপনি দেখেছেন?'

'একটু ভাবলো শিমুল। সে বেশ হতাশই হয়। তারপর মাথা নেড়ে বললো,'না।'

'তা হোলেই ভেবে দেখুক। সশস্ত্র লড়াইয়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলতে যারা মুখ দিয়ে গ্যাঁজা তুলে ফ্যালে, তারাও ক্ষমতার জন্যে, হালুয়া রুটির বখরায় ভাগ বসানোর জন্যে, এমনকি একই শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালায়। ইট পাটকেল ককটেল বোমা— এগুলো কি? অস্ত্র না? ইতিহাস কি বলে?'

'ইতিহাস যা-ই বলুক না কেনো, ওসব আসলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।'

'তা হোলে সন্ত্রাস শব্দটাও এসে গেলো, না? আচ্ছা শিমুলদা', বলুন তো সন্ত্রাস শব্দটার মানে কি?'

'কেনো, এই যে ইঁট-পাটকেল মারা, বোমা ফাটানো, জ্বালাও পোড়াও ভাংচুর করা— এসবের ভাষাগত রূপই হলো সন্ত্রাস।'

'একাত্তরে এই যে লোক মারা গেলো, ওটা? '৫২ তে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলো, সরকার গুলি চালালো, মারা গেলো রফিক-শফিক-জব্বার-বক্কার; ওটা?' '৬৯ এ ভাসানীর

নেতৃত্বে রাজপথে জনতার ঢল নেমেছিল, গ্রামেগঞ্জে কৃষক জনতা টাউট বাটপারদের উৎখাত করার জন্যে তেড়ে উঠেছিল। গুলিতে মারা গেছিলো নুরু মাস্টার, আসাদ। ওটা? আসলে, সন্ত্রাসের সংজ্ঞা ভিন্ন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত ও তার বাস্তব প্রতিফলনের নাম যদি হয় গণতন্ত্র, আমরা তা হোলে বলতে পারি, যে কাজ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রায় পায় না, তা-ই সন্ত্রাস। সেটা যে-ই করুক না কোনো, কি বলেন? প্রকৃতপক্ষে সব ধরনের আন্দোলন সংগ্রামই হচ্ছে এক শ্রেণীর কাছে গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই, অন্য শ্রেণীর কাছে তাই সন্ত্রাস। মানদণ্ড একটাই— শ্রেণী স্বার্থ।'

'আপনার যুক্তিগুলো বোধহয় সঠিক। আমিও যে ওইভাবে একটুও বুঝিনে, তা নয়। তবুও কেনো যেনো অস্ত্রের পথটা আমি মেনে নিতে পারি না। ঠিক ফুল দেয়ার মতো নরম আপোষকামিতাও নয়, আবার বুলেটের মতো বারুদের বিষাক্ত ঘ্রাণও নয়, এই দুইয়ের মাঝামাঝি ভিন্ন ধাঁচের কিছু একটা করা যায় না?'

'আপনার কাব্যিকতার ছোঁয়াটুকু বেশ আরামদায়ক শিমুলদা'। আরে, লজ্জা পাচ্ছেন কেনো? আপনার কবিতা আমি একটু আধটু পড়েছিও। ভালোই লেগেছে, থামবেন না। তো, যা বলছিলাম। শিমুলদা, কেউ কি ইচ্ছে কোরে নিজের পায়ে কাদা লাগায়? লাগায় না। বাধ্য হোলেই অথবা ভিন্ন কোনো উপায় না থাকলেই পানিতে নামতে হয়। আপনাকে আগে পরিস্কার ভাবে একটা কথা বুঝতে হবে— আপনি কি চান এবং চান বোলেই বিপরীত ভাবে আপনি কি চান না। আপানার চাওয়াটা যদি আন্তরিক আর সৎ হয়, তবে কোন পথে তা' পাওয়া সম্ভব, খুঁজে বের করুন। পথটা সরল না জটিল, সহজ না কঠিন, ওভাবে না দেখে দেখুন— পথটা সঠিক আর নির্ভুল কি না। মনে রাখবেন, অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, অর্জন করতে হয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেড়ে নিতে হয়। অস্ত্রের কথা বলছেন তো? কোনো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা অস্ত্র প্রয়োগ করি না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপর গুটিকয়েক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যে শোষণ চালাচ্ছে, ওটা কি অন্যায় নয়? আমরা এই অন্যায়ের প্রতিকার চাই বোলেই অস্ত্র ধরেছি। অস্ত্র ধরেছি, কারণ— ওরা অস্ত্র দিয়েই ওদের তৈরি শোষণের আইনকে রক্ষা করে, কার্যকরী করে। আপনি অস্ত্র ছাড়া কি কোরে তার প্রতিকার করবেন? আমার কথা-ই বলি, আমারও নিজস্ব ঘরবাড়ি ছিলো, স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে। ওদের জন্যে আমারও কষ্ট হয়। বিশ্বাস করুন, হয়তো আরো দশজনের চেয়েও বেশিই হয় কষ্টটা। আমিও ওদের নিয়ে একটা সুস্থ্য স্বাভাবিক সুন্দর জীবন যাপন চাই। কিন্তু চাইলেই আমাকে দেবে কেনো? আমাকে না ঠকালে পুঁজিপতি মুনাফা পাবে না, আমলারা মুনাফার বখড়া পাবে না। এই যে আমার বর্তমানের যাপিত সময়, এটা অস্বাভাবিক। কোথায় খাই, কোথায় ঘুমাই, কখন কি হয় না হয়, ছেলেমেয়ে কেমন আছে, কি করছে, ওদের মায়ের অবস্থাইবা কি— সব কিছুতেই ভীষণ রকমের এক অস্বাভাবিকতা। কিন্তু— শোষণের বিরুদ্ধে আমার ভেতরে একটা জাগ্রত অনুভব আছে, একটা অনুপ্রেরণা কাজ করে। ওটা কিন্তু হিংসে বা বিদ্বেষ নয়, আত্ম প্রতিষ্ঠাও নয়; ওটা ন্যায় বোধের তাড়না। তাইতো আমি ঘর ছেড়েছি। একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্যে অস্বাভাবিকতাকে মেনে নিয়েছি। সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসামাত্রই আমার ভেতরে জাঁকিয়ে বসা ভয়ডরও হুড়মুড় কোরে পালিয়ে গেলো।'

শিমুল চমকে উঠলো। ওর চোখেমুখে সেই চমকের কোনো রাখঢাক নেই। অবাক হয়ে সে স্বপনদাকে দেখছে। রোদে পোড়া শরীর, মুখের আদলে খেটে খাওয়া মানুষের খোলামেলা ছাপ, পরনের কাপড় চোপড় দেখলে কোনো বিশেষজ্ঞও রায় দেবেন, লোকটা জাতকৃষক। এমনই একজন মানুষের মুখ থেকে এমন চমৎকার বিশ্লেষণ শুনতে পারবে, শিমুল কল্পনাও করেনি। হঠাৎ কোরেই বাবুলের লক্ষ কোটিবার আওড়ানো মাও সেতুং এর উদ্ধৃতিটা ওর মনে পড়লো— 'সে-ই বিপ্লবী, যে ব্যক্তি শ্রমিক-কৃষকের সাথে একাত্ম হয়, মিশে যায়।' আসলে একাত্ম হওয়া তেমন একটা কঠিন কিছু নয়, মিশে যাওয়াটাই বিরাট কিছু। শিমুলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হলো, স্বপনদা মিশে যেতে পেরেছেন।

শিমুল তাৎক্ষণিকভাবে বিপরীত কোনো যুক্তি দেখাতে পারলো না। আর কি আশ্চর্য, তেমন কোনো ইচ্ছেও ওর হলো না। ওর ভেতরে একটা তাগিদ যেনো ফিসফিসিয়ে ওকে বলছে— 'বিশ্বাস করা যায়।' সে জিজ্ঞেস করলো— 'আপনাদের কাগজ-পত্র নেই?'

'থাকবে না কেনো?' স্বপনদা শিমুলের মুখের চোখের পরিবর্তনটুকু পরিস্কার ভাবে ধরতে পেরেছেন। তিনি সামান্য একটু হাসলেন। 'আপনি কাগজ পত্র সময় মতো পেয়ে যাবেন। হাতের কাছে যা পাবেন, তাই পড়বেন। কিন্তু—গ্রহণ করবেন শুধুমাত্র সঠিকতাটুকু। কেবল মাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও সেতুং চিন্তাধারা সম্পর্কেই নয়, আপনাকে পুঁজিপতিদেরকে পড়তে হবে, পড়তে হবে সংশোধনবাদীদেরও। যে পর্যন্ত ভেতর থেকে নিশ্চিত কোনো তাগিদ না পান, সে পর্যন্ত জোর কোরে কিছু করতে যাবেন না, ওতে হতাশ হবার সম্ভাবনা থাকে।'

'পুঁজিপতিদের না হয় পড়লাম। কিন্তু সংশোধনবাদীদের?'

'অবশ্যই পড়তে হবে। আপনি আপনার বিরুদ্ধ এবং ভুল পক্ষকে যতো বেশি ভালো কোরে জানতে পারবেন, নিজের অবস্থান সম্পর্কে আপনি ততোবেশি স্বচ্ছ আর সৎ হতে পারবেন।'

'কিন্তু আমি অন্তত: দুইটি কম্যুনিস্ট পার্টির কথা জানি, যারা চান না তাদের সংগঠনের কর্মীরা অন্য কোনো পার্টির কাগজ-পত্র পড়ুক।'

'ওটা ওদের প্রচণ্ড ভুল। তবে ভুলটা কিন্তু আকাশ থেকে আসে না। ভুলটা আসে লাইনের রেষ ধোরেই। সত্য তো সত্যই, সে আপন নির্ভর। সে নিজেই নিজেকে অকপটে মিথ্যের বেসাতি থেকে রক্ষা করতে জানে। কিন্তু আমরা তার নির্ধারক বাহক। কিভাবে আমরা তার নির্ধারক বাহক তা বুঝতে হবে। আমরা বিভিন্ন তত্ত্বকে প্রয়োগে নিয়ে যাই। এই প্রয়োগই সত্যের একমাত্র মাপকাঠি। আপনি আপনার ইচ্ছেমতোই পড়বেন। তা না হোলে, সব পক্ষকে ভালোভাবে জানতে না পারলে আপনি আপনার বিবেচনাকে কি কোরে ন্যায়বোধের দীক্ষায় দীক্ষিত করবেন, প্রয়োগই বা করবেন কোন শক্তিতে?'

'ঠিক আছে, আমি আপনাদের দলিলপত্র পড়তে চাই।'

স্বপনদা বিঁড়ি বের করলেন। শিমুল তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। তিনি প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলেন। ঘুরালেন সিগারেটটা, তবে কিছু বললেন না। ম্যাচ বের কোরে কাঠি জ্বাললেন।

'কয়টা বাজে, দেখেন তো?'

শিমুল কব্জি ঘুরালো।
'নয়টা চল্লিশ।'

স্বপনদা' প্রায় লাফিয়ে ওঠলেন। হাত বাড়িয়ে সবার সাথে করমর্দন করতে করতে তিনি বললেন— 'একদম সময় নেই।' সাঈদের দিকে তাকালেন— 'প্রোগ্রাম মনে আছে তো? তখন কথা হবে। এক কাজ করুন, শিমুলদা'কেও নিয়ে আসুন সাথে, আরো আলাপ করা যাবে।'

শিমুল প্রশ্নবোধক চোখে তাকায়।
'আমরা একটা স্টাডি সার্কেল গড়ে তুলছি। আপনিও আসুন না, আসবেন?'

শিমুল নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে যায়।

স্বপনদা বেরিয়ে গেলেন। একা। সাথে সাথে ঘরের মধ্যে থমথমে একটা ভাব নেমে এলো। সবাই যেনো কি এক ঘোরে আচ্ছন্ন। 'সত্য তো সত্যই, আপন নির্ভর।' কথাটা শিমুলের মাথায় ঘুরঘুর করতে শুরু করেছে। চমৎকার একটা কাব্যিক ভাব, যা আবার সত্য। একটা কবিতা লেখা যায়। সত্য তো সত্যই,আপন নির্ভর............

সাঈদ নড়েচড়ে বোসে তাকালো শিমুলের দিকে।
'তা হোলে যাচ্ছেন তো?'

শিমুল প্রথমটায় বুঝতে পারলো না।
'স্টাডি সার্কেলের কথা বলছি।'
'অবশ্যই যাবো।'
'কাল সকালে রেডি থাকবেন। আটটা সোয়া আটটা। টাইমটা কিন্তু বাঙালি টাইম না, ঘড়ির। সারা দিনের জন্যে যাচ্ছেন কিন্তু।'
'কোথায় হবে?'
'অন্যভাবে নেবেন না। আন্ডার-গ্রাউন্ড পার্টি তো, একটা শৃঙ্খলাবোধ আছে। প্রোগ্রামটা কোথায় হবে, আগে থেকে বলা যাবে না।'
'বুঝেছি। আপনারা থাকছেন তো?'
'আপনি আমাদের গ্রুপে। সজল, হাসেম, আপনি ও আমি— আমরা চারজন।'

শিমুলের মন থেকে সবটুকু সংকোচ উবে যায়।

বড়াল নদী। নদীর টলমলে পানিতে মোহনীয় মাদকতার রঙ মেখে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। পশ্চিমাকাশে ঝুলে পড়া সূর্যের দিকে তাকাতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না। একটু একটু কষ্ট হয় তাতে। কষ্টটা কেনো এবং কোথায়, ঠিক ধরা যায় না। জেগে উঠেই আবার তলিয়ে যাচ্ছে দ্রুত, বুকে রেখে

যাচ্ছে বিষন্নতার বিষফোঁড়। বিষন্নতার সেই বিষফোঁড় মাড়িয়ে বারবার উঁকিঝুঁকি করছে একটি নাম, একটি মুখ— রিয়া। সপ্তাহ্ খানেক আগেও রিয়ার কাছে চিঠি লিখেছে শিমুল। চিঠিটার জন্যে ওর এখন অনুতাপ হচ্ছে। অনেক উল্টাপাল্টা কথা লিখেছিল সে চিঠিটাকে। 'রিয়ার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে', খবরটা শোনার পর থেকেই ওর ভেতরে বিশাল এক শূন্যতা হাঁটু গেড়ে সেই যে বসেছে, নড়ার কোনো লক্ষণই নেই। একবার দেখা করার জন্যে শিমুল গিয়েছিল। দেখা হয়নি। বাবার সাথে ঢাকা গিয়েছিল রিয়া। এতোদিন অবশ্যই ফিরে আসার কথা। অথচ— রিয়া প্রায় তিনমাস ধোরে কোনো চিঠিই লিখছে না, অন্তত: শিমুল কোনো চিঠি পায়নি। শেষে রেগে মেগে গত সপ্তায় ওভাবে বিশ্রী ভাষায় শিমুল চিঠিটা লিখে ফেলেছিল। তারজন্যে ওর এখন খুব খারাপ লাগছে। রিয়া নিশ্চয় খুব কষ্ট পাবে। রিয়া, সোনা আমার; তুমি ভালো আছো তো? ভালো থেকো, রাগ করো না, প্লিজ! আমার যে খুব কষ্ট হচ্ছে, সোনা। আচ্ছা, সত্যিই কি ওর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ওকে ছেড়ে যাবে? ছেড়ে যেতে পারবে রিয়া? রিয়া, রিয়া, রিয়া ....।

সিগারেটও এখন কেমন তিতে লাগছে। শিমুল পর পর চারটে সিগারেট শেষ করেছে আধঘন্টায়। সে হাতের সিগারেটটা পানির দিকে আংগুলের টোকায় ছুঁড়ে ফেলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তারপর সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। ওর সামনে, নদীর ওপারে গ্রাম। শেষ বিকেলের করুণ রোদ গাছপালার উপরের পাতায় নেচে বেড়াচ্ছে, যেনো কি এক অনাদিকালের করুণ গাঁথা, অথচ শ্বাশত এবং চির নতুন, আনন্দের এবং বেদনার। সেইসব গাছ গাছালির ফাঁক গলিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরদোর। দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। মাঝখানে বিদায়ের রক্তমাখা ঝলমলে ঢেউ খেলানো পানি, পানির হালকা কলগুঞ্জন, হালকা নাচন।

নিজের উপর শিমুল খানিকটা জোর খাটায়। সে আর পেছন ফিরে আর না তাকিয়ে কলা ক্ষেতে ঢুকে পড়লো। দশ একর জায়গা জুড়ে কলা ক্ষেত। সাঈদ-এর বড় ভাই রহিম। তিনি থানার পাট সম্প্রসারণ কর্মকর্তা। আবেগের বশে এবং প্রয়োজনের তাগিদে তিনি জমিটুকু লিজ নিয়ে কলার চাষ করেছেন। শিমুল ভাবতেও পারেনি তিনি সর্বহারা পার্টির একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। শুধু সমর্থকই নন, ভালো মাপের সংগঠকও। কলার চাষ করেছেন পার্টিকে আর্থিক সহযোগিতা করার স্বার্থে। শিমুল চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে ক্ষেতের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালো। আটদশ হাত সামনে মাঝারি আকারের একটা বাবলা গাছ। একটা ঘুঘু ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ক্লান্তিহীন আবেশে ডাকছে তো ডাকছেই। শিমুল দীর্ঘশ্বাস ফেললো ঘুঘুটাকে খুঁজতে খুঁজতে। আশ্চর্য, কতো দ্রুত পনেরোটা দিন পার হয়ে গেলো। সকাল নয়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত বিরতি দিয়ে ক্লাশ হয়েছে। নিয়মিত। রাজনৈতিক ক্লাশ। কোনোদিন ক্লাশ নিয়েছেন স্বপনদা, কোনোদিন খালেদ ভাই। কোনো দিন আবার দু'জনই। কে যে বেশি জ্ঞানী, বেশি জানেন, শিমুল তা ঠাওর করতে পারে না। ওর শুধু একটা বিশ্বাসই ওর দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে যে, দু'জনই অসম্ভব রকমের জানেন। যেনো যে কোনো বিষয়েই ওঁদের অগাধ গভীরতা। অথচ

ভীষণ রকমের অকপট, সত। এটা কি কোরে যে সম্ভব হলো, শিমুল তার কূল পায় না। সাইদ-এর বড় ভাই রহিম, যিনি একজন এম.এ,জি, তিনিও ওদের কাছে যেনো নস্যি, ফাইভ সিক্স-এর ছাত্র। অথচ বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। দুইজনই রোদে তাতানো মানুষ।

'এই বাদল, বাদল..........'

একটু চমকে উঠলো শিমুল। বেশ কিছুক্ষণ ধোরেই ডাকা হচ্ছে। সে শুনেছেও। কিন্ত সে ভুলে গেছিলো এখন সে শিমুল নয়, বাদল। কোড নেম।

'এই বাদল...........'

শিমুল জবাব দিলো না। জবাব দিতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না ওর। পতপত শব্দ তুলে ঘুঘুটা ওর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলো। সে শূন্য ডালটার দিকে চেয়েই থাকলো। সজল ওর পাশে এসে দাঁড়ালো। আলতো কোরে হাত রাখলো কাঁধে।

'সবটুকু নীরবতা কেবলই তোমার জন্যে
নৈবেদ্য করেছি প্রিয়তমা'

শিমুল সজলের দিকে তাকায়। হিংসেও হয়। লাইনটা একান্তভাবেই শিমুলের অথচ ওর ঠোঁটে শব্দ হয়ে এলো না, এলো সজলের ঠোঁটে।

সজল হাসলো।

'খালেদ ভাই এসেছেন। তোমাকে ডাকছেন।'

জবাব না দিয়ে শিমুল হাঁটতে শুরু করে একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে । পাশে সজল। আর কি আশ্চর্য, সজলকে এখন আবার হঠাৎ কোরেই ওর ভীষণ ভালো লাগছে। যেনো কতোদিনের চেনা বন্ধু, যে শিমুলকে সত্যি সত্যি বোঝে।

সাঈদ ও হাসেম একমনে দাবা খেলছে। একটু দক্ষিণে রহিম ভাই আর খালেদ ভাই। কি নিয়ে যেনো কথায় ডুবেছিলেন। ওদেরকে দেখে হাসলেন। আরো মিনিট দুই তিন কথা সেরে এগিয়ে এলেন। রহিম ভাই চলে গ্যাছেন। মোটর সাইকেলের শব্দ একটু একটু কোরে দূর থেকে দূরতর হয়ে মিশে গেলো।

খালেদ ভাই করমর্দন কোরে হাসতে হাসতে বললেন—'সবাই ভালো আছেন নিশ্চয়? বিড়ি-টিড়ি আছে কিছু কমরেড?'

শিমুল সিগারেট বের কোরে দেয়।

'ধরুন, আজ রাতে আপনারা বাড়ি ফিরলেন না। কারো অসুবিধা আছে?'

শিমুল ছাড়া ওরা তিনজনই টপাটপ বোলে ফেললো— 'না।' শিমুল না বলতে গিয়েও থেমে যায়। মায়ের চিন্তিত আর আঁধার ঘেরা থমথমে বিষন্ন মুখটা মনে পড়ে ওর। দ্বিধা ওকে দোলায়।

'আপনার?'

'মাকে বোলে আসিনি যে?'

'তাই তো! আচ্ছা, বাড়িতে না বোলেও তো আপনারা চার বন্ধু প্রায় প্রতিদিনই একজন আরেকজনের বাড়িতে রাত কাটান, কাটান না?'

'তা' অবশ্য কাটাই।'

'তা হোলে আর অতো ভাবনা কিসের ! ধরুন আজও তাই করছেন। মাকে বোলে আসলে ভালোই হতো, কিন্তু তা তো আর এখন সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া— আমার কথাও একটু ভাবুন। আমার মাও কিন্তু চায়নি আমি ঘর ছাড়ি। তবুও ছেড়েছি। ছেড়েছি আমার বিশ্বাসী আদর্শের জন্যে। কারো প্ররোচণায় নয়, মনের তাগিদে। লাঙ্গলধর গ্রামে কথায় কথায় আপনাদের নিয়ে একদিন আমি গল্প করেছিলাম। যাবেন আপনারা? ওটা আমাদের একটা 'গণ' গ্রাম কিন্তু গোপন। বাস্তবতার সংস্পর্শে গিয়ে তত্ত্ব আর তথ্যগুলোর সাথে নিজেদেরকেও একটু ঝালিয়ে নিতে পারতেন। যাবেন?

'যাবো।' কিছুটা আকর্ষণ আর কিছুটা চক্ষুলজ্জায় শিমুল শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যায়।

'তা হোলে যে এখনই রওনা দিতে হবে। আপনারা যাবেন দুইভাগে, দুইজন দুইজন কোরে। এক কাজ করুন, কমরেড শিমুল, আপনি কমরেড সাঈদের সাথে থাকুন। এলাকাটা ওর চেনা। আপনারা দুইজন যাবেন আমার সাথে।' তিনি সাঈদের দিকে তাকালেন। 'আপনারা সোজা দবির চাচার ওখানে যাবেন। আমি ওখানে আপনাদের সাথে যোগাযোগ কোরে নেবো। বিকল্প রইলো খালাবাড়ি। কেনো কারণে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে কাল সারা বিকেলে এই কলাক্ষেতে প্রোগ্রাম রইলো।' তিনি শিমুলের দিকে তাকলেন। 'আপনার কাছে টাকা আছে?'

'আছে।'

'আপনার?' তিনি সজলের দিকে তাকালেন।

'বিশ টাকা আছে।'

তিনি একটা পঞ্চাশ টাকার নোট সজলকে দিলেন। 'এটা রাখুন, বিশেষ কোনো মুহূর্তে লাগতে পারে। তো, লাল সালাম।'

'লাল সালাম।'

সাঈদের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শিমুল কলা ক্ষেতের পশ্চিম-উত্তর কোণা দিয়ে ক্ষেত থেকে বেরিয়ে এলো। আশ্চর্য হলো শিমুল। একটা চিকন মেঠোপথ কলাক্ষেতের পাশ ঘেঁষে সোজা পশ্চিমে চলে গেছে। অথচ গত পনেরোটা দিনে একবারও ওর চোখে পড়েছি! নিজের উপর রাগই হলো ওর। আচ্ছা এক আহাম্মক।

অভ্যাসের কারণে খুব ভোরে শিমুলের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আর কি আশ্চর্য, ঘুম ভাঙ্গার পরে প্রথমেই খালেদ ভাইয়ের কথাটা ওর মনে পড়লো, 'বুঝলেন কমরেড, শ্রমিক কৃষকের

জীবনটাই জীবন্ত মার্কসবাদ। কিন্তু বড্ড এলেমেলো। আপনার আমার দায়িত্ব হলো ওই এলোমেলো বিষয়গুলো সাজিয়ে দেয়া, পথ কোরে দেয়া। ব্যস। বাকি যা করণীয়, তা মূলত ওরাই করবেন। সাজানো গোছানো ঐক্যবদ্ধ জনগণই কিন্তু বিশাল শক্তি, মাওয়ের ভাষায়— 'সকল ক্ষমতার উৎস।' বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত জনগণ নন। ওদেরকে সচেতন করতে হোলে, ঐক্যবদ্ধ করতে হোলে ওদের সাথে টোটাল জীবন-যাত্রায় মিশে যেতে হবে। মিশে গিয়েই, ওদেরই একজন হয়ে ওদেরকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে হবে, তুলে আনতে হবে পচা সব কুসংস্কার আর অন্ধ মোহের ফাঁদ থেকে। তবে একটা কথা মনে রাখবেন– মাটি তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলেই, ফসল পুড়ে যেতে থাকলেই যে ঠিক সময়ে বৃষ্টি হবে, এমন কোনো কথা নেই। অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু অপেক্ষার সময়টুকুকে কাজে লাগাতে হয় এমনভাবে যে, বৃষ্টির শেষে যেনো সময় অপচয় না হয় চাষাবাদের। সেই প্রস্তুতিটুকু সব সময়ের জন্যে থাকা চাই। আরেকটা কথা– এই যে শোষিত কৃষক, এরা সব পোড় খাওয়া মানুষ, ছাত্র না হোলে আপনি কিন্তু ওদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবেন না, ওদের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়ে ওদেরই একজন হয়ে উঠতে পারবেন না। ফলে, ইচ্ছে আপনার যতোই সুন্দর হোক না কেনো, প্রচেষ্টা আপনার যতোই সৎ আর আন্তরিক হোক না কেনো, লক্ষ্য আপনার পুরণ হবে না।'

এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে, ধান ক্ষেতের আল বেয়ে, এ বাড়ি ওবাড়ির আঙিনা মাড়িয়ে সম্মোহিতের মতো সাঈদ-এর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শিমুল দবির চাচার বাড়ি গিয়ে উঠেছিল। সাঈদ-এর সাথে দবির চাচার দারুন পূর্ব সখ্যতা। কোনো সংকোচ নেই। অনেক চেষ্টা কোরেও শিমুল ওর মতো সহজ হতে পারেনি। খেতে বোসেও না। দবির চাচা বুঝতে পারছিলেন। তিনি অনেকটা জোরাজুরি করেছিলেন শিমুলকে ভাত তুলে দিতে গিয়ে। লজ্জায় না না কোরে শেষ পর্যন্ত আধপেটা খেয়েই শিমুল থালায় পানি ঢেলেছিল। দবির চাচা হেসেছিলেন শেষে।

দবির চাচাই খাওয়া দাওয়ার পর ওদেরকে নিয়ে গিয়েছিলেন কমরেড কাশেমদের বাড়ি। ওখানে ততোক্ষণে খালেদ ভাই রীতিমতো আড্ডা জমিয়ে বসেছিলেন। লোকজনে বাংলো ঘরটায় ঠাসা। প্রায় সবাই মাঝবয়েসী কৃষক। প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারও ছিলেন দুইজন। কুপির কাঁপা কাঁপা আলোয় শিমুল সজল ও হাসেমকে খুঁজে পায়নি। প্রায় আধঘন্টা পরে খালেদ ভাইয়ের সাথে ওরা পাশের গ্রামে গেলো। রাস্তায় কোনো কথা হলো না। কাদা ভাঙার প্রতিযোগিতায় শিমুল বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শিমুলের বাড়ি গ্রামে। অথচ গ্রামে থেকেও এমন গ্রাম সে আগে আর দেখেনি। একেই বলে অজ পাড়া গাঁ। চারদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ক্লান্তিহীন একটানা ডাক। কেবল ওদের পায়ের শব্দে সেই ডাক ক্ষণিকের জন্যে থেমে থেমে যাচ্ছিল। ওদের হাত পনেরো কুড়ি বাঁয়ে একঝাঁক শেয়াল ডেকে উঠলো হঠাৎ কোরে। ঝোঁপঝাড়ের ফাঁদে ঘলবাড়ি ঘেরা। আকাশভরা তারা অদ্ভুত উজ্জ্বলতায় জ্বলজ্বল করঝিল। ছোট্ট একফালি চাঁদ তখনো ঝুলেছিল পশ্চিম দিগন্ত ছুঁইছুঁই কোরে। ওদের সারা পেয়ে ঘেউ ঘেউ কোরে তেড়ে এসেছিল একটা কুকুর। বাড়ির উঠান পর্যন্ত ওদের দৌড়। রাতের আঁধারেই শিমুল বুঝেছিল, আধুনিকতার থাবা এখনো এইসব গ্রামে এসে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হানতে পারেনি।

সারি বাঁধা ঘর। প্রায় সবগুলোই ছনের এবং তা-ও আবার দো'চালা। মাঝেমধ্যে দুইএকটা টিনের ঘর। বুঝতে অসুবিধা হয়নি। খালেদ ভাইয়ের পিছু পিছু শিমুলরা একটা বাড়ি গিয়ে উঠলো। এখানেও একটা কুকুর তেড়ে এলো। গলায় সে কি ভয়ংকর গো-গো শব্দ! শিমুল ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। খালেদ ভাই মিষ্টি গলায় ধমকে ওঠলেন— 'এই কুতু, চুপ!' ব্যস, লেজ নেড়ে কিউ কাউ কোরে কুকুরটা প্রথমে খালেদ ভাইয়ের গায়ের গন্ধ নিলো, তারপর ওদের দিকে এগিয়ে আসতে গিয়েও থেমে গেলো। তবে আর কোনো ডাকাডাকি না কোরে খালেদ ভাইয়ের গা ঘেঁষে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো।

ঘরে দশ বারোজন মানুষ। যুবক। শিমুলদের বয়স ওরা কয়েকবছর আগে পেরিয়ে এসেছে। তিনজন মাঝ বয়েসী। শুধু একজনকেই মনে হলো, সে শিমুলের বয়েসী।

গামলা ভরা পানি। হাত মুখ ধুয়ে ওরা অপেক্ষমান লোকগুলোর একপাশে গিয়ে বসলো। করমর্দনের সময় যখন সবাই বললো 'লাল সালাম', শিমুলের রক্তে তখন অনেকক্ষণ পরে সত্যিকারের কিন্তু অচেনা মাদকতার একটা নাচন উঠেছিল। ওর মনে হয়েছিল, ও যেনো হঠাৎ কোরে একটা নিষিদ্ধ ক্যাসেট হয়ে গেছে, হয়ে গেছে মহান ব্রতে দীক্ষিত এক নিষিদ্ধ যুবক। চেয়ে দেখলো, একজন যুবকের হাতে কুচকুচে কালো একটি এস.এম.জি.। পাশে সজল ও হাসেম। চোখেমুখে খুশির ঝিলিক। খালেদ ভাই বৈঠক করলেন। কর্মী বৈঠক। এলাকার যাবতীয় খবরাখবর নেয়ার তালে তালে রহিমা খালার অসুখ ভালো হয়েছে কি না; হালিমার বর ওকে কবে নিয়ে গ্যাছে, পরে আর কোনো সমস্যা হয়েছে কি না, হারু দাসের পাওনা টাকা কেরামত প্রামাণিক কবে শোধ করেছে, পরম ধৈর্য নিয়ে তিনি তা জেনে নিলেন। এরপরই এলো সাঈদ ও শিমুলের পালা। বেশ স্বাচ্ছন্দেই সাঈদ আলোচনা চালিয়ে গেলো। আদি সাম্যবাদী সমাজের ভেতরে কি কোরে শোষণের সৃষ্টি হতে শুরু করলো, সমাজটা কি কোরে পাল্টে গেলো দাস সমাজ ব্যবস্থায়, সেখান থেকে কেনো আর কি কোরে সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হলো, বেশ সহজবোধ্য কোরেই আলাপ করলো সে। কর্মীদের প্রশ্নগুলোরও জবাব দিলো প্রায় গ্রাম্য ভষায় বিভিন্ন উদাহরণ টেনে, সহজ কোরে। তবে, সব কিছুতেই বড়বেশি মাপাঝোপা, অন্তত: শিমুলের কাছে তাই মনে হলো।

তারপরই শিমুলের পালা। হুট কোরেই যেনো ওর পানিতৃষ্ণা পেয়েছিল। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ভালোই ধারণা আছে ওর। আত্মবিশ্বাসটা সেই রকমই। মূল যে সমস্যাটা, যেখানে শোষণের আসল বীজটা শিকড় গেঁড়ে শোষণের ডালপালা ছড়িয়ে চলেছে, সেই ভীতটা, তার চরিত্রটা মূলত: সবচে'বেশি সুসংবদ্ধ আর মজবুত হয়েছে এই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায়ই, সে তা' ভালোই বোঝে। সামাজিক উৎপাদনের আধুনিকায়ন যেমন হয়েছে পুঁজিবাদে, তেমনি টোটাল মুনাফাও বেশি মাত্রায় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভেতরেই। পরিষ্কার একটা উপলব্ধি আছে ওর। সে জানে, সামাজিক উৎপাদনের ফসল ব্যক্তির হাত থেকে কেড়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে সামাজিক ভোগে নিয়ে এলেই আসল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ওটাই আসল বিপ্লব।

কিন্তু— গুছিয়ে ভালো কোরে বুঝাতে পারে না শিমুল। বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় যেমন বিরক্তিকর ছন্দ পতন হয়, তেমনি কথায় আসে আড়ষ্টতা, শব্দের জটিলতা। সে একটা জিনিস বেশ পরিষ্কারভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল, বইয়ের ভাষা কৃষক জনতার ব্যবহারিক ভাষায় পাল্টে নিতে ভীষণ কঠিন এবং সে এই ক্ষেত্রে ভীষণভাবে কাঁচা। নিজের উপর নিজেই বিরক্ত হয়েছিল শিমুল।

আজানের ধ্বনি। ধ্বনিটা ভেসে ভেসে ঢেউ তুলে আসছে অনেক দূর থেকে। খালি গলার ভারী মিষ্টি অস্পষ্ট সেই সুরধ্বনি। ভোর হয়ে আসছে। ভোর কোরেই ওদেরকে রওনা দিতে বলেছেন খালেদ ভাই। শিমুল সাঈদের দিকে তাকালো। অন্ধকারে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। সে সাঈদের মাথায় হাত রেখে খুব হালকা ভাবে নাড়া দিয়ে ডাকলো— 'সাঈদ...,এই সাঈদ।'

সাঈদ পাশ ফিরে বালিশটা দুইহাতে আঁকড়ে ধোরে জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করে— 'কয়টা বাজে?'

হাতের ঘের বানিয়ে অন্ধকার আরো একটু ঘন করলো শিমুল। ঘড়ির রেডিয়াম দেওয়া কাঁটা তাতে আরো বেশি উজ্জ্বল আর স্পষ্ট হয়।

'পাচটা বাজে প্রায়। উঠে পড়ুন। আট নয় মিনিট বাকি।'

হাঁই তুললো সাঈদ। তারপর যেনো বিরক্ত হয়েই সে উঠে বসলো। ঝিমালো মিনিট দুই আড়াই চুপচাপ বোসে থেকেই। শেষ রাতের ঘুমের আবেশ থেকে হুট কোরে সে বেরিয়ে আসতে পারে না।

কাকডাকা ভোর। এতো অজপাড়া গাঁয়ে কাক তেমন একটা মেলে না। তারচে' বেশি মেলে দোয়েল-শালিখ-ঘুঘু-চড়াই। বলা ভালো— দোয়েল ডাকা ভোর। অন্ধকার একটু একটু কোরে ফিকে হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে শিস বাজাচ্ছে দোয়েল। একটা দুইটা পাখি গাছ বদল করছে। কিচির মিচির ডাক উঠেই আবার একদম স্তব্ধ! পাতায় পাতায় ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠার ফিসফাস মাতামাতি। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। শিমুলের মনটা হঠাৎ কোরে ভীষণ ভালো হয়ে ওঠে। খুব আনন্দ লাগে ওর সবটুকু চেতনায় । এই না হোলে বেঁচে থাকা? এতো সুন্দর জ্যোতির্ময় আনন্দঘেরা ভালোলাগা সময়, এতো ক্লান্তীহীন আশাভরা প্রভাত! বুকে বাসাবাঁধা হতাশাটুকু ফুৎ কোরে যেনো হাওয়ায় মিশে গেছে। আহ্ বেঁচে থাকায় কি সুখ! ওরা নদীর পাড়ঘেঁষা উঁচু রাস্তায় উঠে এলো। ডান পাশে নদী, বাঁ পাশে গ্রাম। নদীর ওপারে মাঠ আর মাঠ। মাঠটা কুয়াশার মিহি কিন্তু হালকা আস্তরণের ঘোমটা মুড়ে জেগে আছে, নড়ছে একটু একটু। শেষ সময়ের মতো খায়েশ মিটিয়ে জ্বলজ্বলিয়ে উত্থানের বিশ্বাসী আর নরম স্পর্শের আশায় জেগে আছে শুকতারা। উজ্জ্বল এবং নরম আর স্নিগ্ধ রূপালী আভায় পূবাকাশ জেগে উঠছে, জেগে উঠছে প্রাণ, জেগে উঠছে স্পন্দন!

এলাকাটি শিমুলের একদম অচেনা। বিভূতি ভূষণের 'পথের পাঁচালী'র শব্দের যাদুজালে গ্রাম বাংলার একান্ত নিরিবিলি যে সব কল্পছবি এতোদিন শিমুলের অবচেতন কাব্যিক মনে পিটপিট করছিল, ফাঁক পেয়ে এখন ওরা একের পর এক জেগে উঠছে। অথবা— ছবিগুলো হয়তো 'পথের পাঁচালী'র নয়, একটু ভিন্ন ধাঁচের, ভিন্ন কিছু। কৃষকরা দুই চারজন এরই মধ্যে লাঙ্গল জোয়াল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন। সাঈদ এদের ভেতরের চারজনকে ডেকে কুশলাদি জেনে নিয়েছে। একজন তো তেড়েই এলো। রীতিমতো কৈফিয়ত তলব— 'এতোদিন এলিনে কেনো?' শিমুল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। 'তুই-তামারি?' ওর আত্মসম্মানে ঘাই লাগলো। রীতিমতো রাগই হলো ওর। কিন্তু পরবর্তী জীবনে এই ঘটনার কথা মনে কোরে শিমুল লজ্জায় কতো হেসেছে! হঠাৎ পাওয়া এ ধরনের দু' একজনের 'তুই তামারি' ডাকের মধুর ছোঁয়ায় শিমুল ওর হতাশা আর বেদনাকে ঢেকে ডিঙ্গিয়ে পথ ভাংগার দৃঢ়তা পেয়েছিল অনেকবার। সে সব আরো অনেক পরের কথা!

ওরা অনেকক্ষণ হাঁটলো। পা দু'টোয় ভারী ভারী ভাব কিন্তু মনটা তখনো ফুরফুরে, ক্লান্তি নেই সেখানে। সূর্য ইতোমধ্যেই তার সোহাগী লাল রং ছেড়ে খড়খড়ে সোনালী রঙ মেলে ধরেছে। ছোট্ট মাঠ পেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পর ওরা আবার বড়াল নদীর পাড়ে চলে আসে। শিমুল এ সবের কিছুই চেনে না। গ্রামটা ওর কাছে নতুন। গ্রামের মুখেই স্কুল। উপরে টিন। বেড়ার বালাই নেই। এলোমেলো ভাবে পাঁচ-সাতটা বেঞ্চ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। একটা উল্টে চিৎ হয়ে আছে। শিমুল খুঁজেও কোনো টেবিল দেখতে পেলো না। একটাই ব্লাকবোর্ড। বোর্ডটার মাঝখানে ফাটল, দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় কোনো আজব হাত যেনো খাবলা মেরে কালো রং তুলে নিয়েছে। মাঠে দাঁড়িয়ে আছে সাত আটজন ছেলেমেয়ে। ওদের বাঁ পাশে দুইটি গরু আর কয়েকটা ছাগল। পেছন দিক থেকে তিন চারজন ছেলেমেয়ে দৌড়ে এসে মাঠে দাঁড়ালো। তিনজনের গায়ে শার্ট নেই। 'এক-দুই-তিন....' এতোটা দূর থেকেও ছেলেটার বুকের হাড় গোনা যাচ্ছে। শিমুলের বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড! ফ্যা!' হঠাৎ কোরে যেনো শ্লোগানের অর্থটুকু পরিষ্কার হয়ে গেলো ওর কাছে। ভেতরে এতো গড়ল! অবশ্য নিজেকে খুব তাড়াতাড়িই সামলে নিলো সে। আসলে শোষকদের রাজ্যে ছল চাতুরি আর ফাঁকিবাজি ছাড়া আছেই বা কি? কিন্তু আশ্চর্য, এতোবড় ফাঁকিটা এতোদিন কেনো যে ওর মাথায় ধরা পড়েনি! অবশ্যই ফাঁকিবাজি হাজারবার ফাঁকিবাজিই! শিক্ষা নয়, উৎপাদনই জাতির মেরুদণ্ড। উৎপাদনকে আধুনিকায়ন কোরে, বাড়িয়ে তুলে জাতির মেরুদণ্ডকে স্বাধীন এবং সাবলীল করতে হয়। না, এর কোনো বিকল্প হোতেই পারে না। শিক্ষা অবশ্যই জাতির মেরুদন্ডকে আরো বেশি মজবুত, আরো বেশি শক্ত করতে পারে, তাই বোলে নিজেই সে কখনো মেরুদণ্ড হয়ে বসতে পারে না! ওই যে হাড্ডিসার ছেলেটা! ওর বাপ নিশ্চয় উৎপাদিত ফসলে ন্যায্য ভাগ পায় না! ওর ছেলে লেখাপড়া শিখবে কি কোরে? আগে তো জীবন, তারপরেই না জীবনকে সাজিয়ে

তোলা! তা হোলে সব মিলিয়ে মানেটা দাঁড়ালো কি? উৎপাদন দেদারসে হোলেই হবে না. তার উপর উৎপাদকের ন্যায্য অধিকারও থাকা চাই তা নিশ্চিত করা চাই। তখনই ওই সব ছেলেমেয়েগুলোকে ক্ষিধের জ্বালায় সব সময় ট্যা ট্যা করতে হবে না, অল্প বয়সেই বাপ ভাইয়ের সাথে মাঠে ছুটতে হবে না। বাপ তখন বই কিনে দিতে পারবে, লেখাপড়াও ওর হবে। এছাড়া শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার? একদম অসম্ভব!

এই নতুন আবিষ্কারের আত্মতৃপ্ততায় ওর মন নতুনভাবে আন্দোলিত হয়। হতাশার চেয়ে আশার আশ্বাসী আলোটুকুই বেশি এবং সত্য। খোলা আকাশের নিচে হাঁটতে হাঁটতে শিমুল বুক ভরে শ্বাস টানে। ভেতরে থরথর করে ক্লান্তিহীন শপথে পথ চলার এক নতুন উত্তেজনা।

উঠানে পা দিতেই কালু দৌড়ে এলো। কোমর বেঁকিয়ে শিমুল হাত রাখলো কালুর গায়ে। আদর করলো। খুশিতে চিকচিক কোরে উঠলো কালুর চোখ। ফাঁক পেয়েই ও তিন লাফে রান্নাঘরের দরোজায় গিয়ে দাঁড়ালো। লেজ নেড়ে একবার ভেতরে একবার বাইরে এভাবে ভেতর-বাহির করলো চোখ। তারপরই আবার একদৌড়ে ফিরে এলো। শিমুল ততোক্ষণে বারান্দায় গিয়ে উঠেছে। ওর মনটা বাড়ির কাছাকাছি আসার সাথে সাথে খারাপ হয়ে ওঠে। গত দুই দিন বাড়ি ফেরেনি। এক ধরণের অপরাধবোধ ওকে জাপটে ধরে। মাকে বোলে গ্যালেই পারতো। হয়তো বাধা দিতো মা, কিন্তু বেঁধে তো আর রাখতে পারতো না! কিছুটা চিন্তামুক্ত থাকতে পারতো।

শার্ট না ধুলেই নয়। ঘামে বারবার ভিজেছে আবার শুকিয়েছে। উৎকট একটা ভোটকা গন্ধ হয়ে আছে। গেঞ্জিতে তিলে পড়েছে কিছু। শার্ট আর গেঞ্জিটা বারান্দায় খুলে রেখে শিমুল ঘরে ঢোকে। ক্ষিধেয় ওর পেট চোঁ চোঁ করছে। সেই কোন সাত সকালে রসুন পাতা বাঁটা দিয়ে রুটি খেয়েছে! রানু শুনলে নির্ঘাত চোখ বড় বড় কোরে প্রথমে অবিশ্বাসের ভঙ্গি করবে, তারপরই হাসতে হাসতে শিমুলের গলা জড়িয়ে ধোরে জিজ্ঞেস করবে, 'সত্যিই রসুন পাতা বাঁটা খাইছস, না আর কিছু? ক্যামন লাগেরে ভাই? ইস, আমরা যদি এমুন কিছু রাইন্ধা দিতাম. তাইলে তো শরীলের জোরে মারতি একটা আছাড়।' আর মা শুনলে? মা হয়তো

কেঁদেই ফেলবে। রুটি? তাও আবার শুধুমাত্র রসুন পাতা বাঁটা দিয়ে? খেয়েছে শিমুল? কাঁদতে কাঁদতেই হয়তো লতা অবিশ্বাস করতে থাকবে শিমুলের কথাটা। শিমুল মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বাড়িতে সে আর কোনোদিন হৈ চৈ করবে না, যা-ই খেতে দিক না কেনো, স্বাদ যেমনই হোক। রুটি দিলেও চুপচাপ খেয়ে নেবে।

কেজ-এ সাবান নেই। শিমুল ডাকলো— 'এই রানু, সাবান দিয়ে যা তো আপু।'

রানু আসার আগেই লতা এলো। মায়ের চোখে চোখ পড়তেই হাসতে চাইলো শিমুল। কিন্তু পারলো না। লতার থমথমে বিষণ্ন চোখ মুখ ওকে অপরাধী বানিয়ে ফেললো মুহূর্তে। লতা ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। তার ঠোঁট দুটো থরথরিয়ে কাঁপছে। একভাবে চেয়ে আছে ছেলের দিকে। তিন চারদিন শেভ করেনি শিমুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। উস্কো খুস্কো চোখ। সারাটা মুখে রোদে পোড়ার হালকা কিন্তু স্পষ্ট আঁচ। শিমুল এগিয়ে গিয়ে লতার গলা জড়িয়ে ধরে। কোনো কথা বললো না লতা। শুধু ছেলের হাত দুটো গলা থেকে সরিয়ে দেয়। তার ভেতরে বইছে প্রচণ্ড এক বাওকুড়ানি ঝড়। নিজেকে ধোরে রাখতে পারছে না সে। সামান্য সরে সে দরোজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত নিজের মাঝে নিজেকে আর ধোরে রাখতে পারে না লতা। শিমুলের হাত দুটো সে টেনে নেয় নিজের বুকের মাঝে। সে সেই হাত ধোরে, হাতে ভর রেখে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে।

'তর লাইগা বুকটা আমার ক্যামুন যে করে বাবা! হাত দিয়া দ্যাখ, বুকটার মধ্যে আমার কত দু:খ, কত কষ্ট। তুই না বুঝলে আমার আর ক্যাডা আছে বাবা? তর ভাবনায় কবে জানি আমি দম বন্ধ হইয়া মইরা যাই। আমার কষ্ট তুই বুঝোস না, বাবা?' লতা শরীর কাঁপিয়ে ফোঁপাতে থাকে। তার চোখদু'টু হয়ে ওঠে লোনাজলের কষ্টের ঝর্ণাধারা। স্বপ্নের আকাশ তার ভরে যায় বাজ পাখির ডানার ছায়ায়। সেখানে কোনো আলো নেই, নীল নেই, তারাভরা আকাশ নেই।

কি যে হলো শিমুলের! বাকি সারাটা জীবন সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখেছে এবং বারবারই একই মতামত পেয়েছে, মাকে সেদিন ওভাবে জবাব দেয়াটা ঠিক হয়নি। শিমুল যেনো তোতা পাখি। অথবা ওর ভেতরে একটা প্রস্তুত করা ক্যাসেট পুরে রাখা। কিংবা নৈতিকতার সাচ্চা অনুপ্রেরণার ন্যায়বোধের তাগিদে সে মাতৃত্বের সীমাবদ্ধতাকে ভেঙ্গে ফেলার কোনো রোমান্টিক ভাবালুতায় ডুবে আছে। লতার চোখে লোনা জল। গাল ভিজে উঠেছে। এতোক্ষণ ধোরে অপরাধবোধের যে বিপন্ন অনুভূতি শিমুলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তা' মুহূর্তে কেটে গেলো। সে ঠিক সরাসরি মায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারলো না। কষ্টও হলো ওর। কিন্তু আস্তে কোরে সে মায়ের আকুলতার জবাবে বললো—'মা, তুমি কিন্তু আমার জন্যে অযথা বেশি বেশি ভাবো। তুমি জানো না মা, আরো কতো শত শত মা আমার জন্যে পথ চেয়ে থাকে। শুধু তোমার জন্যে বা তোমার কথা শুনে ওদের কাছে, ওইসব মায়েদের কাছে আমি যাবো না? তা হোলে ওদের কথা কে ভাববে, কে ওদেরকে দেখবে? ওরাও যে আমার মা!'

হঠাৎ কোরে লতার চোখে বিদ্যুৎ ঝল্‌কে গেলো। শিমুলের গালে ঠাস কোরে চড় মারে লতা। আর একটিও কথা না বোলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। হঠাৎ কোরেই তার শরীরের থিরথির কম্পন থেমে যায়। চোখে আর নতুর কোরে জলও আসে না। তবে বড় বেশি থমথমে হয়ে ওঠে তার অবয়ব। আঁচল দিয়ে চোখের জলের শেষ চিহ্নটুকু মুছতে মুছতে সে রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকে।

লতা শেষবারের মতো হাত তুললো শিমুলের গায়ে। শাসনও শেষবারের। বাকি জীবনে আর কোনোদিন কোনো কাজে শিমুলকে বাধা দেয়নি লতা। বাধা দিলে হয়তোবা শিমুলের বাকি জীবনে অনেক ঘটনাটাই ঘটতো না, পথটাও হয়তো হয়ে যেতো ভিন্ন। পাল্টে যেতো গোটা জীবন প্রবাহ।

ঘটনার আকস্মিকতায় শিমুল 'থ'। থাপ্পড়টা ভীষণ রকমের অপ্রত্যাশিত। খুব ব্যথা হচ্ছে ওর। ব্যথাটা থাপ্পড়ের আঘাতের নয়, মায়ের হঠাৎ অস্বাভবিক আচরনে, তার হৃদয়মথিত যন্ত্রনার স্পন্দনে। ওর মনে হলো, অনেকদিন পরে মায়ের শরীর থেকে হারিয়ে যাওয়া আতা ফুলের ম-ম গন্ধটা আলতো কোরে ওকে যেনো ঘা দিয়ে গেলো, ছুঁয়ে গেলো। তাও খুব ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট এবং বড়বেশি ক্ষণিকের। মুহূর্তের মধ্যে একটা ভাবনা ঢেউ খেলে গেলো ওর তপোবনের সবটুকু জায়গা জুড়ে। হিসাবের ভাবনা। মাকে কতোটা চেনে সে! কতোটাই বা কাছে পেয়েছে? সেই যে প্রথম লীনার সাথে ওকে জোর কোরে পাঠানো হয়েছিল, তখন সে কতোবার রাতে ঘুম ভেঙ্গে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে মায়ের জন্যে। কিন্তু মাকে সে কাছে পায়নি। আস্তে আস্তে এক সময় সব সয়ে গিয়েছিল। সেই সাথে ওর চেতনার তপোবনে মায়ের মধুর স্পর্শও একটু একটু কোরে ম্লান হতে শুরু করেছিল । সে এখন এটুকু ভালো কোরেই বোঝে, ওর জন্যে মা অনেক লাঞ্ছিত হয়েছে, বড় 'পা এক অস্বাভাবিক জগতের বাসিন্দা হয়ে আটকে পড়েছে। সেজন্যে খুব কষ্টও হয় ওর। ডান হাতটা মনের অগোচরেই নিজের বুকে উঠে আসে। ব্যথাটা বড়বেশি স্পষ্ট এবং তীব্র। অথচ— এতো তীব্র কষ্টেও শিমুল একটুও কাঁদতে পারছে না।

রানু ঘরে ঢুকলো। হাসতে হাসতে শিমুলের কান মলে বললো— 'মজাটা কেমন হইছে?'

বিদ্‌ঘুটে রাগের শকুনটা শিমুলের সারা শরীর ঘিরে ডানা ঝাপ্টাতে থাকে। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত শিমুল নিজেকে ধোরে রাখতে সামর্থ হয়। রানুর চোখ এড়ালো না শিমুলের ক্ষুব্ধ মানসিকতা। আর কিছু না বোলে সে শিমুলকে সাবান দিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেলো। সবানের সাথে সে দিয়ে গেলো দুটো চিঠি। একটার খামের উপরের লেখা চেনা। বড় আপা লিখেছে। অন্যটার লেখা সে চেষ্টা কোরেও বুঝে উঠতে পারে না। চিঠি নিয়ে নাড়াচাড়া সে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো। তারপর ড্রয়ারে রাখলো। আর হঠাৎ কোরে ওর ইচ্ছে হলো শেভ করার জন্যে। কিন্তু শেভ না কোরেই সে অনেকক্ষণ ধোরে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইলো। নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে শিমুল। প্রায় তন্ময় হয়ে। অথবা এলোমেলো ভাবনায় ডুবে গিয়ে। অথবা— একদম কিছুই না ভেবে।

পুকুর পাড়ে উঠতে না উঠতেই কালু গিয়ে হাজির। চোখে মুখে খুশি আর দুষ্টোমীর ঝলকানি। খেলা করার বায়না। অথবা— গোসলের। হাত বাড়িয়ে কালুর কান ধরে শিমুল। শান্ত সুবোধ ভঙ্গিমায় কালু শিমুলের সাথে সাথে ঘাটে গেলো। কি গোবেচারা!

খুব যত্নকোরে কালুর গায়ে সাবানের ফেনা তুললো শিমুল। একসপ্তাহ্ হয়ে যাচ্ছে, গোসল করানো হয়নি। রানুকে অবশ্য জিজ্ঞেস কোরে দেখেনি। কালুর গা ডলতে ডলতে শিমুল কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মা! সে কি সত্যিই এমন কিছু করেছে মা যাতে বড়বেশি কষ্ট পাচ্ছে? পার্টি? না রিয়া? ওঁহো, রিয়া হতে পারে না। শিমুল মাস ছয় আগে নিজের কানেই শুনেছিল, কথা প্রসঙ্গে বড়'পাকে মা বেশ ঝাঁঝালো গলায় সোজা-সাপ্টা বলে দিয়েছিল, 'ওইসব নিয়া তুমি দুশ্চিন্তা কইরো না। শিমুল যারে বিয়া করবার চাইবো, তারেই আমি ঘরে আনুম।' বড়'পা যে মায়ের কথায় খুশি হয়নি, শিমুল তা জানে।

ছ্যাৎ কোরে উঠলো ওর বুক। উড়ো উড়ো একটা কথা শুনছে শিমুল, রিয়াকে বিয়ে দেয়ার জন্যে ওর বাবা নাকি তৎপর হয়ে উঠেছে। বড়'পার হাত নাই তো কোনো? রানুই কথায় কথায় বলে ফেলেছিল, মাঝখানে বড়'পা যখন একা বাড়ি এসেছিল, সে তখন খালাদের ওখানে গিয়েছিল। কেনো, তা' রানু জানে না। তবে তারপর থেকেই রিয়া যেনো কেমন হয়ে গেছে। চিঠিপত্রও লিখছে না। নাহ্, রিয়ার সাথে একবার দেখা করতেই হবে।

ভোঁ দৌড় লাগালো কালু। শিমুলের অন্যমনস্কতার সুযোগ পুরোটাই সে কাজে লাগিয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো শিমুল। চুপচাপ সে পা ঘঁষতে থাকে। সবকিছু মাঝে মাঝে বড়বেশি অর্থহীন মনে হয় ওর। তখন কিচ্ছু ভালো লাগে না। ভেতরে কি যেনো একটা ভাঙ্গনের কেবলই গুড়গুড় শব্দ হয়।

রানু ভাত বেড়ে দিলো। লতা গোসল করতে গেছে। এইমাত্র ঝাঁক বেঁধে কবুতরগুলো মাঠ থেকে উড়ে এসেছে। কেমন বাকুম বাকুম ডাকছে! যেনো বেলুনের মতো আকার ঘেরা কতো খুশির বুদবুদ ওরা বাকুম বাকুম শব্দের মধ্য দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। রানু কচি লাউপাতা মোড়ানো কই মাছ শিমুলের পাতে তুলে দিতে দিতে বললো— 'তুই কি রে ভাই? মা তোর লাইগা রাইত দিন খালি কান্দে! কান্দে কেরে, তুই বুঝোস না?'

'আমি কি করবো?'

'কি করবি মানে? তোরে নিয়ে মা কতো স্বপ্ন দ্যাখে, আর তুই?'

তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে থালার ভাত নাড়ে শিমুল। একদম খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। হঠাৎ কোরে কেনো যেনো ক্ষিধে থাকা সত্ত্বে ওর গলা দিয়ে ভাত নিচে নামতে চাইছে না।

'খাস না ক্যা?'

'ভালো লাগছে নারে।'

'আর ঢং করিস না, ভাত খা।'

রানু আরো এক টুকরো লেবু দেয় শিমুলকে। রানুর এইটুকু মমতায় শিমুলের চোখ ফেটে হঠাৎ কোরে লোনা জলের প্লাবন বইতে চাইছে।

'ওইসব পার্টি ফার্টি না করলে হয় না?'

'আমার ভালো লাগে। করবো না-ই বা ক্যানো? অন্যায় কিছু করছি নাকি যে, অযথা মন খারাপ কোরে কান্নাকাটি করতে হবে। জীবনে কম মার খাইনি। কিন্তু— আর না! এবার মারবোও। তুইও তো সাপোর্ট করিস আমাদের। করিস না?'

'মায়ের লাইগা হইলেও আমি এইসব ছাইড়া দিতাম। মার মুখ দেখলে আমার কিচ্ছু ভালা লাগে না। তুইতো খোঁজ নেস না; মায় পলাইয়া পলাইয়া কান্দে।'

এক নলা ভাত মুখে দিয়ে শিমুল চিবোতে চিবোতে বলে– 'আমরা ছেড়ে দিই বোলেই ফেলু মেম্বররা নির্বিবাদে আমাদের উপর জুলুম চালিয়ে আসছে। একদল হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর পেট ভরে ডাল ভাতও খেতে পায় না, আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ওইসব মানুষের রক্ত নিংড়ানো শ্রমে সুখের প্রাসাদে বোসে খুশিতে করতালি বাজাবে, তা হয় না রে বোনডি।'

'রাখ তোর বড় বড় বুলি। স্বপনদা আইলে তারে আমি কথাডা এইবার জিগামু।'

'মা বুঝতে না চাইলে আমি কি করবো?'

'মা তো আর শোষক শ্রেণীর না, তাই না? তারে ভালা কইরা আগে বুঝা।'

'যতোই বুঝাই, মা বুঝবে না। তার এক কথা— 'তুই আমার একটা মাত্র পোলা।'

'মায় কি মিছা কথা কয়? মারে তুই না দেখলে, কেডা দেখবো?'

'বড়'পা আছে।'

'কথাটা কইতে তোর শরম করে না? বড়পা'রেও তোর দেখতে হইবো।'

শিমুল একচুমুকে পানির গ্লাস শূন্য কোরে নামিয়ে রাখে। খাওয়ার মাঝখানে শিমুল কখনো পানি খায় না। হঠাৎ কোরে ওকে পানি খেতে দেখে রানু একটু অবাক হয়।

'পানি খাইলি যে?'

'ভাল্লাগছে না।'

'ঢাকা যাওনের লাইগা মা তোরে রেডি হইবার কইছে। আট দশ দিনের মইধ্যেই যাওন লাগবো।'

শিমুল কিছুটা অবাক হয়। হঠাৎ ঢাকা কেনো? সে রানুর দিকে তাকায়।

'ঢাকা? ঢাকা যাবো কেনো?'

'বারে, তুই না ডাক্তারি পড়বি!'

ধ্বক কোরে ওঠে শিমুলের বুক। চারদিন হয় রেজাল্ট বেরিয়েছে। সে গ্রামে ছিলো। খবরটা রেডিওতে শুনেছিল। অথচ এতোক্ষণ মনেই হয়নি কথাটা।

'বড়পা' চিঠি দিছে। তোরেও তো দিছে, পড়স নাই?'

'না।'

'তুই আসলেই একটা পানি ঘোলা কইরা খাওয়নের জন্তু। ফার্স্ট ডিভিশন পাইছোস! কেমিস্ট্রি আর বাইওলোজীতে লেটার লেটার ভাব আছে। মা যে কি খুশি হইছে। আর তুই হঠাৎ কইরা কি কইয়া মারে রাগাইয়া দিলি! নে, তাড়াতাড়ি মিষ্টি খাওয়া।'

ভেতরের গুমোট ভাবাটা খুশির উচ্ছ্বাসি ধাক্কায় মুহূর্তে ভেঙ্গে গুড়িয়ে পড়ে। একটা ধুকধুকি আশংকা ছিলোই অনেকবার হিসেব মেলানোর পরও। খুশিতে হাফ ছাড়লো শিমুল।

'মিষ্টি খাওয়াবি তো?'

'অবশ্যই খাওয়াবো। ক কি খাবি?'

'বাব্বা, একদম লাট বাহাদুর হইয়া গেলি যে?'

'অবশ্যই। বোলেই দ্যাখ না!'

'খাওয়াবি তুই, কি খাওয়াবি, তাও তোর ইচ্ছে।'

'ও.কে সিস্টার, দে।'

শিমুল রানুর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরে।

'মানে?'

'মানে— দে।'

'কি?'

'পয়সা! মিষ্টি কিনতে পয়সা লাগবে না?'

রানু শিমুলের হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

'ভাগ। আমিই যদি পয়সা দিমু, তয় তোরে দিয়ে আনামু ক্যারে? দুনিয়ায় আর মানুষ নাই?'

'তাইতো! কে রে সেই ভাগ্যবান? সবুজ?'

'ধ্যাৎ! আর মানুষ পাইলি নে!'

'আমি তো আর কানা নয় রে বোনডি! মনে করেছিস কিচ্ছু জানিনে, না?'

'কানা তুই না, তবে বুদ্ধু। আমি অহনে বিয়াই হইতাম না।'

'পাঁচ বছর পর?'

'তখন দেখা যাইবো। তয়— সবুজরে না।'

'বুঝলাম।'

'কি?'

'গোটা কুড়ি টাকা হবে?' শিমুল পিটপিটিয়ে বোকার মতো হাসে।

'জ্বি না, এক টেহাও না।' মুখ বেঁকায় রানু।

'একবারে দিতে বলছি না। স্রেফ ধার চাইছি, প্লিজ আপু, রাজি হয়ে যা।'

'এই পর্যন্ত ধারের কথা কইয়া কয় টেকা নিছোস, কইবার পারলে দিমু।'

'যা ভাগ, তোর টাকা আমার লাগবে না।'

'থ্যাংক ইউ ভাই, মনে থাহে যেন।'

শিমুল উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ যেনো মনে পড়েছে, এমন ভাব কোরে রানু বললো— 'ওহ্‌হো, তোর না একটা দারুন খবর আছে। ক তো কিয়ের খবর?'

শিমুল না শোনার ভান করলো কিন্তু রান্না ঘর ছেড়ে বের হলো না।

'বেচারি! অনেক শুকাইয়া গ্যাছে।'

শিমুল রানুর দিকে ফিরে তাকায়।

'রিয়া! কাইল তোর বন্ধু খোকন আইছিল। তার লগে নাকি দ্যাহা করবার আইছিল। তোরে বারবার কইরা যাইবার কইছে। ও ক্যামুন আছে, গিয়া একবার দেইখ্যা আইবার কইছে। বিয়ের খবরটাও নাকি মিছে না। যাবি? ল কাইল পরশু যাই!'

রিয়ার কথা শিমুল অহর্নিশি ভাবে। কতোদিন রিয়াকে সে দেখেনি! অবশ্য খুব তাড়াতাড়িই ওর সাথে একবার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শিমুল সাংগঠিক কাজেই একবার বর্নী যাবে। তখন সে একবার চান্স নেবে রিয়ার সাথে দেখা করার। কিন্তু রানুকে সে তা বলতে নারাজ। পাঁজিটা গোপনে গোপনে বড়'পার কাছে সব বোলে দেয়। তাই রানুর কথার ধার দিয়েও শিমুল গেলো না। সে প্রসঙ্গ পাল্টায়।

'এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস?'

উত্তরের অপেক্ষা না কোরে শিমুল বাইরে বেরিয়ে আসে।

ড্রয়ার টেনে শিমুল চিঠি বের করে। বড় আপার লেখা চিঠিটা তুলতে গিয়েও শিমুল অন্যটাই হাতে উঠিয়ে নেয়। নেড়ে চেড়ে বুঝতে চেষ্টা করে। সীলমোহর দেখে খুঁটিয়ে। নাহ্, বোঝার কোনো উপায় নেই। লেখাটা কেমন মেয়েলি। চিনি চিনি কোরেও চেনা হয়ে উঠছে না। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলেই সব রহস্য বের হয়ে পড়বে। আর কি আশ্চর্য, এভাবে ভাবতেই ওর ইচ্ছে হলো আগে বড়'পার চিঠিটা পড়ার জন্যে। শিমুল সিগারেট জ্বাললো। সব কিছুই কেমন যেনো লাফিয়ে লাফিয়ে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ওর ভেতরে। বড়'পা কি লিখেছে, কি লিখতে পারে, জানা কথা। ফুসফুস ভরে ধোঁয়া টেনে শিমুল শেষ পর্যন্ত অন্য চিঠিটাই আগে খুলতে গেলো। খারাপ লাগলো ওর। খামটা বিশ্রীভাবে ছিঁড়ে গেলো। কিন্তু ভারি সুন্দর এবং হালকা একটা গন্ধ এসে ওর নাক ছুঁয়ে দিলো।

চিঠিটা টেনে বের করতেই শিউলীর কথা ওর মনে পড়ে যায়। আগেও আরো দুটি চিঠি লিখেছিল মেয়েটা। শিমুল কোনো উত্তর দেয়নি। ওই দুটি চিঠিতেও এমন সুগন্ধ লাগানো ছিলো। চিঠিটা শিউলী লিখেছে এতোক্ষণে বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হয় না।

ছোট্ট চিঠি। সাথে পঞ্চাশ টাকা মূল্যমানের দুটি প্রাইজ বন্ড। একটার গায়ে ছোট্ট চিরকূট আঁটা। 'খুশি হয়েছি ফলাফলে। তোমার পছন্দ মাফিক একটা বই কিনে নিও, অথবা রেখে দিও, কিংবা— যা' খুশি।'

শিমুল দা,

ফলাফলে ভীষণ খুশি আমি। কাছে পেলে ছুঁয়ে দিতাম। খুব লোভ হচ্ছিল। ভাবছো, মেয়েটা কি বেহায়া আর ফাজিল, তাই না? হয়তো তোমার ধারণাই সত্য, কিংবা-নয়! আমার জন্যে কি একটি লাইনও লেখা যায় না? একটি কবিতা? সত্যিই তুমি ভারী নিষ্ঠুর।'

আমার আকূলতা শুধুই তোমার ভালোবাসার আকাঙ্খায়।'

'শিউলী।'

ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত শিমুল চিঠিটি ছিঁড়লো না। ভাঁজ কোরে ডাইরীতে রেখে দিলো। ভেতরে রানু এলো। হাতে চা। বড়'পার চিঠি খুলতে খুলতে শিমুল রানুর দিকে না তাকিয়েই বললো— 'বাক্সের চাবিটা দিয়ে যা!'

বাক্স থেকে কাটা রাইফেলটা বের করে শিমুল। ভেতরের খাতা পত্রগুলো ঠিক ঠাক করতে যেয়েই বইটা হাতে নিলো। জীবনানন্দ দাসের 'বনলতা সেন'। সে তার স্বভাব সুলভ ভাবে বইয়ের পাতা উল্টাতে শুরু করে। ওভাবে হাঁটু মুড়ে বসেই সে মিনিট পনেরো ডুবে থাকলো কবিতায়। 'সুরঞ্জনা, তোমার প্রেম আজ ঘাস।' লাইনটা ওর খুবই ভালো লাগে, অথচ অর্থটা ঠিক ধরতে পারে না। রানু দরজা ঠেলে শব্দ করাতে আচ্ছন্নের বেড়া ভেঙ্গে শিমুল নড়ে ওঠে। বুক ভাঙ্গা একটা দীর্ঘশ্বাস আসে ওকে নাড়িয়ে দিয়ে। রানু দুটো দশ টাকার নোট শিমুলের দিকে এগিয়ে ধরে।

শিমুল সাথে সাথে হাত বাড়ালো না। কি যেনো ভাবলো একটু। অথবা একটু আগেকার আচ্ছন্নতায় ওর ভেতরে ভালো লাগার যে ঘোর জেগে উঠেছিল, তার রেষ খানিকটা থেকে যায়।

'ধরোস না ক্যা? আমার কাম-কাইজ আছে।'

শিমুল নোট দুটো নিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বললো— 'এ পর্যন্ত কত দিলি, লিখে রাখিস। একদিন ঠিকই সব ফেরত দেবো।'

'ফেরত দিবি? তুই?'

'অবশ্যই, এই আমি!'

'দিনটা কবে? লেইখা রাখতাম।'

'পাকামো করছিস তো? কর। তবে, কথা আমার নড়চড় হবে না। ফেরত পেয়ে যাবি।'

'কবি তো কবে?'

'শোন, এখন যদি নাও পারি, তোর বিয়ের দিন শোধ দিয়ে দেবো।

'তোর দোয়া বা বদ দোয়া, কোনটাই আমার উপর কাজ করবো না।'

'মানে?'

'মানে ঘোড়ার ডিম। আমার বর অবশ্যই এতো গরীবও হইবো না, নিচও হইবো না যে, তোর টেকা নিয়া আমারে তার ঘরে যাইতে হইবো।'

'ওরে বাব্বা, কোন কথায় কোন প্যাঁচ!'

'রাইত্যে বাড়ি ফিরবি তো?'

'জানি না রে। অনেক কাজ আছে।'

'কাম সবারই কমবেশি থাহে। তাই বইলা যত্তো সব অদ্ভূত ধরনের ভালা কাজ কামগুলান করনের লাইগা সব সময় তোরই থাহন লাগবো, এমোন কোনো আইন নাই। আছে নাকি? বাড়ি ফিরনটাও একটা কাম। মারে কান্দাইয়া কিচ্ছু করবার পারবি না। বাড়ি ফিরিস কিন্তু, অনেক রাইত হইলেও।'

ঘর থেকে বের হয়েই লতার চোখে শিমুলের চোখ পড়ে। আড় বাঁশে কাপড় মেলছে লতা। মাথায় এখন ঘোমটা নেই। চুলগুলো খোলা। কি ঘন আর কালো! রোদের আলোয় ঝিকমিক করছে। ফোটায় ফোটায় পানি পড়ছে চুল বেয়ে। শিমুল কোনো কথা বললো না। ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে সে উঠোন পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে ওঠে।

ঘটনাটা আহামরি ধরনের কিছু না, এমনই মনে হয়েছিল তখন। অথচ একমুহূর্তের জন্যেও শিমুল ভুলতে পারছে না। মা ওকে আজ মেরেছে। মেরেছে অনেকদিন পরে। সেই ছোট্ট বেলায় মা বেশ মারধোর করতো। শিমুলও সুযোগ পেলে কম জ্বালায়নি। রাত দুপুর পর্যন্ত ঘরে ঢুকতো না। মা এদিক ওদিক হন্যে হয়ে খুঁজতো। কাঁদতো। দরোজা খুলে বোসে থাকতো। কি কোরে যেনো টের পেতো মা, শিমুল তখন আসে পাশেই আছে। খুব দরদ মিশিয়ে মা ডাকতো– 'শিমুল, ঘরে আয় বাবা। ভাত-তরকারি যে নষ্ট হইয়া যাইতাছে। আয় বাবা, আর মারতাম না।'

শিমুল চোখ বন্ধ কোরে ফেললো। কি যে হলো আজ। ওর সবটুকু চেতনা ঘিরে মায়ের সেই ডাক কেবলই ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। চেতনার সারা আকাশ জুড়ে শুধুই মায়ের আহাজারি মুখটা ঘুরপাক খাচ্ছে। মায়ের সেই ডাক, সেই মুখ কোনো ভাবেই শিমুল আজ কোনো ধরনের চিন্তা-ভাবনার দেয়াল দিয়ে আড়াল করতে পারছে না। থমথমে একটা মুখ! চোখে বিষণ্নতা ঘেরা টলমলে লোনা জল। বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস! শিমুল গভীর কোরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আরো একটা বিড়ি জ্বালিয়ে সবার দিকে তাকায়। রহিম বক্স অনেকক্ষণ ধোরে উঁকিঝুঁকি মারছে। কি যেনো বলতে চায়।

'কিছু বলবেন চাচা? হাতের জ্বালানো বিড়িটা রহিম বক্স-এর দিকে বাড়িয়ে ধোরে শিমুল জিজ্ঞেস করে। লোকটাকে শিমুল ভীষণ পছন্দ করে।

'তর শরীল ডে ভালা তো ভাই? না মানে, মুখটা কেমন শুকাইয়া রইছে কি না!'

মুক্তার চোখে মুখে আন্তরিক উৎকণ্ঠা। ফঁক পেতেই সে শিমুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

শিমুল হাসতে চেষ্টা কোরে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মুক্তারের কথার জবাব না দিয়ে শিমুল সবাইকে উদ্দেশ্য কোরে বলে– 'আরম্ভ করা যাক, কেমন?'

সবাই নড়ে চড়ে বসলো। কাশতে কাশতে রহিম বক্স মাজা বেঁকিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো।
'মনটা আমার ভালো নেই।' শিমুল মুক্তারের বাড়ানো হাত থেকে বিড়ি নিতে নিতে বললো।' অদ্ভুত একটা কাণ্ড হয়ে গ্যাছে। আরেক দিন বলবো। আরো একটু ভেবে নিই আগে। আজ ক্লাশ থাক, অন্য আলোচনা হোক, কেমন?'
'তোর মনটা যখন ভালা না, তয় থাক। কিন্তুক ভাই, তুই কিন্তু গত ক্লাশটাও চালাস নাই। অন্যসব গ্রুপের তুলনায় আমরা পিছাইয়া যাইতাছি।'

শিমুল জানে, আর সব গ্রুপের তুলনায় এই গ্রুপটা এখনো দুই অধ্যায় এগিয়ে আছে। কিন্তু সে কথা না বোলে শিমুল বললো— 'সত্যিই ভুল হয়ে গ্যাছে। আমি অবশ্য অন্য একটা জরুরী কাজে আটকে পড়েছিলাম। তবুও, আরো একটু চেষ্টা করলে হয়তো গত ক্লাশটা করা যেতো। আরো বেশি সতর্ক হবো এরপরে, কেমন? তাছাড়া— বাদশা, মধু, রবিন আর জনের সাথে আমি কিছুটা রাগও করে ফেলেছিলাম। ওটা আমি মোটেই ঠিক করিনি। আমার ভেতরে আসলে পেটি বুর্জোয়া হামবড়া ভাবটা বেশ ভালো মাত্রায়ই জাঁকিয়ে আছে। ওটাকে না তাড়ালে শেষ পর্যন্ত আমার দ্বারা কিছুই হবে না। আশা করি আপনারা আমাকে সহযোগিতা করবেন। আসলে কি জানেন, আমি যতো দ্রুত আত্ম-সমালোচনা করতে পারছি, ততো দ্রুত কিন্তু ওইসব সমস্যাগুলোকে তাড়াতে পারছি না।'

কাজের যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে, তা' নিয়ে শিমুল আলোচনা করলো প্রশংসার সাথে। সাথে সাথে আলাদা আলাদা কোরে সবার ক্রুটিগুলোও সে ধরিয়ে দিলো। গ্রুপের পাঁচজনই ধারাবাহিকভাবে নিজেদের আত্ম-সমালোচনা করলো। শিমুলের মনে হলো ফরিদ ছাড়া বাদবাকি সবাই আন্তরিক ভাবেই নিজেদের আত্ম-সমালোচনা করেছে।

গ্রুপটা ছয়জনের। ছয়জনই রিক্সাওয়ালা। সেই প্রাইমারী পর্যায়ে, চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত মুক্তার ও শিমুল একই ক্লাশে একই স্কুলে পড়াশুনা করেছে। দুই জনের মধ্যে 'তুই' সম্পর্ক। সেই সূত্র ধোরে বাকি সবার সাথে শিমুল ঘনিষ্টভাবে মিশতে চেষ্টা করছে। তবুও, কোথায় যেনো একটা ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। ফাঁক-যে একটা আছে, তা ধরতে পারলেও ফাঁকটা কিসের আর কোথায়, তা' ঠিক মতো ধরতে পারছে না। শিমুল ভেতরে ভেতরে হাস-ফাস করে আন্তরিকভাবে।

ফরিদ বিড়ি বের করলো। শিমুল হাত বাড়িয়ে বিড়ি নিয়ে ধরায়।

বিড়ি ডলতে ডলতে মুক্তার বললো— 'আইচ্ছা ভাই, আমরা না হয় লেখাপড়া খুব একটা করবার পারি নাই। ফরিদ আর রবিন তো একদম ব-কলম। চালাই রিক্সা। বিপ্লব যদি হয়, লাভ হইবো আমার, ফরিদের। কিন্তু— তুই ক্যারে এই পথে আইলি?'

হোসেন সাথে সাথে বললো— 'কথাডা কিন্তুক আমার মনেও ঘুর ঘুর করছিল। আমরা তো মইরাই আছি, বাঁচনের লাইগা না হয় আরো ইট্টু মরলাম। কিন্তু আপনার লাভ কি? ছাত্র হিসাবে আপনার নাম-ডাক আছে। শুনতাছি, ডাক্তারি পড়বেন। পাশ করণ আপনার কাছে পানি ভাত। বড় অফিসার বা ডাক্তার হইবেন দুইদিন পরে। তখন আমাগো কথা আপনার মনে থাকবো? আর— মনে যদি থাকেও, তখন তো আর আপনি আমাগো লগে এমন কইরা চলা ফেরা করবার পারবেন না। কন, পারবেন?'

ফরিদ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রতিবাদ জানায়— 'শিমুল ভাইয়ের কথা আলাদা। তার বুঝি কম কষ্ট সইতে হইছে? অহনও কুত্তো সমস্যা। ভাইগো লইয়া ফেলু মেম্বর কি খেল্‌টা না খেললো। অহনও থামে নাই হারামখোরের বাচ্চা। সুযোগ একটা পাইলেই হয়, কুত্তাটার পাছায় এমন একটা লাথি মারুম না, তখন তুমি টের পাইবা বাপধন! সুমুন্ধির পুতে করে নাই এমন কোনো আকাম বাদ আছে? স্কুলের ফান্ড থাইকাও চুরি করলো! ধরাও পড়ি পড়ি কইরা শেষ মেষ বাইন মাছের লাহান ফসকাইয়া গ্যালো। তয়, আমরা ধরুম একদম ছাই দিয়া বাছাধন। তিনদিন আগেও বাড়িত ছিলো ছোট্ট একটা টিনের ঘর। আর অহন? বিল্ডিং তোলতাছে পশ্চিমা ভিটায়, উত্তোরে আর দক্ষিণা ভিটায় বড় বড় দুইটা টিনের ঘর। আলাদিনের চেরাগ পাইছে নি? ক তো তোরা, হালার পুত কোন কামডা করে? আমাগো, এই আমাগো ঠকাইয়া ইঁট কিনছে, সিমেন্ট-রড কিনছে, আমাগো শ্রম দিয়াই বিল্ডিং তোলতাছে। দিমু একদিন হালার পাছায় একটা বেল ফাটাইয়া!'

শিমুল খুব মনযোগ দিয়েই ওদের কথা শুনছিল। স্বাভাবিকতায় সে কোনো সময়ে বাঁধা দেয় না। তাতে অন্য সবই হয়, হয় না শুধু আসলটুকু বোঝা। সে ঘনঘন কয়েকটা টান দিলো বিড়িতে। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখ বন্ধ রইলো ত্রিশ চল্লিশ সেকেন্ড।

'আমাদের সবাইকে খুব পরিষ্কারভাবে একটা কথা বুঝতে হবে'— শিমুল একটু নড়ে বসলো। 'আমাকে খুবই সুন্দর আর গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করা হয়েছে। আমার যা ভালো লাগছে না! কেনো? কারণ, আপনারা বিপ্লবের প্রশ্নে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অন্যতম মৌলিক বিষয় নিয়ে ভাবছেন। এটা বেশ বড়ো ধরণের একটা অগ্রগতি, সত্যিকারের সচেতনতা। আমি কেনো এলাম এ পথে, তাই না? গরীবের উপকার করার জন্যে? মোটেই না। আমি মহা মানব নই, দেবতা বা ফেরেস্তাও নই। আমি মানুষ, খুবই সাধারণ একজন মানুষ। আমার মধ্যেও ঘৃণা আছে, ভালোবাসা আছে; লোভ-লালসা আছে, আবার ত্যাগী মানসিকতাও আছে। আমি হয়তো ঠিকই একদিন অফিসার বা ডাক্তার হয়ে যাবো। আমার মতো লোকগুলো এই ধরণেরই কিছু একটা হয়ে যায়। আমিও হয়তো ব্যতিক্রম হবো না। তখন? আসলে, আমিও কিন্তু বিভিন্নভাবে শোষিত হচ্ছি এবং হবোও, যা আমি আয়নায় নিজের ছবি দেখার মতো পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি। আমি সৎভাবে বাঁচতে চাই; লেখাপড়া করার জন্যে সমান সুযোগ-সুবিধা চাই, শিক্ষার শেষে যোগ্যতা অনুসারে চাকরি চাই কোনো ধরনের স্বজনপ্রীতি ছাড়া। আমি ঘুষ দিতেও চাই না, নিতেও চাই না। একজন ছাত্র হিসেবে এইসব

চাওয়া পাওয়াগুলো খুবই ন্যায় সঙ্গত অধিকার। কিন্ডার গার্টেন, প্রি-ক্যাডেট,ক্যাডেট, মিশনারী, মাদ্রাসা. ইংলিশ মিডিয়াম— এই ধরনের বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাই আসলে পাল্টানোর প্রগতিশীল দাবী করছি আমি। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকার আমার প্রকৃত প্রগতিশীল দাবী দাওয়া মেনে নিতে পারে না তার নিজের শ্রেণী স্বার্থের কারণে। তা হোলে? হ্যাঁ, সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট দালাল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী এই দালাল সরকারকে পাল্টানো ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ আমার নেই। কিন্তু একা মানেই বোকা, কিচ্ছু করার থাকে না। তাই, এই সরকারকে উৎখাত করা ছাড়া যাদের কোনো মুক্তি নেই, উপায় নেই, আমি তাদের সাথে একাত্ম হচ্ছি। যেমন— আপনারা। তবে এটাও অবশ্য ঠিক, আপনারা যে পর্যন্ত আরো বেশি সচেতন না হতে পারবেন, সে পর্যন্ত সত্যিই বিপ্লব সম্পন্ন হবে না, হতে পারে না।

'ক্যানো, ক্যানো?' রহিম বক্স দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারে।

'কারণ, বিপ্লব না হোলেও আমি হয়তো তোদের চেয়েও অনেক বেশি সুখে বাঁচতে পারবো। তাছাড়া লড়াই শুরু হোলে দালাল সরকার আমার মতো লোককে বিভিন্ন লোভ দিয়ে দালালি করার জন্যে ওদের দলে টানতে চাইবে, তোদেরকে না। আমি যে তখন লোভে পড়বো না, তার গ্যারান্টি কি? কোনো গ্যারান্টি নেই, আছে বিকল্প। সেটা হলো— তোদেরকে, তোরা যারা শুধুমাত্র শ্রম বিক্রি কোরেই বেঁচে থাকিস, নেতৃত্বে আসতে হবে। একমাত্র তখনই আমার মতো লোক সট্‌কে পড়লেও বিপ্লবী লড়াই খুব একটা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। আরেকটা কথা, আমাদেরকে প্রত্যেকটা কাজই পরিকল্পনা মাফিক শৃঙ্খলার ভেতর দিয়েই নীতির সাথে মিলিয়ে করতে হবে। উচ্ছৃঙ্খলা কোরে কোনোদিনই কোনো ভালো কাজ করা যায় না।'

'ভাই, তুই আইজ এই কথা বলতাছোস ক্যারে?'

'ফেলু মেম্বর আমার ফুপা। জায়গা জমি নিয়ে তাদের সাথে আমাদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব অতীতে ছিলো, এখনো আছে; থাকবেও। কিন্তু সে আমার কতোটা ব্যক্তিগত ক্ষতি করেছে, ওটা তেমন কোরে না ভেবে ভাবতে হবে, লোকটা দশজনের কাছে কতোটা ভালো আর কতোটা খারাপ; বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে কি পরিমাণে বাঁধা দিচ্ছে। মনে রখিস, আমরা যাই করি না কেনো, প্রতিটি কাজের জন্যে জন সাধারণের কাছে আমরা ব্যাখ্যাসহ কৈফিয়ত দিতে বাধ্য।' আর নেতৃত্বের প্রশ্নে যা বললাম তার ব্যাখ্যা দেবো আগামি বৈঠকে।

ফরিদ খুব মনযোগ দিয়ে সব শুনছিল। বলা যায়, গিলছিল। কিন্তু হঠাৎ কোরেই আলোচনাটা যেনো থিতিয়ে এলো এবং সে আড় মোড় ভেঙ্গে একটা বিড়ি জ্বেলে সরাসরি শিমুলকে বললো— 'আইজ তাইলে ক্লাশ হইতাছে না, না ভাই?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তাইলে উঠি? আপনার ভাবীর জ্বর জ্বর ভাব দেইখ্যা আইছি।'

'তাই বুঝি? ঔষধ পত্র কিছু দিয়েছেন?'

'না ভাই, অতোটা খারাপ না।'

'যান তা হোলে। অবস্থা খারাপ দেখলে ঔষধ খাওয়াতে আবার গাফিলতি করবেন না যেনো। ওহ্‌হো, ভালো কথা, প্রোগ্রামের কথা আপনার মনে আছে তো?

'শনিবার, রাইত আটটা সোয়া আটটা।'

শিমুল হেসে ফেললো– 'প্রোগ্রামটা কিন্তু শুধুমাত্র আপনার আর আমার। সবাইকে শুনিয়ে দিলেন?'

'তাতে কি, অসুবিধা নাই। আমাগো মইধ্যে কেউ মীরজাফর নাই।'

'কথাটা তা না ভাই। আমরা সবাই একে অন্যকে বিশ্বাস করি, ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। তাই বা যদি না থাকলো, আমরা কি কোরে ঐক্যবদ্ধ আর শক্তিশালী শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো? এটা আসলে এক ধরণের শৃঙ্খলা; বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা। আমার জন্যে যা দরকার না, তা' না জানলে আমার কোনো অসুবিধা আছে? নাই। ঠিক আছে, এ বিষয়টা নিয়েও আগামী ক্লাশে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে, কেমন?'

'আইচ্ছা।'

শিমুল মুক্তারের দিকে তাকায়।

'শোন ভাই, তুই কিন্তু আগামী কালের মধ্যেই সবগুলো পোস্টার লাগিয়ে ফেলবি। ভালো কথা, বাদশা ভাই, মধুদা'দের ঠিকমতো লেখাপড়া শিখাচ্ছিস তো?'

মুক্তার চোখ মটকে ওদের দিকে তাকালো এবং শেষে হেসে ফেললো।

'তুই তো আমারে কানাই মাস্টার বানাইয়া দিলি। তয়, হাতে লাঠি ধরণের অর্ডার তো দিলি নে? অর্ডারটা দিয়া দে, দেখবি সব ঠিকঠাক চলতে থাকবো।'

হো হো কোরে হেসে উঠলো সবাই।

শিমুল হাত তুলতেই সবাই চুপ। ইতোমধ্যেই সবার মধ্যে বেশ ভালো ধরনের একটা শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ইঠেছে। খুব ভালো লাগে শিমুলের।

'মধুদা', আপনি আর জন ভাই আপনাদের গ্রুপ নিয়ে কাল হাটের লোকজনের মধ্যে লিফলেট বিলি করবেন। সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে শুরু করবেন।'

'জিনিস দেবেন তো?'

'জিনিস? জিনিস দিয়ে কি করবেন? হাটে শত্রু পক্ষের তেমন কোনো ভয় নেই। কেবল চোখ-কান খোলা রেখে পোকা-মাকড়দের এড়িয়ে যাবেন। দাদা, জনগণের উপর শুধু কথার তালে নয়, কাজেও বিশ্বাস রাখবেন। জনতার রায়ই সবচে' বড় অস্ত্র। তো, শেষ হোক আজ? না কি কেউ কিছু বলবেন?'

কেউ বললো না কিছু। ফরিদ উঠে দাঁড়ালো।

'তাইলে, লাল সালাম!'

'লাল সালাম!'

শেষ বিকেলের বিষাদিত আলোটুকুও অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। চাঁদ উঠবে আরো ঘন্টা দুই পরে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার দলও তাদের একঘেয়েমি কোরাস পুরো তালে শুরু করেনি। বাতাস

নেই এক ফোটা। কেমন গুমোট একটা ভাব, অথচ মেঘও নেই আকাশে। মাঠের পশ্চিম পাড়ে গোয়ালবাড়িয়া। ওখান থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসছে অস্পষ্টভাবে। খুব নিচু দিয়ে দু'টো বাঁদুর উড়ে গেলো। ভারী ডানার ঝাঁপটানি। মুক্তার ও শিমুল দৃঢ়ভাবে করমর্দন করলো। তারপর— "লাল সালাম" জানিয়ে দুইজন দুই রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে। মুক্তার উত্তরে, ভাদ্রা গ্রামে; শিমুল বাড়ির দিকে, পশ্চিমে।

একা হতেই এতোক্ষণে হারিয়ে থাকা ঘাপটি মারা বিষন্ন বোধটা আবার ওকে খুব আকস্মিকভাবে জাপ্টে ধরলো। একটু আগেও, যখন কথা বলতে বলতে নির্জন মাঠটা মুক্তারের সাথে শিমুল পাড় হয়ে আসছিল, ওর সমস্ত সত্তা জুড়ে তখন জেগেছিল একটা কাঙ্খিত সুন্দর স্বপ্ন, চোখে চকচক করছিল উচ্ছ্বল সুখি মানুষের কাঙ্খিত হাসি— জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের লাল নিশানার পতপত শব্দ। নিকোলাই অস্ত্রভস্কির 'ইস্পাত' উপন্যাসের পাভেল ওর ভেতরে ছায়া হয়ে জেগেছিল, কথা বলছিল ফিসফিসিয়ে। আর 'মা'উপন্যাসের সেইবিখ্যাত মা ওকে যেনো তাড়া কোরে বলছিল–'মায়ের আঁচলের এতোই টান! আদর্শের চেয়েও! আমি তাহলে কি কোরে আমার নাড়িকাটা বুকের মানিক পাভেলকে জনতার কাতারে ছেড়ে দিতে পেরেছিলাম? আমিও কি কম সয়েছি? সে সব তো তোরা আসবি বোলেই! তোরা যে সবাই আমার পাভেল!'

অথচ ওইসব অনুভূতি এখন আবার মায়ের বিষণ্ন চোখ মুখের আড়ালে একটু একটু কোরে হারিয়ে যেতে শুরু করে। ওর আর কিচ্ছু ভালো লাগে না। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ওর পাঁজর নেড়ে বেরিয়ে আসে। উদভ্রান্তের মতো শিমুল মাথার চুল টানতে থাকে। সে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

পাকা রাস্তায় পড়তেই অতুলের সাথে শিমুলের দেখা হয়ে গেলো। শিমুলকে পেয়ে অতুল ভারী খুশি হয়ে ওঠে। 'কি রে, গেছিলি কোথায়? যাহ্, ভুল হয়ে গেলো। আজ কাল তোকে অন্তত: এই প্রশ্নটা করতে নেই। তো, লজ্জিত হবে রাত্রী নিশীথে, কাণ্ডারী, হুশিয়ার!'

কেনো যেনো এখন অতুলকে দেখে শিমুলের তেমন খারাপ লাগলো না। শিমুল অন্ধকারের জন্যে অতুলদার মুখ দেখতে পায় না। তবুও সে খুশিই হয়, হাসে। হাসে খুশিতে নয়, ভিন্ন কারণে। শুধু অতুল দা'ই নয়, ইদানিং স্বয়ং ফেলু মেম্বরও যেনো শিমুলকে একটু হিসেব করে, কথা কয় রয়ে সয়ে।

'বাড়ি ফিরছিস নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'চল একটু ঘুরে আসি। কাজ নেই তো?'

'নাহ্,।' শিমুল আলতো কোরে হাসে।

'ফাইন, চল!'

কোনো প্রশ্ন না কোরেই শিমুল অতুলের সাথে চা স্টলের সামনে এগিয়ে গিয়ে নি:শব্দে অতুলের মোটর সাইকেলে উঠে বসে। যেখানে খুশি, অতুলদা' তাকে নিয়ে যাক; যার যা খুশি– ভাবুকগে!

রাতে শিমুল বাড়ি ফেরে। তবে, সেটা প্রায় মাঝরাত। অথচ তখনো ঘরে হেরিকেন জ্বলছে মিটমিট কোরে। ওর পেটে এখন প্রচণ্ড ক্ষুধা, অথচ খেতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। মা কি খেয়েছে? ওর জন্যে লতা প্রায়ই মাঝ রাত পর্যন্ত না খেয়ে জেগে বোসে থাকে। মাঝে মাঝে শিমুল অনুতাপে আচ্ছন্ন হয়ে যায় আন্তরিকভাবেই। ভাবে, অন্তত: রাতে সে ঠিক মতো বাড়ি ফিরবে। কিন্তু নানা কারণে তা' আর হয়ে ওঠে না। বাইরে গেলেই ভুলে যায়। কেনো যে এমন হয়! কেনো হয়?

অন্য দিনের মতো দেড় শো গজের মতো পাকা রাস্তাটুকু পার হওয়ার সময় শিমুল আজ মাউথ অর্গানটি বাজায় নি। মাউথ অর্গানটা ওর সাথে ঠিকই ছিল। তবুও। কিন্তু কালুটা ঠিকই টের পেয়েছে। ব্রিজ পার হতে না হতেই 'হা-আ-উ' কোরে হাজির। সামনের দু'পা তুলে নাচলো। ওই সময়টায় আদর চায় কালু, বাহাদুরির প্রাপ্য পুরস্কার। শিমুল প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে তখন কালুকে আদর কোরে দেয়। আজ ব্যতিক্রম হলো। পেট পেঁচিয়ে শিমুল আজ কালুকে জোরে লাথি কষেছে।

উঠানে মিনিট দুই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে শিমুল। দুইহাত আড় বাঁশে। আকাশ ভরা তারা। এক ফালি চাঁদ উঠেছে। কেমন নিভু নিভু আলো, আলোটা ছুঁই ছুঁই কোরেও পৃথিবীকে যেনো ছুঁয়ে দিতে পারছে না। খুব খারাপ লাগছে শিমুলের। পেট ঘুলিয়ে গেছে। ঝিমঝিম করছে মাথা। বমি করতে পারলে যেনো ভালো লাগতো। কালু আট দশ হাত দূরে ওর দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। থুতু ফেললো শিমুল। সে ঢুলে ঢুলে বড় ঘরের দরোজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। অন্যদিন যা করে। অভ্যাস। কিন্তু হঠাৎ কোরেই সে ভয় পায়। দ্রুত হাত দুই পেছনে সরে আসে। নিত্য দিনের মতো দরোজায় টোকা দিয়ে ডাকতে পারলো না-' মা, ও মা!' সে চুপচাপ বারান্দা থেকে নেমে আসে। বড় ঘরের সাথে লাগোয়া পশ্চিমপাশে ওর জন্যে আলাদা ঘর। যতোটা সম্ভব শব্দ না কোরে সে দরোজা খুললো। বাতি জ্বাললো না। হাত মুখ না ধূয়েই চৌকিতে বিছানো বিছানায় সে শুয়ে পড়লো। দরোজা খোলা। কালু এক-পা' দু'পা কোরে শিমুলের খোলা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। অপেক্ষা করে কিছুক্ষণ। তারপর পেছন ফিরে ওখানেই পা' ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। শিমুল এ পাশ-ও পাশ করছে। ভীষণ ছটফটানি। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। কান্না পেলো ওর। একবার উঠে বসছে। ভালো লাগছে না তাতেও। আবার শুয়ে পড়লো। ঘুমোনোর চেষ্টায় চোখ বুঁদলো। মনে হচ্ছে, সে ঘুরছে বাতাসহীন অনন্ত শূন্যতায়। একটুও তল নেই। ওর পেট গুলিয়ে বমি আসে। ওয়াক। থুতু উঠে এলো মুখে। বিশ্রী তেতো আর টক। শিমুল চোখ মেলে উঠে বসলো। চৌকি থেকে নেমে কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো পাথরের মূর্তির মতো। ভারে আর বিষাদে ভেঙ্গে আসছে ওর সারা শরীর। সে টলতে টলতে সিগারেট জ্বাললো। হাতে সিগারেট নিয়েই সে আবার শুয়ে পড়ে। মাথার ভেতরটা দুলছে। ঝিমঝিম কোরে এলোমেলো তালে নাচতে শুরু

করেছে বুদবুদ আর বুদবুদ। চোখ বন্ধ করতেই ওর গোটা দেহটা কয়েকবার পাক খেলো শূন্যে এবং পেটের নাড়িতে তীব্র টান পড়লো। শেষ পর্যন্ত শিমুল হড়হড়িয়ে বমি কোরে ফেলে। কালুটা ক্যা কুঁ কোরে কষ্টের ভাগিদার হতে চাইছে। ঘরটা ভয়ংকর রকমের বিশ্রী গন্ধে ডুবে উঠলো মুহূর্তে। মদের উৎকট গন্ধ। বড় ঘরের হেরিকেনের আলো পুরো মাত্রায় হঠাৎ কোরে জ্বলে উঠলো। মিনিটমাত্র। তারপর— একদম নিভে গেলো। তাতেই গোটা পৃথিবী যেনো ভীষণ ঘন আর অচেনা অন্ধকারে গড়িয়ে পড়লো। এতোক্ষণে শিমুলের ঘুম পায়। ভীষণ ঘুম। চোখ ভেঙ্গে আসছে ক্লান্তিতে। সে হাত-পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম এসে ওকে জড়িয়ে নেয়।

ঘাড়ের গোয়ার্তুমির ভূতটা ভীষণভাবে ক্ষেপে ওঠে। লম্বা ঝাঁকড়া চুলের আধ আঁচড়ানো মাথায় থেমে আছে চিরুনি। ধপাস ধপাস লাফাচ্ছে হৃদপিন্ড। প্রচণ্ড এক হীনমন্যতার রঙ মাখানো বিষণ্নতায় চোখ-মুখ— সারাটা অবয়ব ডুবে আছে। ঠোঁট দুটোও শুকিয়ে উঠলো হুট কোরে। সেই শুকনো ঠোঁট যন্ত্রনায় চেপে ধরলো শিমুল। সে মাথার চুল থেকে চিরুনিটা হাতে উঠিয়ে নেয়। চুল বেয়ে ফোটায় ফোটায় পানি চুইয়ে পড়ছে ঘাড় বেয়ে। খালি গা। স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করছে সে। চেষ্টাটা আন্তরিক, তবুও পারছে না। খুব ধীর পায়ে, প্রায় নি:শব্দে সে রান্না ঘরের দরোজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। চোখ-মুখ থমথমে। শিমুলের এমন মুখের সব বর্ণ লতা চেনে। চেনে রানুও। শিমুলকে দেখে ওরা দুইজনই চমকে উঠলো। একদম হতভম্ব। চোখে চোখে তাকালো দুইজনে। ওরা দুইজনের কেউই দেখেনি, শিমুল গোসল কোরে বাড়ি ফিরে এসেছে। দেখেনি বোলেই এতো বিপত্তি।

পথ বাৎলানোর জন্যে শর্তের প্রয়োজন। মানুষ শর্ত চায়। বিভিন্ন শর্ত জীবনের তিক্ত-মধুর পথ চলায় কখনো সখনো নাক উঁচিয়ে দাঁড়ায়। সময় অসময়ের ধার ধারে না, তোয়াক্কা করে না ইচ্ছা অনিচ্ছার। পথ পাল্টে দেয়, গতি পাল্টে দেয়; অন্তত দিতে চায়। শিমুলকে আজকের এই অপ্রত্যাশিত শর্ত আরো একটা বাঁক পার কোরে এক ধাক্কায়

একদম ভিন্ন এক যাত্রাপথে নিয়ে গেলো। আজকের এই দিনটি না এলে পরবর্তী জীবনের বৈচিত্র্যিক, বন্ধুর ও জটিল আবর্তে ওকে এতো ক্ষত বিক্ষত হতে হতো না, ক্ষয় করতে হতো না চার দেয়ালের মাঝে আটকে থেকে জীবনের সোনালী সময়। অক্ষম যন্ত্রণায় বুকে ক্ষরণ হতো না। দলা দলা কষ্টের ক্ষরণ! অনন্ত শূন্যতার দোড় গোড়ায় গিয়ে নতজানু হয়ে আকুতি করতে হতো না, 'ঈশ্বরী আমার, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো'। জীবনের সবচে' ঘনিষ্টতম কষ্টের শূচিতায় তিথিকেও জ্বলতে হতো না! বেচারি তিথি!

ধীর স্থির এবং ফ্যাসফেসে চাপা গলায় শিমুল রানুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো— 'কি বললি রে?'

রানু নিশ্চুপ। সে শিমুলের চোখমুখের ভাব দেখে হতবিহ্বল চোখে মায়ের দিকে একবার তাকালো। শেষে ধোঁয়া থালাটা আবার নতুন কোরে ধোঁয়ার জন্যে রানু পানি নিলো গ্লাস থেকে।

'কথা বলছিস না কেনো?'

শিমুলের গলায় চাপা গর্জন। চাপা হোলেও পিলে কাঁপানোর মতো ভয়ংকর। তরকারির বাটি হাতে নিয়েই লতা তাড়াতাড়ি উঠে এলো। খুব মোলায়েম গলা তার। আকুলতায় ভরা স্নেহ মাখানো মোমের মতো নরম আর ব্যাকুল— 'ওর কথা ধইরো না বাবা। বাদ দেও। তুমি খাইতে বও, আহো। রানু, বাইর হ তুই। গাছ থাইকা একটা লেবু আন, যা।'

রানু উঠতে গিয়েও পারে না। মাথাটা নিচু কোরে সে থালায় পানি নাড়াচাড়া করছে। চোখ ওর জলে ভেজা। সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে মনের আক্ষেপকে ঢাকার চেষ্টা চালায়।

'কথা বলছিস না ক্যানো?'

শিমুল বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে।

রানু চমকে কিছুটা লাফিয়ে উঠলো। শিমুলকে ওর ভালোই চেনা। ওর সব আবদার অভিযোগ শিমুলের কাছে। সময়ে অসময়ে দিব্বি জ্বালায়। আবার ভয় যদি কাউকে পায়, সেও এই শিমুলকে। হয়তো ভয় পেয়েই ও এবার মুখ ঝামটিয়ে বলে ফেললো— 'কইছি তো কি হইছে? মারবি? মার! তোর কামাই খাই নাকি যে গোসল করতে না করতেই ভাত বাইড়া দিতে হইবো?'

'রানু!'

লতা ধমকে উঠে ঠাস কোরে রানুকে থাপ্পর মারে।

যেনো প্রচণ্ড জোরে সেই থাপ্পড়টা পড়লো শিমুলের গালে। সাথে একদলা থুতু। ঘৃণা আর

অবজ্ঞা। সামনা সামনি রানুর এতোটা আক্রমণ ঠেকানোর প্রস্তুতি ওর ছিলো না। শিমুল কুঁচকে গেলো ভেতর

থেকে। শিমুলের ভেতরে আত্ম-সম্মান বোধটা বড়বেশি টনটনে আর সজাগ। ঘাঁইটা পড়েছে সেখানে। রাগী মুখাবয়বে তারই প্রতিক্রিয়ায় নেমে এনেছে বিষণ্ণতা। একটু একটু কোরে তা' কেবল গাঢ়ই হতে থাকে। আর কোনো কথা না বোলে শিমুল ঘুরে দাঁড়ায়। নড়াচড়ায় বড়বেশি ক্লান্তি। ক্লান্তি বিষাদের, অবমাননার। বুক ফেটে ওর কেবলই কান্না পাচ্ছে।

লতা তাড়াতাড়ি উঠানে নেমে আসে। শিমুলের ডান হাতটা ধোরে কেঁদে ফেরে সে-ও।

'কই যাও বাবা? ভাত খাইতা না? আমি মইরা গেছি না কি? রানুর কথার কি দাম যে রাগ করবা? তুমি বুঝি তার কামাই খাও? লও। ভাত খাইবা।

'না!' শিমুল চেঁচালো না। লতা তাতে আরো বেশি ঘাবড়ে যায়।

'না ক্যা? কোন সাত সকালে কইতরের লাহান দুই নলা ভাত খাইছো, ক্ষিধে তো লাগবোই। ওর কি, এই গাছের হভো, ওই গাছের পাঁপাইয়া— সারাটা দিন তো খালি খাইয়াই যায়, কি কামডা করে? ক্ষিধেটা ওর পাইবো কি কইরা?'

শিমুল জোরাজুরি করলো না। ঘুরে দাঁড়ালো। লতার দিকে তাকিয়ে সে হাসতে চেষ্টা করলো। ওর চোখ দুটো জলে টলমল করছে। জোরে ঠোঁট কামড়ে রেখেছে। আবেগটা একদম বাগ মানতে চাইছে না। কষ্ট হচ্ছে আত্মসংবরণ করতে। সেই ফাঁকে ওর চোখের কোন বেয়ে বাঁধাহীন স্রোতে গড়িয়ে পড়লো লোনা জল। ফোটায় ফোটায়।

'মা, রানুর কোনো দোষ নাই। ও তো আর মিথ্যে কিছু বলেনি মা। কথাটা একটু আগে-ভাগে হয়ে গ্যাছে, এই যা। আমি না মা আসলেই একটা ইডিয়ট, এক নম্বরের আহাম্মক। সেই কবে আমাদের স্কুলের হেড স্যার আমারে বলেছিল। আমি জানি মা, কামাই করার সময় আমার আসেনি। কিন্তু মা, আমি যে পরজীবী! তোমার, বড়'পার রক্ত নিংড়ে নিজে বেঁচে আছি। রানু আজ আমার গালে একটা থাপ্পড় মেরে সত্যটা কেবল দেখিয়ে দিয়েছে। সময় নেই অসময় নেই, আমার সব প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তোমার কাছে হাত পাতি, বড়'পার কাছে হাত পাতি, এমন কি রানুর কাছেও। মা, আমি নিজে কামাই না করা পর্যন্ত এই বাড়িতে এক নলা ভাতও আর খাবো না।' শেষদিকে শিমুলের গলা কান্নার ধকলে বুঁদে আসে। হু হু কোরে কেঁদে সে মাকেই জড়িয়ে ধরে।

শাড়ির আঁচল দিয়ে লতা শিমুলের চোখ মুছিয়ে দেয়। আদর কোরে চুল থেকে ঝোরে পড়া ঘাড়ের পানি, ভিজে চুল মুছে দেয়। গলায় উৎকণ্ঠা আর আকুলতা। ভীষণ ভাবে ঘাবড়ে গেছে সে। ছেলের গোয়ার্তুমি তার চেয়ে বেশি চেনে কে? তাই তার আকুলতা কেবল বেড়েই চলে।

'সোনা আমার, এতো বড় রাগ করে না। বইনেই তো কইছে, তারে ফেলাইয়া দিবা হের লাইগা? তাছাড়া তুমি তো আর বইনের কামাই খাও না। আসো বাবা, আমার লগে

বইয়া খাইবা, আমারও খুব ক্ষিধে লাগছে। তুমি না খাইলে আমি কি কইরা খামু! আমার কথা একবারও ভাববা না?

'মা, রানুর কামাই আমি যেমন খাই না, তেমন নিজের কামাইও খাই না। ছাড়ো, কাজ আছে আমার।'

শিমুল মায়ের হাত ছাড়িয়ে ঘরে ঢুকলো। তাৎক্ষণিকভাবে ভেবে পেলো না সে এখন কি করবে। মাউথ অর্গানটা হাতে নিলো। আবার রেখে দিলো ছুঁড়ে ফেলে। আলনার কাছে গেলো। পাঞ্জাবী হাতে নিয়েও পরলো না। রিয়ার ওখানে যাবে বোলে কাল ইস্ত্রি কোরে এনেছিল। শেষে বাঁ হাত বাড়িয়ে সে শার্ট টেনে নিলো। পাশেই লতা। বাচ্চা মেয়ের মতো থমথমে, যে কোনো সময় প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার অপেক্ষায়। শিমুল কিচ্ছু বললো না। মায়ের পাশ দিয়ে ঘর থেকে চুপচাপ বেরিয়ে এলো। হু হু কোরে কেঁদে ফেললো লতা। শিমুলের ভেতরটা ভেঙ্গে যাচ্ছে। তবুও সে দাঁড়ালো না। ঘুরে পা বাড়ালো এবং তখনই মোহাম্মদ আলী চাচার সাথে সে মুখোমুখি হয়। মোহাম্মদ আলীর চোখে মুখে ক্লান্তি কিন্তু সেই ক্লান্তি ছাপিয়ে এই মুহূর্তে জেগে আছে উৎকণ্ঠা আর কৌতুহল। তবুও তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা চিঠি বের কোরে এগিয়ে ধোরে বললেন— 'পিয়নটা খচ্চর হইয়া গেছে। বিলি করণের তারিখটা পাঁচদিন আগেকার। সাহেব হইয়া গেছেন কি না, সময় পাননি। আমারে পাইতেই দিয়া খালাশ করলো। যাই বাহে।'

একটু বসতেও বললো না শিমুল, কোনো কথাও বললো না। যাই কোরেও মোহাম্মদ আলী চাচা হাঁটতে শুরু করেননি। শিমুল গন্ধওয়ালা সিগারেট খায়। মিকচার। মিকচারের উপর কমবেশি অনেকেরই লোভ আছে। মোহাম্মদ আলী সিগারেটের আশা করেছিলেন। কিন্তু শিমুল তাকে পাশ কাটিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। ওর চোখ খামে। ঘুরিয়ে ঘারিয়ে নিশ্চিত হলো, কেউ খোলেনি। খামের উপর লেখা নিজের নাম ঠিকানা দেখলো সে। হাতের লেখাটা খুব বেশি চেনা। রিয়ার। আশ্চর্য, যার একটা চিঠির আশায় শিমুল ভীষণ রকমের তৃষিত, এখন সেই কাঙ্খিত চিঠি পাওয়া সত্বেও ওর বুকটা বরাবরের মতো উল্লাসে নেচে উঠলো না।

দুপুর বেলায় শেষ পর্যন্ত কিছুই খায়নি শিমুল। খেতে খুব একটা ইচ্ছেও হয়নি। সারাটা বিকেল এখানে-ওখানে ঘুরে কাটিয়েছে আর দোকানে এসে চা খেয়েছে। চারটা সাড়ে চারটায় প্রোগ্রাম ছিলো সজলের সাথে, শিমুল ইচ্ছে কোরেই যায়নি। সন্ধ্যার পর পর আটটার দিকেও গোয়াল বাড়িয়ায় মা মনিদের বাড়িতে প্রোগ্রাম নির্ধারিত ছিলো। স্বপনদার সাথে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে আছে তাও। কিন্তু একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না যেতে। সাতটা বাজে। শিরিন দ্বিতীয়বারের মতো ডেকে গেলো খেতে যাওয়ার জন্যে। এই ঘরেই দিয়ে যাবে কি না, তাও জিজ্ঞেস করেছে। শিমুল আজ কোনো ভাবেই এখানে খেতে পারবে না। হাশেম শিমুলের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। শিমুল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই সিগারেট জ্বাললো।

'সিগারেট জ্বাললে যে?'

'খেতে ইচ্ছে হলো যে!'

'ভাত খাবে না?'

'নাহ্, ভালো লাগছে না। তুমি খেতে যাও, আমি চললাম।'

শিমুলের ঘটনা হাসেম কিছুই জানে না। তাই তেমন একটা পীড়াপীড়িও করলো না। আসলে সম্পর্কটাও পীড়াপীড়ির নয়, অনেকটাই অধিকারের। শিমুলের পেটে এখন ভীষণ ক্ষুধা। অজগরটা ফুঁসছে সেই কখন থেকে। শিরিনের ডাক শুনে তা' আরো ক্ষেপে গ্যাছে। তবুও শিমুল রাজি হলো না। অন্যদিন হোলে এতোক্ষণে সে নিশ্চিত বোসে যেতো। আজ বসেনি। বসা যায় না। নিজের বাড়ির ভাত বন্ধ বোলেই বন্ধুর বাড়িতে ভাত খাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হলো না। ভেতরে খচখচ কোরে কি যেনো বেঁধে, নিজেকে করুণার পাত্র বোলে মনে হয়। অথচ আশ্চর্য, আজ সকাল পর্যন্ত এমন ধরণের কোনো বোধের পরিচয় ওর জানা ছিলো না। সে রাস্তায় এসে সিগারেট শেষ করলো। মুখ তিতে হয়ে গেছে। বমি বমি ভাব। শিমুল দোকান থেকে চিড়ে আর গুড় কিনলো। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতেই চিড়ে খেলো সে। দোকানে বোসে খেতে লজ্জা হচ্ছিল। শেষে দোকানে গিয়েই পানি খেলো। সাথে চা। পেট ফুলে উঠেছে। কিন্তু মন একটুও ভরলো না। কেবলই খাই খাই ভাব, অতৃপ্ত হাড় চিবোনো একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। মাথায় সারা দুনিয়ার এলোমেলো ভাবনা। কোত্থেকে শুরু করবে, শুরুটা হবেই বা কেমন কোরে, ভাবনাগুলো গিজগিজ করছে মাথায়। কোনো সমাধানই শেষ পর্যন্ত টিকছে না। একটা 'যদি' এসে সব পরিকল্পনাকে অসম্ভবের তলায় ডুবিয়ে দিচ্ছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো শিমুল। মাত্র হাত দুই তিন সামনে গিয়ে বাঁয়ে মোড় দিলেই বারান্দা। বারান্দায় লীনার গলা। বড়পা'! এমন অসময়ে তার আসার কথা নয়। ভাবনায় পড়লো শিমুল। নোটিশ ছাড়া এমন হুট কোরে বড়'পার বাড়িতে আসার কোনো কারণ সে খুঁজে পেলো না। অবচেতন মনই ওকে হঠাৎ কোরে থামিয়ে দিলো, সচেতন কোরে দিলো কান। বড়'পার গলা স্পষ্ট! ওর নাম নিয়ে কথা বলছে।

'কার জন্যে আমি রক্ত পানি কোরে চলেছি? আমার জীবনটা এমন হলো ক্যানো, তা কি ও একবারও ভাবে? ও কোথায় কি করে না করে, আমি বুঝি জানিনে ? সব জানি।'

'চেঁচাও ক্যারে? আস্তে কওন যায় না?' মা লীনার কথায় বিরক্ত হয়েছে।

'চেঁচাই সাধে আর খুশিতে। তোমার লায় পেয়েই ওর এই অধ:পতন হয়েছে। নাক টিপলে দুধের গন্ধ বেরোবে, করেছে প্রেম! এখন আবার রাজনীতিতে মেতেছে? তুমি দ্যাখো না এসব? রাজনীতির বুঝিসটা কি তুই? রাজনীতি তোর জন্যে না, অতুলদের সাজে, সাজ্জাদদের সাজে। ওদের গোলায় ধান আছে, গোয়ালে গরু আছে, মাথায় ছায়া আছে। তোর আছেটা কি? আমার কথা কাওকে ভাবতে বলিনে। তাই বোলে নিজের কথাও ভাববিনে, মায়ের কথাও একবার ভাববিনে?'

'আমারে কেউর দেহন লাগবো না।'

'এই রাগটা পোলার উপর একটু দেখাইবার পারো না?'

'বিশ্বাস কর বড়'পা, আমি খালি কইছি, তোর কামাই খাই নাকি যে গোসল করতে না করতেই ভাত দেওন লাগবো? তুই তো জানোস না বড়'পা, ভাত দিতে দশ পাঁচ মিনিট দেরি হইলে সে কি রাগারাগি-দাপাদাপি? একদিন দেখতি যদি!'

'তোরে এতো পটপট করতে হইবো না। সকাল দশটায়ও যদি নাস্তা দ্যাস, কয় কিছু? রাইত্যে?'

'রানু ঠিকই বলেছে। কামাইয়ের নাম নাই, রাগের বেলা নবাব পুত্তুর। কয়দিন না খেয়ে থাকে, দেখা যাবে। টের তো পায় না!'

শিমুল কাঁপছে। কাঁপছে থরথরিয়ে। কান দু'টো ওর ঝাঁ ঝাঁ করছে। ছি: ছি: ! কি লজ্জা! কি অপমান। আহত আত্ম-সম্মানবোধ ওকে মাটির সাথে নতুন কোরে মিশিয়ে ফেললো। সে পিছিয়ে যেতে লাগলো । যেনো একটু পিছিয়ে গেলে সে বেঁচে ওঠে এই লজ্জার হাত থেকে। সে পিছুতে থাকে ধীরে ধীরে, শব্দ এড়িয়ে। কিন্তু রাস্তা ছেড়ে কিছুটা সরে পড়াতে বরই ডালের কাঁটায় শিমুল আটকে পড়লো। পায়ের কয়েক জায়গায় কাঁটা বিঁধে ছিলে গেলো, ফ্যাৎ কোরে উঠতেই বুঝলো, লুঙ্গি ছিঁড়ে গেছে। কালু ঘেউ ঘেউ কোরে তেড়ে এলো। থেমেও গেলো কাছে এসে। শিমুল তাড়াহুড়ো কোরে দ্রুত রাস্তায় উঠে এলো। তাতে আরো একবার লুঙ্গি ছেঁড়ার শব্দ হলো। তবে ততোক্ষণে ওর শরীরের কাঁপুনি থেমে গেছে।

চার রাস্তার মোড়ে এসে শিমুল দাঁড়ালো। এতোটা পথ সে যেনো পালিয়ে এসেছে। কি যেনো তাড়া কোরে ওকে ঠেলে এনেছে। সে একটু ভাবলো এবার কোনদিকে যাবে। দক্ষিণ দিকে কয়েক পা হেঁটেও সে আবার ফিরে এলো। বাঁ পাশে হাসেমদের বাড়ি। বাতি জ্বলছে হাশেমদের ঘরে। ওর কাছে যেতে একদম ইচ্ছে হচ্ছে না। সজলের কথা মনে পড়লো ওর। কিন্তু পথটা অনেকখানি। সে স্যান্ডেল বিছিয়ে ঘাসের উপর বোসে পড়লো। ভাবতেও ভালো লাগছে না কিছু। পকেট থেকে সিগারেট বের করলো সে। আকাশে চাঁদ নেই, তারারও বালাই নেই। আকাশ ভালো থাকলে শেষ রাতে এক ফালি সরু চাঁদ খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে আসবে একদম নিস্প্রভ সমর্পনে। কি ভীষণ ঘুটঘুটে অন্ধকার এখন। এক হাত দূরেও কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। শিমুল তীক্ষ্ণ আর সজাগ চোখে হাতের সিগারেটটা দেখার চেষ্টা করতে থাকে। সব কিছুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একটু একটু কোরে রাত বাড়তে থাকে।

অজস্র এলোমেলো ভাবনার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউয়ে শিমুল অনেকক্ষণ ভেসে থাকে। কখনো সে সামনে গেলো সাঁতরে, কখনো পেছনে। শেষ পর্যন্ত ওর ক্লান্ত হওয়াই সার, ঘুরে ফিরে একই বিন্দুতে এসে সব ভাবনা স্থির হয়ে থেমে যাচ্ছে। বিন্দুটি অনিশ্চয়তার কেন্দ্রমাত্র। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পুরানা ঘটনাগুলো এদিক-ওদিক থেকে ছুটে এসে ওকে ধাক্কা দিচ্ছে, নাড়িয়ে দিচ্ছে এদিক ওদিক।

মার্কসীট ও টেস্টিমোনিয়াল পাঠানোর সময় বড়'পা একটা ফরম পাঠিয়েছিল। আর্মীতে কমিশনার পদে ভর্তির আবেদনের ফরম। সাথে ক্রস্‌ড় পোস্টাল অর্ডার। পোস্টাল অর্ডারগুলো ওর কাছে এখানো আছে। কোথায় রেখেছিল, সঠিক মনে নেই। তবে—রেখেছিল। ছিঁড়ে ফেলেনি বা ফরম-এর মতো পুড়িয়েও ফেলেনি। একদিকে খুশির উচ্ছ্বাসী দোলা, অন্যদিকে আশা ভঙ্গের সুস্পষ্ট দেয়াল— খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল শিমুল। সেই ছোটবেলা থেকে বুকের ভেতরে একটা স্বপ্ন সুস্পষ্ঠভাবে লতিয়ে উঠেছে— সে ডাক্তারি পড়বে। লীনা তা' জানেও। কম বেশি সমর্থনও কোরে এসেছিল এতোদিন। অথচ........., রাগটা শিমুল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। ফরমটি হেরিকেনের আগুনে সে পুড়িয়ে ফেলেছিল। মায়ের সামনেই। লতা বাধা দেয়নি, কোনো উচ্চবাচ্যও করেনি। ওর দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়েছিল শুধু। কাগজটা পুড়ে ছাই হবার পরই সে শিমুলকে শুধু জিজ্ঞেস করেছিল—'কি করবা?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তর্জনী আঙুলে ফরম পোড়া ছাই নাড়তে নাড়তে শিমুল বলেছিল—'আমি মেডিক্যাল সাইন্স পড়বো। ডাক্তারি।'

'তাই পইড়ো। একটা কথা মনে রাইখ্যো, বড়'পার পাঠানো ফরমটা তুমি নিজের হাতে পুড়ছো আর আমি তা দেইখ্যাও তোমারে কিছু কই নাই।'

এক সপ্তাহ পরেই শিমুল ঢাকা গিয়েছিল। সব ব্যবস্থা লতাই করেছিল। কেনো যেনো লীনা ওকে কোনো টাকা দেয়নি। যোকিম, ওর স্কুল জীবনের বন্ধু, নটরডেম কলেজে পড়তো। থাকতো হোস্টেলে। মায়ের দে'য়া তিন হাজার টাকা নিয়ে শিমুল যোকিমের ওখানেই উঠেছিল। মেডিক্যালে ভর্তি হবার এই লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষাটাই শিমুলের জীবনে একটামাত্র ব্যতিক্রম, যেটিতে সে পুরো মনযোগ দিয়ে পড়ে প্রস্তুতি নিয়েছিল। ফলাফলও এসেছে তেমন। দিন পনেরো আগে যোকিম চিঠি দিয়েছে। জানিয়েছে, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার শেষ তারিখ আগামী ২৭ তারিখ পর্যন্ত। শিমুল প্রথম লিস্ট-এ চান্স পেয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে, ওর দ্বিতীয় চয়েস।

যোকিমের চিঠি পেয়ে শিমুল বড়'পাকে চিঠি লিখেছিল। শুধু ভর্তি হবার খরচটুকু সে বড়'পার কাছে অনেক অনুনয় কোরে চেয়েছিল। সাথে প্রথম বর্ষের বইয়ের দাম। স্টাইফেন-এর টাকা আর দু'একটা টিউশনীর টাকায় বাকি খরচ চালিয়ে নিতে পারবে বোলে শিমুল ভেবে স্থির করেছিল। যোকিম কথাও দিয়েছে, ঢাকা যাওয়া মাত্রই সে শিমুলকে টিউশনী ঠিক কোরে দেবে।

বড়'পার চিঠির আশায় গত বাইশটা দিন শিমুল পার করেছে। কোনো চিঠিই লিখেনি বড়'পা। আজ অবশ্য সে নিজেই বাড়ি এসেছে। কিন্তু—কোনোভাবেই সে বড়'পার টাকা নেবে না। সামনে আর মাত্র নয়টা দিন বাকি। তা-ও পার হয়ে যাবে এবং শিমুলের পক্ষে এই মুহূর্তে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। হঠাৎ কোরে শিমুলের খুব কান্না পায়। নিসঙ্গ রাস্তায় একাকী বোসে সে হু হু কোরে কেঁদে ফেলে।

ছয়দিনের দিন দুপুরে শিমুল লুঙ্গি নিয়ে গোসল করতে গেলো। এই কয়দিনেই ওর স্বাস্থ্য বেশ ভেঙ্গে গেছে। চোখের কোনায় কালির আবছা আস্তরণ। গতকাল লীনা চলে গেছে। ওর সাথে একটাও কথা হয়নি। দুপুরের দিকে, লীনা চলে যাবার ঘন্টা তিন আগে শিমুল একবার বাড়ি এসেছিল। চিড়ে-মুড়ি কিনে এনেছিল দোকান থেকে। লতা কান্নাকাটি করেছিল। ভাত খাওয়ার জন্যে অনেক টানাটানি করেছিল। শিমুল খায়নি। লীনা দেখেছিল সবই, কিন্তু কিচ্ছু বলেনি। কালুটাও যেনো ঘটনা আঁচ কোরে চুপসে থেকেছিল। কষ্টে শিমুলের হাসি পায়।

অনেকটুকু সময় নিয়ে শিমুল গোসল করেছে আর ভেতরের ভাংচুরকে কিছুটা গুছিয়েছে। চুলগুলো এখনো ভেজা। হাতে চিরুনি, সামনে আয়না। আয়নায় সে মায়ের থমথমে শুকনো মুখটা দেখতে পেয়ে হাসতে চেষ্টা করে। ঘুরে মায়ের দিকে তাকায়। চুলে চিরুনি দিতে দিতে বললো—'আমি ঢাকা যাচ্ছি মা। আগামী কাল। আমাকে কিছু টাকা দেবে? ধার!' শিমুল হাসতে থাকে মায়ের দিকে তাকিয়ে।

লতা চেয়ারের হাতলে হাত রাখলো। অপলকে ছেলের মাথা আঁচড়ানো দেখলো। শিমুল মাথা আঁচড়িয়ে শার্ট প্যান্ট পড়লো। লতা শার্টের হাতার ভাজ ভেঙ্গে দিতে দিতে বললো—'তুমি ডাক্তারি পড়বা না?'

শিমুল হাসতে গিয়ে ঢোক গেলে। হাসিতে সে মাকে সহজ কোরে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু লতা সেই হাসিতে এলোমেলো হয়ে উঠলো। এ কেমন হাসি? তার চোখে লোনা জল টলমলিয়ে উঠলো। বুকটা ভেঙ্গে যাচ্ছে বেদনায়।

শিমুল মায়ের দুই কাঁধে হাত রেখে আলতো কোরে মাকে ঝাঁকিয়ে দেয়। তারপর কিছুক্ষণ মায়ের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকে। অনেক কষ্টে সে বুকের দীর্ঘশ্বাসটাকে চাপা দিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো–'তোমার জন্যে আমার কষ্ট হয় মা, বিশ্বাস করো, খুব কষ্ট! কিন্তু মা, কেনো যে আমি তোমার জন্যে একটুও কাঁদতে পারি না! কেনো মা? কেনো? আমার যে খুব কষ্ট হয় মা!'

লতা আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। তাৎক্ষণিক ভাবে সে কোনো কথা না বলতে পারে না।

'বড়'পা তোমার ভর্তির টাকা দিয়া গ্যাছে। যা হইবার হইছে। এতো বড় রাগ করতে নাই। সামনে তোমার অনেক সময়।'

'না মা, তা আর হয় না। মা, কোনো একদিন বাবার হাতে গোলা ছিলো, ভরাট না হোলেও গোলাটা যে খালি থাকতো না, লোকমুখে শুনতে শুনতে কথাটা আমি বিশ্বাস কোরে ফেলেছি। কিন্তু মা, আমি সেই গোলা পাইনি। ডাক্তারি পড়ার কপাল আমার নাই। বাবা বেঁচে থাকলে কি হতো, জানিনে। তোমার নিজেরও ব্যক্তিগত এমন কিছু নাই যা আমি নিতে পারি। তা হোলে?'

'বড়'পার উপরে এতো বড় রাগ করা তোমার ঠিক হইতাছে না। তুমি তো আর অবুঝ না তোমাগো লাইগাই নিজের সুখটাও হেয় দেখলো না।'

'আমি বুঝি তা' জানিনে? বড়'পা যা করেছে, কোনো আপাই তা' করে না, মা। আমি কারো উপর রাগ করছি না মা। বড়'পার উপরে না, রানুর উপরেও না। আমার সব রাগ আমার জন্মের উপরে। বাদ দাও এসব কথা। মা, তুমি কি আমাকে কিছু টাকা দেবে?'

লতা হতভম্ব। এমন কোরে শিমুল আগে কোনোদিন কথা বলেনি। কথাগুলো কি সাংঘাতিক, অথচ বলছে কতো শান্ত সুরে, অবলীলায়। তবুও সে হাল ছাড়তে চাইছে না।

'আমার কাছে পনেরো ষোল হাজার টেহা আছে। তুমি সব নিয়া যাও, তবুও কিন্তু তোমার ডাক্তারি পড়তে হইবো।'

'না মা। যা হয় না, বারবার তা' বললে শেষে তোমার টাকাও আমি নেবো না।'

'তুমি তাইলে আর লেখাপড়া করবা না?'

লতা শরীর ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে বোসে পড়ে।

'কে বললো আমি লেখাপড়া করবো না? তুমি দেখে নিও, এই তোমারে ছুঁয়ে বলছি, লেখাপড়া আমি করবোই। ডাক্তারি না হয় পড়া হলো না, পড়ার আরো কতো কিছু আছে!'

লতা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সে ধীরে ধীরে বাক্সের সামনে যায়। বাক্স খুলে ব্যাংকের চেক বই বের কোরে চেকে সই করে। ব্ল্যাংক চেক। শিমুলের শার্টের পকেটে চেকটা ঢুকিয়ে দিয়ে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে নতুন কোরে। 'এ্যাকাউন্টটা যাতে নষ্ট না হয়, হের লাইগা দুই তিনশো টাকা রাইখা সব টাকা নিয়া যাও। ষোল হাজার সাতশো কয়টেহা জানি আছে।'

পকেট থেকে চেকটা বের করলো শিমুল। ঠোঁটে হাসি। চোখ দু'টো ওর চিকচিক করছে। ইচ্ছে হচ্ছে মায়ের গলা জড়িয়ে একটু কাঁদতে। কিন্তু সে মায়ের দিকে একবারও না তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে। হাতে যেটুকু সময় আছে, তার ভেতরেই সব গুছিয়ে নিতে হবে।

শিমুল দ্বিতীয়বারের মতো ব্যাগ গোছাতে লাগলো। অনেক কাটছাট করেছে সে। একান্ত আপন আর আবশ্যিক জিনিসপত্রগুলোই নিয়েছে কেবল। তবুও ব্যাগে জায়গা করা গেলো না। কতোক্ষণ ব্যাগটার দিকে চুপচাপ চেয়ে থাকলো সে। একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসে মনের অজান্তে। সে ব্যাগ থেকে সব বের কোরে ফেলে। যা না নিলেও মোটামুটি চলে, এ ধরণের আরো কিছু নিজিস আলাদা করলো। বড়'পার দেওয়া নতুন পাঞ্জাবীটাও। কিন্তু বইগুলো কমালো না। সব নোট খাতা আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই সে কার্টুনে ভালো কোরে বেঁধে নিয়েছে। এতোদিনের তিল তিল আনন্দ বেদনার সংমিশ্রণে লেখা দুইটি কবিতার, একটি ছোটো গল্পের ও একটি গানের খাতার শূন্যতা আজ ওকে নতুন কোরে কষ্ট দিলো। মা যে কি কোরে এমন ভুল করেছিল! একগাদা খাতা ছিলো শিমুলের। কোনোটা রাফ, কোনোটা নোট। লতা অতো সতো ভেবে দেখেনি। জঞ্জাল ভেবে দেড় দুই মাস আগে ওই সব খাতা পত্র ফেরিওয়ালার কাছে সে বিক্রি কোরে দিয়েছিল। সাথে শিমুলের একটা অঙ্গও—ওইসব খাতাগুলো। ক্ষেপে ওঠার কথা ছিলো ওর, কিন্তু শিমুল সেদিন একটুও ক্ষ্যাপেনি। সে-ও এক আশ্চর্য। মায়ের বোকা বোকা চোখ আর মুখের হাসির দিকে তাকিয়ে বুকের সব ক্ষোভকে কি কোরে যেনো মুহূর্তেই সেদিন সে দাবিয়ে নিয়েছিল।

সে ডাইরী দু'টো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। শেষ সম্বল। বেশ কিছু কবিতা ডাইরী দু'টোয় রয়ে গ্যাছে। অনেকগুলো আবার শুধুই রিয়ার জন্যে। বাক্স থেকে টেনে একাগাদা চিঠি বের করলো সে। মেঝেয় বিছিয়ে দিলো সব এবং তাকিয়ে দেখলো, লতা দরোজার কপাটে হাত রেখে তাকিয়ে আছে। শিমুল একটা একটা কোরে চিঠি ছিড়তে লাগলো।

শিউলীর শেষ চিঠি। লিখেছে— সে ইডেনে চান্স পেয়েছে। আজিমপুরে মামার বাসায় উঠেছে। ঠিকানাও দিয়েছে। ঢাকা গেলে দেখা করার জন্যে বারবার মিনতী জানিয়েছে মেয়েটা। শিমুল চিঠিটি আলাদা করলো। একটা ছবিও আছে ভেতরে। কোনো কারণেই শিউলীর সাথে সে

দেখা করার ইচ্ছে রাখে না। তবুও চিঠিটা না ছিঁড়ে সে ডাইরীতে ঢুকিয়ে রাখলো। আর সব চিঠিগুলো নিয়ে উঠানে গেলো। আগুন জ্বালিয়ে ঘরে ফিরে এলো। ব্যাগের চেইন টেনে শেষবারের মতো আয়নার সামনে গেলো। কিন্তু তাকালো না আয়নায়। তাকাতে পারছে না। চোখ দু'টো বন্ধ রেখে সে চুপচাপ মাথা আঁচড়ালো।

কাপড় দিয়ে স্যান্ডেল মুছতে মুছতে শিমুল চেঁচিয়ে রানুকে ডাকলো। রানু বারান্দায় ছিলো। এক সপ্তায় দুইজনের মধ্যে একটাও কথা হয়নি। রানু সেই দিন থেকেই কাঁদছে। কাঁদছে শিমুলকে এড়িয়ে, আড়ালে, আবডালে। শিমুল টের পেয়েছে, তবুও কিছু বলেনি।

ঘরে ঢুকতেই হাউ মাউ কোরে কেঁদে ফেললো রানু। দেখতে দেখতে কান্নাটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলো। রানু শিমুলের জামার হাতা টেনে ধরেছে। কি যেনো বলতে চাইছে বারবার, কিন্তু পারছে না। কান্নার ধ্বকল ওকে বারবার দুর্বোধ্য কোরে দিচ্ছে।

শিমুল ওর চুলগুলো এলোমেলো কোরে দিলো। ওর ভেতরটাও এখন বেদনায় হু হু করছে। কিন্তু তা' সে প্রকাশ করতে চায় না। কোনোভাবেই না। রানুর চুলগুলো তিন ভাগ কোরে সে সুন্দর একটা বেণী পাকিয়ে দিলো।

'এই গবেট, এভাবে কাঁদছিস কেনো?'

'তুই আমারে মার ভাইয়া; যতো খুশি মার। তবুও— '

রানুর কথা আর শেষ হয় না, ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নায় খেই হারিয়ে সে নতুন কোরে তলিয়ে গেলো।

'দূর বোকা, তোরে মারবো কেনো?'

'না, তুই মার। আমি তোরে ওইসব কথা.........'

'ও কিছু না। তুই তো আর মিছে কিছু বলিসনি। এইই ভালো হয়েছে।'

'তুই এমুন কইরা যাইস না ভাইয়া।'

'তা আর হয় না রে। চলে যাচ্ছি, মরে তো আর যাচ্ছি নে! দেখিস, বরের ঘরে তোর যাবার আগেই আমি দাঁড়িয়ে গেছি। হাতে টাকা হোলে তোর জন্যে না দারুণ একটা শাড়ি কিনবো, টিয়ে রঙা। ওটাই তো তোর ফেভারিট কালার। পাড়টা কোন রঙয়ের হবে রে? লাল? এই দেখ, আবার কাঁদতে শুরু করেছিস। তোর বিয়েতেও দারুণ মজা করবো, দেখিস! আর কিছু না হোক, বিয়ের সময় তোর বরকে দারুণ একটা রিং দেবো। তোকে? তোকে কিচ্ছু দেবো না তখন, শুধু চমৎকার এক তোড়া রজনীগন্ধা। তোর মনে আছে সেই কথা– সেই যে আমার হোস্টেলে গিয়ে– নে তো বাবা, চোখ মোছ এবার। শোন, তুই আমার শুধুমাত্র বোনই নোস; তুই আমার বোন, ভাই, আমার বন্ধু— সব, বুঝলি বুদ্ধু!'

রানু আরো জোরে কেঁদে ওঠে।

'নাহ্, এই হলো তোর দোষ। শ্বশুর বাড়িতে তোকে এই কান্নার জন্যে নির্ঘাত দেবর-ননদদের কাছে টিটকারি খেতে হবে। শোন, আমার কিন্তু সময় হয়ে গেছে। কই তুই আমাকে এক কাপ চা খাওয়াবি, তা না— কাঁদতে লাগলি।'

খুব কাজ হলো এবার। শাড়ির আঁচলে চোখ মুখ মুছে রানু চট কোরে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো। শিমুল মায়ের কাছে এগিয়ে গেলো এবার। কাঁধে হাত রাখলো। চোখে চোখ। টুক কোরে চুমো খেলো মায়ের কপালে, গালে।

'তুমি না মা, খুব— খুব ভালো। আমি জানি মা, তুমি আমারে খুব বেশি ভালোবাস। আর সবার চেয়ে বেশি। মা, আমিও তোমারে ভালোবাসি, বিশ্বাস করো, খুব ভালোবাসি। তোমার মুখ আমি কালো করবো না মা।'

'নিজের দিকে খেয়াল রাইখো। আমার কথা ভাবতে হইবো না। চিঠি দিও ঠিক মতো।'

'একশোবার চিঠি দেবো। তবে— প্রথম দিকে কিছুটা দেরি হতে পারে। তুমি আবার উল্টা পাল্টা ভাবতে বোসো না যেনো।'

'টাকা পয়সা লাগলে আমারে জানাইও। মনে রাইখো— তোমার মা অহনও মইরা যায় নাই, বাঁইচা আছে। আর', লতা একটু থামলেন। 'শত হইলেও হেয় তোমার বড় আপা। পারো তো তারেও এক কলম লেইখ্যো। হেয় তোমার খারাপ চায় না।'

'ভালো কথা মা, আমি তোমার চেক থেকে তিনশো টাকা নিয়েছি।' শিমুল দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টায়।

'তিনশো টেহা!'

থমকে গেলো লতা। একদম হতভম্ব। খুব হতাশ হয়ে উঠলো সে। শিমুলের লম্বা হাত সে ভালোই চেনে। ভিন্ন ধরনের আশ্চর্যের এক অভিব্যক্তিতে তার মুখ বিষণ্ন এবং থমথমে। শিমুল হাসলো।

'বারে, শোধ করতে হবে না আবার? বোঝা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভালো কথা মা, সাত জোড়া কবুতর আমি হাসেমের কাছে বেচে দিয়েছি। দুই জোড়া গিরিবাজ আর তিন জোড়া লোটন। বাকি দুই জোড়া যা খুশি ও বেছে নিক। পুরো পাঁচশো টাকা। নিতে এলে ওকে তুমি কবুতর দিয়ে দিও।' হাঁটু মুড়ে মাকে সালাম করলো শিমুল। অনেকদিন পর। ছেলের মাথায় হাত রেখে লতা ঠোঁট নাড়লো, তবে শব্দ বের হলো না। তার দুই চোখে জলের ধারা। থর থর কোরে তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নিলো শিমুল। হাতে বইয়ের কার্টুন।

'রানু না চা বানাইতাছে? খাইয়া যাও।'

'থাক না মা! তাছাড়া— সময়ও আর খুব একটা নেই।'

কোনো উচ্চবাচ্য না কোরে শিমুল ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

'শিলুরা টঙ্গীতে বাসা নিছে। তাগো কাছে যাইও, আমি চিঠি লেইখা দিমুনে।' লতা ছেলের সাথে সাথে হাঁটতে থাকে।

'না মা, খবরদার; ওসব করতে যেয়ো না। আমি এমনিতেই মাঝে মাঝে গিয়ে ওদেরকে দেখে আসবো। তুমি এতোবেশি ভেবো না তো!'

'ঢাকা গিয়া কার কাছে উঠবা? যোকিমের কাছে?'

'এখনো ঠিক করিনি।'

'ঠিক না কইরা ঢাকা যাওন যায় না। ঢাকা অন্য রকম শহর।'

'কি যে তুমি কও না মা? আমি বুঝি তা' জানিনে? ঢাকা ঢাকাই।'

'সাগরের কাছে যাও তা'ইলে?'

'এ নিয়ে তুমি ভেবো না তো মা!' শিমুল দাঁড়ালো। 'এবার তুমি ফিরে যাও মা।'

লতা শিমুলের হাত ধোরে দাঁড়িয়ে পড়লো। সে শিমুলের মাথার ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দিলো, হাত বুলিয়ে দিলো পিঠে, হাতে।

কয়েক হাত সামনেই বাঁক। তিনটে সতেজ দেবদারু গাছ এক দঙ্গল ভাটগাছের সাথে মিতালী কোরে বাঁককে নিশ্ছিদ্র আড়াল কোরে রেখেছে। বাঁক পার হোলেই পাকা ব্রিজ। তারও চল্লিশ পঞ্চাশ গজ পূবে পাকা রাস্তা। শিমুল ও বিকুর লাগানো বটগাছটা বেশ বেড়ে উঠেছে। বটগাছের তলায় রিক্সা নিয়ে মুক্তার নিশ্চয় বেশ কিছুক্ষণ ধোরে অপেক্ষা করছে। শিমুল শেষবারের মতো মায়ের দিকে তাকালো। তারপর— মাথাটা সামান্য নিচু রেখেই বাঁকের দিকে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে গেলো। কান্না পাচ্ছে ওর, ভীষণ কান্না! দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে, আর একবারও পেছনে না ফিরে হাতের কার্টুনটা ঝাঁকুনি দিয়ে শিমুল বাঁকের আড়ালে একটু একটু কোরে আড়াল হয়ে গেলো।

লেখক পরিচিতি

পাবনা জেলা। রেল স্টেশন ও থানা চাটমোহর এর মাঝামাঝি মথুরাপুর গ্রাম।পাকা রাস্তার পাশ ঘেঁষে মিশন পাড়া। এখানেই তার জন্ম। দিনটি ছিল ১২.৯.'৬১ইং।

জন্মলব্ধ ধর্মীয় ভাবাদর্শের টানে স্কুল জীবন কাটে মূলত মিশনারি স্কুলের হোস্টেলে।ঘুরতে হয়েছে চার-চারটি স্কুলে। এহেন অস্থির স্থানান্তরের টানাপোড়েনে চেতনার গভীরে অবচেতনভাবেই বাড়তে থাকে একটা বিষলতা, যা বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণা হয়ে জীবনকে পীড়ন করতে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে।

যশোর এম.এম. কলেজে অধ্যয়নকালে ছাত্র রাজনীতির সাথে কিছুটা ছোঁয়াছুঁয়ী। সেই সাথে বাম ধারার সাহিত্যগোষ্ঠী 'উন্মেষ'-এর সাথে সখ্যতা। গতানুগতিক ভাবাদর্শে টান লাগে পাশ্চাত্যের লেখা এবং মার্কসীয় দর্শনের প্রভাবে। শুরু হয় লেখাপড়া ও জঠর নিবৃত্তির এক কষ্টকর অথচ অপরিহার্য ভাঙ্গাগড়ার বাওকুড়ানি ঝড়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে তাতে আসে যৌক্তিক স্থিরতা। এই স্থিরতা যোগায় শক্তি। লালিত বিশ্বাসে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়। পথ এবং পদ্ধতিটা কঠিন এবং জটিল! লেখক তবুও স্পর্ধা দেখিয়ে পা বাড়ান। জড়িয়ে পড়েন সশস্ত্র মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের সাথে। তাকে ছাড়তে হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহ, মাখতে হলো মেঠো-পথের ধূলো আর কল-কারখানার ধোঁয়া। জানতে হলো পৃথিবীর ইতিকথা, শুরু করতে হলো করণীয়। পথ চলার এমন এক ক্ষণে তিনি গ্রেফতার হন এবং কালাকানুন ও সাজার বিষচুম্বনে হয়ে ওঠেন অচেনা দূরবর্তী দ্বীপের বাসিন্দা। শুরু হয় অকল্পনীয় নিত্য-নতুন অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার সেই ঘৃণা এবং ভালোবাসাকেই বর্ণমালার আঁচড়ে লেখক এঁকে চলেছেন। যখন কবিতার প্রাথমিক সজ্ঞাও তার জানা ছিল না, তখন থেকেই— সেই শৈশবে কবিতা লেখায় তার হাতে খড়ি। আর থামেননি তিনি। অথচ প্রচারে লেখক চূড়ান্তভাবেই ঘরকুনো'র পরিচয় দিয়েছেন।